পাঁচটি
রোম্যান্টিক উপন্যাস

নিমাই ভট্টাচার্য

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

বিরাট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ব্যাক ব্রাশ করতে করতে ক্যাপ্টেন রায় গুন্‌গুন্‌ করে সুর আওড়াচ্ছিলেন, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে—।'

কোন্‌ মণিহার? আমি অফিসার হয়ে এই এ-ডি-সি-র চাকরি? নাকি মণিকা?

বোধহয় মনে মনেই নিজেকে প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন রায়। মুখে কিছু বলেন না, শুধু ঠোঁটের কোণায় মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সামনের আয়নায় দেখে চোখ দুটো কেমন যে রোমান্টিক হয়ে নীরব ভাষায় কত কথা বলে।

ব্যাক ব্রাশ করতে করতেই একবার হাতের ঘড়ি দেখে নেন। না, ঠিক আছে। এখনও পঁচিশ মিনিট হাতে আছে।

মুখখানা একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নেন। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ দেখাচ্ছে। সকাল বেলায় হট বাথ নেবার পর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর ইউনিফর্ম পরলে বেশ লাগে।

ব্রাশটা নামিয়ে রাখলেন। এবার একটু পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার ভালোভাবে দেখে নেন। 'ও-কে!'

আবার গুন্‌গুন্‌ করে কি যেন একটা সুর আওড়াতে আওড়াতে ক্যাপ্টেন রায় ওপাশে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সেন্টার টেবিল থেকে আর্ম ব্যাচটা তুলে নিলেন। স্যাফরন কলারের ব্যাচের মাঝে ভুলে যাওয়া অতীত ভারতের অশোকস্তম্ভ। ওটা এখন ভারতের প্রতীক। আর্ম ব্যাচের ওই অশোক পিলারের প্রতিকৃতি দেখে মুচকি হাসেন ক্যাপ্টেন রায়। হাসবেন না? মনে মনে ভাবেন যদি কোনো মাস্টারমশাই ধরনের লোক জিজ্ঞাসা করেন, 'ওহে ছোকরা, বৈষ্ণবদের তিলক কাটার মতো সর্বাঙ্গে তো অশোকস্তম্ভের ছড়াছড়ি! বলতে পার সম্রাট অশোক কোথায় জন্মেছিলেন? কবে জন্মেছিলেন? এই অশোকস্তম্ভ কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?'

এসব কিছু জানে না সে। হয়তো স্বয়ং গভর্নরই...। চাকরি করতে কি জ্ঞান বুদ্ধির দরকার হয়? তাহলে তো প্রায় কারুরই চাকরি বাকরি করা হতো না। ইউনিভার্সিটির একটা চোথা সার্টিফিকেট হলেই সরকারি চাকরি পাওয়া যায়। বিদ্বান, বুদ্ধিমান বা কর্তব্যপরায়ণ হলে চাকরিতে বিভ্রাট হয়।

এই সাত সকালে যত সব আজেবাজে চিন্তা! ক্যাপ্টেন রায় আর্ম ব্যাচটি তুলে হাতে পরেন। বেশ লাগে দেখতে।

চট করে আবার হাতের ঘড়ি দেখে নেন। না, না, আর দেরি নয়। আটটা কুড়ি হয়ে গেছে। মাত্র দশ মিনিট বাকি। ওপাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে পার্সটা পকেটে পুরে নিলেন, পেন, বলপেনটাও তুলে নিলেন।

দরজায় দুবার নক্‌ করার আওয়াজ হল।

'কাম ইন।'

অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেটের একটা টিন ও একটা দেশলাই হাতে করে আমজাদ আলি ঘরে ঢুকল।

'নমস্তে।'

নমস্তে বলেই হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন আর দেশলাইটা নিলেন ক্যাপ্টেন রায়।

সব সময় অবশ্য গৌরবে বহুবচন হয় না। গভর্নরের অবর্তমানে বা প্রোটোকলের নিয়মানুসারে অনেক সময় এ-ডি-সি-কেই গভর্নরের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। ভাগ্যক্রমে অনেক সময় সে-সব ছবিও খবরের কাগজের পাতায় পরদিন সকালে দেখতে পাওয়া যায়।

আমজাদ আলি বেড-টি তৈরি করতে করতেই ক্যাপ্টেন রায় দেখে নেন খবরের কাগজের পাতায় নিজের বা অন্য সহকর্মীর ছবি। বেশ লাগে। চীফ্ অফ্ দি আর্মি স্টাফের ছবি নানা কারণে খবরের কাগজে ছাপা হলেও লেফ্টেনান্ট জেনারেল বা মেজর জেনারেলের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয় না বললেই চলে। অথচ ক্যাপ্টেন রায়ের মতো এ-ডি-সি-দের ছবি হরদম কাগজে ছাপা হচ্ছে।

একটা স্কুল গ্লোবের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে যে সময় লাগে, তার চাইতেও কম সময়ে বিশ্ব সংবাদ পরিক্রমা সমাপ্ত করেন এ-ডি-সি সাহেব। তারপর দেখে নেন গভর্নরের কোনো ছবি আছে কিনা। সত্যিকার কোনো ভি-আই-পি-র আগমন নির্গমন হলেই গভর্নর সাহেবকে যেতে হয় দমদম এয়ারপোর্টে। এক গোছা ফুল তুলে দিতে হয় সেই ভি-আই-পি-র হাতে। অথবা দন্ত বিকশিত করে একটা হ্যান্ডসেক। ব্যাস! সূর্যের আলোকে ম্লান করে দিয়ে জ্বলে উঠবে প্রেস ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ বাল্বের আলো। হাই অফিসিয়াল আর পুলিশের হুড়োহুড়িতে তখন কেউ খেয়াল করেন না, কিন্তু পরের দিন সকালের কাগজগুলিতে ঠিক দেখা যাবে কি একটা অজ্ঞাত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ভি-আই-পি আর গভর্নরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সোনালি-রূপালী বিচিত্র পোশাক পরা এ-ডি-সি!

সভা-সমিতি, লাঞ্চ-ডিনারে গভর্নর বক্তৃতা দিলেও অনেক সময় ছবি ছাপা হয়। সেখানেও লাটসাহেবের পাশে পাওয়া যাবে এ-ডি-সি-কে।

আমজাদ বেড-টি দিয়ে চলে যায়। আবার আসে ঠিক সাড়ে সাতটায়। প্রায় আড়াই ফুট লম্বা রূপোর ট্রে করে নিয়ে আসে ব্রেকফাস্ট। আর আসে এই আটটা পঁচিশে। সিগারেট-দেশলাই দিতে।

অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেটের টিনটা পকেটে পুরতে পুরতে আবার হেসে ফেলেন ক্যাপ্টেন রায়। হাসবেন না? অশোকস্তম্ভ মার্কা এই সিগারেট খাদি প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয় না। পাক্কা বিলেতি কোম্পানির সিগারেট ডবল মাশুল দিয়ে এই স্বদেশীপনার ন্যাকামি প্রচার করা হয় দেশ-বিদেশের অতিথিদের কাছে। দুষ্টু সন্ন্যাসীরা যেমন কাঁচা বিধবা সেবাইত রেখে ভোগ করেন, অনেকটা সেই রকম আর কি! সাধাসিধে মানুষদের ধোঁকা দেবার জন্য চাই মোটা খদ্দর আর রাতের আবছা আলোয় চাই পাক্কা স্কচ! ইতালিয়ান ভারমুথ বা মার্টিনী হলেও চলবে না।

আমজাদের সঙ্গে সারাদিনে আর দেখা হবে না। রোজ সকালে মেসিনের মতো তিনবার আমজাদ আসে এ-ডি-সি সাহেবের ঘরে। সাড়ে ছটায় ছোট্ট এক পট চা আর একটা সিঙ্গাপুরী কলা নিয়ে। ওই বেড-টি দেবার সময়ই কলকাতার মর্নিং পেপারগুলো নিয়ে আসে আমজাদ। আমজাদই চা তৈরি করে। আর সেই ফাঁকে এ-ডি-সি সাহেব চোখ বুলিয়ে নেন খবরের কাগজগুলোতে।

আর দেরি করেন না ক্যাপ্টেন রায়। প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে করিডোরে পা দিতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ান লর্ড ওয়েলেসলীর ওই বিরাট

পেন্টিংটার সামনে। ওই মুহূর্তের মধ্যেই ক্যাপ্টেন শ্রদ্ধা জানান ওই মহাপুরুষকে যাঁকে ইংরেজরা ঠাট্টা করে বলত Sultanized Englishman. ইংরেজ হয়েও যিনি সুলতানের মতো প্রমত্ত থাকতে ভালোবাসতেন—যিনি লালকেল্লা-কুতব-মিনার-তাজমহল তৈরি না করলেও ডালহৌসী পাড়ায় লাটসাহেবের ওই প্রাসাদ তৈরি করেছেন, তাঁকে বড় ভালো লাগে ক্যাপ্টেন রায়ের। ইতিহাসের পাতায় লর্ড ওয়েলেসলীর নাম লেখা থাকলেও ভারতের মানুষ তাঁকে ভুলে গেছে। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকরা হয়তো নানা অপকীর্তির জন্য লর্ড ওয়েলেসলীর বিদেহী আত্মাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, কিন্তু গভর্নর থেকে শুরু করে রাজভবনের জমাদার পর্যন্ত তাঁকে লুকিয়ে শ্রদ্ধা করবেই। ক্যাপ্টেন রায় তো তাই ডিউটিতে যাবার আগে ওয়েলেসলীর ওই পেন্টিংটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন না।

এগজ্যাক্টলি অন্ দি ডট্! কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায় আধ ডজন বেয়ারার সেলাম নিতে নিতে অফিসে হাজির। লাটসাহেবের ছাপান প্রোগ্রাম সামনেই রয়েছে।

ছাপান প্রোগ্রাম?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছাপান। সোস্যালিস্ট ভারতবর্ষের নাবালক সংবিধানের সাবালক অভিভাবককে কি টাইপ করা কাগজে ডেইলি এন্‌গেজমেন্ট দেখান যায়?

সাধারণত সাড়ে আটটা নাগাদই লাটসাহেবও নিজের অফিসে আসেন। সারা দিনের কাজকর্ম নিয়ে এ-ডি-সি ও সেক্রেটারির সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলেন। তারপর তিনি ভিজিটার্সদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেন।

...লাটসাহেবের দপ্তরের দুটি ভাগ। সেক্রেটারি টু দি গভর্নরই সর্বেসর্বা। তবে সাধারণত তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে গভর্নরের যোগসূত্র রক্ষা করেন বা তদারক করেন। প্রতিদিন বেশ কিছু সরকারি ফাইলে ও নথিপত্রে গভর্নরকে অটোগ্রাফ দিতে হয়। ঠিক টপ সিক্রেট কাগজপত্র কিছু নয়। অধিকাংশই মামুলি ধরনের আর আসে ক্যাবিনেটের কাগজপত্তর। মন্ত্রীদের ফরমায়েস মতো চীফ সেক্রেটারি বা হোম সেক্রেটারি মারফত যে সব ফাইলের বাণ্ডিল আসে গভর্নরের সেক্রেটারির কাছে, চটপট গভর্নরকে দিয়ে সই করিয়ে সে-সব ফাইল ফেরত পাঠানই সেক্রেটারির প্রধানতম কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও টুকটাক চিঠিপত্র আসে। সে-সবের সদ্‌গতি করাও ওই সেক্রেটারি সাহেবেরই কাজ।

রাজভবনের দেখাশুনা, অতিথি আপ্যায়ন, সরকারি অতিথি-শালা পরিচালনা, গভর্নরের ভ্রমণসূচী ঠিক করা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা ইত্যাদি সব কাজই আগে দেখাশুনা করতে মিলিটারি সেক্রেটারি। ওটা ইংরেজ আমলের নিয়ম ছিল। বীরপুরুষ ইংরেজ যেকালে মনে করত সব ইন্ডিয়ানদের পকেটেই একটা রিভলভার থাকে, সেকালে মিলিটারি সেক্রেটারি ছাড়া ও সব দায়িত্বকে বহন করতে পারত? জমানা বদল গয়া। এখন একজন মামুলী ধরনের ডেপুটি সেক্রেটারি, মিলিটারি সেক্রেটারির কাজ করেন। সাধারণত যেসব অফিসারকে দিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই অথচ ফালতু মাতব্বরী করতে শিরোমণি, তাদেরই পাঠান হয় রাজভবনে।

রাজভবনে পোস্টিং পাওয়া অবশ্য শাপে বর। যাগ্‌গে সেসব কথা।

এ-ডি-সি-দের কাজ হচ্ছে গভর্নরের খিদমদগারি করা। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম যাঁরা তামিল করেন, তাঁদেরই বলা হতো এইড-ডি-ক্যাম্প্। জাপানের সম্রাট, রাশিয়া বা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এ-ডি-সি নেই কিন্তু আমাদের গভর্নরদের তিন তিনজন করে এ-ডি-সি থাকে। আশে পাশে কিছু মোসাহেব বা খিদমদ্গার ভ্রমরের মতো গুঞ্জন না করলে জমিদার ইংরেজ

ঠিক শান্তি পায় না। নিজের দেশে বৌ বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, নিজে গাড়ি চালাবে কিন্তু জমিদারিতে এলেই সব ঠুটো জগন্নাথ। তখন কথায় কথায় সেলাম চাই, সেক্রেটারি চাই, সোফার চাই, আয়া চাই, কুক চাই, চাই এ-ডি-সি আর কত কি!

বেশ লাগে দেখতে। হঠাৎ দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এরা রাষ্ট্রপতি ভবন বা রাজভবনের বেয়ারা, চাপরাশী, অর্ডালী বা অন্য কিছু। মনে হবে চিৎপুরের যাত্রা পার্টির মীরমদন, মীরকাশিম বা সিরাজের সৈন্যবাহিনীর অন্য কেউ।

ডালহৌসী পাড়ায় বাঙালির ছেলেরা বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে মুখের গ্রাসের জন্য দিবারাত্র সংগ্রাম করছে। জীবন-সংগ্রামের এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে রাজভবন একটি ছোট্ট দ্বীপ। অমরাবতী, অলকানন্দা। ক্লাইভ, কার্জন, ডালহৌসীর আত্মা যেন ওখানে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মীরমদন, মীরকাশিমের দল তাদের খিদমদ্গারী করছে।

ক্যাপ্টেন রায়ের বেশ মজা লাগে। ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ওই ব্যারাকের জীবন থেকে রাজভবন। এ যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। বেগম নেই, বাদশা নেই, সন্ধ্যাবেলায় নর্তকীর ঘুঙুরের আওয়াজ নেই, নেই সেতারে দরবারি কানাড়া ও মেঘমল্লারের ঝঙ্কার কিন্তু তবু এ যেন বিংশ শতাব্দীর অচিন দেশ!...

পৌনে নটা নাগাদ ছোট্ট একটা তুড়ির আওয়াজ! মীরমদন, মীরকাশিমের দল সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে আর একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন রায় সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ইউনিফর্মটা একটু ঠিক করে নিয়েই বেরিয়ে করিডোরে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই গভর্নর সাহেব বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে।

স্মার্ট আর্মি অফিসারের মতো ক্যাপ্টেন রায়ের দুটো বুটে একটা ছোট্ট ঠোকাঠুকি আর সঙ্গে সঙ্গে একটা স্যালুট।

গভর্নর সাহেব ডান হাতটা তুলে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

তারপর একটু মাথা নীচু করে ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'গুডমর্নিং! ইওর একসেলেন্সী!'

'গুডমর্নিং!'

সিরাজের সৈন্যবাহিনী করজোড়ে মাথা নীচু করে প্রভুভক্তি দেখাল।

গভর্নর নিজের অফিস কক্ষে গেলেন। ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করলেন এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায়।

গভর্নর সাহেব চেয়ারে বসে বলেন, 'আজ কেয়া হ্যায়?'

'স্যার, সকালে তিনজন ভিজিটার্স আছেন। আফটারনুনে মরক্কোর অ্যাম্বাসেডর আসবেন আর ইভনিং-এ মিস রমলা যোশীর একজিবিশন ওপেনিং আছে।'

'কোনো গেস্ট আসছেন নাকি আজ?'

'লেট নাইটে বম্বে থেকে ইউনিয়ন ডেপুটি মিনিস্টার ফর সাপ্লাই আসছেন।'

গভর্নর সাহেবের চোখমুখ দেখে মনে হল ডেপুটি মিনিস্টার সাহেবের আগমনের খবর শুনে মোটেও খুশি হলেন না।

'হাউ লং উইল হি স্টে হিয়ার?'

'স্যার, উনি চারদিন থাকবেন।'

'চা—র—দি—ন?'

'ইয়েস স্যার।'

এ-ডি-সি তো নিজের লোক। গভর্নর সাহেব আর মনের কথা চেপে রাখতে পারেন না।

বলেন, 'বুঝলে ক্যাপ্টেন, আগে এইসব লোক বড়বাজারের গলিতে কোনো কাটা কাপড়ের দোকানদারের বাড়িতে উঠত!' একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারলেন না হিজ এক্সেলেন্সী। 'আর আজ! এরাও গভর্নমেন্ট হাউসে উঠছে!'

কথাটা বলেই শান্তি পেলেন না। সমর্থনের জন্য এ-ডি-সি-র দিকে তাকালেন।

ক্যাপ্টেন রায় কি করবেন? মাথাটা একটু নেড়ে চাপা গলায় বললেন, 'ইয়েস স্যার!'

'বুঝলে ক্যাপ্টেন...'

গভর্নর সাহেব আরো কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। দরজার কোণা থেকে একজন বেয়ারা এ-ডি-সি সাহেবকে কি যেন একটা ইসারা করল।

'এক্সকিউজ মি স্যার! আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

ক্যাপ্টেন রায় চটপট বেরিয়ে নিজের অফিসে গিয়েই নামিয়ে রাখা টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিলেন।...'ক্যাপ্টেন রয় হিয়ার...'

ওপাশ থেকে কিছু শোনার পর ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'উনি এসে গেছেন? দ্যাটস্ অল রাইট। উপরে পাঠিয়ে দিন।'

এ-ডি-সি আবার গভর্নরের অফিসে গেলেন।

'স্যার, মিঃ জগতিয়ানী আসছেন। এখানেই বসবেন নাকি ড্রয়িংরুমে যাবেন?'

'আরো তো অনেকে আসছেন। অনেকক্ষণ তো বসতে হবে, সো লেট মি গো টু ড্রইংরুম।'

গভর্নর ড্রইংরুমে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন রায় গেলেন নিজের অফিসে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বেয়ারা মিঃ জগতিয়ানীকে নিয়ে এল এ-ডি-সি-র ঘরে।

ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। করমর্দন করতে করতে বললেন, ''হাউ ডু ইউ ডু স্যার?'

'আই অ্যাম ফাইন। হাউ ডু ইউ ডু?'

ক্যাপ্টেন সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলেন।

'না, না, আমি সিগারেট খাই না।'

'বাঃ, আপনি তো বেশ বাংলা বলেন।'

'ভবানীপুরে জন্মেছি, সাউথ সুবার্বন স্কুলে পড়েছি। বাংলা বলব না?

ক্যাপ্টেন রায় খুশি হন। মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

মিঃ জগতিয়ানী মজা করার জন্য বললেন, ''আমি যা বাংলা বই পড়েছি, তা বোধহয় আপনাদের মতো অনেক অফিসারই পড়েননি।'

'খুব ভালো কথা।'

ক্যাপ্টেন রায় হাতের ঘড়িটা দেখেই 'বাজার' বাজালেন। বেয়ারা ঘরে আসতেই মিঃ জগতিয়ানীর নাম ছাপান স্লিপটা তাকে দিলেন। একটু পরেই বেয়ারা ফিরে এল। ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন।'

ড্রইংরুমের দরজায় দুবার নক করেই এ-ডি-সি ভিতরে ঢুকলেন।

'...স্যার, মিঃ জগতিয়ানী ইজ হিয়ার।'

মিঃ জগতিয়ানী ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন রায় বেরিয়ে এলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বেয়ারা চা আর কিছু নাটস্ নিয়ে ওই ঘরে ঢুকল।

নিজের অফিসে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন রায় সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন।

ওই চেয়ারে বসেই একটু কাত হলেন। একটু যেন তলিয়ে গেলেন। এ-ডি-সি-র চাকরিতে মজা অনেক। তবে সব চাইতে বেশি মজা বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে।

আবার সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন ক্যাপ্টেন রায়।

স্কুলে পড়ার সময় মনে হতো কত ছেলের সঙ্গে ভাব। তারপর কলেজে পড়বার সময় মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সবার সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেছে। মানুষ সম্পর্কে এত অভিজ্ঞতা বোধ করি আর কারুর হয়নি, হতে পারে না। আরো পরে আর্মিতে ঢোকার পর মনে হল, দুনিয়ার বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল।...

দেরাদুন ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির মেসের একই ঘরে থাকত ওরা দুজনে। ক্যাপ্টেন রায় তখন ক্যাডেট রায়। ক্যাডেট কমল রায়। জেনকিন্সও এই ব্যাচের ছিল। পার্ক সার্কাসের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারে জন্ম হলেও মনে মনে পুরোপুরি বাঙালি ছিল। কবিতা লিখতে জানত না বটে তবে ভাব প্রবণতায় বাঙালির ছেলেদেরও হার মানাত। প্রবাসী বাঙালি বলে কমল বরং ওর চাইতে অনেক কম ভাবপ্রবণ ছিল। তবু বড় ভাব ছিল দুজনে।

ছুটির দিনে দুজনে সাইকেলে চেপে প্রথমে যেত এফ-আর-আই-এর ওই ছোট্ট মার্কেটের কোণার নোংরা রেস্তোরাঁয়।

জেনকিন্স বলত, 'বাঙালি হয়ে নোংরা রেস্টুরেন্টে না খেলে যেন মন তৃপ্ত হয় না।'

দুজনে দুকাপ চা খেয়ে চলে যেত শহরে, দেরাদুনে। রাজপুর রোডের ধারে কোনো একটা সিনেমা হলে ঢুকে পড়ত। কোনো কোনো দিন আবার সিনেমা হলে না ঢুকে ওই রাজপুর রোড ধরেই আরো এগিয়ে যেত সাইকেলে চড়ে। শহরের ধারে পাহাড়ের কোলে বসে গল্প করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কেন ছুটিতে? কত কি করেছে দুজনে।

একবার ছুটি থেকে ফিরে ক্যাডেট কমল রায় মেসে এসে আর দেখতে পেল না জেনকিন্সকে। একদিন, দুদিন, তিনদিন পর হয়ে গেল। জেনকিন্সের পাত্তা নেই। কমলের মনটা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কয়েকদিন পরে অফিসে খবর নিয়ে জানল, মার্ডার করার দায়ে জেনকিন্স জেল হাজতে।

জেনকিন্স মার্ডার করেছে? অনেক চিন্তা ভাবনা করার পরও বিশ্বাস করতে পারল না। মাস কয়েক পরে হঠাৎ জেনকিন্সের ছোট্ট একটা চিটি পেল কমল।

'...প্রেসিডেন্সি জেলের একটা 'সেল' থেকে এই চিঠি লিখছি। দুনিয়ার সব চাইতে জঘন্যতম কাজ—মানুষ হত্যা আমি করেছি। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পীর সৃষ্টিতে যে মাকে মহীয়সীরূপে দেখিয়েছে, যাঁর গর্ভে জন্মে আমি ধন্য হয়েছি সেই তিনি পয়সার জন্য এত নীচে নামতে পারবেন, ভাবতে পারিনি। হাজার হোক নিজের মা। তাইতো রিভলভারটা তাঁর দিকে তুলতে পারলাম না, যে পিশাচ মাকে কলুষিত করেছিল, সেই তাকেই একটা গুলিতে শেষ করে দিলাম।...'

'আর কেউ না হোক, অন্তত তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।...'

চমকে উঠেছিল ক্যাডেট কমল রায়। এই দুনিয়ায় এও হয়?

এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায় সেদিনের কথা ভেবে আপন মনে হাসে। হাসবে না? মানুষের নিত্য নতুন চেহারা দেখতে দেখতে আজ সে মশগুল হয়ে গেছে। মিঃ সর্বাধিকারীর কথা না হয় বাদই দিল। কেন মিস বিশ্বাস? এই বয়েসে কি কাণ্ডটাই করল?

মিস বিশ্বাসের কথা মনে হতেই ক্যাপ্টেন রায় হাসেন। হাসবেন না? সে তো এক মহাভারত! শেষ নেই তার কীর্ত্তির, তার কাহিনির।

অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেট কেস থেকে অশোকস্তম্ভ আঁকা বিলেতী কোম্পানির একটা সিগারেট বের করলেন। টেবিলের ওপাশ থেকে লাইটারটা টেনে নিয়ে জ্বালতে গিয়ে কি যেন ভাবলেন।

কি আর ভাববেন?

ভাবছিলেন ডায়মণ্ডহারবার রোডের সরকার বাড়ির কথা। আদিনাথ সরকার, দিবানাথ সরকার ও সতীনাথ সরকার। তিন ভাই। তিন রত্ন? মণিমাণিক্য হীরা-জহরত বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশের উর্বর জমিতে বিনা কসরতে ধান, পাট আর বিপ্লবী হতে পারে কিন্তু শিল্পপতি হওয়া দুর্লভ ব্যাপার। রাজস্থানের মরুভূমির প্রাণহীন, হৃদয়হীন বীজ, বাংলাদেশের জল হাওয়ায় শুধু বড়বাজারে নয় সর্বত্রই পল্লবিত হয় কিন্তু বাংলার বীজ ডালহৌসী-ক্লাইভ স্ট্রিটে পুঁতলেও কৌনোদিন ফল ধরে না। বিধাতার এই নির্মম রসিকতাকে উপেক্ষা করে যে মুষ্টিমেয় কটি বাঙালি পরিবার লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করতে পেরেছেন, সরকার বাড়ি তার অন্যতম।

আদিনাথ তো সাক্ষাৎ দেবতা। চেহারাটা দেখলেই ভক্তি আসে। সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ছাত্রজীবন শেষ করে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথমে ক্যানিং স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিট। পরে মিশন রো। আরো পরে ব্রেবোর্ন রোড। হাজার। লাখ। কোটি। না জানি কত কোটি।

এখন বয়েস হয়েছে। টাকা পয়সা স্পর্শ করলে রামকৃষ্ণের মতো জ্বালা অনুভব না করলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। এখন সাধুসঙ্গ আর সৎ কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। পরলোকগতা স্ত্রী নীহারিকা দেবীর নামে কলকাতার উপকণ্ঠে 'নীহারিকা মাতৃসেবাসদনে' নিত্য কত নারীর সেবা হচ্ছে। কত সহায় সম্বলহীনার শিশু পৃথিবীর প্রথম আলো দেখছে এই মাতৃসেবাসদনে।

সিগারেট জ্বালতে গিয়ে লাইটারটা হাতে নিয়ে এত কথা মনে পড়ার কথা নয়। কিন্তু কি করবে ক্যাপ্টেন রায়? হিজ্ এক্সেলেন্সী জগৎপতি বাজপেয়ী পাঁচ পাঁচ বছরের দুটি টার্মে বাংলাদেশের গভর্নর থাকায় এই সরকার বাড়ির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ না হয়ে পারেনি।

ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে বেশ কিছু এগিয়ে গেলে 'নীহারিকা মাতৃসেবাসদন'। মেটারনিটি আর জেনারেল ওয়ার্ড আগের থেকেই ছিল কিন্তু সার্জিক্যাল ওয়ার্ড না থাকায় বড়ই অসুবিধা হচ্ছিল। চটপট অপারেশন করলে যাঁদের বাঁচান যেত তাঁরাও পি-জি-তে যাবার পথে অ্যাম্বুলেন্স বা ট্যাক্সিতেই প্রাণ হারাতেন। আদিনাথবাবু মনে মনে বড় কষ্ট পেতেন। বছরের পর বছর নিঃশব্দে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ভাবতেন, হয়তো আশেপাশে সরকারি হাসপাতালে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও কিছু হল না। রাইটার্স বিল্ডিং-এ দরখাস্ত পাঠান হল নানা মহল থেকে। না, তবু অচলায়তন নড়ল না।

এম-এল-এ বিনোদবাবু যখন এসে বললেন, 'সামনের বছরের বাজেটে ইনক্লুড করার জন্য কত অনুরোধ করলাম কিন্তু তাও সম্ভব হল না।'

অচঞ্চল আদিনাথবাবু বললেন, 'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। মার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে...'

মাস ছয়েক পরে বিনোদবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আদিনাথবাবু এলেন রাজভবনে। ক্যাপ্টেন রায়

সেদিন ডিউটিতে ছিলেন না। কিন্তু যেদিন সকালে 'নীহারিকা মাতৃ সেবাসদনে'র সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের ও অপারেশন থিয়েটারের ওপেনিং করতে গভর্নর গিয়েছিলেন, ক্যাপ্টেন রায় সেদিন ডিউটিতে ছিলেন।

সরকার বাড়ির সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়।

তারপর গত দশ বছরে কত শত অনুষ্ঠানে কত শতবার দেখা হয়েছে দিবানাথ ও সতীনাথ সরকারের সঙ্গে। শুধু দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নয় সতীনাথের সঙ্গে আজ তাঁর গভীর বন্ধুত্ব।

এই সতীনাথই দিয়েছিল লাইটারটা। রনসনের বেস্ট কোয়ালিটি। আঙুল দেবার আগেই যেন জ্বলে ওঠে। সে আগুন বাড়ান যায়, কমান যায়। কখনো দপ্ করে জ্বলে, কখনও ধীরে ধীরে জ্বলে। দিনের আলোয় সে আগুনের শিখা নজরে পড়ে না অপরিচিতের চোখে।

লাইটারটা নিয়ে আরো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর ক্যাপ্টেন রায় সিগারেট ধরালেন। এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন।

আবার নজর পড়ল লাইটারটার উপর। আপন মনেই মুচকি হাসল। এতো লাইটার নয়, যেন সতীনাথ সরকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে উপরটা। দেখে বুঝা যায় না, একটা আগ্নেয়গিরি। কল্পনা করা যায় না, এর ভেতর এত আগুন লুকিয়ে আছে। রনসন লাইটারের মতো সে আগুন দিনের আলোয় মিশে যায় কিন্তু সন্ধ্যার পর ফ্রি স্কুল স্ট্রিট আর পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটগুলোতে আলো জ্বলে উঠলে...

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই সতীনাথের চিন্তা কোথায় লুকিয়ে পড়ল। এনগেজমেন্ট ডায়েরির দিকে তাকাতে না তাকাতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'এ-ডি-সি হিয়ার'।

মুহূর্তের জন্য ওপাশ থেকে কি যেন শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'সেন্ড হিম আপ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন রায়। টেবিলের ওপাশ থেকে টুপিটা নিয়ে মাথায় দিলেন। ইউনিফর্মটা একটু টেনে টুনে ঠিক করে আর এক ঝলক ঘড়িটা দেখে ঘর থেকে বেরিযে গেলেন।

বেয়ারা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'নেক্সট্ ভিজিটার্স আসছেন।'

রাজভবনের বেয়ারা চাপরাশীদের একটু ইঙ্গিত করলেই কাজ হয়। তাছাড়া এরা এদের কাজকর্ম দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সরকারি দপ্তরখানায় আই-সি-এস সেক্রেটারিরা ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে হাঁপিয়ে যান কিন্তু বেয়ারাদের দর্শন পান না। যে হেড অ্যাসিসট্যান্ট সেক্সন অফিসারদের ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেই তাদের টেবিলের ঘণ্টাটা দেখবেন। ঠং ঠং করে বাজাতে বাজাতে ঘণ্টার মাথাগুলো বেঁকে তুবড়ে গেছে, হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বেয়ারা-চাপরাশীর দল নির্বিকার। একটু চেঁচামেচি হয়তো শুনতে হয়, তবে বেয়ারা-চাপরাশীর দল ওসব গ্রাহ্যই করে না।

রাজভবন সরকারি পয়সায় চললেও অনেকটা বড় বড় হোটেলের মতো। ইসারা-ইঙ্গিত ফিস-ফিসই বেশি।

রাজভবনকে হোটেল বললেও অন্যায় হবে না। ভি-আই-পি-র দল তো এখানেই আতিথ্য গ্রহণ করেন। কখনও স্বদেশি, কখনও বিদেশি। কেউ একদিন বা কেউ এক সপ্তাহের জন্য। পার্থক্য শুধু একটাই। ক্যাশিয়ার-একাউন্টেন্টের কাউন্টার এখানে নেই। আর নেই আগমন

নির্গমনের সময় ওই বিরাট লম্বা খাতায় দস্তখতের পর্ব। ছোটখাটো পার্থক্য আরো আছে।

বেয়ারাকে ভিজিটার আসার কথা বলেই ক্যাপ্টেন রায় এগিয়ে গিয়ে গভর্নরের ড্রইংরুমের দরজায় দু-একবার নক করেই ভেতরে গেলেন।

গভর্নর এ-ডি-সি-কে দেখেই বুঝলেন, পরবর্তী দর্শনার্থী হাজির।

মিঃ জগতিয়ানী গভর্নর সাহেবের দুহাত ধরে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।

করিডোরে এসে দুজনে হ্যান্ডসেক করলেন।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বেশ লাগল।'

'ওসব ফর্মালিটি ছেড়ে দিন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় চলে আসুন আমার ভবানীপুরের বাড়িতে। তেলেভাজা মুড়ি খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া যাবে আর আমার মেয়ের গান শুনে আসবেন।'

সিঁড়ির দিকে এগুতে এগুতে ক্যাপ্টেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন. 'কি গান?'

'হিন্দী ফিল্মের গান না, পিওর বাংলা গান।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা-টাচ্ছা নয়, একদিন আসুন।'

সিঁড়িতে পা দিয়ে মিঃ জগতিয়ানী পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, আমি ব্যবসাদার হলেও আপনাকে এক্সপ্লয়েট করব না।'

'না, না, ও কি বলছেন।'

মিঃ জগতিয়ানী বিদায় নিলেন। ক্যাপ্টেন রায় অফিসে আসতে না আসতেই পরবর্তী দর্শনার্থী মিস্টার আর কে চ্যাটার্জি এলেন।

ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুডমর্নিং স্যার।'

'গুডমর্নিং।'

আবার বেয়ারার তলব। ছাপান স্লিপ গেল হিজ এক্‌সেলেন্সির কাছে। বেয়ারা ঘুরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় টুপিটা দিয়ে এক পা এগিয়ে বললেন, 'ইয়েস স্যার, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড...'

আবার ড্রয়িংরুমের দরজায় দুবার নক করে ক্যাপ্টেন রায় ভিতরে গিয়ে বললেন, 'ইওর এক্‌সেলেন্সি! মিঃ আর কে চ্যাটার্জি ইজ হিয়ার।'

মিঃ চ্যাটার্জিকে এগিয়ে দিয়ে এ-ডি-সি পিছিয়ে এলেন। মাথাটা একটু নীচু করে বিদায় নিলেন গভর্নরের কাছ থেকে।

এ-ডি-সি সাহেব বেরুতে না বেরুতে বেয়ারা ট্রে-তে করে চা-স্ন্যাকস্ নিয়ে ঢুকল।

ক্যাপ্টেন রায় নিজের ঘরে ফিরে এসে টুপিটি খুলে চেয়ারে বসে আবার একটা সিগারেট খাবার জন্য সিগারেট কেস আর লাইটারটা তুলে নিলেন। একটু অন্যমনস্কভাবে লাইটারটা জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎ দপ্ করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চারপাশে দরজা-জানলা খোলা। সূর্যের আলোয় ভরে আছে সারা ঘর। তবুও এমন বিশ্রীভাবে লাইটারটা জ্বলে উঠল যে চোখ দুটো যেন সহ্য করতে পারল না।

ক্যাপ্টেন রায়ের মনে পড়ল। হ্যাঁ, এই দিনের বেলাতেও সতীনাথ সরকার কখনও কখনও জ্বলে ওঠে। দপ করে জ্বলে ওঠে, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ক্যাপ্টেন রায়ের মতো বন্ধুদের চোখগুলো সহ্য করতে পারে না।

প্রথম প্রথম কষ্ট হয়, অসহ্য মনে হতো ক্যাপ্টেনের। মনটা বিদ্রোহ করতে চাইত, সৈনিক হয়েও ধৈর্যচ্যুতি ঘটত কিন্তু মডার্ন সোসাইটির সৌজন্য বজায় রাখবার জন্য কিছু করতে পারত না। প্রায় মুখ বুজে সহ্য করত।

লাইটারের আগুনটা অমন দপ্ করে, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠায় ক্যাপ্টেন মুখ সরিয়ে নিয়েছিলেন সিগারেটটা জ্বালাতে পারেননি। ফ্রেম কন্ট্রোলকে ঘুরিয়ে আবার লাইটারটা জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন ক্যাপ্টেন। প্রায় অদৃশ্য এক শিখা! মুহূর্তের জন্য বেশ লাগল দেখতে। শুধু যেন একটা ইঙ্গিত, একটা ইসারা। একটা নিমন্ত্রণ। একটা স্বপ্ন, একটা আশা। ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

মোগলের প্রাসাদ বা আলাউদ্দীন খিলজীর হারেমের অনতিদূরে বসে নয়। যমুনা পারে গুলবাহারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পারস্য-সুন্দরীদের দেখতে দেখতেও নয়, ডালহৌসী পাড়ার রাজভবনে বসে বসেই ক্যাপ্টেন রায়ের মনটা যেন একটু চঞ্চল হয়। একটু বিচলিত হয়।

সরকারি বা বেসরকারি দপ্তরে বসে মন চঞ্চল হতে পারে না। চারপাশে লোকজন গিজ গিজ করছে। বক্ বক্ করতে হয় সারাক্ষণ। তাছাড়া পরিবেশ।

রাজভবনে তো সে বালাই নেই। এ-ডি-সি-র অফিস থেকে জানলা দিয়ে দেখা যায় ফুলের জলসা, সবুজের মেলা।

আর?

আর দেখা যায় দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। দুটো ডানায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়ায় ছোট্ট ছোট্ট পাখি। কতটুকুই বা ওদের প্রাণশক্তি? কতটুকুই বা সামর্থ্য? তবুও স্বপ্ন দেখার শেষ নেই। অফুরন্ত ওদের সাধ। উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় সীমাহীন নীল আকাশের বুকে।

রাজভবনে ওই দপ্তরে বসে নীল আকাশ দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেনও উড়ে ঘুরে বেড়ান দিগন্ত বিস্তৃত পরিচিতের মহাকাশে। এ যেন সেই 'পথ হারানোর অধীন টানে অকূলে পথ আপনি টানে।'

সিগারেটে একটা টান দেন। একবার লাইটার দেখেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৃষ্টিটা ঘুরে আসে ফুলের জলসায়, সবুজের মেলায়, নীল আকাশের কোলে।

পর পর দুটো টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিলেন ঘরটা, এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন কমল রায়। রিভলবিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে একটা টি-পাই এর ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন।

কি ভাবছিলেন কে জানে? হয়তো সতীনাথবাবুর কথা। হয়তো বিভ্রান্ত মন চাইছিল মণিকার আশ্রয়। হয়তো বা অন্য কিছু, অন্য কাউকে!

হঠাৎ লাল আলোর ঝলকানি অনুভব করতেই মুহূর্তের মধ্যে মাথায় টুপি চাপিয়ে এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায় ছুটে গেলেন গভর্নরের কাছে।

মর্নিং ভিজিটার্স চলে যাবার পর রাজভবনের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়। খুব জরুরী কাজ থাকলে অবশ্য রাজ্যপালকে পাঁচ-দশ মিনিট আরো থাকতে হয়। জরুরী কাজ মানে কয়েকটা দস্তখত। অটোগ্রাফ। নিজের বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা—কিছুরই প্রয়োজন নেই। কোনো চিন্তাভাবনা না করেই রাজ্যপালকে অর্ডিন্যান্স বা বিল বা অন্য কোনো দলিলে দস্তখত দিতে হয়।

এমন ধরনের জরুরী কাগজপত্রে রাজ্যপালের দস্তখত দরকার হলে মর্নিং ভিজিটার্স চলে যাবার পর সেক্রেটারি টু দি গভর্নর নিয়ে আসেন এইসব কাগজপত্র। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই রাজ্যপালের বিবেচনার পর্ব শেষ হয়। তারপর দস্তখত। অটোগ্রাফ।

গভর্নর অন্দরমহলে প্রস্থান করলে রাজভবনের প্রাণহীন নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

এ-ডি-সি ফিরে আসেন নিজের অফিসে। রিভলবিং চেয়ারে দেহটা এলিয়ে পা দুটো তুলে দেন টেবিলের ওপরে। অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেট ধরিয়ে ভর্তি করে দেন ঘরটা।

দুটো একটা টান দিতে না দিতেই পিছনের ওই বিরাট জানলা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া আসে। সিগারেটের ধোঁয়া কোথায় হারিয়ে যায়, লুকিয়ে যায় ক্যাপ্টেন রায় তা নিজেই বুঝতে পারেন না। হাতের রনসন লাইটারটা বড় স্পষ্ট করে দেখতে পান।

ইতিমধ্যে বুড়ো রমজান এসে গেছে। রোজ যেমন আসে। এক পট দার্জিলিং টি, কিছু স্ন্যাকস্, কিছু পেস্ট্রি, কিছু নাটস্ নিয়ে। রমজান আপন মনে এক কাপ চা তৈরি করে এগিয়ে দেয় ক্যাপ্টেন রায়ের সামনে। 'লিজিয়ে সাব, চা খান।'

লাইটারটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সম্বিত ফিরে পান আনমনা ক্যাপ্টেন রায়। রমজানের কথা শুনে একটু মুচকি হাসেন।

'কিঁউ সাব? হাসেন কেন?' রমজান জানতে চায়।

সাধারণ বেয়ারা-চাপরাশীর দল অফিসারদের সঙ্গে ঠিক এভাবে কথা বলার সাহস বা প্রশ্রয় না পেলেও রাজভবনে এসব সম্ভব। এখানে বেয়ারা চাপরাশীরা যে বড় বেশি ঘনিষ্ঠ। বড় বেশি কাছের মানুষ। দু চোখ ভরে ওরা যে সবকিছু দেখেছে। মুখে কিছু বলে না, বলতে পারে না, বলতে চায় না। কিন্তু মনে মনে তো সবকিছু জানে, বোঝে।

তাছাড়া রমজানের কথা স্বতন্ত্র। রিটায়ার করার পর দু-দুবার এক্সটেনশন পেয়েছে স্বয়ং গভর্নরের সুপারিশে। রমজানের কনিষ্ঠ সহকর্মীরাও আপত্তি করেনি। বরং তাদেরই সম্মিলিত অনুরোধে রমজানের চাকরির মেয়াদ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতেও হবে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে রমজান কাজ করছে এই রাজভবনে। নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছে তার সব তরুণ সহকর্মীদের। ওদের সবাইকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করে প্রবীণ রমজান। রমজান রাজভবনের প্রধানতম কর্মী। সবার কাছেই ওর বিশেষ মর্যাদা।

তাইতো এ-ডি-সি সাহেবের মুচকি হাসি দেখে রমজান তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারে।

ক্যাপ্টেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা রমজান তুমি তো প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর এই কলকাতা শহরের এই রাজভবনে কাটালে—'

'হাঁ সাব, করিব তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে বৈকি।'

'তবে তুমি বাংলা বলতে পার না কেন?'

হাসতে হাসতে রমজান বলে, 'এহি বাত সাব?'

রমজান হারিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে। স্কুল-কলেজের কিছু ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সেসব দিনের দুচার পাতা ইতিহাস মুখস্থ করলেও আর সবাই ভুলে গেছে। কলকাতা শহরের রাস্তা থেকে মুছে গেছে সেসব দিনের স্মৃতি। সেদিনের এসপ্লানেড, হেস্টিংস, ডালহৌসীর চরিত্র চেহারা হারিয়ে গেছে। কলকাতার মানুষ ভুলে গেছে কারমাইকেল, রোনাল্ডসে, স্টেইনলি, জ্যাকসন, অ্যান্ডারসন, ব্রেবোর্নের কথা।

রমজান যেন ক্যাপ্টেন রায়ের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাজভবনটা পুরো একটা চক্কর দিয়ে আসে। কুর্নিস করে আসে রোনাল্ডসে, স্টেইনলি জ্যাকসন, অ্যান্ডারসনকে।

'সাব, বাংলা জানে বৈকি! তবে আমি তো পুরান জমানার লোক। আংরেজি ছাড়া আর কিছু চলত না এই গভর্নমেন্ট হাউসে।'

ফর্ক দিয়ে এক টুকরো রুটি মুখে পুরে ক্যাপ্টেন রায় রমজানের কথা শোনেন। একটু যেন অবাক হয়েই পুরান জমানার কথা শোনেন।

'ক্যাপ্টেন সাব, আমি যখন ছোকরা বয়েসে নোকরিতে ঢুকি, তখন বাঙালিবাবুরা এই গভর্নমেন্ট হাউসে ঢুকতে পেত না...'

'কেন যাঁরা গভর্নমেন্ট হাউসের অফিসেই কাজ করতেন?'

'না, তাঁরাও না। সাধারণ বাঙালি কেরানীবাবুরাও অন্দরে আসতে পারতেন না। কার্জন সাহেবের আমলে বাংলা দুটুকরা করার সময় যে মুভমেন্ট হল, তাতে আংরেজদের বড় ডর লেগেছিল। বাঙালি পুলিশ পর্যন্ত এই গভর্নমেন্ট হাউসে ডিউটি দিতে পারত না।'

'আচ্ছা?'

'জি সাব।'

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিতে দিতে ক্যাপ্টেন রায় জানতে চাইলেন, 'তুমি চাকরি পেলে কি ভাবে?'

'সে তো আর এক কাহানি। তবে তখন আপকান্ট্রি মুসলমানদের নোকরি মিলত। আমার এক চাচা জ্যাকসন সাহেবের এক দোস্তের খাস বেয়ারা ছিল। সেই সাহেবের দয়াতেই আমি ছোকরা বয়সে গভর্নমেন্ট হাউসে নোকরি পাই।'

ভারি মজা লাগে রমজানের কথা শুনতে। 'তা তুমি ছোকরা বয়সে কি কাজ করতে?'

'এই কলকাত্তা শহরের বড় বড় সাহাবদের মেমসাহেবদের দল রোজ সকালে হেস্টিংসের মাঠে গল্‌ফ খেলতে যেতেন। কোনো কোনোদিন লাটসাহেবের মেমসাহেবও যেতেন। আমি যেতাম মেম-সাহেবদের সঙ্গে বল কুড়িয়ে দেবার জন্য।

কথাগুলো বলতে বলতে রমজানের চোখমুখগুলো একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন একটু গর্ব হয় সেদিনের স্মৃতি রোম-হন করতে।

'মেমসাহেব আমাকে খুব পসন্দ করতেন...'

আর এক পেয়ালা চা শেষ করে ক্যাপ্টেন রায় প্রশ্ন করেন, 'কেন?'

রমজান হঠাৎ একটু হাসে। একটু যেন জোরেই হাসে। রাজভবনের শান্ত শীতল, প্রাণহীন পরিবেশে সে হাসি যেন বেমানান।

ক্যাপ্টেন একটু বিস্মিত না হয়ে পারেন না। 'কি ব্যাপার, হাসছ কেন?'

'বড় মজা হতো ও জমানায়। রোজ সন্ধ্যার পর খানা-পিনার পার্টি হতো। এই কলকাতার সব বড় বড় সাহেবরা আসতেন দিল্লি, বিলাইতের সাহেবরাও আসতেন। নাচ, গান আর শরাব চলত রাত একটা, দুটো, তিনটা পর্যন্ত...'

'রোজ হতো?"

'হ্যাঁ সাব, রোজ। এখনকার মতো তখন লাটসাহেব রোজ লেকচার দিতে বাইরে যেতেন না। লাটসাহেব সাল মে দো-চোর বাইরে খানাপিনা করতেন। বাকি রোজ সন্ধ্যায় লাটসাহেবেই অন্যদের খানাপিনার পার্টি দিতেন। আর ওইসব পার্টিতে কি ভয়ানক বদমাইশি হতো...'

ক্যাপ্টেন রায়ের আগ্রহ বাড়ে, 'কেন? পার্টিতে আবার কি বদমাইশি হতো?'

ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বৃদ্ধ রমজান বলে, 'আরে সাব! মাত পুছিয়ে। বোতল বোতল শরাব খাবার পর কি আর হুঁশ থাকে? সাহেব-মেমসাহেবরা বেহুঁশ হবার পর বদমাইশি হতো।'

রমজান একটু থেমে আবার ঠিক করে মনে করে নেয়।

'সাহাব-মেমসাহাবের দল বেহুঁশ হবার পর বেয়ারা-চাপরাশীরা মজা শুরু করত। কেউ শরাব খেত, কেউ চোরি করত, কেউ আবার...'

রমজান আর এগোতে পারে না। বলতেও দ্বিধা হয়, সঙ্কোচ হয়। লজ্জাও করে ঘৃণাও করে।

ক্যাপ্টেন রায়ের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'তা মেমসাহেব তোমাকে কেন ভালোবাসতেন?'

'আমি ছোকরা ছিলাম বলে ওদের চোরি করাতে আমার ডর লাগত, খারাপ লাগত। পারলে ওদের চোরির জিনিস আমি ফিরিয়ে দিতাম। মেমসাহেবকে সাবধান করে দিতাম। তাইতো...'

শুধু সেদিন সকালে নয় আরো কতদিন বসে বসে এই গভর্নমেন্ট হাউসের কত কাহিনি শোনেন ক্যাপ্টেন রায়। আজকের রাজভবনের সঙ্গে সেদিনের গর্ভনমেন্ট হাউসের কত পার্থক্য। এক যুগ নয়, বহু যুগের ব্যবধান। ইউনিয়ন জ্যাক থেকে তেরঙ্গা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনন্য স্মৃতি লুকিয়ে আছে এই রাজভবনের সর্বত্র। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদের সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির ঐতিহাসিক ঝগড়া হয় রাজভবনে। মেকলের সঙ্গে বেন্টিক-এর বির্তক হয় ওই পাশের কাউন্সিল চেম্বারে।

রমজান তখন গভর্নমেন্ট হাউসে চাকরি পায়নি, তবে শুনেছে। অনেকের কাছে শুনেছে। শুনেছে লর্ড ক্যানিং-এর কাহিনি। স্বেচ্ছাচারী ক্যানিং যখন এই গভর্নমেন্ট হাউসে ছিলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছিল। কলকাতার ইংরেজরা ওই ওপাশের টাউন হলে বসে সভা করে দাবি জানিয়েছে, 'গো ব্যাক ক্যানিং'। পরবর্তীকালে আই-সি-এস লরেন্স লর্ড লরেন্স হয়ে গভর্নর জেনারেল হলে এই গভর্নমেন্ট হাউসের লনে ক্রিকেট খেলেছেন আর কলকাতার হাজার হাজার মানুষ সে খেলা দেখে হাততালি দিয়েছে শীতকালের দুপুরে।

'ক্যাপ্টেন সাব, কি হয়নি এই গভর্নমেন্ট হাউসে। অ্যান্ডারসন সাহাব যখন লাটসাহেব তখন তাঁর মেয়েকে লিয়ে কি গড়বড়ই না হল।'

'কি হয়েছিল?'

'কি হয়নি তাই বলুন। সুইসাইড পর্যন্ত হয়ে গেছে ওই লেড়কির জন্য।'

'কই তাতো কখনো শুনিনি।'

'এই রমজান ছাড়া আর কেসে কাহিনি বলবে বলুন। আমার চোখের সামনে হয়েছে...'

জ্যাকসনের পর বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন স্যার জন অ্যান্ডারসন। সঙ্গে এলেন লেডি অ্যান্ডারসন ও তাঁর দুই মেয়ে। ছেলেটি পড়াশোনার জন্য বিলেতেই রইল। মেয়ে দুটির নাম রমজানের মনে নেই। ঠিক বয়স কত ছিল তাও মনে নেই। তবে মনে আছে মেয়ে দুটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা ছিল এবং ওদের নিয়ে গভর্নমেন্ট হাউসের অফিসারদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

স্যার জন যখন কলকাতা এলেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মোড় ঘুরেছে। ডালহৌসী বা ক্যানিং-এর যুগ বহুদিন আগে শেষ হয়েছে। রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, খিলাফত আন্দোলন, এক প্রস্থ অসহযোগ আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেছে ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। গুলি-গোলা, বোমা-পটকাও শুরু হয়েছে নানা দিকে। বাংলাদেশ তখন টগবগ্ করে ফুটছে। অ্যান্ডারসন সাহেবকে তাই গভর্নমেন্ট হাউসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি কাজে মন দিতে হল। মিলিটারি আর পুলিশ অফিসারদের নিয়ে বসতে হতো রোজ সকালে। ঘন ঘন দিল্লীতেও যেতে হতো শলা-পরামর্শের জন্যে।

চাকরি করতে এসে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই স্যার জন অ্যান্ডারসন। চব্বিশ ঘণ্টা সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন। গভর্নমেন্ট হাউসের বাইরে বেরুতেন না বিশেষ। লেডি অ্যান্ডাসনও স্বামীর জন্য বড়ই চিন্তিত থাকতেন। তাইতো স্বামীর সান্নিধ্য তিনি বিশেষ ত্যাগ করতেন না।

মাঝখান থেকে বিপদে পড়ল মেয়ে দুটি। বিলেত থেকে সদ্য আগতা যুবতী মেয়েদের পক্ষে ওই গভর্নমেন্ট হাউসের মধ্যে বন্দিনী থাকা বিশেষ আনন্দের নয়। কদিন পরেই ওরা ছটফট করতে শুরু করল। লেডি অ্যান্ডারসন দু-চারদিন গঙ্গার ধার, ফোর্ট উইলিয়াম আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবার পর মেয়েদের বললেন 'এই শহরে আর যেদিকে যাবে, সেখানেই টেরোরিস্টে ভর্তি। তাছাড়া ডার্টি সিটি! কি আর দেখবে?'

মেয়ে দুটি কিন্তু ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না। একদিন সুযোগ সুবিধা মতো লাঞ্চের সময় একেবারে খোদ মিলিটারি সেক্রেটারিকে ওরা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পারি না?'

'কেন পারবে না?' কর্নেল উত্তর দেন।

'ওই যে মা বললেন চারপাশে টেরোরিস্ট...'

কর্নেল সাহেব হেসে বললেন, 'না, না, তোমাদের ওসব ভয় নেই। তবে গভর্নমেন্ট হাউসের গাড়ি চড়ে, পুলিশ নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে বিপদ আছে। সাধারণ মেয়েদের মতো ঘুরলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। বরং ইউ কান্ট গেট এ মোর ফ্রেন্ডলি প্লেস দ্যান দিস সিটি!'

রমজান বলল, 'ব্যাস! উসকে বাদ লেড়কিদের আর গভর্নমেন্ট হাউসে দেখাই যেতো না। কোনোদিন লাঞ্চ খেতেন না, কোনোদিন ডিনার খেতেন না। আবার কোনো কোনো দিন পিকচার দেখে রাত বারোটার পরে গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরতেন।'

ক্যাপ্টেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা একলা একলাই ঘুরে বেড়াত?'

রমজান হেসে ফেলে, 'আরে সাব, জোয়ান লেড়কি কভি আকেলে আকেলে ঘোরাঘুরি করে?'

প্রবাসী বাঙালি হলেও বাঙালি তো বটে। বাংলাদেশের ইতিহাস পুরোটা না জানলেও কিছু কিছু তো জানেন ক্যাপ্টেন রায়। কিছু পড়েছেন কিছু শুনেছেন। স্যার জন অ্যান্ডারসনের নাম তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়।

হাজার হোক এলাহাবাদের ছেলে। মেদিনীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা থেকে অনেক দূর। তবুও যে বাংলা, পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ধরে টান দিয়েছিল সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে এলাহাবাদ ছিল তাদের কেন্দ্রবিন্দু। মিলনক্ষেত্র। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর পুণ্য সঙ্গম এই এলাহাবাদ। ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের প্রয়াগ তীর্থ। আধুনিক ভারততীর্থের পুণ্যভূমি। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মর্মস্থল।

স্যার স্টেইনলি জ্যাকসনের নামটা ঠিক মনে না থাকলে অ্যান্ডারসন সাহেবের নাম বেশ মনে আছে। তিরিশের বাংলাদেশ—বিপ্লবের ভরা যৌবন! সেদিনের কাহিনিতে অ্যান্ডরসন সাহেবের বার বার উল্লেখ 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীদের বার বার নজর পড়ছে এই ঘৃণা নায়কের দিকে।

রমজান অত শত জানে না, বুঝে না। তবে সে জানে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে অ্যান্ডারসন সাহেবের মনের আগুন, অন্তরের জ্বালা।

'অ্যান্ডারসন সাহেবের বড় গুস্‌সা ছিল। এই আপনাদের বাঙালিদের উনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।'

ক্যাপ্টেন রায় ছোট্ট প্রশ্ন করেন 'কেন?'

রমজান আবার বলে, 'এখনকার মতো তখন হিন্দী বা উর্দু আখবার পাওয়া যেত না। আংরেজি পেপারই শুধু গভর্নমেন্ট হাউসে থাকত। তাছাড়া আমাদের পেপার পড়ার পারমিশান ভি ছিল না।'

'আচ্ছা?' অবাক হন এ-ডি-সি।

'অর কিয়া?' রমজান একটু হাসে। 'আমি কি এমনি এমনি বলি জামানা বদলে গেছে? জামানা বহুত বদল গ্যায়া সাব!'

খবরের কাগজ পড়তে পারত না রমজানের দল। তবুও খবর পৌঁছে যেত ওদের কাছে। পাষাণে গাঁথা পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে যেমন চুঁইয়ে চুঁইয়ে বিন্দু বিন্দু জল বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি করে গভর্নমেন্ট অফিসের সতর্ক দৃষ্টির অজ্ঞাতসারেই আসত মেদিনীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের খবর। খবর আসত পাঞ্জাব থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে ; এই কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে বসেই শোনা গিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের সর্বনাশা কাহিনি। বড় বড় রাজকর্মচারীর ফিস ফিস করে আলোচনা করত পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার ও তাঁর সহচর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যারি ডায়ারের কীর্তি। অমর কীর্তি! বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি।

'সরি! সেদিন আমার কাছে সাড়ে বারোশ রাউন্ড গুলির একটাও অবশিষ্ট ছিল না। যদি থাকত, নিশ্চয়ই সদ্ব্যবহার করতাম।'

জেনারেল ডায়ার দুঃখ করে আরো বলেছিলেন, 'গলিটা বড় সরু ছিল বলে মেসিনগান দুটো ভিতরে নেওয়া যায়নি। ও দুটো ভিতরে নিতে পারলে বড় খুশি হতাম!'

এরাই হচ্ছে স্যার জন অ্যান্ডারসনের পথিকৃত। মনে মনে বোধহয় ইনিও স্বপ্ন দেখতেন বিলেতের কাগজে বীরপুরুষ জেনারেল ডায়ারের মতো তাঁরও ছবি ছাপা হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ কীর্তির মহানায়ক এই জেনারেলকে বিলেতের লোক কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার পাউন্ডের এক তহবিল পুরস্কার দিয়েছিল। অ্যান্ডারসন বোধহয় দেশবাসীর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের তহবিল আশা করেছিলেন।

'জানেন ক্যাপ্টেন সাহেব, লাটসাব একদম উন্মাদ হয়েছিলেন। তাছাড়া মেদিনীপুরে হরদম আংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে মেরে ফেলার জন্য কলকাতার আংরেজরাও বড় ক্ষেপে উঠেছিল।'

এমন গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি বলতে বলতেও বুড়ো রমজান ফিক্ করে একটু হাসে। বলে, 'একদিন ওই পিছনের বাগানে বেড়াবার সময় লাটসাব মেমসাবকে একটা গাছের ছায়া দেখিয়ে বললেন, ছায়াটা ঠিক মেদিনীপুরের ম্যাপের মতো!'

'সব সময় ওই এক চিন্তা! মেদিনীপুর!'

'সাহেবের অফিস কামারায় সামনে ছিল ওই মেদিনীপুরের ম্যাপ আর পিছনে থাকত বাংলাদেশের ম্যাপ।'

ইংরেজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এই স্যার জন অ্যান্ডারসনকে পাঠিয়েছিল বাংলাদেশে। বোধহয় পঞ্চ নদীর পুণ্যতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি চেয়েছিলেন বাংলাদেশে। কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, ভাগীরথীর বাংলাদেশে!

ডালহৌসীর গভর্নমেন্ট হাউসের এই নব নায়ক আগে ছিলেন ইমন ডি ভ্যালেরার আয়ারল্যান্ডে। সিন-ফিন মুভমেন্টের জন্য ইংরেজ শাসকদের অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে

হচ্ছিল। তাই তারা পাঠিয়েছিলেন স্যার জনকে।

জার্মানদের সহযোগিতায় স্বাধীনতাকামী আইরিশরা শুরু করেছিলেন সিন-ফিন আন্দোলন। এদের শায়েস্তা করার জন্য অ্যান্ডারসন সৃষ্টি করেছিলেন কুখ্যাত ব্ল্যাক এন্ড ট্যানস্ ইংরেজ পুলিশ বাহিনী! ওদের অত্যাচারের কাহিনি শুনলে গা শিউরে উঠবে।

অ্যান্ডারসন সাহেব বাংলাদেশে এসে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি দিয়ে বাঙালিকে শায়েস্তা করার জন্য জন্ম নিল ভিলেজ গার্ডস্!

দিন রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা ওই এক চিন্তায় মেতে থাকতেন অ্যান্ডারসন। মেদিনীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম! নিজেদের মেয়েদের চাইতে প্রিয় ছিল আর্মি আর পুলিশ অফিসাররা। ওরাই ছিল স্যার জনের প্রিয় সহচর। বন্ধু, আত্মীয়, পরমাত্মীয়!

এখনকার মতো তখন এই গভর্নমেন্ট হাউসের শুধু নর্থ গেটেই পুলিশ প্রহরী থাকত না। নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট—সব গেটেই থাকত পুলিশ। সশস্ত্র পুলিশ। আরো পার্থক্য ছিল। এখন হিজ একসেলেন্সির দ্বাররক্ষক হচ্ছেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও জনা কয়েক কনস্টেবল। হিজ একসেলেন্টসি ইজ্জত বাঁচাবার জন্য মাঝে দেখা যাবে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্টকে। দিল্লী থেকে লাটসাহেবের 'বস' গেলে অবশ্য অর্থহীন ঝাণ্ডা হাতে নেওয়া ঘোড়সওয়ার পুলিশ দেখা যায়।

আর তখনকার দিনে? স্যার জন অ্যান্ডারসনের আমলে? চার ফটকে পুলিশ। ডজন ডজন পুলিশ। বেছে নেওয়া হিংস্র প্রকৃতির কিছু কনস্টেবল, দেশি সব ইন্সপেক্টর, অ্যাংলো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। এ ছাড়া থাকত আর্মড পুলিশ। চারপাশে ঘোরাঘুরি করত গোয়েন্দা।

এখন তো রাজভবনের চারপাশের ফুটপাতে হকার বসে, দেওয়ালে পসার সাজায়। ছআনায় গেঞ্জি, আট আনার তিনটি রুমাল, সস্তায় বেনারসী পেয়ারা ও ভাগ্যগণনা করাবার জন্য আশে পাশের অফিসের বাবুরা তো এখন রাজভবনের ফুটপাতেই আসেন। শুধু বাবুরা কেন? লুকিয়ে চুরিয়ে হয়তো লাটসাহেবের বৌ বা বৌমাও আসেন।

বাংলার তখৎ-এ-তাউসে যখন এই কুখ্যাত অ্যান্ডারসন আসীন, তখন ইন্ডিয়ান মাছি-মশা পর্যন্ত গভর্নমেন্ট হাউসের চৌহদ্দিতে আসতে পারত না।

'লেড়কি দুজন প্রথম প্রথম লাটসাহেবের কোনো পার্সোনাল আংরেজ অফিসারকে নিয়ে বাইরে যেতেন। এক, দো, ঘণ্টার জন্য। কিন্তু ওতে কি ওরা খুশি হয়?'

কথাটা বলে রমজান একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

গভর্নমেন্ট হাউসে নিত্য যেসব স্থানীয় ইংরেজরা আসা-যাওয়া করতেন, তাদের সঙ্গে মেয়ে দুটির খাতির শুরু হল।

সন্ধের আগে দুটি উন্মনা পাখি ঘরে ফিরে আসত সত্য কিন্তু প্রতীক্ষা করত ককটেল বা ডিনারের গেস্টদের জন্য।

হুইস্কির গেলাসটা চট পট ডান থেকে বাঁ হাতে নিয়ে মিঃ জেফারসন মাথাটা একটু নীচু করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, 'ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস অ্যান্ডারসন।' মিস অ্যান্ডারসন খুশি হয়ে একটু যেন হাসেন। ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে হ্যান্ডসেক করেন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।'

জেফারসন বড় খুশি হন। মিস অ্যান্ডারসনের হাতে গেলাস না দেখে উৎকণ্ঠিত হন ; 'হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ড্রিংকস?'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আমি নেব এখন।'

'তাই কি হয়?'

জেফারসন আর কথা না বলে থ্রোন রুমের ওই বিরাট পার্টির মধ্যে হারিয়ে যান! আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুহাতে দুটি গেলাস নিয়ে হাজির হন অ্যান্ডারসনের সামনে।

দুটি গেলাস দেখে মিস অ্যান্ডারসনের বেশ মজা লাগে! 'কি ব্যাপার দুটি গেলাস?'

'স্যাম্পেন এন্ড ফ্রেঞ্চ ওয়াইন। জানি না আপনি কোনটা পছন্দ করবেন। তাই দুটোই...'

লোকটা তো বেশ মজার। মিস অ্যান্ডারসন মুহূর্তের জন্য ভাবেন।

'কিন্তু হুইস্কি আনলেন না যে?'

'জেনারেলি...'

জেফারসন বলতে গিয়েও যেন দ্বিধা করেন।

'জেনারেলি কি?'

'সুড আই সে?'

মিস অ্যান্ডারসনের আরো মজা লাগে। 'কাম অন! আমার বাবা গভর্নর, আমি নই। আই অ্যাম জাস্ট এ ইয়ং গার্ল লাইক অল আদার ইংলিশ গার্লস।'

'এক্সকিউজ মী। তাহলে বলছি।'

'একশোবার বলুন। ইউ ক্যান সে এনিথিং ইউ লাইক।'

পাশের টিপাই থেকে নিজের হুইস্কির গেলাসটা তুলে এক চুমুকে দেন। যেন দ্বিধা সঙ্কোচের জন্য গলা দিয়ে কথাটা বেরুচ্ছিল না, তা বোধ হয় পরিষ্কার হয়!

'জেনারেলি সাধারণ মেয়েরা ওয়াইন খায় আর রোমান্টিক মেয়েরা স্যাম্পেন খায়। তাই...'

মিস অ্যান্ডারসনের মুচকি হাসিটা আর লুকিয়ে থাকে না, প্রকাশ হয়ে পড়ে। 'সো হোয়াট?'

'আই ডোন্ট নো আপনি কি ধরনের মেয়ে। তাই দুটো গেলাসই...'

পরিতৃপ্তির হাসিতে অ্যা ডারসন-নন্দিনীর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড ইভন আফটার দিস আমি আর ওয়াইন খেতে পারি না।'

'ওয়ান্ডারফুল!'

মিঃ জেফারসন স্যাম্পেনের গেলাসটা তুলে দিলেন ওর হাতে।

দুজনের হাতের দুটি গ্লাস এগিয়ে এল কাছে ; একেবারে নিবিড় হবার পর ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ হল দুটি গেলাসে।

'চিয়ার্স!'

'চিয়ার্স!'

এই হল শুধু। একটি অধ্যায়ের শুরু। একটি কাহিনির শুরু।

রমজানের কি সব মনে আছে? বিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা কি মনে থাকে? মনে আছে জেফারসন সাহেবও নতুন বিলেত থেকে এসে একটা বড় বিলেতি কোম্পানির বড় অফিসার ছিলেন। তবে রমজান জানে না উনি শৈশব, কৈশোর কাটিয়েছেন এডিনবরায়, যৌবনে পড়াশুনা করেছেন কিংস কলেজে। কলেজ থেকে বেরুবার পর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে বা কলোনিয়াল সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দেবার কথা ভেবেছিলেন, তাও রমজান জানে না। কি দরকার ওসব জানার।

'ওই সাহেবের দপ্তর ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের ওই কোণায় আর থাকতেন বেঙ্গল ক্লাবে।'

বুড়ো রমজান ঠিক বলছে তো? ক্যাপ্টেন রায় একটু জেরা করেন, 'ওই সাহেব কোথায় থাকতেন কোথায় চাকরি করতেন, তা তুমি জানলে কেমন করে?'

রমজান এ-ডি-সি সাহেবের কথা শুনে হাসে। 'আরে সাব, আমি জানবো নাতো কে জানবে?

আমাকে যে ডিউটি দিতে হতো। সকালে, সন্ধেয়, রাত্তিরে।'

'তার মানে?'

'প্রথম প্রথম লাটসাহেবের কোনো পার্সোন্যাল অফিসার সঙ্গে থাকলেও পরবর্তীকালে একজন বেয়ারা-চাপরাশীকে নিয়েই ওঁরা ঘোরাঘুরি করতেন। সাদা পোশাকে। তাছাড়া গভর্নমেন্ট হাউসের ক্রাউন মার্কা রোলস্ রয়েস বা ফোর্ড গাড়ি চড়ে নয়, সাধারণ ছোট গাড়ি চড়েই ওঁরা ঘুরতেন।'

ক্যাপ্টেন রায় আবার প্রশ্ন করেন, 'কেন?'

'কেন আবার?' তখনকার দিনকাল কি ছিল, তা জানা নেই? গভর্নমেন্ট হাউসের গাড়ি দেখলে কোথা থেকে কে বোমা মেরে দেবে, তার কি কোনো ঠিকানা ছিল? তাইতো খোদ মিলিটারি সেক্রেটারি পরামর্শ দিয়েছিলেন, তোমরা ঘোরাফেরা করতে চাও, কোনো আপত্তি নেই। বাট ইউ মাস্ট মুভ অ্যারাউন্ড লাইক কমোনার্স।

নিছক সাধারণ ইংলিশ গার্লের মতো ঘোরাঘুরি করলে বিপদ নেই বলেই সাধারণ গাড়ি আর সাদা পোশাকের চাপরাশী-বেয়ারার ব্যবস্থা হল।

'ক্যাপ্টেনসাব, বিশওয়াশ করুন কভি কভি বেঙ্গল ক্লাব থেকে ঐহি ছোকরী রাত দুতিন বাজে ফিরত।'

'এতক্ষণ...'

'আরে সাব, লাচ-গান, খানা-পিনা আউর কত কি চলত, কে জানে।'

বেশি দূর যাবার দরকার নেই। আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, অতীত বর্তমানের সব কিছু মাল-মশলাই পাওয়া যাবে। দৃষ্টিটা একটু চারপাশে ঘোরালেই হয়। কিন্তু এই দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নেবার অবকাশ থাকলেও ইচ্ছা থাকে না সবার। আগ্রহও নেই বহুজনের। তাছাড়া চোখ থাকলেই দৃষ্টি শক্তি কি থাকে সবার? কান থাকলেই কি শুনতে পায় সবাই?

না। চোখ, কান থাকলেই দৃষ্টি শক্তি বা শ্রবণ শক্তি থাকে না। হৃদপিণ্ড তো সবারই আছে ; মন, সংবেদনশীল মন কি সবার হয়?

না।

শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য যাঁরা ডালহৌসীর রণাঙ্গনে নিত্য সংগ্রামে মত্ত, তাঁদের কথা আলাদা। মার্চেন্ট অফিসের হৃদয়হীন ছোট কর্তাদের ভজনায় যাঁদের সারা জীবন কেটে যায়, তাঁরা আশপাশে দেখবেন কখন?

সবাই তো ওই দলের নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের অফুরন্ত অবকাশ রয়েছে সংসারের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার। কিন্তু অপরের মুখের হাসি, চোখের জল দেখার প্রয়োজন কি? আশপাশের মানুষগুলো বাঁচল কি মরল, হাসল কি কাঁদল, তাতে ওই সার্থক স্বার্থপরদের কি আসে যায়?

কিছু না। বিন্দু মাত্র না। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের খবর না নেওয়াই তো বড় হবার লক্ষণ!

অফিসারের দল বেয়ারা-চাপরাশী-কেরানীদের সেলাম নেন কিন্তু তাদের সঙ্গে নিবিড়

যোগাযোগ? নেভার? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রেস্টিজ সব গোল্লায় যাবে যে!

রাজভবনের বেয়ারা-চাপরাশীদের বেশি দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। তবে খুব বেশি কাছে টানতেও অফিসারের দল নারাজ।

সেকেন্ড পাঞ্জাব ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ব্যারাক থেকে ক্যাপ্টেন রায় যখন প্রথম রাজভবনে এলেন, তখন তিনিও শুধু সেলাম নিতেন। আমজাদ আলি, রমজান, হরকিষণ, মনোহরলালদের রোজ দেখতেন, সেবা নিজেন কিন্তু ঠিক চিনতে চাইতেন না। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও ক্যাপ্টেন রায়ের দৃষ্টিটা উদাস হয়ে শূন্য আকাশের দিকে চলে যেত।

আমজাদ আলি, রমজানের দল এজন্য কিছু মনে করত না। ওইটাই তো নিয়ম।

ব্যাচিলার এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায়কে রাজভবনের সামনের ওই স্যান্ডস্টোনের স্পর্শ-ধন্য কোয়ার্টারে আশ্রয় নিতে হয়নি। ওই গুটিকতক কোয়ার্টার নিয়ে মারামারি যেসব সরকারি অফিসারের দল সরকারি পয়সায় বার কয়েক দার্জিলিং ঘুরে পাহাড়ের প্রেমে হাবুডুবু খান, ওই কোয়ার্টারগুলির প্রতি তাঁদের বড় মোহ, বড় আকর্ষণ। লাটসাহেবের ঘোড়ার আস্তাবল ও মোটরের গ্যারেজের পাশে বা উপরে থাকার ইজ্জত কি বাগবাজার বা ভবানীপুরে সম্ভব? লাটসাহেবের সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি ছাড়াও আরও দুজন একজন অফিসের আস্তাবল-গ্যারেজের পাশে অফিসার্স কোয়ার্টাসে আস্তানা পান। ভাগ্যক্রমে ম্যারেড এ-ডি-সি-ও পেতে পারেন ওর একটি সুইট।

অফিসারের দল সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের নিজের ফ্ল্যাটকে মিনিয়েচার রাজভবন করে রাখেন। ছমাস-এক বছর কাশ্মীরি কার্পেট প্রিন্স অফ্ ওয়েলস বা ডাফরিন সুইটে রাখার পর সেগুলো চলে যায় ওই আস্তাবলের পাশের অফিসারদের ফ্ল্যাটে। আরো অনেক কিছু চলে যায় ওইসব অফিসার্স ফ্ল্যাটে। থ্রোন রুমের চেয়ার, কাউন্সিল চেম্বারের পর্দা, লাটসাহেবের ড্রইংরুমের সোফা থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু নজরে পড়বে ওইসব মিনিয়েচার রাজভবনগুলিতে।

বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? রমজান বা আমজাদ আলিকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। ওরা তো সিনিয়ার কর্মচারী। নতুন ছোকরা বেয়ারা-চাপরাশীদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরাই সব বলে দেবে। বলে দেবে যে কিছু কিছু অফিসারের বিছানার গদি, চাদর, বেডকভার, বাথরুমের তোয়ালে, গায়ে মাখা সাবান পর্যন্ত আসে ওই বড় রাজভবনের স্টোর থেকে।

রাজভবনের অধিকাংশ অফিসারই এইসব উপরি পাওনা নিয়েই মত্ত। রমজান বা আমজাদের সঙ্গে পুরনো দিনের গল্প করার মেজাজ বা প্রবৃত্তি কোথায়?

ক্যাপ্টেন রায় খাস রাজভবনের অন্দর-মহলে আস্তানা পেয়েছিলেন স্বয়ং হিজ একসেলেন্সির অর্ডারে। তাই রমজান বা আমজাদকে বেশি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি।

প্রথম প্রথম ডিউটির পর চলে যেতেন অফিসারদের কোয়ার্টারে প্লেট ভর্তি কাজু আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি খেতে খেতে আড্ডা দিতে বেশ লাগত। সকালে, দুপুরে কাজ না থাকলে চলে যেতেন এ-ডি-সি স্কোয়াড্রন লিডার নরেন্দ্রপ্রসাদ সিং-এর কোয়ার্টারে। বিকানীরের মরুভূমির লোক হলেও মনটা বড় সরল, সহৃদয়।

ক্যাপ্টেন রায়ের আজও মনে পড়ে সেদিনের কথা। এ-ডি-সি ইন ওয়েটিং ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার সিং। তিনিই ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গিয়েছিলেন গভর্নরের কাছে। তারপর পরিচয় করিয়েছিলেন অন্যান্য অফিসার ও কর্মীদের সঙ্গে। অতগুলো লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে করতেই অনেক বেলা হয়ে গেল।

রাজভবনের দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্কোয়াড্রন লিডার সিং একবার ঘড়িটা

দেখে বললেন, 'কাম অন, লেট আস্ রাস ফর লাঞ্চ।'

ক্যাপ্টেন রায় জানতে চইলেন, কোথায় খেতে যাবেন?

'কোথায় আবার? আমার কোয়ার্টারে।'

'আবার আমার জন্য...'

সিং মুখে কিছু জবাব দেয়নি, শুধু একটু হেসেছিল। প্রায় ডবল মার্চ করার মতো লম্বা পা ফেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হল কোয়ার্টারে।

পর্দা সরিয়ে সামনে ড্রইংরুমে ঢুকতেই যিনি অভ্যর্থনা করলেন, তিনি মিসেস পূর্ণিমা সিং।

'ক্যাপ্টেন মীট মাই ওয়াইফ পূর্ণিমা।' পূর্ণিমা সিং হাত জোড় করে একটা নমস্কারও করলেন না। 'আর মীট মাই ওয়াইফ করতে হবে না, চল খেতে চল।'

ক্যাপ্টেন রায় অতি পরিষ্কার স্পষ্ট বাংলা কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। এক ঝলক দুজনের দিকে তাকিয়ে মিসেস সিং-এর উদ্দেশ্যে বললেন, 'চমৎকার বাংলা শিখেছেন তো!'

পূর্ণিমা মুচকি হেসে পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল!

স্কোয়াড্রন লিডার সিং একটু চাপা গলায় বললেন, 'ক্যাপ্টেন বিয়ের আগে সী ওয়াজ মিস পূর্ণিমা মুখার্জী।'

'আই সি!'

পূর্ণিমা বাঙালি হলেও যোধপুরের মেয়ে। জন্ম, মামাবাড়ি পাটনাতে হলেও যোধপুরে কাটিয়েছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন। পূর্ণিমার বাবা যোধপুরের সর্বজনপ্রিয় বাঙালি ডাক্তার! সারাদিন ডাক্তারি করে সন্ধ্যার পর তাস-পাশা-চা-সিগারেট। রবিবারে তানপুরা, হারমোনিয়াম তবলা। নিজে গাইতেন 'আয়েনা বালম', স্ত্রী গাইতেন 'একটি নমস্কারে প্রভু', মেয়ে পূর্ণিমা গাইত 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।'

সন্ধ্যাবেলার সে আড্ডায় কে না থাকতেন? হিজ হাইনেসের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে যোধপুর এয়ারফোর্স স্টেশনের ছোট বড় অফিসারের দল। আসতেন ফ্লাইট লেফট্‌ন্যান্ট নরেন্দ্রপ্রসাদ সিং।

সে এক ইতিহাস! কলকাতার রাজভবনের অফিসার্স ফ্ল্যাটে এসেও পূর্ণিমা ভুলতে পারে না পুরনো দিনের সন্ধ্যাবেলার মজলিশ। কলকাতায় ঠিক আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই। আর রাজভবনের অফিসাররা সন্ধ্যাবেলায় তানপুরা হাতে নিয়ে বসবার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং যখন বাংলাদেশের গভর্নরের এ-ডি-সি মনোনীত হলেন, তখন আনন্দে, খুশিতে ফেটে পড়েছিল পূর্ণিমা। 'এ তোমাদের বিকানীর বা চণ্ডীগড় নয়। দেখো কি মজা করেই দিন কাটবে।'

এখন সন্ধ্যা যেন কাটতে চায় না। কত সিনেমা-থিয়েটার দেখা যায়? তাছাড়া পূর্ণিমা তো বাইরের আনন্দের চাইতে ঘরের আনন্দই বেশি চায়। সিং-এর যেদিন ইভনিং ডিউটি থাকে, সেদিন পূর্ণিমা সীতার বনবাসের শূন্যতা অনুভব করে মনে মনে।

তাই তো ক্যাপ্টেন রায়কে বড় সমাদর করে গ্রহণ করলেন ওঁরা দুজনে।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং খেতে বসে বললেন, 'প্লিজ ডোন্ট মিসটেক। পূর্ণিমা বাঙালি হলেও এ প্রোডাক্ট অফ আওয়ার রাজস্থান।'

'বাজে বকো না! তোমাদের দেশে ডাক্তার ছিল না বলেই তো আমার বাবাকে যেতে

হয়েছিল।'

এবার ক্যাপ্টেন রায়ের দিকে ফিরে পূর্ণিমা বলল, জানেন দাদা, আমার বাবাই যোধপুরের প্রথম অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার।'

স্কোয়াড্রন লিডার একটু সংশোধন করে দেন, 'না, না, একটু ভুল হয়ে গেল। শুধু যোধপুরের নয়, সারা রাজস্থানের মধ্যে উনিই প্রথম ডাক্তার।'

ওদের দুজনের মধ্যে এমনি টুকটাক ঠোকাঠুকি বেশ লাগত ক্যাপ্টেনের। বলত, 'আমাদের আর্মির ভাষায় তোমাদের এই বর্ডার স্কারমিশ বেশ এন্টারটেনিং।'

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাসত।

যাই হোক প্রথম কিছুকাল বেশ কেটেছে ওদের নিয়ে। সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য আর যেতো না, তবে দুপুরে-রাত্রে খেতেই হতো।

ক্যাপ্টেন রায় বলেছিল, 'সিং, দিস কান্ট বি দি রেগুলার ফিচার। তোমাকে এর বিনিময়ে...'

স্কোয়াড্রন লিডার জিভ কেটে বলেছিল, 'মাই গড! আমি মাড়বারের লোক হতে পারি কিন্তু ঠিক এতটা ব্যবসাদার নই। তাছাড়া ডক্টর মুখার্জীর মেয়ে ঠিক দুজনের সংসার চালাতে শেখেনি।'

ওরা যতদিন ছিল রমজান বা আমজাদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারেননি ক্যাপ্টেন। প্রয়োজন হয়নি। তাগিদ বোধ করেননি ওদের কাছে টেনে নেবার। রমজানের কাছে অ্যান্ডারসন সাহেবের ছোকরীর কাহিনি শোনার চাইতে পূর্ণিমার সঙ্গে খোসগল্প করার টান ছিল অনেক বেশি।

'আচ্ছা দাদা, একদিন ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে যাবেন?'

তুমি ডায়মন্ডহারবার যাওনি?'

চোখ দুটো ঈষৎ ঘুরিয়ে সিং-কে একটু আড় চোখে দেখে পূর্ণিমা বলে, ওই মরুভূমির লোকটার কোনো রসবোধ আছে?'

স্কোয়াড্রন লিডার সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটে, 'ইউ আর পারফেক্টলি জাস্টিফায়েড পূর্ণিমা! আমার রসজ্ঞান নেই বলেই 'আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার ওগো প্রিয়—' গান শুনে তোমার কাছে সারেন্ডার করেছিলাম।'

ক্যাপ্টেন রায় হাসতে হাসতে বলেন, 'সিং এয়ার ফোর্সে অফিসার হয়ে এসব সিক্রেট ডিস্‌ক্লোজ করা অন্যায়।'

স্কোয়াড্রন লিডার সিং হঠাৎ বদলি হয়ে চলে গেল আম্বালা। এতদিন পরে ক্যাপ্টেন রায় আবিষ্কার করলেন, এই পাথরে গাঁথা রাজভবনে মনের আনন্দ, প্রাণের রসের বড় অভাব। অনুভব করলেন তিনি বড় নিঃসঙ্গ।

চুপচাপ নিজের ঘরের মধ্যে শুয়েছিলেন তিনি। দরজাটায় নক্ করে আমজাদ এল ভিতরে। একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'ক্যাপ্টেন সাব, মন খারাপ করবেন না। যান একটু ঘুরে আসুন।'

মুখে কিছু বললেন না ক্যাপ্টেন রায়। তবে সেই প্রথম উপলব্ধি করলেন, যাদের এতদিন দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, যাদের দেখেও দেখেননি, যাদের মানুষ বলে স্বীকার করতে চাননি, তাদেরও প্রাণ আছে, আছে হৃদয়, আছে সহানুভূতি।

ডিউটির পর এখন আর চুপচাপ বসে থাকতে চান না ক্যাপ্টেন। ডেকে নেন রমজান, আমজাদ আলিকে। গল্প বলেন, গল্প শোনেন। শোনেন অ্যান্ডারসন সাহেবের মেয়েদের কীর্তি।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং চলে যাবার পর আর কোনো অফিসারের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রায় বিশেষ হৃদ্যতা গড়ে তুলতে চাননি। আশা করেছিলেন সেক্রেটারি বা ডেপুটি সেক্রেটারির সংসারে ছোট ভাইয়ের মর্যাদা পাবেন। ওদের সংসারের পাঁচ জনের একজন হয়ে কাটিয়ে দেবেন কলকাতায় কটা বছর। বাংলাদেশের বাঙালি তো মিশুক হয় বলেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছেন। কলকাতায় আত্মীয়স্বজন না থাকলেও বন্ধুহীন হয়ে নিশ্চয়ই কাটাতে হবে না।

এসব কথা মনে হলে ক্যাপ্টেন রায়ের হাসি পায়। তাইতো আমজাদ-রমজানের দল এগিয়ে আসতে তাদের ফিরিয়ে দেননি, নিজেও এগিয়ে গেছেন ওদের কাছে। ভালোই হয়েছে। রমজান-আমজাদের কাছে কত কি জানতে পেরেছেন, শিখতে পেরেছেন! এই রাজভবনে তো কোনো অফিসার নেই, যিনি অ্যান্ডারসন সাহেবের কাহিনি বলতে পারেন। কে জানে ওর মেয়েদের বেলেল্লাপনার কাহিনি?

দু-একজন বুড়ো কেরানি হয়তো জানে কিন্তু তারা কিছুতেই ইংরেজ লাটের নিন্দা করবে না। ইংরেজদের কাছে অহর্নিশি অপমান সহ্য করে চাকরি করতে হয়েছে এদের। তবু এরা আজ ইংরেজ বলতে বিভোর হয়।

আমজাদ বেশি কথা বলে না। তবুও সেই আমজাদের মুখেই ক্যাপ্টেন রায় শুনেছিলেন, 'আজকাল লম্বা-চওড়া কথা বলেন কিন্তু আমরা তো সরকার বাবুকে ইংরেজ আমলেও দেখেছি।'

'কেন ইংরেজ আমলে উনি কি করতেন?'

'শুনলে বিশ্বাস করবেন?'

'কেন করব না?'

'তবে শুনে রাখুন এইসব বাবুদের কীর্তি।'...

সারা বাংলাদেশের পি-ডবলিউ-ডি ডিপার্টমেন্টের যত ওভারশিয়ার ছিল, তাদের মধ্যে সব চাইতে ইংরেজভক্ত খুঁজে বার করতে চীফ ইঞ্জিনিয়ার মাস ছয়েক সময় নিলেন। সেকালে বাঙালি ছোকরাদের সরকার বাহাদুর বিশ্বাস করতেন না বলেই এই সামান্য কাজের ভার স্বয়ং চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হয়েছিল। চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেই সিলেক্ট করতে পারতেন তবে কে কোথা থেকে কি করে বসে—এই ভয়ে দুজনের নাম সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন ডেপুটি মিলিটারি সেক্রেটারির কাছে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত রাজভক্তির সিংহদ্বার পার হলেন শ্রীনিশিকান্ত সরকার। আমাদের সরকার মশাই।

'জানেন এ-ডি-সি সাব, সরকারবাবুর কি কাজ ছিল?'

'পি-ডবলিউ-ডি-র ওভারশিয়ার যখন, তখন নিশ্চয়ই বিল্‌ডিং-এর...

আমজাদ মাঝ পথেই আটকে দেয়, 'তাহলে আর কি দুঃখ ছিল। সরকারবাবু শুধু বাথরুম দেখাশুনা করতেন।'

'স্যানিটারি ফিটিংস দেখাশুনা করতেন।'

'আমরা ওকে বলতাম বাথরুম বাবু। আর মিলিটারি সেক্রেটারি অফিসের বাবুরা ওকে বলতেন টাট্টি বাবু!'

আমজাদ একটু হাসে! 'শুধু বাথরুম দেখাশুনা করে ওর ইংরেজ ভক্তি আরো বেড়ে গেল। উনি বলতেন, সাহেবরা জানে কি ভাবে বাথরুম ইয়ুজ করতে হয়। যদি কখনও কোনো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হাউসে এসে দু-একদিন থেকে গেলেন, তাহলে আর কথা নেই! উনি চলে যাবার পর শুরু হতো সরকারবাবুর বকবকানি, ইন্ডিয়ানরা বাথটব ইয়ুজ করতে জানে না অথচ

করবেই।'...

'সরকারবাবুর 'বস' ছিলেন ডেপুটি মিলিটারি সেক্রেটারি। একটা ছোকরা মেজর। ছোকরাটা ইন্ডিয়ানদের রাস্তার কুকুরের মতো মনে করত। কথায় কথায় স্কাউন্ড্রেল বিচ, ব্লাডি, বাগারের মতো সাধারণ বিশেষণে উনি খুশি হতে পারতেন না। আর তার সঙ্গে বুটের ছোট্ট লাথি। কোনো কর্মচারী একবার 'এক্সকিউজ মি' স্যার, বললেই হল! সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা মেজর বুটের এক লাথি দিয়ে বলত, 'তোর মাথায় কি ঘিলু নেই? তুই কি কুকুরের পেটে জন্মেছিস?'

'কেউ সহ্য করতে পারত না ওই ছোকরাটাকে। ধরাধরি করে অন্য সবাই বদলি হয়েছিল অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে। শুধু সরকারবাবু কোনোদিন প্রতিবাদ করেননি, কোনোদিন বদলি হতে চাননি। 'আরে বাপু, ওসব কি গায়ে মাখলে চলে? কাজ শিখতে হলে এইসব কড়া সাহেবদের কাছে শেখা যায়।'

আমজাদ বলল, 'এই ছোকরাটা ব্রেবোর্ন সাহেবের সময়েই গভর্নমেন্ট হাউসে এল। পরে শুনেছিলাম ও ব্যাটা মেদিনীপুরে অনেক অত্যাচার করেছিল, অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছিল। তাই প্রমোশন দিয়ে ওকে গভর্নমেন্ট হাউসে আনা হয়।'

সেই সরকারবাবু আজ রাজভবনের মস্ত অফিসার!

একদিন সুবিধে মতন ক্যাপ্টেন রায় পাকড়াও করলেন, 'সরকারবাবু অনেকদিন কাটালেন এই গভর্নমেন্ট হাউসে তাই না।'

একটু গাম্ভীর্য এনে উনি বললেন, 'হ্যাঁ, তা হল অনেক দিন।'

'আপনি তো পুরনো জমানাও দেখেছেন।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সরকারবাবুর। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দেখে নিলেন পুরনো লাট সাহেবের দুটো একটা পেন্টিং। 'ক্যাপ্টেন, দ্যাট ওয়াজ গুপ্ত পিরিয়ড অফ মাই লাইফ।'

'তা তো বটেই!'

শেরওয়ানির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে মাথার গান্ধী ক্যাপটা ঠিক করে নিলেন সরকারবাবু।

'...কি বলব সে-সব দিনের কথা! তখন সবকিছুরই একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। আর আজকাল? হা, ভগবান! এই গভর্নমেন্ট হাউস! আমরা কি এসব প্যালেসে থাকার উপযুক্ত? এখন গভর্নমেন্ট হাউসের লনে আলু-পটলের চাষ হয়, মার্বল হলে খোল-করতাল বাজিয়ে কেত্তন হয়! আরে বাপু, আলু-পটলের চাষ করতে হয় তো দত্তপুকুর-গোবরডাঙা যাও, কেত্তন শুনতে হয় তো নবদ্বীপ যাও, এই গভর্নমেন্ট হাউসে কেন?'

এতক্ষণ প্রায় স্বগতোক্তি করছিলেন সরকারবাবু। এবার ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললেন, 'আজকাল লাটসাহেবকে ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গেও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখা যাবে। আর আগে? লাটসাহেবকে দেখলে ডেপুটি সেক্রেটারির আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যেত। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন কি এমনি গোল্লায় যেতে বসেছে?'

এ-ডি-সি সাহেব ছোট্ট সায় দেন, 'তা যা বলেছেন আপনি!'

'আপনি তো সেদিন এলেন। কি আর বলব আপনাকে। এমন লাটসাহেবও দেখলাম যিনি সেক্সন অফিসারকে হিসেব নিকেশ পাল্টাতে বলেন।'

'কেন?'

'কেন আবার? নিজের সুনাম রাখার আগ্রহে।'

কথাগুলো যে একেবারে মিথ্যে, তা নয়। দেশে যখন খাদ্য সমস্যা চরমে উঠল, যখন দেশের

লিডাররা বন্দেমাতরম ভুলে 'গ্রো মোর ফুড' স্লোগান দিতে শুরু করলেন, তখন লাটসাহেব ঠিক করলেন, রাজভবনেও চাষ করতে হবে। সরকারি ফার্ম থেকে সব চাইতে ভালো বীজ আনানো হল, বিখ্যাত কেমিক্যাল কোম্পানি থেকে ফার্টিলাইজার আনা হল। জাপানীজ এম্বাসেডরের উপহার দেওয়া ছোট্ট হ্যান্ড ট্রাক্টর চালিয়ে ধান চাষের উদ্বোধন করলেন স্বয়ং লাটসাহেব। তারপর ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ সীডস্‌, ডেভলপমেন্ট অফিসার, ফার্টিলাইজার কোম্পানি রোজ কয়েক ঘণ্টা কাটাতেন রাজভবনে ওই ছোট্ট জমির তদারকিতে। কয়েকমাস অজস্র অর্থ ব্যয়ে একদিন সত্যি সত্যি ধানের শিষ বেরুল। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাম্যান তলব করে ডজন ডজন ছবি নেওয়া হল। এমনি করে একদিন বাইশ হাজার টাকার বিনিময়ে দুমণ ধান হল রাজভবনের উর্বর জমিতে।

হর্টিকালচারাল ডিপার্টমেন্টের শঙ্করলাল বলে, অত কাণ্ড করেও শেষ পর্যন্ত এক মণ ধানও হয়নি। ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার নিজের প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য একদিন গাড়ি করে এক বস্তা ধান এনে মিশিয়ে দিলেন এই ধানের সঙ্গে।

সরকারবাবু পরে বলেছিলেন, 'স্বয়ং লাটসাহেবের নির্দেশে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনের খরচা কম দেখান হল। লড ব্রেবোর্ন বা স্যার জন হার্বার্ট হলে গভর্নমেন্ট হাউসে চাষ করতে দিতেন না আর চাষ করলেও খরচ দেখবার জন্য সেক্সন অফিসারকে অনুরোধ করতেন না।

কথাটা যে বেঠিক, তা নয়। লর্ড ব্রেবোর্ন বা স্যার জন হার্বার্ট হয়তো অনেক কিছুই করতেন না, হয়তো তাঁরা মহানুভব ছিলেন, কিন্তু ডেপুটি মিলিটারি–ওই ছোকরা মেজরটা যে কুট্টাকা বাচ্চা না বলে সরকারবাবুকে আদর করতে পারতেন না? তবুও সেটাই ছিল ওর জীবনের গুড পিরিয়ড, স্বর্ণ যুগ!

চমৎকার! এই লোকগুলোকে দেখলেও ক্যাপ্টেন রায়ের ঘেন্না করে। তাইতো আমজাদ-রমজানকে অনেক বেশি ভালো লাগে তাঁর।

আমি লাইফে নিঃসঙ্গতার কোনো প্রশ্নই নেই। সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। বিকেল বেলা মেসে ফিরেই ক্লান্ত দেহটা লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। রুম বয় অনুগ্রহ করে যেদিন চা নিয়ে আসতে দেরি করত সেদিন ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নিতেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? বিশ পঁচিশ মিনিট। না হয় আধঘণ্টাই হবে। কোনো কোনো দিন রুম বয় চা নিয়ে আসতে দেরি করলেও ঘুমুতে পারতেন না পাশের ঘরের শ্রীবাস্তবের জন্য। ক্যাপ্টেন এল. পি. শ্রীবাস্তব। এলাহাবাদের ছেলে না হলেও ইউ পি-র তো বটে। তাই ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা। অফিস থেকে ফিরে চিঠিপত্র পড়ার পর রোজ আসে ক্যাপ্টেন রায়ের ঘরে।

রোজ?

হ্যাঁ। মন ডে টু স্যাটার ডে। যে কদিন পোস্টাফিস খোলা থাকে আর কি। প্রত্যেক দিন বেরিলী থেকে যমুনা ত্রিবেদীর একটা চিঠি আসবেই। সে চিঠি আর কাউকে দেখাবে না। শুধু ক্যাপ্টেন রায়কে পড়াবে। না পড়িয়ে থাকতে পারে না। কেউই পারে না। ক্যাপ্টেন শ্রীবাস্তবও পারে না।

রাতের অন্ধকারে ফুল ফোটে। ভোরের আলোয় সে আত্মপ্রকাশ করে সবার কাছে। কিন্তু অমানিশার অন্ধকারেও কি সে সত্যি লুকিয়ে থাকতে পারে? অজ্ঞাত রাখতে পারে কি নিজের পরিচয়? না। চোখের আলোয় তাকে দেখা না গেলেও গন্ধ ছড়িয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয় তার পূর্ণ যৌবনের খবর। শুধু ক্যাপ্টেন শ্রীবাস্তব নয়, দুনিয়ার সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে। বেরিলী-কাঠগুদামের পথে জীপ অ্যাক্সিডেন্টে বেশ আঘাত পাবার পর ডাঃ ত্রিবেদীর আস্তানায় ওকে কটি দিন কাটাতে হয় সেকথা হয়তো ওদের রেজিমেন্টের প্রায় সবাই জানে। কিন্তু ওরা কেউ জানে না ওই আঘাতের যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই কাছে পেয়েছিল ডাঃ ত্রিবেদীর মেয়েকে-অধ্যাপিকা যমুনা ত্রিবেদীকে। ক্যাপ্টেন রায় ছাড়া আর কেউ জানে না ওদের কথা। অনেক কথা। অনেক কাহিনি।

যমুনা রোজ একটা চিঠি লেখে এল পি-কে। সে চিঠি নিয়ে এল পি ছুটে আসে ক্যাপ্টেন রায়ের ঘরে। বার বার পড়বে সে চিঠি। তারপর জানতে চাইবে তার অর্থ, মর্মার্থ, গূঢ় অর্থ।

'রয়, হোয়াট ইজ ইওর রিঅ্যাকসান?'

'ক্যাপ্টেন রায় হাসতে হাসতে বলে, 'প্রেমে করবে তুমি আর রিঅ্যাকসান হবে আমার?'

'না, মানে চিঠি পড়ে তোমার কি মনে হয়? এই চিঠিটার টোনটা একটু আলাদা না?'

'যমুনায় ডুব দিয়েছ তুমি আর চিঠির টোন্ বুঝব আমি? তাই কি হয়?'

এল পি যুক্তিতর্ক বোঝে না বুঝতে চায় না। প্রেমে পড়লে যেমন অন্যে বোঝে না। ক্যাপ্টেন রায় তা উপলব্ধি করে। কিন্তু তবুও বেশ কেটে যায় বিকেল বেলার কিছু সময়।

সন্ধ্যার পর বিগ্রেড হেড কোয়ার্টাসে মেসে কিভাবে যে সময় কাটে তা কেউ খেয়াল করে না। নাচ-গান, খেলাধুলো, ড্রিঙ্ক ডিনারের শেষে যখন হুঁশ হয়, তখন আর কতটুকুই বা রাত বাকি থাকে?

আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে এলেও আমি লাইফে কেউ নিঃসঙ্গতা অনুভব করে না, করতে পারে না।

কলকাতার রাজভবনে কয়েক শ মানুষ কাজ করেন। দিবারাত্র এক গন্ডীবদ্ধ রাজভবনে এঁরা থাকেন কিন্তু নৈকট্য নেই নিজেদের মধ্যে। প্রাণহীন ফর্মালিটি আছে, নেই ভালোবাসার উষ্ণতা, উত্তাপ, আনন্দ। স্কোয়াড্রন লিডার সিং চলে যাবার পর যখন এই নির্মম সত্য ক্যাপ্টেন রায় আবিষ্কার করলেন, তখন বড় আঘাত পেয়েছিলেন মনে মনে, আহত হয়েছিল অনেক দিনের প্রত্যাশা, ভেঙেছিল অতীত দিনের স্বপ্ন।

আজ আর সে দুঃখ নেই। রমজানের কাছে অ্যান্ডারসেন সাহেবের মেয়েদের কীর্তি শুনতে বেশ লাগে ব্যাচিলার এ-ডি-সি সাহেবের।

আরে সাব, কি বলব আপনাকে? লেড়কি দুটো কি কাণ্ডই না করত। আমার যেমন সরম লাগত তেমনি ডর লাগত...'

'কেন? তোমার ভয় লাগার বা লজ্জা পাবার কি ছিল?'

বুড়ো রমজান একটু না হেসে পারে না। হাসবে না? এখন না হয় ও বুড়ো হয়েছে, অ্যান্ডারসন সাহেবের আমলে তো জোয়ান ছিল। সেই বয়সে ওই জোয়ান লেড়কিদের খিদমদ্গারী করতে লজ্জা হবার কথা বৈকি!

বেঙ্গল ক্লাবে জেফারসন সাহেবের আতিথ্য উপভোগ করার জন্য অ্যান্ডারসন তনয়াদের আবির্ভাব হতো সন্ধ্যার পরই। রমজান অস্টিনের দরজা খুলে দিতেই স্বয়ং জেফারসন সাহেব অভ্যর্থনা করতেন মিস ডায়না অ্যান্ডারসন ও মিস ডরোথি অ্যান্ডারসনকে। হাজার হোক

লাটসাহেবের মেয়ে! সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করতেন না ছোকরা জেফারসন সাহেব। টপ-হ্যাট খুলে মাথা নিচু করে বিনম্র কণ্ঠে বলতেন, 'গুড ইভনিং!'

'গুড ইভনিং!'

তারপর ডান হাত এগিয়ে দিয়ে আলতো করে তুলে নিতেন ওদের ডান হাত, স্পর্শ করাতেন নিজের ওষ্ঠে। যেন রয়্যাল ফ্যামিলির কাউকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে।

বেঙ্গল ক্লাবের আত্মসচেতন অন্যান্য ইংরেজ বাসিন্দারা ভিড় না করলেও বেয়ারা-চাপরাশীরা ভীড় করত চারপাশে লাটসাহেবের মেয়েদের সেলাম দেবার জন্য। গর্বে অহঙ্কারে ওদের সামনে বুক ফুলিয়ে জেফারসন সাহেব ও অ্যান্ডারসন কন্যাদ্বয়কে অনুসরণ করত রমজান।

থার্ড ফ্লোর। রুম নম্বর থ্রি ফোর ফাইভ!

সাধারণত জেফারসন সাহেবের দু-একজন বন্ধুবান্ধব রোজই থাকতেন ওই সন্ধ্যাকালীন আসরে। রুম নম্বর থ্রি-ফোর ফাইভের প্রবেশ পথে তাঁরা অভ্যর্থনা জানাতেন ডায়না ও ডরোথিকে।

রমজান একটা চেয়ার নিয়ে দোরগড়ায় বসে থাকত। পাহারা দিত। বেঙ্গল ক্লাবের বেয়ারারা ট্রেতে ভর্তি করে যখন ড্রিংক নিয়ে যেত তখন রমজান একবার সেসব নেড়ে চেড়ে দেখত। একটু মেজাজের সঙ্গে জানতে চাইত, 'সব ঠিক হ্যায় তো?'

'জি হ্যাঁ।'

'যাইয়ে অন্দর।'

প্রথম দু-এক ঘণ্টা রমজানের কানে শুধু একটু আধটু হাসির আওয়াজ ভেসে আসত। ঘড়ির কাঁটা আরও খানিকটা ঘোরার পরে সে হাসি আরো-প্রাণবন্ত হতো, আরো বিচিত্র হতো। শুরু হতো নাচ-গান।

তখনকার দিনকালই আলাদা ছিল। ইংরেজ সাহেবসুবরা দিনের বেলা ক্লাইভ স্ট্রিট ডালহৌসী চৌরঙ্গীতে বেনিয়া বৃত্তি করত। কোটি কোটি টাকা লুঠপাট করে দেশে পাচার করত। সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষ চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপির মতো লুঠপাঠ করতেও পারে না। ওটা অসাধারণ, অস্বাভাবিক, মত্ত প্রমত্ত কাজ। তাইতো চোর ডাকাতের দল কাজের পর মদের ভাটিতে বসে, যত্রতত্র রাত্রিবাস করে।

ইংরেজ বেনিয়ারা হাজার হোক কালচার্ড। তাইতো মদের ভাটিতে বসে মাটির ভাঁড়ে বা ভাঙা গেলাসে ওদের তৃপ্তি হয় না, হতো না। ওরা ক্লাব গড়ে, 'বার' খোলে। বেয়ারা-চাপরাশী নিয়োগ করে। শেয়াল কুকুরের মতো পশু প্রবৃত্তিতে ভরা। তবুও যত্রতত্র রাত্রিবাস? নৈব নৈব চ! ওরা ককটেল, ডিনার, ডান্সে মেয়েদের নেমন্তন্ন করে আপ্যায়ন করে, তিলে তিলে মত্ত প্রমত্ত করে। ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলে সুপ্ত প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় চেতনা।

তারপর দপ্ করে জ্বলে উঠত আগুন।

সেকালের বেঙ্গল ক্লাব ছিল এদেরই তীর্থক্ষেত্র। জেফারসন ভাগ্যবান বলে ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য পেয়েছিল অ্যান্ডারসন নন্দিনীদের। জনসন, জ্যাকসন জেন্ডারসনের অদৃষ্টে জুটত ভঙ্গ কুলীনরা।

রুম নম্বর থ্রি-ফোর ফাইভের দোরগোড়ায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো পাহারা দিতে দিতে রমজান কি না দেখত? প্রথম প্রথম সব কিছু ঠিক বুঝতে পারত না। কিন্তু কিছু দিন পর সব কিছুই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার লাগত।

বেয়ারা আবার এক বোতল হুইস্কী ও তিন-চার বোতল সোডা নিয়ে হাজির হল। রমজান ভ্রূ কুঁচকে পরীক্ষা করে দেখল বোতলগুলো। হুকুম করল, 'যাও।' পর মুহূর্তে আবার অর্ডার করল 'জলদি বাহার আনা!'

হাজার হোক গভর্নমেন্ট হাউসের বেয়ারা! অভিজাত বেঙ্গল ক্লাবের বেয়ারারাও সমঝে চলত। 'জি হুজুর'।

হুইস্কি সোডার খালি বোতলগুলো বেয়ারা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই দরজাটা একটু ফাঁক করে রমজান ভিতরে উঁকি দেয়। না, বেশ জমেছে। ডায়না ডরোথিকে নিয়ে স্লো স্টেপে ডান্স হচ্ছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে পাঁচজনে দুবোতল হুইস্কি ওড়ালে কুইক স্টেপে ড্যান্স করা যায়? তাহলে বেশ নেশা ধরেছে।

হাজার হোক ছোকরা বয়স! একটু দেখতে গিয়ে হয়তো রমজান সময়ের হিসেব রাখতে পারত না।

আবার ফিরে আসত দোরগোড়ার চেয়ারে। দেখত এপাশ-ওপাশ। দেখত কতজনের আসা-যাওয়া। হঠাৎ যেন চমকে উঠল। কে যেন আসছে এদিকে? যেন চিনি চিনি মনে হয়! রমজান তখনও ভাবছে। ভদ্রমহিলা সোজা চলে গেলেন উইলসন সাহেবের ঘরে। শাড়ি পরে উইলসন সাহেবের ঘরে?

ক্যাপ্টেন রায় প্রশ্ন করেন, 'বাঙালি মেয়ে?'

'অর কেয়া? তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, পরে চিনেছিলাম। আগর নাম বলব তো আপনিও চিনবেন...'

'আমিও চিনব?' অবাক হয়ে জানতে চান এ-ডি-সি।

'বহুত আচ্ছি তরাসে চিনবেন। হরদম গভর্নমেন্ট হাউসে আসা-যাওয়া করছেন। মিটিং-এ লেকচার দিচ্ছেন, আখবারে ফটো ছাপা হচ্ছে...'

ক্যাপ্টেন রায় আর এগুতে চান না। হাজার হোক রমজানের সঙ্গে ঠিক এসব বিষয়ে আলোচনা করা তাঁর শোভা পায় না। মার্বেল পাথরে মোড়া রাজভবনের সর্বত্র যেন মৃত্যুর মতো শান্ত শীতল পরিবেশ। প্রাণ-চঞ্চল ক্যাপ্টেন রায় ঠিক সহ্য করতে পারেন না। অপারেশন্যাল এরিয়ায় নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করেছেন কিন্তু এমন অসহ্য মনে হয়নি। রাজপুতানার মরু প্রান্তরে ছোট তাঁবুতে থাকবার সান্ত্বনা ছিল যে সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। কলকাতার রাজভবনে তো কত মানুষের ভিড়, কত কি রয়েছে! অজ্ঞাত রহস্যে ভরা রাজভবনের প্রতি অসংখ্য মানুষের কত আকর্ষণ! কিন্তু ক্যাপ্টেন রায় প্রাণের স্পর্শ, ভালোবাসার উত্তাপ বিশেষ অনুভব করেন না বলেই রমজানদের একটু কাছে টেনে নেন।

তাছাড়া হাই-সোসাইটির নোংরামি রমজানের কাছে শোনার কি দরকার? সে নিজেই কি কম জানে? দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, জয়পুরে থাকার সময় কি কম দেখেছে? আমি ক্যান্টিন থেকে সস্তায় হুইস্কি পাবার জন্য কত মানুষের হ্যাংলামি দেখেছে সে! বিনা পয়সায় মদ খাবার জন্য আর্মি অফিসারদের সঙ্গে কতজন বন্ধুত্ব করে!

'ওসব বাদ দাও রমজান। তুমি অ্যান্ডারসন সাহেবের মেয়েদের কথা বল।'

রমজান কথার মোড় ঘুরিয়ে আবার শুরু করে ডায়না-ডরোথির কাহিনি।

রাত একটু গভীর হলে জেফারসন সাহেবের বন্ধুরা একে একে বিদায় নিতেন। রমজান ওদের সেলাম জানাত। দু-পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে একবার ধীর পদক্ষেপে জেফারসন সাহেবের ঘরে ঢুকত।

ঘর?

রমজান ভিতরে ঢুকে যা দেখত তাকে হারেম বলাই ঠিক। চোখে যা দেখত, তা এ-ডি-সি সাহেবকে বলা যায় না। ডায়না জেফারসন সাহেবের কোলের ওপর লুটিয়ে থাকত আর ডরোথি আপনমনে ড্রিংক করে যেত।

রমজান অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সেলাম করে ঘড়ি দেখিয়ে বলত, 'নাইট ইলেভেন। কাম গভর্নমেন্ট হাউস।'

জেফারসন চিৎকার করে বলতেন, 'গেট আউট ব্লাডি বাগার।'

ডরোথি বলত, 'ব্লাডি জেফারসন ডোন্ট সাউট। গিভ হিম ড্রিঙ্কস্।'

রমজান আর এক মুহূর্ত দেরি করত না। ভয়ে চটপট পালিয়ে যেত ঘর থেকে।

এবার রমজান টেলিফোন করত গভর্নমেন্ট হাউসের পুলিশ অফিসে। 'হিজ এক্সেলেন্সীর মেয়েরা এখন যাবেন না। এখনও ওরা ঘরের মধ্যেই আছেন।'

রাত এগারোটার পর আধ ঘণ্টা অন্তর রমজানকে খবর দিতে হতো গভর্নমেন্ট হাউসে। প্রয়োজনবোধে পুলিশ অফিস সতর্কতা অবলম্বন করত। হাজার হোক অ্যান্ডারসন সাহেবের মেয়ে তো। বাপের পাপে মেয়েদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কিনা কে বলতে পারত?

বারোটা নাগাদ রমজান আর একবার ভিতরে গেল। একি ড্রইংরুমে ডরোথি একলা বসে মদ খাচ্ছে? ওরা দুজনে গেল কোথায়? প্রথমদিন রমজান সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিল কিন্তু পরে জেনেছিল ডরোথির একটু বেশি নেশা হলেই জেফারসন আর ডায়না বেডরুমে চলে যেত।

'জানেন সাব, ছোট লেড়কিটা বড় বেশি সরাব খেতো কিন্তু বদমাস ছিল না। বড়া লেড়কী? হা আল্লা! এমন বদমাস লেড়কী আমি সারা জিন্দেগীতে আর দেখব না।'

রাত একটা-দেড়টা দুটোর সময় ওদের দুজনকে নিয়ে রমজান গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরত। বেঙ্গল ক্লাব থেকে রওনা হবার আগে গভর্নমেন্ট হাউস পুলিশ অফিসে ফোন করে জেনে নিত কোনো গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকবে। এক একদিন এক একটা গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকত। ডায়না গাড়ি থেকে নেমে ঠিক টুক টুক করে হেঁটে লিফট্ এ চড়ত কিন্তু ডরোথির দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকত না প্রায়ই। কতদিন ডরোথিকে কোলে করে ঘরে পৌছে দিয়েছে রমজান। জোয়ান বয়সে সরাব খাওয়া বেহঁশ জোয়ান লেড়কীকে কোলে নিতে গিয়ে রমজানের রক্ত হয়তো একটু দ্রুত চলাচল করত কিন্তু তাই বলে বেইমানী? কখনও করেনি।

বাংলাদেশের চারপাশে যত বেশি বোমা-পটকা ফুটতে লাগল অ্যান্ডারসন সাহেব তত বেশি ক্ষেপে উঠলেন। কনভোকেশন অ্যাড্রেস দেবার সময় অ্যান্ডারসন সাহেবের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বাংলা গর্জে উঠল তরুণী কিশোরীর হাতের রিভলভারের মধ্যে। আহত ব্যাঘ্রের মতো অ্যান্ডারসন সাহেবও প্রতিহিংসার নেশায় জ্বলে উঠলেন। বাংলাদেশ আর বাঙালিকে শায়েস্তা করার নেশায় চব্বিশ ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকতেন স্যার জন অ্যান্ডারসন।

ডায়না-ডরোথি আরো বেশি দূর সরে গেল। আরো বেশি স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পেল।

গভর্নরের লঞ্চে গঙ্গার মোহনা দেখতে যাবার সময় মিলিটারি সেক্রেটারি স্পেশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাপ্টেন লংম্যানের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হল ডায়নার। তারপর থেকে সময়ে অসময়ে ডায়না যাতায়াত শুরু করল লংম্যানের কোয়ার্টারে। গভর্নমেন্ট হাউসের সামনেই লংম্যানের কোয়ার্টার। কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা কমলেও ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। ডরোথিকে নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি শুরু করলেন।

'ঠিক এই টাইমে হামার ডিউটি বদলে গেল। আমি লাটসাহাবের পার্সোন্যাল ডিউটি দিতে শুরু করলাম। লেড়কিদের ঠিক খবর রাখতে পারতাম না। তবে ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে জেফারসন সাহেবের লড়াই বেশ জমে উঠেছিল। গভর্নমেন্ট হাউসের সবাইকে জব্দ করবার জন্য জেফারসন সাহেব তো একবার ডরোথিকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন দো-তিন হপ্তার জন্য...'

'আচ্ছা?'

'আর কিয়া? শেষে লংম্যান সাহেবকে জব্দ করার জন্য জেফারসন সাহেব ওরই সরকারি কোয়ার্টারে রিভলভারের গুলিতে সুইসাইড করেন।

'বল কি রমজান?'

'হ্যাঁ সাব। জেফারসন দেখাতে চেয়েছিলেন লংম্যান ওকে মার্ডার করেছে...'

রমজানের কাছে শুধু ডায়না-ডরোথির বেলেল্লাপনার কাহিনির মধ্যে ডুবে থাকতে পারেন না ক্যাপ্টেন রায়। আমজাদের দেওয়া ব্রেকফাস্ট খেয়ে সকাল বেলায় লাটসাহেবের সেবা করতে গিয়ে যে-সব দর্শনার্থীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাতে মন ভরলেও খেয়াল চরিতার্থ করা যায় না। তার জন্য চাই ইভনিং ডিউটি বা ট্যুর। সব ট্যুর, সব ইভনিংই রঙিন হয় না কিন্তু ঘুরে ফিরে রংমশালের রঙিন আলো নজরে পড়বেই।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং এয়ারফোর্সে ফিরে গেছে অথচ পরবর্তী নেভাল এ-ডি-সি তখনও এসে পৌছাননি। কয়েক মাসের জন্য একজন আই-পি-এস পুলিশ অফিসার এ-ডি-সি-র কাজ করছিলেন। লাটসাহেবের ও রাজভবনের কতকগুলো আদব-কায়দা-নিয়ম-কানুন ও বৈশিষ্ট্য আছে। অনেক নিয়ম-কানুন আদব-কায়দার কথাই ফাইলে লেখা থাকে না। অনেকটা বিয়েবাড়ির স্ত্রী-আচারের মতো আর কি! বিয়ের মন্ত্র পাঁজি-পুঁথিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্ত্রী আচার কোথাও লিখিত পাওয়া যায় না। দেখে শুনেই ওসব শিখতে হয়। লাটসাহেব ও রাজভবনের ক্ষেত্রে পাঁজি-পুঁথির মন্ত্রের চাইতে স্ত্রী আচারের প্রাধান্য ও গুরুত্বই বেশি। নতুন কোনো এ-ডি-সি-র পক্ষে এসব রপ্ত করা সহজ নয়।

টুকটাক সভা-সমিতিতে রাজ্যপালের অনুগমন করা বা ক্যাজুয়াল ভিজিটার্সদের রাজ্যপালের ড্রইংরুমে পৌছে দেবার কাজ নতুন এ-ডি-সি করলেও সব গুরুত্বপূর্ণ কাজই ক্যাপ্টেন রায়কে করতে হতো।

কাজের কি শেষ আছে এ-ডি-সি-র? কি না করতে হয় তাঁকে? লাভ-ম্যারেজের পর একলা স্বামীর ঘর করতে গিয়ে মেয়েদের যে অবস্থা হয়, এ-ডি-সিদেরও অনেকটা সেরকম। কলেজ-ইউনিভার্সিটি, কফি-হাউস-সিনেমাহল, লেক-ডায়মন্ডহারবার-দীঘার পর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সিংহদ্বার টপকে স্বপনচারিণীকে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে হয়। চাল-ডাল-আটা-ময়দা হাঁড়ি-কড়া-হাতা-খুন্তীর তদারকি করতে হয়, ইন্টিরিয়র ডেকরেটর হয়ে ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল-এ চালাতে হয়, সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে স্বামীকে গান শোনাতে হয় অথবা ট্যাক্সিতে যাবার সময় স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে ন্যাকামির অভিনয় করতে হয়। আরো

কত কি করতে হয়। মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দোলনায় দোল খেতে খেতে নার্সিংহোম ঘুরে আসার পরও স্বামীকে খুশি করার জন্য অভিসারিকা সাজতে হয়।

একটা স্বামীকে তাল দিতেই স্বপনচারিণীর প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। আর-এ-ডি-সি-কে? নিত্য নতুন স্বামীর মনোরঞ্জন করতে হয় তাঁকে। রাজভবনে নিত্য অতিথিদের আগমন। অতিথি সৎকারের দায়িত্ব গভর্নরের ডেপুটি সেক্রেটারির কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব এ-ডি-সি-র নয়। কলকাতার বাইরে লাটসাহেবের ট্যুর ডিউটিতে থাকলে তো কথাই নেই। বেয়ারা, চাপরাশি, অর্ডালী থাকলেও সব দায়িত্বই এ-ডি-সি-র। লাটসাহেবের পোশাক-আসাক খাওয়া-দাওয়া ওষুধ-পত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই এ-ডি-সি-কে দেখতে হয়। এইখানেই শেষ নয়।

এক একজন লাটসাহেবের এক একরকম বাতিক থাকে। যে লাটসাহেব নরম বালিশে শুতে পারেন না, তাঁর ট্যুর প্রোগ্রাম ঠিক হবার পরই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে এ-ডি-সি-র টেলিগ্রাম পাঠাতে হয়, অ্যারেঞ্জ শক্ত বালিশ ফর গভর্নর অ্যাট সার্কিট হাউস স্টপ কনফার্ম স্টপ এ-ডি-সি গভর্নর। লাটসাহেব কি খাবেন, কি ভাবে তা রান্না হবে এবং সে খাবার অল্প না বেশি গরম খেতে উনি পছন্দ করেন, তার ছাপান সার্কুলার আছে। সুতরাং এ-ডি-সি-কে তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে না হলেও লাটসাহেবের খাবার আগে চেক-আপ করে দেখতে হয় সার্কুলারের ইজ্জত রক্ষা করা হয়েছে কিনা।

এইখানেই শেষ নয়। রাজ্যপাল ভাব ভোলা বলে তাঁর পোশাক-আসাকের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর দিতে হয়।

আরো কিছু?

আরো কিছু আছে তবে হয়তো প্রকাশ্যে নয়। রাজাগোপালাচারী বা কৈলাশনাথ কাটজু বা হরেন মুখুজ্জের মতো গভর্নর আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকাল অনেক রাজ্যপাল দিনে প্রহিবিশন কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করলেও সন্ধ্যার পর স্কচ মার্কা দাওয়াই না খেলে পারেন না। সমস্ত লোকচক্ষুর আড়ালে এ-ডি-সি-কেই গেলাস বোতল সোডার ব্যবস্থা করতে হয়। একজন অতি বিশ্বস্ত বেয়ারা সাহায্য করে মাত্র। অনেক রাজ্যপাল তো পুরনো দিনের বান্ধবী দেখলে বর্তমান ভুলে যান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদ্য পরিচিতাকে পুরনো দিনের বান্ধবী বলে চালাতে স্যুট-টাই পরা রাজ্যপালরা দ্বিধা করেন না।

ক্যাপ্টেন রায় অবশ্য ভাগ্যবান। ওর গভর্নরের বোতল বা বান্ধবীর রোগ নেই কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে অন্য রাজ্যপালদের এসব রোগের কথা জানতে বাকি নেই। রাজভবনের বা সরকারি গাড়িতে নয়, সন্ধ্যার পর প্রাইভেট গাড়িতে লাটসাহেব যান বান্ধবী সন্দর্শনে। ব্যবস্থা করতে হয় এ-ডি-সি-কেই। সবাইকে বলতে হয়, আই অ্যাম সরি স্যার, হিজ একসেলেন্সি ইজ নট ওয়েল।'

রমজানের কাছে ডায়না-ডরোথির কাহিনি শুনতে ভালো লাগে কিন্তু চমক লাগে না ক্যাপ্টেন কমল রায়ের। তখনকার মতো এখনও সন্ধ্যার পর চোখের দৃষ্টিটা রঙিন হয়, রক্ত একটু বেশি দ্রুত চলাচল করে, নিশ্বাসে আগুনের হলকা ভেসে আসে।

মারাঠা রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মিশ্র যখন আসাম গভর্নরের এ-ডি-সি ছিলেন, তখন তার কাছে কত কি শুনত! ঘন ঘন কলকাতা থাকতেন লাটসাহেব আর ক্যাপ্টেন রায়কেই তো খবর দিতে হতো মিসেস সরকারকে।

বত্রিশ বছর দেশ সেবার পর ট্যান্ডন সাহেব যেদিন রিটায়ার করলেন, সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই

রাষ্ট্রপতি ভবনের ইস্তাহারে তার পুরস্কার ঘোষণা করা হল।...দি প্রেসিডেন্ট ইজ প্লিজড টু অ্যাপয়েন্ট...।' ট্যান্ডন সাহেব আসামের গভর্নর হলেন। প্রেসিডেন্ট একটুও খুশি হননি তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টে। সরকারি অফিসে বড় বড় অফিসারদের পৌষ মাস খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ট্যান্ডন সাহেবের এমন দুর্দিনে তাকে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারি করার প্রস্তাব করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিজে ফাইলের উপর মন্তব্য লিখেছেন, 'এনি ওয়ান বাট মিঃ ট্যান্ডন!' সেই ট্যান্ডনকে প্রেসিডেন্ট ইজ প্লিজড্ টু অ্যাপয়েন্ট...।

দশ চক্রে ভগবান ভূত! ক্ষেত্র বিশেষে ও প্রয়োজন মতো অপ্রিয় অফিসারদের প্রমোশন দিয়ে দিল্লী থেকে বিতাড়ন করা হয়। ট্যান্ডন এমনি একজন অপ্রিয়-ভাগ্যবান। বত্রিশ বছর সরকারি চাকরি করতে গিয়ে কি না করেছেন?

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের জীবনী ছাপা হয়। কিন্তু যদি এইসব দেশপ্রেমিক একসেলেন্সিদের জীবনী ছাপা হতো, তাহলে উপন্যাস লেখার প্রয়োজন হতো না। লিখলেও বিক্রি হতো না। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এক হাতে পবিত্র কোরাণ অন্য হাতে ধারালো ছোরা নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন বলে আজও তার নিন্দা ছাপা হচ্ছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। কিন্তু যেসব বেইমান মীরজাফরের দল এন্ডারসন বা ডায়ারে কৃপালাভ করার জন্য নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে, কিশোর-কিশোরীদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছে, তাদের নিন্দা কোনো ইতিহাসের পাতায় লেখা হল না। লেখা হল না আরো কিছু...

পুরোদমে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। গ্রামের চাষীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সৈন্যদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হল। দেশের লোকদের মুষ্টিভিক্ষা দেবার জন্য চালু হল রেশনিং। পেটের ক্ষুধা, দেহে লজ্জা নিবারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সব কিছুই রেশনিং-এর আওতায় এল। এক মুষ্টি অন্নের জন্য, এক টুকরো কাপড়ের জন্য দেশের কোটি কোটি মানুষ হাহাকার করে উঠল।

দেশের মানুষের এই সর্বনাশের দিনেই ট্যান্ডন সাহেবের পৌষ মাস ছিল। ট্যান্ডন হলে ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল অফ রেশনিং। গাল ভরা নাম হলেও আন্ডার সেক্রেটারির চাকরি আর কি! ইংরেজ কোনো গোলমালকেই বিশ্বাস করত না। ডিফেন্স বা হোম ডিপার্টমেন্টে যে দুচারজন ইন্ডিয়ান অফিসার ছিলেন, তাদের কাউকেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা গোপনীয় কাজের ভার দেওয়া হতো না। আর যাদের দায়-দায়িত্ব দেওয়া হতো না, তারা পেতেন গাল ভরা নামে পোস্ট! ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল অফ রেশনিং ছিল এমনি এক পদ! দায়-দায়িত্ব বিশেষ না থাকলেও কয়েক হাজার লোকের অস্থায়ী চাকরি নেবার মালিক ছিলেন ট্যান্ডন সাহেব এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেননি তিনি।

চাকরির উমেদারী করতে আসার সময়ই কাপুর স্ত্রী কমলাকে নিয়ে এসেছিলেন ট্যান্ডন সাহেবের কাছে।

'সাব ছোটা সে এক নোকরি দে দিজিয়ে। বড়ই বিপদে পড়েছি।'

'চাকরি-বাকরি' নেই তো বিয়ে করলে কেন?'

কাপুর আর কমলা মাথা হেঁট করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

'এক গাদা বাচ্চা-কাচ্চাও হয়েছে নিশ্চয়ই?'

কমলা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কাপুর চাপা গলায় জবাব দেয়, 'না সাহেব, এখনও বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি।'

লোদি রোডের বাংলোর বারান্দার দু-চারবার পায়চারি করে ট্যান্ডন সাহেব বললেন, 'চাকরি

তো টেম্পোরারি।'

'তাতেই রাজি স্যার।'

ঠোঁটটা কামড়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ দৃষ্টি দিয়ে কমলাকে দেখে বললেন, 'রেশনিং-এর চাকরিতে তো কেবল বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। তারপর একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, অবশ্য তাতে অ্যালাউন্স পাবে।...'

'হাঁ সাব তাতে অসুবিধা হবে না।'

'তোমার ফ্যামিলিকে কে দেখাশুনা করবে?'

কাপুর শুধু চাকরিই পেল না, তিন মাসের মধ্যে পারচেজ ইন্সপেক্টর হল। সরকারের চাল-আটা কিনতে ঘুরে বেড়াত নানা দেশ। সরকারি অ্যালাউন্স ছাড়াও উপরি-পাওনাও আসতে লাগল দু-পকেট ভরে।

ট্যান্ডন সাহেব প্রথমে সপ্তাহে একদিন, তারপর দুদিন, তারপর রোজ সন্ধ্যায় বেঙ্গলি মার্কেটের ফ্ল্যাটে গিয়ে কমলার দেখাশুনা শুরু করলেন। আরো কতজনকে দেখাশুনা করতেন কে জানে? কেউ টুঁ শব্দটি করতে পর্যন্ত সাহস করত না। টেম্পোরারি চাকরি। মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘর লুটিয়ে পড়বে।

ফুড ডিপার্টমেন্টের পুরনো কর্মচারীরা জানলেও এসব কাহিনি ক্যাপ্টেন রায় জানেন না। তবে হিজ একসেলেন্সি ট্যান্ডন কলকাতা এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছোট্ট প্রাইভেট গাড়ি চড়ে বেহালায় মিসেস সরকারের কাছে রোজ ডিনার খেতে যেতেন, তা তো জানেন।

উর্দুতে একটা কথা আছে, 'আই-ই তো ঈদ, নেহি তো রোজা।' জুটল তো ভুরিভোজন, নয়তো অনশন। কথাটা বার বার মনে পড়ছিল ক্যাপ্টেন রায়ের।

সেদিন সকালে লাট সাহেবের কোনো ভিজিটার্স ছিলেন না। আগের দিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত কুমারী পদ্মাবতীর নাচ দেখে এসে কি পরের দিন সকালে কাজ করা যায়? লাটসাহেব তো আর 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এর লোয়ার ডিভিশন কেরানী নন। সরকারি বা বেসরকারি ডিনার অথবা অন্য কোনো প্রোগ্রামের জন্য রাত্রি নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত লাটসাহেব এনগেজড থাকলে পরের দিন সকালে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে না। সরকারি প্রোগ্রাম থাকলে অবশ্য আলাদা কথা! পাঁচ হাজার টাকার চাকরির জন্য যদি ভোরে উঠে গান্ধী ঘাটে মালা দিতে হয় বা দমদম এয়ারপোর্টে অজ্ঞাত অপরিচিতিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হয় তো সে আলাদা কথা। অন্যথায় ছাপানো এনগেজমেন্টের কাগজে চব্বিশ পয়েন্টের মোটা মোটা হরফে লেখা থাকবে 'নো এনগেজমেন্ট ইন দি মর্নিং।

সাধারণত রাজভবনের অফিসাররাও জরুরি কাজ না থাকলে ওই সময় লাটসাহেবকে বিরক্ত করেন না। সকালে তাই ক্যাপ্টেন রায় সোজা এসেছেন নিজের অফিসে। কিছু কাজকর্ম ছিল। কিন্তু ঠিক মন বসল না। পাশের জানালা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরের নীল আকাশের দিকে।

ক্যাপ্টেন একটা সিগারেট ধরালেন। আপন মনে ভাবছিলেন গত রাত্রের কথা। 'ক্যাপ্টেন ট্রাই দিস ফাস্ট 'দিস ইজ কোত্‌লেটা পোজারস্কী।'

'আই-ই তো ঈদ, নেহি তো রোজা।'

এলাহাবাদ ইস্টার কলেজে পড়বার সময় কথাটা শিখেছিল মাথুরের কাছ থেকে।...সতীর্থ অশোক বাজপেয়ী আবার নতুন করে ভালোবাসল চন্দ্রাবলীকে। সিভিল লাইন্স-এর নির্জন পথে ঘন ঘন দেখা গেল দুজনকে। ক্লাস ফাঁকি সাইকেল নিয়ে যমজবাগের দিকে উধাও হবার খবরও

শোনা যেত মাঝে মাঝেই। অভয়া, গার্গী, ডলিদের নিয়ে যা হতো, চন্দ্রাবলীকে নিয়ে অশোক শুধু তার পুনরাবৃত্তি করছিল। নতুন কিছু নয়।

ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা, ছাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। রাগে দুঃখে, হিংসায় অনেক ছেলেমেয়েই অস্থির হয়ে উঠল। উত্তেজনা অস্থিরতা যখন চরমে, তখন মাথুর বলেছিল, 'এই তো দুনিয়া! আ-ই তো ঈদ, নেহী তো রোজা।'

হাসতে হাসতে মাথুর বলেছিল, 'অশোকের ঈদ, আমাদের রোজা!'

ইস্টার কলেজের দিনগুলো বহুদূরে চলে গেছে। বহুদিন পর এ-ডি-সি-র চাকরি করতে এসে ক্যাপ্টেন রায়ের বড় বেশি মনে পড়ছে মাথুরের কথা, 'আই-ই তো ঈদ...'

অ্যান্ডারসন, বারোজ বা লর্ড কেসি যখন বাংলার লাট ছিলেন, তখন আই-সি-এস, আই-পি-এস ছাড়া কিছু রায়-সাহেব খান-সাহেব—রায়-বাহাদুর—খান-বাহাদুরের দল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার নিয়মও পাল্টে গেল। শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশেই। সরকারি পৃষ্ঠপোশকতার জোয়ার ভাঁটা হতো। কখনও কুমিল্লা, কখনও শ্রীরামপুর! কখনও বরিশাল, কখনও বাঁকুড়া! কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও বদ্যি। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ-নাদার, অন্ধ্রে, কামারেড্ডি, পাঞ্জাবে পাঠান-সর্দার-জাঠ! উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ! ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি!

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাংলাদেশে যখন নন্-ম্যাট্রিকুলেট নেতাদের রাজত্বে ঘোর কলিকাল চলছে, তখন যে কজন ব্যর্থ কেরানী রেসের ঘোড়ার মতো একলাফে অফিসার হয়েছিলেন, রাজ্যপালের স্পেশাল সেক্রেটারি মিঃ সরকার তাদের অন্যতম। যে সরকার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গ্যালিফ স্ট্রিটের ট্রামে চড়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুড ডিপার্টমেন্টের তিন তলার কোণার হল ঘরের হাতল ভাঙা চেয়ারে বসতেন, তিনি হঠাৎ থ্রি পিস স্যুট করে 'সত্যমেব জয়তে' মার্কা গাড়িতে ঘোরা-ঘুরি শুরু করলেন।

ক্যাপ্টেন রায়ের এসব জানার নয়। তবে খটকা লেগেছিল রাজভবনের ক্লার্কদের কথাবার্তা শুনে। মিঃ সরকারকে ওরা সবাই সরকার মশাই বলতেন। এবার গভর্নরের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ট্যুরে গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের কাছে সরকারের ইতিহাস জানতে পারেন। '...ইউ নো ক্যাপ্টেন রয়, দিস ফেলো ওয়াজ এ ক্লার্ক আন্ডার মি।'

সেই সরকার আজ শেরওয়ানি-চুড়িদার পরে, গভর্নরের বি টিম। মালেশিয়া পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের সদস্যরা তো সরকারকেই 'ইওর একসেলেন্সি' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

'এক্সকিউজ মি স্যার! আই অ্যাম স্পেশাল সেক্রেটারি টু হিজ একসেলেন্সি...'

ডেলিগেশনের নেতা হাসতে হাসতে মন্তব্য করেছিলেন, 'বাট ইউ লুক লাইক এ গভর্নর!'

সেই সরকার সাহেবের মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে গত রাত্রে ডিনার খেয়েছেন ক্যাপ্টেন রায়। লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী জীবন ভোর 'রোজা' পালন করা যেমন সত্য, স্পেশাল অফিসার—স্পেশাল সেক্রেটারিদের 'ঈদ'টাও তেমনি সত্য।

রাজভবনের হেড কুক পেরেরা সাহেবের খানা এ-ডি-সি-দের অপরিচিত নয় কিন্তু তবুও সরকার সাহেব বার বার বললেন, 'সুড আই গিভ ইউ অ্যানাদার কোত্‌লেটা পোজারস্কি?' রাশিয়ান অন্যান্য খাবারের চাইতে এই চিকেন কাটলেটটা আমার সব চাইতে ভালো লাগে।

'না, না, থ্যাঙ্ক ইউ! অলরেডি অনেক খেয়েছি...'

'ইউ মাস্ট হ্যাভ এনাদার! এসব কোনো হোটেল রেস্তোরাঁয় পাবেন না। আমার স্ত্রী নিজে হাতে...'

'কোথায় শিখলেন?'

'সী লার্নট ইট ফ্রম রাশিয়ানস হু কেম উইথ ক্রুশ্চেভ অ্যান্ড বুলগানিন।'

'আই সী! একটা দিন!'

ক্যাপ্টেন মনে মনে পেরেরাকে ধন্যবাদ জানায়।

প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার বা অন্যান্য রাজ্যের গভর্নর ছাড়াও বহু অতিথির আগমন হয় রাজভবনে। প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারের মতো ভি-আই-পি-দের সিকিউরিটির জন্য, নিরাপত্তার জন্য রাজভবনের থাকতেই হয়? এদের পক্ষে অন্যত্র থাকা নাকি নিরাপদ নয়।

ভারতবর্ষের মতো সিকিউরিটির কদর্যতা আর কোথাও দেখা যাবে না। নিজের দেশের মানুষকে এমন ভাবে দূরে বহুদূরে রাখার নজির আর কোনো দেশে নেই। লর্ড ওয়েলেসলি, স্যার জন অ্যান্ডারসনই আমাদের পূর্বসুরী থেকে গেলেন। স্যার জন অ্যান্ডারসন প্রতিটি ভারতবাসীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন ; মনে করতেন প্রতি ভারতবাসীর পকেটেই টাইম বোমা থাকে। সরকারি গোলামের দল কনস্টেবল সাবইনসপেক্টরদের বিশ্বাস করবেন কিন্তু হেডমাস্টার-প্রফেসর ভাইস চ্যান্সেলারকেও ঠিক সন্দেহের উর্ধ্বে মনে করতে পারেন না।

আর্মিতে সিকিউরিটি হচ্ছে মূলমন্ত্র। দেশরক্ষার জন্য গোপনে কত কি করতে হয়। একজন সুবেদার বিশ্বাসঘাতকতা করলে দেশের কি ভীষণ সর্বনাশ হতে পারে কিন্তু সেখানেও মানুষকে এমনভাবে ঘৃণা বা অবিশ্বাস করা হয় না।

রাজভবনের ভি-আই-পি সিকিউরিটির ব্যবস্থা দেখে ক্যাপ্টেন রায় স্তম্ভিত হন। অজ্ঞাত জুজুর ভয়ে এদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসিও পায়।

পাবে না?

ওই বিরাট লোহার ফটকের ওপাশ থেকে যারা রাজভবনকে দেখে, বর্শা হাতে নিয়ে ঘোড়-সওয়ার পুলিশ দেখে যারা শুধু মজা পায়, তারা না হয় সব কিছু জানে না, জানতে পারে না। যাঁরা কালে কস্মিনে রাজভবনে আসেন বা মার্বেল হলে কাউন্সিল চেম্বারে ভি-ভি-আই-পি দর্শনের পরম সৌভাগ্যলাভ করেন, তাঁরাও হয়তো সবাইকে চিনতে পারেন না। কিন্তু এ-ডি-সি তো সবাইকে চেনেন, জানেন। সবকিছুই দেখেন।

গেটের বাইরে দুচারটে বেতার গাড়ি, দুচার লরি বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ভিতরে? ভিতরে প্রতি পদক্ষেপে ভি-ভি-আই-পি-দের অভিভাবকের দল। বাছাই করা অভিভাবকের দল। রাজভবনের বারান্দায় লিফট-এর পাশে, প্রিন্স অফ ওয়েলস স্যুইটের মুখে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের অমন করে চৌকিদার দারোয়ানী করতে দেখে ক্যাপ্টেন রায় না হেসে পারেন না। রাজভবনের বাইরে থেকে কামানের গোলা ছুঁড়লেও যেখানে পৌঁছাবে না, সেখানেও এই সতর্কতা? নাকি মেন গেটের সশস্ত্র বাহিনীকে পরাস্ত করে যদি কোনো অবিমৃষ্যকারী ঢুকে পড়ে ভিতরে?

এসব ভি-ভি-আই-পি এলে রাজভবনের সমস্ত কর্মচারীদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। সমস্ত কাজকর্ম জীবনযাত্রা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ঠিক কাজের চাপ, দায়িত্বের বোঝা যে খুব বেশি থাকে তা নয়। অধিকাংশ সময়েই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা খিদ্‌মদগার হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। গভর্নরের সেক্রেটারি, স্পেশাল সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, এ-ডি-সি থেকে বেয়ারা-চাপরাশিদের ওই একই অবস্থা। মনে-মনে বিরক্তবোধ করে সবাই, মুখে প্রকাশ করে না কেউই। বিদেশি ভি-আই-পি এলে বেয়ারা-চাপরাশিদের অদৃষ্টে কিছু

প্রাপ্তিযোগ ঘটে। আর ইন্ডিয়ান ভি-আই-পি এলে প্রাইভেট সেক্রেটারির বাথ টাওয়েলের হিসাব না মেলার জন্য মাইনে থেকে খেসারত দিতে হয়।

সহিদাদুল্লা তো স্পষ্টই বলে, 'আরে ছোড়িয়ে সাব–। বড়া মিনিস্টার বা লাটসাব হলেই দিল বড় হয় না। আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু বাথরুম থেকে তোয়ালে বা ড্রইংরুম থেকে বই নিয়ে চলে যাব না।'

গঙ্গা সিং বলেছিল, 'কি আর বলব সাহেব? কিছু কিছু সাহেব আছেন যাঁরা ডিনারের ফলমূল পর্যন্ত নিয়ে যেতে দ্বিধা করেন না।'

অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন রায় বলেছিলেন, 'কি বলছ?'

'বিশ্বাস না হয় হেড ক্লার্কবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন। ওর কাছে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

এসব নোংরামি ঘাঁটাঘাঁটি করতে ক্যাপ্টেন রায় উৎসাহবোধ করেন না। হেডক্লার্ক মজুমদার বাবুকে তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি তবুও কানে ভেসে এসেছে অনেক কাহিনি।

ভি-আই-পি-দের নামে স্পেশাল সেক্রেটারি বা ডেপুটি সেক্রেটারিরও উপরি পাওনা নেহাত মন্দ হয় না। ফরেন ভি-আই-পি এলে প্রতিটি গেস্টের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় ইমপোর্টেড ওয়াইন বা অ্যালকোহলের বোতল। সবাই মদ খান না ; খেলেও এক বোতল কেউই খান না, খেতে পারেন না। পরের দিন সকালে পুরুত ঠাকুর ডেপুটি-স্পেশাল সেক্রেটারির বাড়িতে পৌঁছে যায় এই বোতল বোতল নৈবেদ্য। সীল ভাঙা বোতল তো আর কোনো গেস্টকে দেওয়া যায় না।

ক্যাপ্টেন রায় এসব জানতেন না। একবার আমজাদ আলি এক বোতল স্কচ পৌঁছে দেয় ওর ঘরে। হঠাৎ এক বোতল স্কচ পেয়ে মনটা আনন্দিত হলেও বিস্মিত হয়েছিলেন।

'কি ব্যাপার? স্কচের বোতল?'

'জি হ্যাঁ সাব। এটা আপনার।'

বোতলটা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে এ-ডি-সি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাকা দিতে হবে না?'

'নেহি সাব। টাকা পয়সা দিতে হবে না।'

'গভর্নর সাব পাঠিয়েছেন?'

এবার আমজাদ হেসে ফেলে, 'না সাব লাটসাব কি শরাব পাঠাতে পারেন?'

'তবে?'

আমজাদ আর চেপে রাখতে পারেনি। গড় গড় করে সব বলেছিল।

'বোতলটা ফেরত দিয়ে সাহেবকে আমার সেলাম দিও।'

পরে একদিন আমজাদকে বলেছিলেন, 'একটু আধটু ড্রিংক করি বটে তবে বিনা পয়সায় নয়। আর্মি অফিসারদের কাছে মদ জোগাড় করা খুব কঠিন কাজ নয়। দরকার হলে আমি ফোর্ট উইলিয়াম ক্যান্টিন থেকেই আনতে পারব।'

ওই ঘোড়ার আস্তাবল বা মোটর গ্যারেজের উপরে যে অফিসারগুলো থাকে, তাদের মনোবৃত্তি যে কেমন বিচিত্র হয়!

যাকগে ওসব। রাজভবনে তো শুধু ভি-ভি-আই-পি-রাই থাকেন না, আরো অনেকে থাকেন। এখানে এক অতিথির আগমন হয়েছিল বলেই তো মণিকার সঙ্গে ক্যাপ্টেন রায়ের প্রথম আলাপ হয়।

ক্যাপ্টেন কমল রায়ের মানসী, মণিমালা মণিকা ব্যানার্জি।

...রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটির রেক্টর উ মঙ এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দিতে। বার্মার সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হবার সাদর আমন্ত্রণ জানান। উ মঙ সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তারপর মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ মতো পশ্চিমবাংলার গভর্নর তাঁকে তিনদিনের জন্য ব্যক্তিগত অতিথি হবার অনুরোধ জানান।

এসব ক্যাপ্টেন রায় জানতেন। উ মঙকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে গিয়েছিলেন ওর সহকর্মী। পরের দিন সকালে গভর্নরের সঙ্গে উ মঙের সৌজন্য সাক্ষাৎকার করাবার দায়িত্ব ছিল ক্যাপ্টেন রায়ের। যেসব অতিথিদের সঙ্গে প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকেন না, তাঁদের এনগেজমেন্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে এ-ডি-সি'দের একটু খেয়াল রাখতে হয়।

আমজাদের ব্রেকফাস্ট খেয়ে, সিঁড়ির মুখে লর্ড ওয়েলেসলীর পেন্টিং-এর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ভক্তি জানিয়ে ক্যাপ্টেন রায় ঠিক আটটায় গভর্নরকে সেলাম জানাতে গেলেন।

'প্লিজ লুকআফটার প্রফেসর মঙ। হাজার হোক বৃদ্ধ মানুষ, তারপর সাহায্য করার কেউ নেই।'

মাথা নিচু করে এ-ডি-সি জানান, 'সার্টেনলি স্যার।'

'ইফ দেয়ার ইজ নো আদার সিরিয়াস ওয়ার্ক তাহলে এই তিনদিন তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে একটু থেকো।'

'পারফেক্টলি অল রাইট, স্যার! আমি তিনদিনই ওর সঙ্গে থাকব।'

গভর্নরের প্রস্তাবে ক্যাপ্টেন খুশিই হন! এসব গেস্টদের দেখাশুনা করতে কোনো ঝামেলা নেই। গভর্নরের সঙ্গে ওর দেখা করার কথা পৌনে নটায়! তবুও সওয়া আটটা বাজতে না বাজতেই ক্যাপ্টেন রায় প্রফেসর মঙের দরজায় নক করলেন।

মিনিট খানেক পরে যিনি দরজা খুলে দিলেন, ঠিক মহিলাও নন, একজন যুবতী। সাধারণ ভারতীয় মেয়েদের মতো শাড়ি পরা মেয়ে। দেখে অধ্যাপক মঙের স্ত্রী বা মেয়ে বলেও মনে হল না।

তবে?

মনের দ্বিধা মনেই রাখলাম! 'গুডমর্নিং।'

'আই অ্যাম ক্যাপ্টেন রয়, এ-ডিসি টু দ্য গভর্নর।'

বিচিত্র ঔৎসুক্যভরা সলজ্জ দৃষ্টি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এ-ডি-সি-কে দেখে নেবার পর উনি বলেছিলেন, 'গুডমর্নিং!'

তারপর মিষ্টি গলায় শুদ্ধ বাংলায়, 'আসুন ভিতরে আসুন।'

বাচালতা, চপলতা এ-ডি-সি-র জন্য নয়। মুখে কিছু বলেননি ক্যাপ্টেন রায়। তবে মুচকি হেসে ভালো করে একবার দেখেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন-সম্রাজ্ঞীকে।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ অধ্যাপক বড় কৌচের একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

'এক্সকিউজ মি স্যার, আমি গভর্নরের এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রয়।'

'কাম অন অফিসার, এদিকে বসো।'

সম্মানিত অতিথিদের পাশে বসার বাধা না থাকলেও চলন নেই। ক্যাপ্টেন রায় সঙ্কোচের সঙ্গে সকৃতজ্ঞ হয়ে ধন্যবাদ জানালেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!'

মণিকার বেশ লাগছিল। কথায় কথায় থ্যাঙ্ক ইউ।

গোল গোল রূপোর ফ্রেমের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধও একটু সকৌতুক দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলেন ক্যাপ্টেন রায়কে।

তিনটি দিন বেশ কেটেছিল। ক্যাপ্টেন রায়ের স্মৃতিতে অমর অক্ষয় হয়ে রয়েছে ওই তিনটি অবিস্মরণীয় দিনের কথা, কাহিনি।

অধ্যাপক মঙ যখন রেঙ্গুনে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার, মণিকার বাবা ডক্টর ব্যানার্জি তখন ওখানে ভিজিটিং প্রফেসর হয়েছিলেন দুবছরের জন্য। মণিকা তখন ভিক্টোরিয়াতে বি-এ পড়ে। একমাত্র সন্তান হয়েও বাবা-মার সঙ্গে রেঙ্গুনে যেতে পারেনি। হোস্টেলেই থাকত। ছুটিতে রেঙ্গুনে যেতো।

অধ্যাপক মঙ মণিকাকে বলতেন, 'মাই সুইট লিটল মাদার।'

পরে এই বৃদ্ধের আগ্রহেই মণিকা রেঙ্গুনে এম-এ পড়ে।

অধ্যাপক ডক্টর ব্যানার্জিকে আরো দুবছর রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখেছিলেন শুধু মণিকার জন্য। এম-এ পাশ করার পর সবাই চলে এলেন কলকাতা।

ব্যানার্জি পরিবার কলকাতা চলে এলেও ভুলতে পারলেন না স্নেহাতুর বৃদ্ধ অধ্যাপক মঙকে। আর মণিকা? সে তো সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না তার এই বৃদ্ধ সন্তানকে। বিপত্নীক অধ্যাপক মঙের একমাত্র পুত্র—উ থান একেবারে উত্তরে কাচিনে হীরার কারখানায় কাজ করত। বছরে একবারের বেশি ছুটি পেত না। পুরনো দুটি কর্মচারী ছাড়া বৃদ্ধকে দেখার কেউ ছিল না। মণিকা মনে মনে বড় দুঃখ পেত বৃদ্ধের কথা ভেবে। তাইতো বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছিল বৃদ্ধের সঙ্গে।

বিকালবেলায় দুজনে মিলে বেড়াতে যেতেন। কোনোদিন গোল্ডেন প্যাগোডায় বা ইনিয়া লেকের ধারে। অথবা অন্য কোথাও। কত কথা হতো দুজনের।

'আচ্ছা আংকেল, আপনার ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?'

মণিকা জানতে চাইতো।

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে জবাব দেন, 'ঠিক বলেছ মা। একবার একটি মেয়ে পছন্দও হয়েছিল কিন্তু মেয়েটির জন্মবার নিয়েই গণ্ডগোল হল।'

অবাক হয় মণিকা, 'তার মানে?'

'বুঝলে তোমাদের মতো আমাদের বিয়েরও কতকগুলো নিয়ম-কানুন আছে। ছেলেমেয়ের জন্মবার এক হলে আমাদের বিয়ে হয় না।'

'তাই নাকি?'

'থানানের জন্ম সোমবার। মেয়েটিও সোমবারে জন্মেছে। তাই...'

'আরো তো মেয়ে আছে।'

নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আছে বৈকি মা। তবে বিয়ে-টিয়ে কি চটপট হবার জিনিস?'

মণিকা তবুও থামে না। 'কিন্তু আপনি কতকাল এমনি একলা একলা কাটাবেন?'

ইনিয়া লেকের জলে হয়তো মুহূর্তের জন্য নিজের অদৃষ্টের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। 'সব মেয়েই যে তোমার মতো আমার কথা ভাববে তার কি মানে আছে?'

'না, না, ওকি কথা বলছেন? তাছাড়া নাতি-নাতনি তো আপনার কাছে থাকতে পারবে।'

'অত শত আমি আশা করি না।' নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ নিরাশক্তের মতো জবাব দেন।

গোল্ডেন প্যাগোডার ধারে বেড়াতে বেড়াতে কোনো কোনোদিন বৃদ্ধ বলেন, 'তার চাইতে তুমি বিয়ে কর। আমি কলকাতায় তোমার কাছেই থাকব আর মাঝে মাঝে একটু বোদ্ধগয়া ঘুরে আসব।'

বৃদ্ধের সঙ্গে মণিকার সম্পর্কই আলাদা। 'আমার স্বামী যদি খারাপ হয়?'

মণিকার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মঙ বললেন, 'এই বুঝি দুষ্টুমি শুরু হল?'

এই অধ্যাপক মঙ আর মণিকাকে নিয়ে তিনটি দিন ক্যাপ্টেন রায়ের বড় আনন্দে কেটেছিল।

'ক্যাপ্টেন, ইউ উইল নেভার ফাইন্ড এ বেটার গার্ল দ্যান মণিকা।' বৃদ্ধ যেন একটু গর্ব অনুভব করেন মণিকার কথা বলতে। আত্ম তৃপ্তিভরা হাসি মুখে একবার মণিকাকে দেখে নিয়ে বলেন, 'লেখাপড়ায় যদি আর একটু ভালো হতো...'

মণিকা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিল বলে বুড়োর মনে বড় দুঃখ।

'...গান বাজনা আর সংসারের প্রতি এত আকর্ষণ হলে কি লেখাপড়া হয়?'

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন রায়কে।

ক্যাপ্টেন রায় এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে? কথার মোড় ঘোরাবার জন্য মণিকার দিকে ফিরে বলে, 'একদিন গান শোনাবেন তো?'

বৃদ্ধ গর্জে ওঠেন, 'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই 'শোনাবেন তো?' আজ ইভনিং...এ-ই এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ফিরে এলে গান হবে।'

পাশের কৌচে মুখ নিচু করে বসে থাকে মণিকা।

বৃদ্ধের প্রস্তাবে খুশি হয় ক্যাপ্টেন রায়, 'খুব ভালো হবে।'

'বাট...।' বৃদ্ধ যেন কোথায় খটকা বোধ করলেন।

ক্যাপ্টেন আর মণিকা একসঙ্গেই বৃদ্ধের দিকে তাকায়।

'তোমাদের এই রাজভবনে ঠিক জমবে না। তার চাইতে অন্য কোথাও...'

এশিয়াটিক সোসাইটিতে অধ্যাপক মঙের সম্বর্ধনা সভা শেষ হবার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনজনে চলে গিয়েছিল শহর থেকে দূরে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'শুরু কর মা, সময় নষ্ট করো না।'

মণিকা জানতে চাইল, 'শুধু গীতাঞ্জলির গান?'

'একশো বার!'

একের পর এক গান শুনিয়েছিল মণিকা।

গান শুনতে শুনতে বিভোর হয়েছিলেন অধ্যাপক মঙ। বেশ কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে এলে বললেন, 'ওনলি এ সঙ, ফিলসফার লাইক টেগোর ক্যান রাইট দিস। এমন করে আত্মসমর্পণ আর কে করতে পারে?'

কলকাতা ফেরার পথে অধ্যাপক এ-ডি-সি-কে বলেছিলেন, 'শুধু গভর্নমেন্ট হাউসের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখো না। মাঝে মাঝে আমার মায়ের কাছে গিয়ে গান শুনে এসো।'

এক ঝলক মণিকাকে দেখে নিয়ে ক্যাপ্টেন রায় বলেছিলেন, 'স্যার আপনি চলে গেলে কি উনি চিনতে পারবেন?'

এবার আর মণিকা চুপ করে থাকেনি, 'বরং আপনিই চিনতে পারবেন না। গভর্নমেন্ট হাউসে থেকে কি আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের মনে রাখা সম্ভব?'

'তাই নাকি?'

অধ্যাপক মঙের কলকাতা ত্যাগের পূর্বসন্ধ্যায় ব্যানার্জিগৃহে ক্যাপ্টেন রায়ের প্রথম পদার্পণ

হয়। সে সন্ধ্যায় বাইরের বিশেষ কেউ ছিলেন না। শুধু তরুণ বার্মিজ কন্সাল জেনারেল এসেছিলেন, সরকারি পদমর্যাদার জন্য নয় ডক্টর ব্যানার্জির ছাত্র হিসেবে। ভাত মাছ তরকারি রান্না করেছিলেন মণিকার মা। মণিকা রান্না করেছিল মঙের প্রিয় মহিঙ্গা।

ক্যাপ্টেন রায় অবাক হয়েছিলেন, 'আপনি বার্মিজ রান্নাও জানেন?'

'এই একটু আধটু।'

মণিকার মা বললেন, 'আমি এতদিন রেঙ্গুনে থেকেও শিখতে পারলাম না অথচ মণিকা...'

খেতে খেতে হঠাৎ থেমে গেলেন অধ্যাপক মঙ, 'গতজন্মে ও বার্মিজ ছিল।'

ক্যাপ্টেন রায় হাসতে হাসতে বলেন, 'মনে হয় আপনার কথাই ঠিক।'

সে রাত্রে বিদায় নেবার সময় ডক্টর আর মিসেস ব্যানার্জি দু'জনেই বলেছিলেন, 'সময় পেলেই চলে এসো।'

'নিশ্চয়ই।'

পরের দিন সকালে অধ্যাপক মঙ বেনারস চলে গেলেন। এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে অনেকেই এসেছিলেন। ডক্টর ব্যানার্জি আর মণিকাও এসেছিল। ডক্টর ব্যানার্জি ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন রায় মণিকাকে বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে তো আমার আস্তানায় এক কাপ কফি খেয়ে যান।'

রাজভবনের গাড়িতে ক্যাপ্টেন রায় আর মণিকা রওনা হল গভর্নমেন্ট হাউসের দিকে।

রাজভবনেব পোর্টিকোতে গাড়ি থামতেই তকমা আঁটা বেয়ারা এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। এ-ডি-সি সাহেবের সঙ্গে মণিকাকে দেখে মার্বেল হলের এপাশে ওপাশে যে সব বেয়ারারা ছিল, তারা সবাই একটু অবাক হল। আগে কোনো কোনো এ-ডি-সি-কে ওরা গার্ল নিয়ে আসতে দেখেছে, কিন্তু ক্যাপ্টেন রায় কোনোদিন কাউকে নিয়ে আসেননি।

আশপাশের বেয়ারারা মুখে কিছু বলল না, বলতে পারে না, শুধু সেলাম দিল।

লিফট্‌ম্যানও সেলাম দিয়ে উপরে নিয়ে গেল। করিডোরের বেয়ারারাও সেলাম দিল। সেলাম কুড়ুতে কুড়ুতে ক্যাপ্টেন রায় মণিকাকে নিয়ে নিজের ঘরের দরজায় এলেন। সেখানেও একটা বেয়ারা সেলাম দিয়ে দরজা খুলে দিল।

ক্যাপ্টেন রায় মাথার টুপিটা খুলে সসম্ভ্রমে দরজা দেখিয়ে বললেন, 'প্লিজ।'

একটু মুচকি হেসে মণিকা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল, 'এখানে কিভাবে থাকেন বলুন তো?'

'কেন বলুন তো? আমার ঘরটা কি এত খারাপ?'

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলতে খুলতে মণিকা বলে, 'আপনার ঘরের কথা বলছি না বলছি এই রাজভবনের কথা।'

অবাক হয় ক্যাপ্টেন রায়, 'রাজভবনের আবার কী হল।'

একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মণিকা আবার বলে, 'মাই গড! সে বোধশক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন?'

'এক্সকিউজ মি...'

মণিকা নিজের মুখের সামনে একটা আঙুল তুলে বললে, 'এই ফর্মালিটিগুলো ছেড়ে কথা বলতে পারেন না?'

অনেকটা নিশ্চিন্তবোধ করে ক্যাপ্টেন রায়। দু'এক পা এগিয়ে এসে একটা কৌচের টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'বাট হোয়াট হ্যাপেনড্‌ টু রাজভবন?'

'প্রাণহীন পুতুলের মতো এই লোকগুলোর সেলাম নিতে বুঝি আপনার খুব ভালো লাগে?'

ক্যাপ্টেন রায় এবার হেসে ফেলে। 'প্লিজ হ্যাভ ইওর সিট...'

'আবার প্লিজ?'

'আই অ্যাম সরি।'

'শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই চলবে না। প্রতিজ্ঞা করুন আমার সঙ্গে ওই ধরনের ফর্ম্যাল কথাবার্তা বলবেন না।'

ক্যাপ্টেন রায় যেন হঠাৎ একটু দুষ্টুমি করে একটু চাপা গলায় জানতে চায়, 'যদি বেশি ইনফর্ম্যাল হই?'

মণিকা এবার ব্রেক করে, 'আপনি আমাকে কফি খাওয়াবেন বলে এখানে এনেছেন। সেকথা মনে আছে কি?'

'আই অ্যাম সরি...'

ক্যাপ্টেন রায় বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে তলব করল। 'আমজাদ আভি ডিউটিমে হ্যায়?'

'হ্যাঁ সাব।'

'পাঠিয়ে দাও তো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমজাদ এসে দু'জনকেই সেলাম দিল।

'আমজাদ, এই মেমসাহেব আমার পয়লা মেহমান। একটু ভালো করে কফি-টফি খাওয়াবে?'

'জরুর।'

'তাহলে জলদি লে আও।'

এতকাল রাজভবনে কাজ করে মেহমানের মর্যাদা বোঝে আমজাদ আলি। তাইতো, শুধু কফি আনেনি, এনেছিল ডবল ডিমের ওমলেট, কেক, পেস্ট্রি, ক্যাসুনাটস ও আরো কি যেন।

মণিকা ঘাড় বাঁকা করে ক্যাপ্টেন রায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?'

'কেন? কি হল আবার?'

'সামনে ট্রে দেখেও বুঝতে পারছেন না কি হল?'

হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন রায় বলে, 'আই সি! কিন্তু আমি জানতাম বার্মিজ মেয়েরা বেশ খেতে পারে।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'না, না, আমি কিছু মিন করছি না তবে...'

'তবে-টবে ছাড়ুন। এক কাপ কফি খাওয়াতে এনে যা ইচ্ছে তাই বলে যাবেন?'

কেন যে অহেতুক দু'জনে তর্ক করল, তা ওরা কেউ জানে না। মনে যখন ঝঙ্কার লাগে, দূর থেকে যখন একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন উঁকি দেয়, তখন বোধহয় এমনি হয়। সবারই হয়। ক্যাপ্টেন-মণিকার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটল না।

ক্যাপ্টেন সকালে শুধু এক কাপ চা খেয়েই এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। বেশ খিদে লেগেছিল।

'আপনি ভদ্রতা করলেও করতে পারেন; আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'নিশ্চয়ই।' বলে নিজেই ক্যাপ্টেনকে খাবার-দাবার এগিয়ে দিল। নিজেও দু'চারটে নাটস মুখে দিল।

ক্যাপ্টেন নিজেই কফি করতে হাত বাড়ালে মণিকা বাধা দিল। 'থাক, থাক। আমি থাকতে আপনাকে আর নিজে হাতে কফি তৈরি করতে হবে না।'

'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল ফর দি কাইন্ড কন্সিডারেশন।'

'আবার ভদ্রতা? অত ভদ্রতা করলে এক্ষুনি চলে যাব।'

'অভদ্রতা করলে অনেকক্ষণ থাকবেন?' চাপা হাসি হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন রায় জানতে চান।

মণিকাও হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'ভদ্রতা-অভদ্রতা কিছুই করতে হবে না! স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলুন। একটু গল্পগুজব করেই পালাই।

ক্যাপ্টেন যেন উদ্বিগ্ন হয়, এক্ষুনি যাবেন?'

'যাব না?'

ক্যাপ্টেন একটু আনমনা হয়। কৌচ থেকে উঠে একবার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কোনো সুদূরের দিকে একবার দেখে নেয়। প্যান্টের পকেটে দুটো হাত পুরে ধীরে ধীরে ফিরে আসে মণিকার দিকে।

'জানেন মিস ব্যানার্জি, কলকাতায় আসার পর আপনিই আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফার্স্ট গেস্ট।'

মণিকা যেন আঘাত পেল তার দরদী মনে। 'কেন, এখানে আপনার কেউ নেই?'

'না।'

'সময় কাটান কিভাবে?'

'সময়?' রাজভবনের শাসন অমান্য করেই ক্যাপ্টেন রায়ের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। 'ডিউটির পর চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বইপত্তর পড়ি, নয়তো এই বেয়ারা-চাপরাশিদের সঙ্গে গল্পগুজব করি।'

ডক্টর মঙের নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করত যে মণিকা, সে যেন ক্যাপ্টেন রায়ের নিঃসঙ্গতার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল। 'কলকাতায় আপনার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই?'

'না।'

'এমন করে একলা থাকেন কিভাবে?'

ক্যাপ্টেন কোনো জবাব দেয় না। কি জবাব দেবে? মণিকাও চুপ করে বসে বসে নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন প্রিয়হীন ক্যাপ্টেনকে দেখে আর মনে মনে অস্বস্তিবোধ করে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। ক্যাপ্টেন রায়ের আবার মনে পড়ে, সে এ-ডি-সি! সে রাজভবনে রয়েছে।

'আই অ্যাম সরি মিস ব্যানার্জি। কতকগুলো আজেবাজে কথা বললাম বলে মনে কিছু করবেন না।'

'না না মনে করব কেন?'

আবার কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ। ক্যাপ্টেন আবার বলেন, 'একলা বেশ ছিলাম। দুঃখ কষ্টটা ঠিক অনুভব করতাম না। কিন্তু এই কদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করে ঘোরাঘুরি করে নিঃসঙ্গতার বেদনাটা যেন প্রথম অনুভব করলাম।'

মণিকা হাসল।

'আপনি হাসছেন?'

'একটা কথা মনে হল।'

'কি কথা?'

'সেদিন সকালে যখন আপনাকে প্রথম দেখি তখন ভাবতে পারিনি আপনি এত লোনলি! আপনার হাসিখুশি ভরা মুখ আর স্মার্ট ব্যবহার দেখে ভেবেছিলাম ইউ আর দি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান ইন দিস ওয়ার্লড।'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে দুটো লাইন আবৃত্তি করলেন, 'The wind blows out of the gates of the day, the wind blows over the lonely of heart...ওসব বাইরের ঝোড়ো হাওয়া...'

ক্যাপ্টেন আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মণিকা বাধা দিল, 'আপনি তো বেশ মজার লোক।'

'কেন বলুন তো?'

'ইয়েটস্‌কেও মুখস্থ রেখেছেন?'

ক্যাপ্টেন কোনো কথা না বলে সামনের সেন্টার টেবিলে রাখা সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে তুলে নেয়। লাইটারটাও হাতে তুলেছিল কিন্তু মণিকা হাত থেকে নিয়ে নিল, 'আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি।'

মণিকা লাইটার জ্বালতেই ক্যাপ্টেন সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কিছু ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। ডক্টর মণ্ড চুরুট তুললেই আমি লাইটার জ্বেলে ধরতাম।'

'Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us.'

মণিকা হাসতে হাসতে বলে, 'আই উইস আই ওয়াজ ইওর লর্ড!'

'এই অন্ধকারে যখন একবার আলো জ্বালিয়েছেন, তখন লর্ড না বলে অস্বীকার করতে পারি?'

মণিকার সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ। আরো অনেক মেয়ের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। নানা জায়গায়, নানা ভাবে। আম্বালা ক্যান্টে থাকার সময় দুর্গাপুজো নিয়ে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মনীষার সঙ্গে। জীপে চড়ে সারা ক্যান্টনমেন্ট ঘুরেছে দিনের পর দিন, চাঁদা তুলেছে প্রতিটি কোয়ার্টার থেকে। বিজয়ার দিন মা দুর্গার স্বামীর ঘর করতে চলে যাবার পরও সে সম্পর্ক হারিয়ে যায়নি। হায়দ্রবাদে থাকার সময় বাঙালিদের নববর্ষ উৎসবে আলাপ হয়েছিল সীমার সঙ্গে। আরো কত জনের সঙ্গে এমনি আলাপ হয়েছে। কিন্তু এবারের সুর যেন আলাদা। স্বতন্ত্র। হয়তো বা অনন্য।

ক্যাপ্টেন রায়ের বার বার মনে হল মণিকা চলে গেলেও কি যেন রেখে গেছে, কি যেন নিয়ে গেছে। সব কিছু ঠিক ছিল, কিন্তু তবুও যেন একটা লেনদেন হয়ে গেছে দু'জনেরই অজ্ঞাতসারে।

দিনগুলো শুরু হতো, শেষ হতো ঠিক আগেরই মতো। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে শুয়ে শুয়েই খবরের কাগজে লাটসাহেবের ছবি দেখা, আমজাদের দেওয়া ব্রেকফাস্ট খাওয়া, তাড়াহুড়ো করে ইউনিফর্ম চেক করা, হাতে স্যাফরন কলারের আর্ম ব্যাচ পরা থেকে শুরু করে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মুখে লর্ড ওয়েলেসলীর বিরাট পেন্টিংটার সামনে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'গুডমর্নিং লর্ড!'

ঘড়ির কাঁটার মতো সব কিছুই আগের মতো চলছিল। কিন্তু তবুও কেমন ব্যতিক্রম মনে

হচ্ছিল ক্যাপ্টেনের। অফিস ঘরের জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে যে ক্যাপ্টেন শুধু দূরের ফুলের মেলা দেখতেন, সেই ক্যাপ্টেন টিউলিপ বা লিলির গোছা নিয়ে নিজের ঘরে রাখতে শুরু করলেন। টিউলিপ লিলির বিনম্র সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে হয়তো মণিকাকে দেখতেন।

একে আর্মি অফিসার তার উপর লাটসাহেবের এ-ডি-সি। ভদ্রতা, সৌন্দর্য শৃঙ্খল দিয়ে মনকে বন্দী করতে চেষ্টা করতেন সর্বদা। টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে ডক্টর ব্যানার্জির নাম্বারের পাশে লাল পেন্সিসের নিশানা দিয়েছিল কিন্তু তবুও ডায়াল ঘোরাতে পারেনি।

ডিউটির পর একলা একলা চুপচাপ শুয়ে থাকে নিজের ঘরে। মোরাভিয়াকে পড়তেও ঠিক মন বসে না।

দু'দিনের জন্য লাটসাহেবের সঙ্গে মেদিনীপুর ঘুরে এলেন। সেদিন গভর্নরের বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। শুধু বিকেলে কাউন্সিল চেম্বারে স্টেট লেপ্রসি বোর্ডের একটা মিটিং ছিল। ডিউটিতে ছিল লেফটেন্যান্ট ধীলন। ক্যাপ্টেনের অফ ছিল। দুপুরে ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়েছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে। ফিরে এলেন প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ। শুয়ে শুয়ে বইবত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের জন্য।...'ইয়েস ক্যাপ্টেন রায়...।'

গলাটা শুনেই চমকে উঠলেন, 'কে?'

'আমি মণিকা ব্যানার্জি বলছি।'

মণিকা দেখতে পেল না ক্যাপ্টেন আনন্দে লাফিয়ে উঠে বসলেন। 'বলুন কেমন আছেন?'

'মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এলেন?'

'আপনি জানলেন কেমন করে?'

'কেমন করে আবার! খবরের কাগজে ছবি দেখে।'

'রিয়েলি?'

'তবে কি ঠাট্টা করছি?'

আরো কি যেন বলে দুজনেই। তারপর মণিকা বলল, 'ডক্টর আপনার খুব প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন।'

'প্রশংসা করার মতো তো কিছু করিনি।'

'আমি কি করে জানব বলুন? তবে অনুমতি দিলে ওর চিঠিটার রেলিভ্যান্ট পোর্সান পড়ে শোনাতে পারি।'

'ইফ ইউ উইস।'

মণিকা পড়ল, 'প্লিজ কনভে মাই পার্সোন্যাল থ্যাঙ্কস টু দ্যাট চার্মিং ইয়ং এ-ডি-সি টু দি গভর্নর। এমন একদিন আসবে যেদিন হয়তো গভর্নরকে ভুলে যাব কিন্তু ক্যাপ্টেন রায়কে নিশ্চয়ই ভুলব না।'

মণিকার কাছে এসব শুনতে খুব ভালো লাগে। হাসতে হাসতে বললেন, 'মাই গড। হোয়াট হ্যাভ আই ডান?'

মণিকাও একটু হাসতে হাসতে বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'এ চিঠি গভর্নরের হাতে পড়লে এক্ষুনি আমাকে বিদায় করবেন।'

ক্যাপ্টেন একটু হেসে আবার জানতে চায়, 'আর কি লিখলেন?'

'এর বেশি জানতে হলে এখানে এসে দেখে যান।'

অপ্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ জানায় মণিকা।

'ডিনারের সময় বেড়াতে যাওয়া কি ঠিক হবে?' ঠাট্টা করেন এ-ডি-সি।

'সারা দুনিয়াটাকেই রাজভবন ভাবেন কেন বলুন তো?'

সেইদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন রায় দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন ডক্টর ব্যানার্জির বাড়িতে।

মণিকা দরজার গোড়ায় অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বলল, 'আপনার মতো বলব নাকি প্লিজ কাম ইন?'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে বলেন, 'অতিথিকে অপমান করছেন?'

দাঁত দিয়ে জিভ কেটে মণিকা বলে, 'ছি, ছি। অপমান করব কেন? আসুন আসুন ভিতরে আসুন।'

মণিকার মা ভিতরের বারান্দা থেকে ড্রইংরুমে ঢুকেই বললেন, 'এসো, এসো। এতদিন পরে মনে পড়ল?'

মিসেস ব্যানার্জির কথায় খুশি হয় ক্যাপ্টেন। 'না, না, ওকথা কেন বলছেন? একটু ব্যস্ত ছিলাম কদিন।'

'বসো, বসো, কোনো তাড়াহুড়ো নেই তো? একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে যাবে।'

ক্যাপ্টেনের জবাব দেবার আগেই মিস ব্যানার্জি বলে, 'সে কি মা? উইদাউট প্রপার ইনভিটেশন এ-ডি-সি কি ডিনার খেতে পারেন?'

ভদ্রমহিলা মেয়েকে শাসন করেন, 'আঃ! বুলু কি হচ্ছে?'

মণিকা যখন ছোট্ট ছিল তখন বুলবুলি পাখির মতো দিনরাত্তির বক বক করত। সেই থেকেই ওর নাম হয় বুলু। ছোট্ট মেয়েকে বুলু বলে ডাকলে হয়তো ভালোই লাগে কিন্তু তাই বলে এম-এ পাশ করার পরও বুলু?

'আঃ! মা, সবার সামনে কি বুলু বুলু করছ!'

এবার আর ক্যাপ্টেন চুপ করে থাকে না 'এত রাগ করছেন কেন? বুলু নামটা তো ভারি সুন্দর।'

'পরের ডাকমান শুনতে সবারই ভালো লাগে।'

মিসেস ব্যানার্জি যেন অনুযোগ করেন, 'আজকালকার কি যে ফ্যাশান তা বুঝি না। ডাকনাম ধরে ডাকলেই রেগে যায়।'

ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'না মাসিমা। আমি কিন্তু রাগ করি না।'

মণিকা বলে, 'আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক। বুড়ো-বুড়িদের খুশি করার বেশ কায়দা জানেন তো?'

মিসেস ব্যানার্জি ভিতরে যাবার সময় বলে গেলেন, 'তুমি ওর কথা গ্রাহ্য করো না।'

মিসেস ব্যানার্জি চলে যাবার পর মণিকা বলল, 'তারপর বলুন কেমন আছেন।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'বেকারের আবার ভালো-মন্দ থাকার কি আছে?'

'আপনার চাকরি করার প্রয়োজন কি?'

'তাই বলে সারাজীবন বাপ-মার অন্ন ধ্বংস করব?'

'সারা জীবন কেন করবেন? লেখাপড়া শিখেছেন, এবার বিয়ে করে...'

ক্যাপ্টেনকে আর বলতে দেয় না মণিকা, 'বুড়ো লাটসাহেবের সঙ্গে থেকে বুড়োদের মতো কথাবার্তা চিন্তা-ভাবনা করতে শিখেছেন তো বেশ।'

'বিয়ের কথা বললেই বুড়োদের মতো হলাম?'

'তবে কি?'

চাকরটা এক কাপ কফি নিয়ে আসতে না আসতেই মিসেস ব্যানার্জিও ড্রইংরুমে এলেন। 'এখন আর কিছু দিলাম না। একটু পরেই খেতে দেব।'

ক্যাপ্টেন হাসিমুখে বলে, 'ঠিক আছে মাসিমা।'

এবার মণিকার দিকে ফিরে বলেন 'ডক্টর মণ্ডের চিঠিটা কই?'

'চিঠিটা সত্যিই পড়বেন? পড়লে কিন্তু আপনার অহংকার বেড়ে যাবে।' বাঁকা চোখে হাসতে হাসতে মণিকা বলল!

'আপনি বড্ড বেশি তর্ক করেন।'

মণিকা হাসতে হাসতেই উঠে গেল।

একটু পরেই ডক্টর মণ্ডের চিঠিটা নিয়ে এল, 'এই নিন, পড়ুন।'

'আপনিই পড়ুন।'

'না, না, আপনিই পড়ুন।'

'ওটা আপনার চিঠি। আমার পড়া ঠিক নয়।'

শেষ পর্যন্ত মণিকাই পড়ল, 'মাই সুইট লিটল মাদার, বেনারস আর গয়াতে এত বেশি পোগ্রাম ছিল যে কিছুতেই তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। তাই তোমার বাবাকে শুধু একটা টেলিগ্রাম করি। যাই হোক সব সময় তোমাদের কথা মনে হয়। তোমার বাবা, মা ও তুমি আমাকে এত বেশি প্রাণের মধ্যে টেনে নিয়েছ যে একমুহূর্তও তোমাদের ভুলতে পারি না। বার বার মনে হচ্ছে আবার কবে রেঙ্গুন ফেরার পথে কলকাতা আসব...'

এবার মণিকা থামে। বলে, 'এবার আসল জায়গাটা পড়ি।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ।'

'তবে শুনুন।' মণিকা আবার শুরু করে, 'ক্যাপ্টেন রায়ের কি খবর? তোমার সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়েছে নাকি ছেলেটিকে বড় ভালো লেগেছে। চেহারাটির মধ্যেই কেমন যেন একটা সুন্দর আকর্ষণ আছে...'

মণিকা মুখ টিপে হাসতে হাসতে জোর করে একটি কাশির আওয়াজ করল। একবার এক ঝলক দেখেও নেয় ক্যাপ্টেনকে।

'আরো পড়ব?'

ক্যাপ্টেনও চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'অ্যাজ ইউ প্লিজ!'

'আমি কিন্তু আপনার গভর্নর নই? কথায় কথায় এত প্লিজ প্লিজ না করলেও চলবে।'

'ইউ আর মাচ মোর ইমপর্ট্যান্ট দ্যান মাই গভর্নর।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

বসন্তের একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন এবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার বাবাকে দেখছি না?'

'বাবা কটকে গিয়েছেন।'

'কটকে?'

'হ্যাঁ। কটক ইউনিভার্সিটিতে একটা মিটিং আছে। বাবা থাকলে কি আমাকে বকবক করতে হতো?'

'কেন, আপনার বাবা বুঝি কথাবার্তা বলতে খুব পছন্দ করেন?'

'সারাজীবন প্রফেসারি করে কাটিয়েছেন। ছেলেমেয়ে দেখলেই বক্তৃতা না দিয়ে থাকতে পারেন না।'

মিসেস ব্যানার্জি আবার ড্রইংরুমে এলেন, 'কিরে বুলু, ছেলেটাকে খেতেটেতে দিবি নাকি শুধুই বকবক করবি?'

খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা বেশ ভালোই হল। বহুদিন পর কেন, বহু বছর পর এমন খাওয়া হল।

বাংলাদেশের বাঙালিদের খাওয়া-দাওয়ার একটা ধরন আছে। হরেক রকম ডাল, তরকারি, মাছ। তার সঙ্গে দই, মিষ্টি। মাঝে চাটনি। প্রবাসী বাঙালিরা আধিক্য বর্জন করেন কিন্তু ঠিক বাঙালিপনা ছাড়তে পারেন না। ডাল থাকে, মাছ থাকে ; বাদ পড়ে তরকারি। তার বদলে হয়তো বা মাংস। চাটনি থাকলেও একটু আচার, স্যালাড, ফ্রাই, সসের মতো কিছু পাওয়া যাবে। এর ব্যতিক্রম হয় দেশ, কাল ভেদে। দক্ষিণ দেশের বাঙালিগৃহে সম্বার, চণ্ডীগড়ে বাঙালিগৃহে বেসনের কাড়ি পাওয়া যায়।

যেসব বাঙালিরা দেশ-বিদেশে ঘুরে বাংলাদেশেই ফিরে আসেন, খাওয়া-দাওয়াটা তাদের ঘরেই ভালো হয়। নানারকম খাবারের আদিতে একটু সুপ, অন্তে একটু পুডিং ও এক কাপ কফিও থাকে।

আর্মি মেসে আর রাজভবনে খেয়ে খেয়ে মা-র হাতের রান্নার কথা ভুলেই গেছে ক্যাপ্টেন। আজ মনে পড়ল মা-র রান্নার কথা।

ক্যাপ্টেনকে খাইয়ে মিসেস ব্যানার্জি খুব খুশি। 'কষ্ট করে রান্না-বান্না করার পর অশ্রদ্ধা করে খেলে বড় বিরক্ত লাগে।'

'আমি কিন্তু অশ্রদ্ধা করে খাইনি, মাসিমা।'

'না বাবা। আমি তো তা বলছি না।'

একটু যেন আপন মনে হয় ক্যাপ্টেনকে।

দৃষ্টিটা মণিকার দিকে ঘুরিয়ে বলেন, 'ওর বাবা বেশ খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করতেন! এখন অবশ্য কিছুই খেতে পারেন না। কিন্তু এই হতভাগী মেয়েটা কিছু খায় না।'

আবার একটু থামলেন। 'লোকে না খেলে কি রান্না-বান্না করতে ভালো লাগে?'

'মাসিমা, ওটা আজকালকার মেয়েদের ফ্যাশান।'

এতক্ষণ মণিকা চুপ করেছিল। 'মা-র মোসাহেবী করছেন কেন বলুন তো?'

ক্যাপ্টেন মজা করে, 'হোয়াট?'

হাসিটা চেপে থাকলেও ইরানি ঠোঁটের কোণায় যে সামান্য ইঙ্গিতটুকু ছিল, তাতেই মণিকার সারা মুখে মিহি আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'আর হোয়াট, হোয়াট করবেন না। লাটসাহেবের মোসাহেবী করে করে মোসাহেবী করাটা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'আঃ! বুলু কি যা তা বলছিস?'

দিন কতক পরে যখন মণিকার সঙ্গে দেখা হল তখন ক্যাপ্টেন বলেছিল, 'আপনি এখনও সেই ছোট্ট বুলবুলিই থেকে গেছেন।'

'কেন বলুন তো?'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'এখনও বেশ মিছিমিছি সুন্দর কথা বলতে পারেন।'

সেই সুন্দর ইরানি ঠোঁটটা উল্টেই বলেছিল, 'পঁচিশ বছরের বুড়ির আবার মিছিমিছি কথা?'

'আপনি বুড়ি?'

'তবে কি? জানেন না বাঙালি মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়?'

'ইউ উইল নেভার বি বুড়ি।'

মণিকা ভুলতে পারেনি কথাটা। ঘরে, বাইরে, সর্বত্র প্রতিধ্বনি হয়ে কানে ভেসে আসছিল। 'ইউ উইল নেভার বি বুড়ি', 'ইউ উইল নেভার বি বুড়ি!'

ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিটা যে ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, তা বুঝতে কষ্ট হল না মণিকার। ভালোই লাগল।

কথাটা তো ভালো লেগেছিল। এমন দৃষ্টি নিয়ে আগে কি কেউ দেখেছে? মণিকার মনে পড়ে না। জাল ফেললেই পুকুরের সব মাছ ধরা পড়ে না, পড়তে পারে না। ফসকে যায়, পালিয়ে যায়। কলেজ ইউনিভার্সিটির জীবনে মণিকাও ধরা পড়েনি। কিন্তু আজ?

মনের মধ্যে এই এখন দোলা লাগল। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সঙ্কোচ যেন এই এখন অনুভব করল মনে মনে।

কটক থেকে ডক্টর ব্যানার্জি ফিরে এলেন কদিন পর।

'ওগো, ওই এ-ডি-সি ছেলেটিকে একদিন খেতে বলেছিলাম...'

'তাই নাকি?'

'বেশ ছেলেটি।'

'হ্যাঁ আমারও বেশ লেগেছে।' ডক্টর ব্যানার্জি হাতের বইটা নামিয়ে রেখে বলেন, 'নিশ্চয়ই ভালো ফ্যামিলির ছেলে।'

ক্যাপ্টেন রায়ের পরিবারের কোনো খবরই জানেন না মিসেস ব্যানার্জি। তবুও বললেন, 'তাতো বটেই।'

হাসতে হাসতে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'গভর্নরের চাইতে এ-ডি-সি-কেই তো প্রফেসার মণ্ডের বেশি ভালো লেগেছে'।

'উনি ঠিকই বলেছেন।'

পরে ডক্টর ব্যানার্জি মণিকাকে বলেছিলেন, 'হাঁরে বুলু, আমি যখন ছিলাম না, তখনই তোর মা ওই এ-ডি-সি ছেলেটিকে খেতে বলল?'

মণিকা শুধু একটু হাসল। কিছু বলল না।

'আর একদিন ওকে আসতে বলিস।'

'মা-কে বলো। মা-র সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে।'

ডক্টর ব্যানার্জির মজা লাগে নিজের স্ত্রীর কথা শুনতে। 'তোর মা-র ব্যাপারই আলাদা।'

'এ-ডি-সি তো বেশ চালাক আছে। মাসিমা—মাসিমা করে বেশ জমিয়েছে।'

'প্রথম দিনই যখন মাসিমা বলেছে তখন তো তোর মা গলে গেছে।'

আর্মি লাইফে একটা উত্তেজনা আছে। কাজকর্মের মাঝে অবকাশ থাকলেও অবসর নেই। কখনো নিজেকে নিয়ে, কখনো পরকে নিয়ে। কখনও বা সবাইকে নিয়ে। পরিচিত, অপরিচিত, আধা পরিচিতদের নিয়ে। কোথাও ব্যারাকে, কোথাও মেসে, কোথাও কোয়ার্টারে থেকেছে। একা একা। তবে নিঃসঙ্গ হয়নি কোনোদিন। আর্মি বা এয়ারফোর্সে কেউ নিঃসঙ্গ নয়। ওরা খায়-দায়-ঘুমোয় একসঙ্গে। নাচ-গান মদ খায় একসঙ্গে। যুদ্ধ করে একসঙ্গে। মৃত্যুর সময়ও ওরা নিঃসঙ্গ নয়। দল বেঁধে মরে ওরা।

রাজভবনে আসার পরই সুরটা পাল্টে গেল। এখানে নিজের নিজের তালে সবাই মত্ত। যারা দল বেঁধে মরতে শিখেছে, তাঁরা যেন এখানে বেমানান। এরা এক টুকরো রুটি কাউকে দিতে পারে না, নিজেরা কেক্ খেতে ওস্তাদ!

এতদিনের অভ্যাস, এতদিনের ট্রেনিং ভুলতে পারেননি। ধীরে ধীরে বহু দূরে সরে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি কাজ করেছেন কিন্তু কাছাকাছি আসতে পারেননি। মতের মিল হয়নি।

আমজাদ-রমজানের সঙ্গে গল্প করেছেন। ডায়ানা-ডরোথির গল্প শুনেছেন। পুরনো দিনের গভর্নমেন্ট হাউসের কাহিনি শুনেছেন, অফিসারদের নোংরামি জেনেছেন। তাদের নিয়ে সময় কেটেছে। ব্যস, তার বেশি কিছু নয়। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে গেলে সতীনাথের অতৃপ্ত আত্মার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আশেপাশেই কোথাও মিস বিশ্বাসকে দেখতে পায়।

সময় কাটে আরো নানা ভাবে। সভা-সমিতিতে, পার্টি রিসেপশনে ককটেলে। তবুও ক্যাপ্টেন নিঃসঙ্গ থেকে যায়।

সেদিন রাত্রে নেমন্তন্ন খেয়ে আসার পর অনেকবার টেলিফোন করতে ইচ্ছা করেছে, আগ্রহ হয়েছে। তবুও করেননি। লজ্জা, সংকোচ আর কিছু আত্মসম্মানবোধ বাধা দিয়েছে।

আর দেরি করলেন না। হাজার হোক একটা ধন্যবাদ জানানো কর্তব্য। 'বেটার লেট দ্যান নেভার।'

'আমি ক্যাপ্টেন রায় বলছি।'

ডক্টর ব্যানার্জি প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। টেলিফোনের ঘণ্টা শুনে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন।

'কেমন আছ?

'ভাল। আপনি ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, এর মধ্যে এসো। আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি কথা বলো।'

ডক্টর ব্যানার্জি চলে গেলেন।

মণিকা ভেবেছিল কোনো পুরনো ছাত্র হবে।

'আমি মণিকা বলছি।'

'আমি ক্যাপ্টেন রায়।'

হঠাৎ এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে পড়ল মণিকার মুখে। 'আপনি! এতদিন পর মনে পড়ল?'

'আপনার বুঝি রোজ মনে পড়ত?'

মনে পড়ত বৈকি! কিন্তু সে কথা কি বলা যায়? স্বীকার করা যায়?

'আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কথা বাদ দিন।'

'আপনিও তো একবার টেলিফোন করতে পারতেন।'

'একবার কেন, একশো বার করতে পারি, কিন্তু আপনাকে কি পাওয়া যাবে?'

'আপনার জন্য, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

মজা করে মণিকা। 'সিরিয়াসলি? নাকি রাজভবনের প্রোটোকলের মতো কথা বলছেন?'

'বুড়ো গভর্নরের চাইতে আপনাদের সান্নিধ্য নিশ্চয়ই মোর ইন্টারেস্টিং।'

ক্যাপ্টেন যে বলতে চাইছিল ওরই সান্নিধ্যে মোর ইন্টারেস্টিং, তা বঝুতে কষ্ট হল না মণিকার। হাজার হোক পঁচিশটি বসন্ত-মল্লিকার সৌরভে ভরেছে দেহ মন। তাই তো 'বারতা পেয়েছি মনে মনে সব নিঃশ্বাস পরশনে' কিন্তু বলতে পারে না 'কেন বঞ্চনা কর মোরে, কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে–দেখা দাও দেখা দাও দেহ মন ভরে মম নিকুঞ্জবনে।'

বলতে পারে না অনেক কথাই। কিন্তু মন? মুখে শুধু বলল, 'সেইজন্যই তো এতদিন পর টেলিফোন করছেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'বাবা বলছিলেন আপনি যদি একদিন আসতেন...'

'শুধু আপনার বাবাই বলছিলেন?'

'মা তো চান আপনি রোজই আসুন।'

'তাই নাকি? এনিবডি এলস্?'

মণিকার মুখে একটু হাসির রেখো ফুটে ওঠে। 'এই কিছুদিন রাজভবনে থেকেই তো বেশ পলিটিক্স শিখেছেন।'

'কেন বলুন তো?'

এসব কথার অর্থ নেই, তাৎপর্য শুধু মনে মনে। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে হাস্নাহানা, ছড়িয়ে পড়ে তার সৌরভ।

শেষে ক্যাপ্টেন বলে, 'আমি তবুও একবার ঘুরে এসেছি। এবার তো আপনার একবার আসা উচিত।'

'আসব বৈকি। আপনি এর মধ্যে একবার আসুন। তারপর নিশ্চয়ই যাব।'

'ঠিক তো?"

'নিশ্চয়ই।'

বিন্দু বিন্দু শিশির ঝরে পড়ে রাতের অন্ধকারে। তার স্পর্শে, ভালোবাসায় ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ফুল। রাতে অন্ধকারে এ খেলা দেখা যায় না, বোঝা যায় না, অনুভব করাও যায় না। কিন্তু ভোরেব আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে ফুলের মেলা।

ক্যাপ্টেন আর মণিকাও বুঝতে পারেনি। যেমন 'রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে, তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছে তোমার গান।' কোথায় লুকিয়ে ছিল এই মন? চোখের এই দীপ্তি? আঁখি-পল্লবে এই মায়াকাজল?

ডক্টর ব্যানার্জি বড় খুশি হলেন ক্যাপ্টেনকে দেখে। 'তোমার প্রেজেন্ট অ্যাসাইনমেন্টটা তো খুব ইন্টারেস্টিং?'

হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন বলল, 'হ্যাঁ, তা কিছুটা।'

'তোমরা বুঝি এলাহাবাদের বাসিন্দা?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন এলাহাবাদে আছ?'

'বাবা ল পাশ করার পরই এলাহাবাদ যান। সেই থেকেই...'

'তোমার বাবা এখনও প্র্যাকটিশ করেছেন?'

'বছর দুই হল এলাহাবাদ হাইকোর্টের জর্জ হয়েছেন বলে...'

ডক্টর ব্যানার্জি খুশি হয়ে বলেন, 'আই সি!'

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস ব্যানার্জি। বলেন, 'তোমার আর ভাইবোনেরা এলাহাবাদেই?'

ক্যাপ্টেন মজা করে বলে, 'সেদিন খাওয়া-দাওয়া দেখে বুঝতে পারেননি আমিই বাড়ির একমাত্র ছেলে?'

ইতিমধ্যে ডক্টর ব্যানার্জির এক পাবলিশার্স এসে হাজির হলেন এক বান্ডিল প্রুফ আর কিছু

কাগজপত্তর নিয়ে।

মিসেস ব্যানার্জি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে মণিকার ঘরে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই দীর্ঘ বিনুনির শেষে বাঁধুনী দিতে দিতে মণিকা এলো।

'এইভাবে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে আর কতদিন নেগলেকট্ করবেন?'

বিনুনি বাঁধা শেষ হল। বুকের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল যে বিনুনি তাকে ছুঁড়ে দিল পিছন দিকে। ঈষৎ বাঁকা চাহনি আর চোরা হাসি হাসতে হাসতে মণিকা বলে, 'তার মানে?'

'আপনি আসতে বললেন আর আপনারই পাত্তা নেই?'

'স্নান করতে গিয়েছিলাম। বিকেলে এক পুরনো বন্ধু আর তার স্বামী এসেছিলেন বলে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল।'

'ভালই হয়েছে।'

'কেন বলুন তো?'

'ইউ লুক ভেরি ফ্রেশ।'

আরো অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছিল ক্যাপ্টেনের। মন বলছিল, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা মম শূন্যগগনবিহারী।'

অথবা...

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুম চয়নে।'

সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দু-খানি নয়নে।'

মনে মনে ভাবতে গিয়েও ঠোঁটটা বোধহয় একটু নড়েছিল, একটু কেঁপেছিল। মণিকার দৃষ্টি এড়ায়নি।

'কি বলছেন মনে মনে? গালাগালি দিচ্ছেন না তো?'

মনের কথাও জানতে পারে মণিকা? ক্যাপ্টেন চমকে ওঠে। 'কি করে বুঝলেন মনে মনে কিছু বলছি?'

'এটা মেয়েদের ট্রেড-সিক্রেট। বলতে নেই।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি?'

মিসেস ব্যানার্জি ঘরে ঢুকেই একটা প্লেট এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের দিকে।

'মাছ ভাজা দুটো খেয়ে নাও।'

'সে কি মাসিমা?'

'রান্নাবান্না কিছু হয়নি। আজ খেতে খেতে অনেক দেরি হবে!'

'মা-মাসির কাছে এলে না খেয়ে কে যায়?' মিসেস ব্যানার্জি আর কথা না বলে ভিতরে চলে গেলেন।

মণিকা তখনও দাঁড়িয়ে।

ক্যাপ্টেন জানতে চাইল, 'বসবেন না?'

মণিকা পাশের বুক শেলফ্-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সারাদিন শুয়ে-বসে তো টায়ার্ড হয়ে গেলাম। আপনার মতো মুক্ত বিহঙ্গ হলে তো বেঁচে যেতাম।'

'এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা।'

ভ্রু কুঁচকে বাঁকা চোখে মণিকা ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আটকে রেখে জানতে চাইল, 'একটা কথা বলবেন?'

'আপনাকে না বলার মতো তো কিছু নেই।'

'এত কাব্য সাহিত্য চর্চা করলেন কোথায়?'

'আমার কর্মজীবনে কাব্য-সাহিত্যের স্থান নেই বলেই অবসর কাটাই কাব্য পড়ে।'

ক্যাপ্টেন একটু থামে। মুখটা উঁচু করে মণিকার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাছাড়া অবসর যে প্রচুর! একটু গল্প করে সময় কাটাবার মতো কেউ নেই আমার। গত্যন্তর নেই বলেই শুয়ে শুয়ে বই পড়ি।'

'আমাদের এখানে চলে এলেই তো পারেন।'

'আপনিও তো আসতে পারেন আমার ওখানে।'

'কোনোদিন তো বলেননি।'

'সব কথাই কি বলতে হয়?'

তা বটে। 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে, তোমার ভাবনা তারার মতো বাজে।' মণিকা বোঝে বৈকি।

'সত্যি, আমার যাওয়া উচিত ছিল।'

মণিকা গিয়েছিল। টেলিফোন করে ক্যাপ্টেনের ছুটির দিনে গিয়েছিল।

নর্থ গেট পুলিশ অফিস থেকে টেলিফোন পাবার পরই ওই পায়জামা পাঞ্জাবি পরেই ক্যাপ্টেন গিয়েছিল পোর্টিকোতে মণিকাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

ইউনিফর্ম বা স্যুট পরতেই দেখেছে এর আগে। নতুন বেশে বেশ লাগল। লিফট্-এর ওখানে পৌঁছে ক্যাপ্টেন বাটন্ পুশ করল। পাশে দাঁড়িয়ে মণিকা এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, 'আজ এই পোশাকে তো বেশ লাগছে!'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আবার থ্যাঙ্ক ইউ বলছেন? অমন করে প্লিজ আর থ্যাঙ্ক করলে এক্ষুনি চলে যাব।'

এর মধ্যে লিফ্‌ট নেমে এলো। মুখের ঝগড়া চোখের হাসিতে মিটমাট হয়ে গেল। তবে নিজের ঘরে ঢুকেই ক্যাপ্টেন বলল, 'বার্মিজ মেয়েদের মতো আপনি একটু শাসন করতে পছন্দ করেন, তাই না?'

'শুধু বার্মিজ মেয়েরাই নয়, সব দেশের মেয়েরাই পুরুষদের উপর খবরদারি করতে পছন্দ করে। আমিও পছন্দ করি!'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর ফ্র্যাঙ্কনেস্।'

মণিকা বসেছে। ক্যাপ্টেন তখনও দাঁড়িয়ে।

'বসুন।'

'বসছি।'

'নাকি ভাবছেন সিরাজদৌল্লার ওই পরাজিত সৈনিকদের ডেকে কাটলেট-ওমলেট চা-কফির অর্ডার দিতে হবে?'

মণিকার কথায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন না হেসে পারে না।

মণিকা আবার বলে, 'আচ্ছা এখানকার খাবার-দাবার খেতে আপনার ভালো লাগে?'

'ভালো লাগলেই কি সবকিছু পাওয়া যায়? নাকি, খারাপ লাগলেই দূরে রাখা যায়?'

মণিকা কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, 'এখানকার কাটলারিজ ক্রকারিজ দেখলেই কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'মনে হয় সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁতিয়া তোপি, ঝাঁসির রানির প্যালেস লুঠ করে এসব

জোগাড় করা হয়েছিল। আর কিছু এসেছিল উইন্ডসর ক্যাসেল-এর পুরনো স্টোর রুম থেকে।'

দু'জনে হাসে। হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মণিকার দিকে। বেশ লাগে মণিকাকে। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর হঠাৎ লজ্জা লাগে।

দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, বসুন।

এবার ক্যাপ্টেন বসে। একই কৌচের অপর কোণায়।

সেন্টার টেবিল থেকে সিগারেট-কেস খুলে একটা সিগারেট তুলে নেয়। মণিকা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেয় লাইটার। জ্বালিয়ে ধরে ক্যাপ্টেনের সামনে। সে একটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'ধন্যবাদ জানাব?'

'প্রয়োজন নেই!'

আরো দু-একবার সিগারেট টান দিয়ে ক্যাপ্টেন বলে, 'চা আনতে বলি?'

নাক উঁচু করে, ঠোঁটটা উল্টে মণিকা বলল, 'চা? এখানে নয়, চলুন বাইরে খাব।'

'চলনু' বলেই ক্যাপ্টেন উঠে পড়ল। ঘরের কোণায় ওয়াড্রোব খুলে একটা লাইট কালারের স্যুট বের করে বাথরুমের দিকে এগুতে গেলেই মণিকা বলল, ছুটির দিনেও স্যুট পরবেন?'

'তবে কি পরব?'

'কেন, আপনার ধুতি নেই?'

'সরি! একটাও ধুতি নেই।'

'সে কি? বাঙালির ছেলে অথচ একটাও ধুতি নেই?'

'বাঙালিপনা দেখাবার সুযোগ পেলাম কোথায় বলুন?'

একটু থেমে ক্যাপ্টেন জানতে চায়, 'কেন, স্যুট পরলে কি দেখতে খারাপ লাগে?'

'না, না, তা তো বলিনি। তবে বাঙালির ছেলেরা মাঝে মাঝে ধুতি-পাঞ্জবি পরবে বৈকি।'

'ধুতি না পরার জন্য মার কাছেও কি কম বকাবকি শুনি?'

'এবার আরো শুনবেন।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্টেন স্যুট-টাই পরে বেরিয়ে এলো।

'বেশি দেরি করি নি তো?'

'বার্মিজ মেয়েরা আরো অল্প সময় নেয়।' নীচের ঠোঁটটা ডান দিকে টেনে চাপা হাসি মুখে এনে মণিকা বলল।

'ভগবান সবাইকে তো আপনার মতো রূপ দিয়ে পাঠান না।'

যেমন বোলিং তেমনি ব্যাটিং। তাছাড়া ক্রিজটাও বোধকরি ভালো ছিল। অপরাহ্নের ক্লান্ত সূর্য রাজভবনের চারপাশের পাম গাছের মধ্য দিয়ে উঁকি দিতে দিতে গোধূলির আলাপ শুরু করে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে দুটো একটা কোকিলের ডাকও ভেসে আসছিল।

ভাল লাগারই তো সময়।

'আমাকে কী খুব রূপসী মনে করেন?'

'খুব বেশি রূপসী হলে আপনার সঙ্গে মেলামেশাই করতাম না।'

অবাক হয় মণিকা। 'তার মানে?'

'বেশি সুন্দরীদের দিয়ে কোনো কাজ হয় নাকি?'

'অনেক সুন্দরীর সঙ্গে মিশেই কী এই অভিজ্ঞতা?' জেরা করে মণিকা।

হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন বলে, 'Remember that the most beautiful things in the

world are the most uselesspeacocks and Lilies for example.'

আপন মনেই মণিকা বলে, 'শুধু রাশকিন্ পড়েই কি এই অভিজ্ঞতা হয়?'

'নিশ্চয়ই...' অত্যন্ত মার্জিতভাবে হাসতে হাসতে ঠাট্টা করলেও অন্য মেয়ের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ঘনিষ্ঠতার সামান্যতম ইঙ্গিত মণিকাকে ঈর্ষান্বিত করে। মজা লাগে ক্যাপ্টেনের।

'তর্ক করবেন না বেরুবেন?'

'তর্ক করছি?'

'তর্ক করছেন না?'

'তাই বলে আপনি আমাকে যা তা বলবেন?'

'সুন্দরকে সুন্দর, ভালোকে ভালো বলব না?'

ক্যাপ্টেন কি করে বোঝায় মণিকাকে? একথা কি বলা যায় যে 'The beauty shall no more be found' অথবা 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে।' নবাব সিরাজদৌল্লার মতো কৈশোরের প্রারম্ভ থেকেই নারী-সাহচর্য উপভোগ করেনি ক্যাপ্টেন কমল রায় কিন্তু মেলামেশা তো করেছে বহুজনের সঙ্গে। এ-ডি-সি হয়ে কলকাতায় আসার পরই কি কম মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল? গ্র্যান্ড--গ্রেটইস্টার্ন–স্পেনসেস, ক্যালকাটা ক্লাবে বা কোচবিহার কাপের খেলার দিন টার্ফ ক্লাবে গেলে কত ললিত-লাবণ্যের দেখা হয়। কথা হয়, হাসি হয়, ঠাট্টা-মস্করা হয় কিন্তু তারা তো, 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়' না। বাগানে কত ফুল ফুটে থাকে ; যাদের ফ্লাওয়ার ভাস-এ রাখলে ভালো লাগে তাদের দিয়ে কি পুজোর অঞ্জলি দেওয়া যায়?

ক্যাপ্টেনের মনের এসব কথা কি কোনো ভাষায় ব্যক্ত করা যায়?

একটু পরে ক্যাপ্টেন আবার বলে, 'আজ আর আপনার সঙ্গে তর্ক করব না।'

ঘাড় বেঁকিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে মণিকা বলে, 'কেন?'

'তর্ক করলে কি গান শোনাবেন?'

মাথাটা দোলাতে দোলাতে মণিকা বলে, 'বিশ্বাস করুন, আজকাল আর একেবারেই চর্চা করি না।'

'তাতে কি হয়েছে? আজ থেকেই না হয় আবার গানের চর্চা শুরু হবে।'

ঘরের এপাশে-ওপাশে ঘুরে-ঘুরে ক্যাপ্টেন সিগারেট, দেশলাই, পার্স ও আরো কি কি পকেটে পুরে নিল। লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে একবার চুলটা ব্রাশ করে নিল।

'চলুন, বেরিয়ে পড়ি।'

মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

পাশাপাশি এগুতে গিয়েই একবার দু'জনে দু'জনকে দেখে নিল। মণিকা একটু লজ্জিত হল এমন করে চোখে চোখ পড়তে। চট করে বুদ্ধি খাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সবকিছু নিয়েছেন তো?'

ক্যাপ্টেন থমকে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ে বলল, 'দ্যাট্স্ রাইট! ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে এসেছি, কিন্তু চাবিটা নিতেই ভুলে গেছি।'

'তা না হলে পুরুষ মানুষ?'

'ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেবার জন্য তো আপনারা আছেন।'

এ বহুবচনের অর্থ মণিকা বোঝে। মুখে কিছু বলে না, মনে মনে তৃপ্তি পায়।

রাজভবনের নর্থ-ইস্ট গেটের পাশে গাড়িটা একটা গাছের ছায়ায় ছিল। দরজার লক্ খুলে

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় বসবেন? সামনে না পিছনে?'

পিছনে বসলে লোকে যে আপনাকে ড্রাইভার ভাববে।' হাসতে হাসতে মন্তব্য করে মণিকা।

ক্যাপ্টেন চুপ করে থাকে না। 'সামনে বসলে যে লোকে আপনাকে আমার স্টেনোগ্রাফার ভাববে?'

'আমাকে দেখে কেউ স্টেনো ভাববে না।'

'এটা যে অফিস এরিয়া।'

'তবুও।'

'তবে কি ভাববে?'

বিপদে পড়ে মণিকা। 'যা ইচ্ছে ভাবে ভাবুক।'

ক্যাপ্টেনের পাশে বসে মণিকা।

এবার গাড়িতে স্টার্ট করে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করে, 'বলুন, কোথায় যাবেন?' প্রস্তাব, পালটা প্রস্তাবের পর মণিকা বলল, 'চলুন, মধ্যমগ্রাম ঘুরে আসি।'

'সেখানে কি আছে?'

'আমাদের একটা ছোট্ট ফার্ম আছে।'

ক্যাপ্টেনের মনে পড়ল মণিকার মা-ই একদিন বলেছিলেন, নিজেদের বাগানের শাক-সবজি কত কি আসে, কিন্তু খাবার লোক নেই।

ক্যাপ্টেন জানতে চেয়েছিল, 'কোথায় আপনাদের ফার্ম?'

'মধ্যমগ্রাম। একবার দেখে এসো, ভালো লাগবে। দু-এক বছর পর উনি তো ওখানেই থাকবেন বলেছেন।'

স্টিয়ারিংটা ভালো করে ধরে গিয়ার দিতে দিতে মণিকাকে বলল, 'ঠিক আছে বাট-লেট্ আস হ্যাভ সাম টি বিফোর দ্যাট।'

'চলুন। আপনারা হোটেল-রেস্তোরাঁয় না গেলে ঠিক শান্তি পান না, তাই না?'

ক্যাপ্টেন হাসে। বলে, 'যারা নিজের ঘর বাঁধতে পারেনি, তাদের আর কি গতি বলুন? মধ্যমগ্রামে গেলে চা খাওয়াবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে চলুন।'

সোজা মধ্যমগ্রাম গিয়েছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে ক্যাপ্টেন বার বার এদিক-ওদিক কি যেন দেখছিল।

'কি দেখছেন?'

'এই লোকজন।'

'লোকজন?'

'হ্যাঁ। প্রবাসী বাঙালি বলে কোনোদিন এত বাঙালি ছেলে-মেয়ের ভিড় দেখিনি। তাই তো কলকাতার রাস্তাঘাটে এত বাঙালি দেখতে ভীষণ ভালো লাগে।'

'ক বছর রেঙ্গুনে কাটিয়ে কলকাতা ফেরার পর আমারও এমনি হয়েছিল।'

'বাংলাদেশের অ্যাটমস্ফিয়ার এনজয় করব বলে এ-ডি-সি-র চাকরি নিয়ে এলাম, কিন্তু ঠিক যেটা চেয়েছিলাম সেটাই পেলাম না।'

যতীন্দ্রমোহন এভিন্যু পিছনে ফেলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় পার হল।

মণিকা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা রাজভবনের অ্যাটমস্ফিয়ারটা অমন

পিকিউলিয়ার কেন বলুন তো?'

'কেন তা জানি না। তবে একটা জগা-খিচুড়ি অ্যাটমস্‌ফিয়ার। খানিকটা কলোনিয়াল, খানিকটা বাদশাহী, খানিকটা ইংলিশ। সব কিছু পাবেন, পাবেন না ইন্ডিয়ান অ্যাটমস্‌ফিয়ার।'

'ঠিক বলেছেন।'

'কোটিপতি ইন্ডিয়ানদের বাড়িতেও একটা আবছা আবছা ভারতীয় পরিবেশ পাবেন, কিন্তু এখানে তাও নেই।'

'অনেকটা হোটেল-হোটেল অ্যাটমস্‌ফিয়ার।'

'না, তাও না। হোটেলে মানুষ স্বাধীনভাবে হাসে, খেলে, গান গায় কিন্তু রাজভবনে সে অ্যাটমস্‌ফিয়ারও নেই।'

'এমন পরিবেশের মধ্যে থাকতে কষ্ট হয় না?'

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে তাকাল মণিকার দিকে। 'দারুণ কষ্ট হয়, কিন্তু কে আমাকে মুক্তি দেবে বলুন?'

মণিকা আস্তে মাথাটা নীচু করল। মুখে কিছু বলল না।

ফার্মে সময়টা বেশ কেটেছিল। গাড়ি থেকে মণিকাকে নামতে দেখেই বনমালী ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'কি দিদিমণি? কি ব্যাপার?'

বনমালী এক ঝলক ক্যাপ্টেনকেও দেখে নিল।

'কি আবার ব্যাপার? তোমাকে দেখতে আসব না?'

আনন্দে খুশিতে প্রায় লুটিয়ে পড়ল বৃদ্ধ বনমালী। 'তোমরা ছাড়া আমাকে আর কে দেখে বল?'

এবার মণিকা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা যখন রাজশাহী কলেজে, তখন থেকে বনমালী আমাদের সঙ্গে আছে। আমি এরই কোলে চড়ে মানুষ হয়েছি।'

'ইজ ইট?'

'হ্যাঁ। বনমালী হচ্ছে বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

বনমালীর মুখে আবার সেই খুশির হাসি। 'কি যে বল দিদিমণি!'

একটু পরেই বলল, 'চল, চল ভিতরে যেয়ে বসবে চল।'

ফার্মের এক কোণায় ছোট্ট দুখানি ঘর। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, বেশ বোঝা যায় কোনো অধ্যাপকের ঘর।'

বনমালী চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তুমি আজ এসে ভালোই করেছ।'

'কেন?'

'কতকগুলো পেঁপে পেকে উঠেছে। আজকালের মধ্যে না খেলে নষ্ট হয়ে যাবে!'

আবার ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে চাইল মণিকা, 'জানেন বনমালী কোনোদিন নিজের সংসার করল না কিন্তু আমাদের সংসার নিয়েই ও পাগল!'

বনমালীর আদর-অভ্যর্থনার পর্ব শেষ হল। জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমণি, তোমরা কিছুক্ষণ আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

আমি তাহলে একটু ওদিকে যাচ্ছি। যাবার আগে আমাকে ডাক দিও কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই!'

বনমালী চলে গেল। যতক্ষণ ওকে দেখা গেল, ক্যাপ্টেন ওর দিকেই চেয়ে রইল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'এই যুগেও এমন বনমালী পাওয়া যায়?'

'সত্যি হি ইজ এ রেয়ার ক্যারেকটার! তাছাড়া আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।'

ছোট্ট একটু মুচকি হাসি হেসে ক্যাপ্টেন বলে, 'আপনাকে দেখছি সবাই ভালোবাসে!'

'ঠাট্টা করছেন?' চোখের কোণে একটু বিদ্যুৎ হাসির ইঙ্গিত ফুটিয়ে মণিকা জানতে চায়।

'প্রফেসর মণ্ড থেকে শুরু করে বনমালী পর্যন্ত সবাই-ই আপনাকে ভালোবাসে।'

'আপনাকে যতটা উদার ভেবেছিলাম, এখন দেখছি তা নয়।'

'ইজ ইট?'

'তবে কি?'

মণিকা একটু হাসে, একটু চুপ করে। তারপর বলে, 'এখানে বসে বসে ঝগড়াই করবেন, নাকি একটু ঘুরে দেখবেন?'

মজা করে ক্যাপ্টেন, 'এখানে বসে বসে ঝগড়া করতে পারলেই বেশি খুশি হতাম, কিন্তু বনমালী হয়তো পছন্দ করবে না।'

ক্যাপ্টেন একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চলুন একটু ঘুরেই আসি।'

'চলুন।'

বাগানটি খুব বড় না হলেও নেহাত ছোট নয়। দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে যে রুচিবান বাঙালিরও রুচির উন্নতি হয়, বাগানে ঘুরলেই তা নজরে পড়ে।

'একি? স্ট্রবেরি?'

'মণিকা জবাব দেয়, হ্যাঁ।'

ক্যাপ্টেন একটা সিগারেট ধরিয়ে মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'বাঙালি একটু বাইরে ঘুরে-ফিরে এলে দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেক পাল্টে যায়, তাই না?'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মণিকা বলে, 'হঠাৎ একথা বলছেন?'

'এই আপনাকে আর ওই স্ট্রবেরি গাছটা দেখে মনে পড়ল।'

'তার মানে?'

'বাংলাদেশের বাঙালির বাগানে আম-জাম-কলা পাবেন, পাবেন না স্ট্রবেরি।'

'কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'হ্যাড ইউ বিন এ পিওর বেঙ্গলি গার্ল, তাহলে কি এত ফ্রি হতে পারতেন?'

'হোয়াট ডু ইউ মীন বাই এ পিওর বেঙ্গলি গার্ল?'

'মানে আপনার জন্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই যদি বাংলাদেশে হতো...'

ক্যাপ্টেন এক ঝলক দেখে নেয় মণিকাকে। মণিকা মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। খোঁপাটা ঢিলে হয়ে ঘাড়ের কাছে পড়েছে। কানের পাশ দিয়ে লম্বা জুলফির চুলগুলো ওর গালের উপর এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেনের বেশ লাগছে ওকে দেখতে।

মণিকা এবার মুখ উঁচু করে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলে, 'তাহলে কি হতো?'

'কি না হতো বলুন? আপনার সঙ্গে আমার মেলামেশার সুযোগ হতো?'

কলকাতার কলেজ-ইউনিভার্সিটির কিছু ছেলেমেয়ে কমনরুমে বা কফি হাউসে একসঙ্গে গল্প-গুজব-আড্ডা দিলেও সহজ-সরলভাবে মেলামেশার পথে অনেক বাধা অনেক বিপত্তি।

সে কথা মণিকা জানে। জানে কলকাতা শহরে পাশাপাশি বাড়িতে ওরা দু'জনে আজন্ম বাস করার পরও ক্যাপ্টেন বলতে পারত না চল মণিকা একটু বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কলকাতার

বাইরে বরাকরের ওপারে পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ, বোম্বের বাঙালি ছেলেমেয়েরা অনেক ঘনিষ্ঠ হতে পারে। শুধু ছেলে-মেয়েরা কেন? মা-বাবাও।

তাইতো ক্যাপ্টেন বলল, 'আপনার বাবা যদি শেয়ালদা কোর্টের উকিল হতেন আর সারপেনটাইন লেনেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন তাহলে কি তার মেয়েকে এত স্বাধীনতা দিতেন?'

বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দুচারটে পাখির ডাক হয়তো কানে এসেছিল ক্যাপ্টেনের। ঢলে পড়া সূর্যের গোলাপি রশ্মি বোধহয় মনটাকেও একটু রঙিন করেছিল। 'বনমালী না থাকলে আপনাকে একটা গান গাইতে বলতাম।'

মণিকা হাসি চাপতে পারে না, 'বনমালীকে এত ভয় কেন?'

'ভয় না করলেও ওর বিরক্তিতে ভবিষ্যৎ নষ্ট করব কেন?'

মজা লাগে মণিকার, 'তার মানে?'

'আজ নয় পরে বলব।'

বেশ কেটেছিল সেদিনের অপরাহ্ণ। বিদায়বেলায় বনমালী এক টুকরি ভর্তি পাকা পেঁপে দিয়ে বলেছিল, 'দিদিমণি মাকে বলো এগুলো কালকের মধ্যেই খেয়ে ফেলতে, নয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।'

মণিকা এক ফাঁকে বনমালীকে ক্যাপ্টেনের পরিচয় দিয়ে এসেছিল। ক্যাপ্টেন তা জানত না।

বনমালী ক্যাপ্টেনকে বলল, 'আপনি লাটসাহেবের বাড়িতে থাকেন, কত মস্ত লোক। দয়া করে যে এসেছেন...'

ক্যাপ্টেন আর এগোতে দিল না। মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'এর ফাঁকে কখন ওকে এসব শিখিয়ে পড়িয়ে এলেন?'

মিটমিট করে হাসতে হাসতে মণিকা বলল, 'হ্যাঁ বনমালীদা, তোমাকে আমি কিছু শিখিয়েছি?'

বনমালী অত সাদা মিথ্যা কথাটা বলতে পারল না। মণিকার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'সময় পেলে দয়া করে আসবেন।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে যশোর রোডের ওপর আসার পরই ক্যাপ্টেন মণিকাকে বলল, বনমালীকে বলে দেবেন আমি মাঝে মাঝেই আসব।'

মণিকা বলল, 'তাই নাকি?'

কলকাতা ফেরার পথে গাড়ির স্পীডটা বেশ কম ছিল।

মণিকা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? এত আস্তে চালাচ্ছেন? গাড়িতে কোনো ট্রাবল...'

'জোরে চালালেই তো এক্ষুনি সব ফুরিয়ে যাবে।'

মণিকা কিছু বলে না। ক্যাপ্টেনও একটু চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে, 'ওই গরাদখানায় যেন আর মন টেঁকে না।'

দূর থেকে রাজভবনের মানুষগুলোকে কত সুখী মনে হয়। মনে হয় ওরা সবাই সুখ-সম্ভোগ আনন্দ-বিলাসে মত্ত। ওখানে যারা থাকে, তাদের কি সাধারণ মানুষের মতো সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে? দূর থেকে যারা রাজভবনকে দেখে তারা মনে করে, না। এত প্রাচুর্য, আনন্দবিলাসের মধ্যে কি দুঃখ থাকতে পারে?

ক্যাপ্টেনকে দেখে মণিকার উপলব্ধি হয়েছে, না ওখানকার সবাই সুখী হয়। মধ্যমগ্রাম থেকে কলকাতা ফেরার পথে সে কথাটা আরো বেশি করে উপলব্ধি করল।

'এ-ডি-সি হবার আগে কি করে সময় কাটাতেন?'

'আর্মি লাইফে একটা সুন্দর উত্তেজনা আছে। বেশ কাটত দিনগুলো। কিন্তু এখানে তো কেউ প্রাণ খুলে হাসতেও পারে না।'

'হোয়াট অ্যাবাউট গভর্নর?'

দুঃখের মধ্যেও ক্যাপ্টেনের হাসি পায়। 'তাঁর অবস্থা আরো সঙ্গীন। আমি তো আমজাদের সঙ্গে গল্প করতে পারি, মণিকা ব্যানার্জিকে নিয়ে মধ্যমগ্রামে যেতে পারি, ভবিষ্যতে সিনেমা দেখতে পারি...'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনেই মণিকা হাসে, 'কে বলল আপনার সঙ্গে আমি সিনেমায় যাব?'

কথাটা যেন কানেই তুলল না ক্যাপ্টেন।...'লাটসাহেবের তো সে স্বাধীনতাও নেই।'

রাজভবনের কথা আর কাকে বলবে? না বলে মনে শান্তি পায় না ক্যাপ্টেন রায়। লাটসাহেবের অসহায় অবস্থার কথাও বলে।

'বিশ্বাস করুন ব্যারাকপুরের গঙ্গার ধারে ওই বাগানবাড়ি আর দার্জিলিং গভর্নমেন্ট হাউসে ছাড়া অন্য কোথাও যেতে হলেই লাটসাহেবকেও চীফ মিনিস্টারের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়।'

মণিকা অবাক হয়ে বলে, 'রিয়েলি?'

'কত সরকারি অনুষ্ঠানে লাটসাহেবকে নেমন্তন্ন করেও পরে ক্যানসেল করা হয় চীফ মিনিস্টারের ইচ্ছায়...'

হাঁটু দুটোকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে বসে থাকতে থাকতে মণিকা আবার প্রতিবাদ করে, 'কি যা তা বলছেন?'

ভ্রু কুঁচকে মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবে মণিকা। তারপর আবার বলে, 'আপনি এ-ডি-সি বলে ইউ কান্ট সে হোয়াট এভার ইউ লাইক।'

ক্যাপ্টেন রায় হাসে। হাসতে হাসতে চেয়ে থাকে মণিকার দিকে। কিছু বলে না, যেন বলতে চায় না।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে মণিকাও হাসে, 'কি? ভেবে দেখছেন এবারে কি বানিয়ে বানিয়ে বলবেন?'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতেই বলে, 'মিথ্যা কথা বলে আমার কি লাভ? তাছাড়া আপনাকে আমি মিথ্যা কথা বলব?'

কথাটা বড় ভালো লাগে মণিকার। সংযত সংহত পরিবেশের মধ্যেও একটু যেন নিবিড়তা অনুভব করে।

চোখ দুটো বড় বড় করে মণিকা বলে, 'আমাকে মিথ্যা কথা বলতে নেই?'

একটু ভেবে উত্তর দেয় ক্যাপ্টেন, 'না, ঠিক তা নয় ; তবে আপনাকে মিথ্যা কথা বলে আমিই মনে মনে শান্তি পাব না।'

লাটসাহেবের দুরবস্থার আরো অনেক কাহিনি মণিকাকে বলেছিল ক্যাপ্টেন রায়। 'যাঁকে প্রতি পদক্ষেপে স্যালুট করব, যাঁর হুকুম তামিল করাই আমাদের কাজ, তাঁর এই অসহায় অবস্থা

দেখে আমাদেরই খারাপ লাগে।'

সরকারি-বেসরকারি অফিসে ছোট-বড় অফিসারদের অপমান দেখতে দেখতে অভ্যস্ত থাকেন তাদের সহকর্মীরা কিন্তু আর্মিতে এসব দেখা দুর্লভ ব্যাপার, অসম্ভব ব্যাপার। তাই তো এ-ডি-সি-র চাকরি করতে এসে ক্যাপ্টেন রায় মনে মনে আহত হন প্রতি পদক্ষেপে। উত্তরবঙ্গের সর্বনাশা বন্যার খবর কলকাতায় পৌঁছাবার পর পরই লাটসাহেব ঠিক করলেন নিজের চোখে দেখে আসবেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ লাটসাহেবের অভিপ্রায়ের খবর পৌঁছাবার একটু পরই লাটসাহেবের সেক্রেটারিকে জানান হলো, 'না না, এক্ষুনি লাটসাহেবের যেতে হবে না। সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা উদ্ধার কার্যে ব্যস্ত। লাটসাহেব গেলে এইসব জরুরি কাজকর্ম বন্ধ করে তাঁর দেখাশুনা করতে হবে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের।'

অথচ...

দু'দিন পরই চীফ মিনিস্টার নিজে গেলেন নর্থ বেঙ্গল।

মণিকা ঠিক বুঝতে পারে না তাৎপর্য, 'তাতে কি হলো?'

'প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর যে ভি-আই-পি প্রথম যান, তাঁর ছবি, নিউজ খবরের কাগজে বেশি ছাপা হয়। ফিল্ম ডিভিশনের নিউজ রিলে বা রেডিওতে বেটার কভারেজ পায় সুতরাং...

রাজভবনের জীবন গতানুগতিকভাবে কাটে। সেই একই ইউনিফর্ম, স্যাফরন আর্মড্-ব্যাচ ; সেই সেলাম দেওয়া, সেলাম নেওয়া। সেই সভা-সমিতি, ডিনার-ড্যান্স-কক্‌টেল।

ক্যাপ্টেন রায় অভিনবত্ববোধ করে না এই নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে। সকাল থেকে সন্ধ্যা, কত জনের সঙ্গে দেখা হয়, আলাপ হয়। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবও হয় কিন্তু তাদের সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশতে উৎসাহবোধ করেন না। এসব কথা মণিকা জানে।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করার জন্য লাটসাহেবের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রায়ও দু'দিন বাঁকুড়া ঘুরে এল। মফঃস্বল শহরে গভর্নর এলেই একটু বেশি হৈ চৈ হয়। বাঁকুড়াতেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বৃদ্ধ লাটসাহেবের পক্ষে এসব সহ্য করা সহজ নয়।

কলকাতায় ফিরেই লাটসাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হিজ একসেলেন্সির সব প্রোগ্রাম-এনগেজমেন্ট বাতিল করা হলো। চীফ মিনিস্টারও তখন কলকাতার বাইরে। গভর্নরের দস্তখতের জন্য সরকারি কাগজপত্র আসাও কদিন বন্ধ ছিল।

অনেকদিন পর সেদিন আবার মণিকা এসেছিল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গল্প করতে। বড় সোফাটায় দুটো পিলো মাথায় দিয়ে ক্যাপ্টেন কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে গুল্প করছিল মণিকার সঙ্গে। হঠাৎ টেলিফোন বাজল। বেশ বিরক্ত হয়েই ক্যাপ্টেন উঠে গেল টেলিফোন ধরতে।

ডান হাত দিয়ে চেয়ারটা টানতে টানতেই বাঁ হাত দিয়ে রিসিভারটা তুলল, 'ক্যাপ্টেন রয় হিয়ার?'

একটু পরেই ক্যাপ্টেনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, 'গুড আফটারনুন, মিস গুপ্তা। কেমন আছেন?'

মিস গুপ্তা শুনতেই মণিকা ঘাড় বেঁকিয়ে একবার ক্যাপ্টেনকে দেখল।

একটু পরে ক্যাপ্টেন মিস গুপ্তাকে বলল, 'মিঃ গর্ডন বোধহয় এ মাসের শেষের দিকে কলকাতা আসছেন। আই উইল সার্টেনলি ইনফর্ম ইউ হোয়েন হি কামস।'

ক্যাপ্টেন একটু থামল। মণিকা আর একবার দেখল, হাসল।

'নো নো মিস গুপ্তা। বিরক্ত হবো কেন? ইট ইজ এ প্রিভিলেজ টু গেট এ কল ফ্রম ইউ।'

ক্যাপ্টেন টেলিফোন নামিয়ে রেখে ফিরে আসতেই মণিকা বলল, 'আই অ্যাম সরি।'

'কেন?'

'আমার জন্য একটু প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলেন না?'

ক্যাপ্টেন একটু মুচকি হাসল। 'চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।'

নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ে মণিকা বলে, 'ট্রাই এগেন অ্যান্ড এগেন। নাউ ইউ হ্যাভ মাই বেস্ট উইসেস।'

কলকাতা রাজভবনের একটা ট্রাডিশন আছে, মর্যাদা আছে, মোহ আছে। সমাজের পাঁচজনের মধ্যে একজন হতে হলে রাজভবনের সঙ্গে একটু মিতালি থাকা প্রয়োজন।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। লাটসাহেবের উমেদারী করে অনেকেই সমাজে এই স্বীকৃতি লাভ করেন। যাঁরা পলিটিক্স করেন, স্বপ্ন দেখেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোর গোড়ায় সাব ইন্সপেক্টর সেলাম দিচ্ছে, তাঁদের ইষ্টদেবতা লাটসাহেব নয়। যাঁরা পলিটিসিয়ান কাম সোস্যাল ওয়ার্কার কাম বেনামী বিজনেসম্যান, যাঁরা অন্য কোথাও কল্কে পান না, তাঁরাই লাটসাহেবের সান্নিধ্য লাভের জন্য একটু বেশি লালায়িত।

এদের ড্রইংরুমে, অফিস ঘরে লাটসাহেবের ফটো লটকান থাকে। সুতরাং চিনতে কষ্ট হয় না। রাজভবনের সঙ্গে আরো বহু ধরনের মানুষের যোগাযোগ আছে। কারণে, অকারণে। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে। এদের সবাইকেই চেনা যায়, জানা যায়, বোঝা যায়।

বোঝা যায় না, জানা যায় না আরতি সরকার, শ্যামলী গুপ্তা, অলকা মিত্র, উজ্জ্বলা সেনকে। বাইরের কেউ জানতে না পারে, বুঝতে না পারে কিন্তু এ-ডি-সি? নাটকের অন্তিম দৃশ্য দুচোখ দিয়ে না দেখলেও সব কিছু বুঝতে পারে, জানতে পারে।

ক্যাপ্টেন টেলিফোন শেষ করে ও পাশের সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরাল। দৃষ্টিটা হয়তো মুহূর্তের জন্য ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁক দিয়ে একটু ঘুরে এলো।

মণিকা একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'মনটা একটু উদাস হয়ে গেল, তাই না?'

মুচকি হাসতে হাসতে চেয়ে রইল ক্যাপ্টেনের দিকে।

ক্যাপ্টেন হাসল। 'আমার ওপর রাগ হয়েছে তো?'

'না, রাগ করব কেন?'

'মিস গুপ্তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম বলে।'

'আফটার অল আপনি একজন আর্মি অফিসার ; তারপর আবার এ-ডি-সি। সুতরাং আপনার সঙ্গে যে শুধু মণিকা ব্যানার্জির আলাপ নেই...'

ক্যাপ্টেন বাধা দেয়, 'তবু বলবেন রাগ করেননি?'

'না না, রাগ করব কেন?'

'আপনার সামনে থেকে সিগারেট তুলে নিলাম, কই আপনি তো লাইটার জ্বেলে ধরলেন না?'

মণিকা লজ্জা পায়। 'সরি।'

ক্যাপ্টেন কিন্তু মনে মনে খুশি হয়! ভালোবাসা না থাকলে কি ঈর্ষা আসে?

'মিছিমিছি সন্দেহ করবেন না। এখানে চাকরি করতে এসে আপনাদের কলকাতার অনেক কিছু জানলাম! ভবিষ্যতে সুযোগ এলে আপনাকে বলব।'

মণিকা, আবার একটু মুচকি হাসে। 'মিস গুপ্তার স্টোরি বলার দিন কি অ্যাট-অল আসবে?'

'আই হোপ সো বাট ইট ডিপেন্ড্স অন ইউ।'

'তার মানে?'

'শ্যামলী গুপ্তার স্টোরি এখন আমি বলতে পারব না, আপনি শুনতেও পারবেন না।'

'কেন?'

ক্যাপ্টেন একটু ভাবে। 'আমাদের পরিচয়টা আরো একটু গভীর না হলে ওইসব মেয়েদের কাহিনি বলতে ও শুনতে দুজনেরই লজ্জা করবে।'

টানা টানা ভ্রু দুটো উঁচু করে মণিকা বলে, 'ইজ, ইট সো রোমান্টিক?'

'নট রোমান্টিক বাট ভালগার!'

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'শুনেছি অধিকাংশ পুরুষই ভালগারিটি পছন্দ করে।'

মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে চলে দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ।

শেষে মণিকা বলে, 'তর্ক করছি বলে কি একটু কফিও খাওয়াবেন না।'

ক্যাপ্টেন লজ্জিত হয়। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে আর সব কিছু গুলিয়ে ফেলি।'

'শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলার সময় তো মনে হলো না কিছু গুলিয়ে ফেলেছেন?'

'কান্ট ইউ ফরগেট শ্যামলী?'

'এমন একটা রোমান্টিক ক্যারেকটারকে চট করে ভোলা যায় না?'

একটু থেমে মণিকা আবার জানতে চায়, 'আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি গুলিয়ে ফেললেন?'

'আমার কলিগ ন্যাভাল এ-ডি-সি ও তাঁর স্ত্রী আপনাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছে।'

'কোথায়?'

'এইতো নর্থ গেটের সামনেই ওদের কোয়ার্টারে।'

'কেন বলুন তো?'

'কেন আবার? আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।'

'আপনি বুঝি ওদের কাছে আমার কথা বলেছেন?'

'বলেছেন মানে? রেগুলার আপনার কথা বলি।'

'সব কিছু বলেছেন?'

'ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার মতো এখনও তো কিছু হয়নি। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই বলব না।'

কথাটা শুনেই মণিকার সারা মুখটা লাল হয়ে ওঠে। সলাজ চোখের দৃষ্টিটা আনত হয়। ক্যাপ্টেন মুগ্ধ হয়ে দেখে।

কয়েক মিনিট এমনিভাবে কেটে গেল।

তারপর ক্যাপ্টেন বলল, 'সুড আই টেল মাই কলিগ অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ দ্যাট ইউ আর হিয়ার?'

'বলুন।'

ক্যাপ্টেন টেলিফোনে লেফটেন্যান্ট ভাটিয়াকে জানাল, 'মণিকা ইজ হিয়ার।'

ভাটিয়া কি যেন বলল।

'অ্যাডমিরাল ইজ কামিং? ওয়ান্ডারফুল!'

ক্যাপ্টেন রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই মণিকা প্রশ্ন করল, 'অ্যাডমিরাল কে?'

'ভাটিয়ার স্ত্রী সুনীতা। ওকে আমি অ্যাডমিরাল বলি।'

ক্যাপ্টেন আবার একটা সিগারেট তুলতেই মণিকা বলল, 'আবার সিগারেট ধরাচ্ছেন যে?'

'তাতে কি হলো?'

'জামা-কাপড় চেঞ্জ করবেন না?'

'অ্যাডমিরালের ওখানে যাবার জন্য পায়জামা-পাঞ্জাবিই যথেষ্ট।'

'না না। চেঞ্জ করে নিন।'

ক্যাপ্টেন চেঞ্জ করে বেরুতে না বেরুতেই সুনীতা এসে মণিকার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল।

'গুড আফটার নুন অ্যাডমিরাল! কখন এলেন?'

সুনীতা বলল, 'আর কথা নয় চলুন তাড়াতাড়ি।' মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'চলুন ভাই।'

পরিচিতের সীমা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন সবার ভালো লাগতে নাও পারে কিন্তু স্বীকৃতি যখন ছড়িয়ে পড়ে আপন পর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে তখন সবার ভালো লাগে। মণিকারও!

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটা সুন্দর মিষ্টি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সে সম্পর্ক অসামাজিক না হলেও সামাজিক নয়। কিছুটা স্নেহমমতা ভালোবাসা। বাংলাদেশের বাইরে বিদেশে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য মা-বাবা মণিকাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধা দেননি। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে এই পরিচিতির স্বীকৃতি মণিকা আশা করে না।

লেফটেন্যান্ট ভাটিয়া ও সুনীতার কাছে সেই স্বীকৃতি পেয়ে বড় ভালো লাগল মণিকার।

'আপনি শুনে অবাক হবেন ইওর গ্রেট ফ্রেন্ড নেভার টোল্ড আস এনিথিং অ্যাবাউট ইউ।'

সুনীতা বাঁকা চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে কটাক্ষ করে মণিকাকে বলল।

মণিকা একটু হাসে। বলে, 'আমার সম্পর্কে কিছুই বলবার নেই।'

'আপনার বলবার কিছু না থাকলেও আমাদের শোনার অনেক কিছু আছে।'

এবার ক্যাপ্টেন বলে, 'সুনিতা, ডোন্ট ট্রাই টু রিড বিটুইন দি লাইন্‌স্‌।'

'আমরা দুজনে কথা বলছি। এর মধ্যে তো আপনার মাথা গলাবার দরকার নেই।'

বেশ লাগে মিসেস সুনীতা ভাটিয়াকে।

পরে মণিকা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এদের সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দেননি কেন বলুন তো?'

'আগে আমার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হোক।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভালো করে পরিচয়?

'আই মিন হোয়াট আই সে।'

ক্যাপ্টেন একটু থামে। একবার দেখে নেয় মণিকাকে। মণিকাও ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে দেখে। মাঝপথে দেখা হয়।

এমন খুশির আমেজের সময়ই মণিকার মনে পড়ে মিস শ্যামলী গুপ্তার কথা।

'তারপর বলুন মিস গুপ্তার কি ব্যাপার।'

'এত গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টার পরেও মিস গুপ্তাকে ভোলেননি?'

'ভুলব কেমন করে? গভর্নরের এ-ডি-সি-র সঙ্গে কলকাতার টপ-এর সোসাইটি গার্লের পরিবারে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ব্যাপারে কার জানার আগ্রহ হয় না বলুন?'

ক্যাপ্টেন বলে, 'ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছি আপনার সঙ্গে আর লোকের আগ্রহ হবে মিস গুপ্তার খবর জানতে?'

'আমার মতো সাধারণ মেয়েকে নিয়ে দুনিয়ার কেউ আলোচনা করবে না।'

ফোর্ট উইলিয়ামের পাশ দিয়ে হেস্টিংস-এর দিকে এগোতে এগোতে ক্যাপ্টেন একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আই উইস আই কুড সে হোয়াট আই ফিল লাইক সেইং।'

'কি বলতে চান বলুন। আমি কি আপনাকে বারণ করছি?

'বারণ করেননি ঠিকই, তবুও...'

ক্যাপ্টেন আর এগোতে পারে না।

মণিকাও নিশ্চয় জানতে চায় ক্যাপ্টেনের মনের কথা। 'নদীর পাড় দিয়ে হাঁটলে তো কোনোদিনই নদী পার হতে পারবেন না...'

মণিকাকে আর বলতে হয় না।

ক্যাপ্টেন বলল, 'তবে বলছেন এবার নদীতে ঝাঁপ দিতে পারি?'

মণিকা মজা করে। 'সাহস থাকলে নিশ্চয়ই ঝাঁপ দেবেন।'

'সাহস না আগ্রহ?'

'দুই-ই?'

একটু পরেই মণিকা আবার বলল, চলুন আমাকে পৌঁছে দেবেন।'

'এক্ষুনি?'

'অনেকক্ষণ তো বেরিয়েছি।'

ক্যাপ্টেন মনে মনে বলে, আচ্ছা মণিকা এখনও তোমার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করে? ভালো লাগে?

মনে মনে আরো কত কথা জানতে চায়, বলতে চায়, শুনতে চায় কিন্তু পারে না।

ক্যাপ্টেন ওইসব ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায়।

'কি ভাবছেন?'

ক্যাপ্টেনের হুঁশ ফিরে আসে। 'না, না কিছু ভাবছি না।'

'এমন কি ভাবছেন যা বলতে এত সঙ্কোচ?'

একটু শুকনো হাসি হাসল ক্যাপ্টেন। বলে, 'ঠিকই ধরেছেন। বড় সঙ্কোচ, বড় দ্বিধা। কবে যে এর থেকে মুক্তি পাব।'

আর দেরি করে না। একটা ট্যাক্সি কাছে আসতেই দুজনে হাত তুলল। থামাল। চড়ল।

বাড়ি পৌঁছেই মণিকা সামনের বাঁ দিকের ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বাবা কোথায়?'

'ডক্টর চৌধুরি এসে তোর বাবাকে নিয়ে গেলেন।'

ক্যাপ্টেনকে দেখে মিসেস ব্যানার্জি খুশি হলেন, 'এসো, এসো ভিতরের ঘরে চলো।'

এবার মণিকার দিকে ফিরে বললেন, 'এতক্ষণ বেরিয়েছিস, একটা টেলিফোন তো করতে পারতিস্।

মণিকার জবাব দেবার আগেই ক্যাপ্টেন বলল, 'আর বলবেন না মাসিমা। আমার কলিগ এ-ডি-সি ভাটিয়ার স্ত্রীর সঙ্গে এমন গল্পের মশগুল হয়েছিলেন যে অনেক বলবার পরও উঠেছিলেন না!'

হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে দূরের সোফায় ফেলে মণিকা বলল, 'আপনি কটা মার্ডার করেছেন বলুন তো?'

. 'মার্ডার?' চমকে ওঠে ক্যাপ্টেন।

'এমন সুন্দর করে যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, সে মার্ডার করে না?'

ক্যাপ্টেন এবার মিসেস ব্যানার্জির সাহায্য সহানুভূতি চায়, 'দেখছেন মাসিমা, কি বলছেন?'

'আঃ। কি যা তা বলছিস?' মণিকাকে শাসন করে ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'যাও বাবা, তুমি ও ঘরে গিয়ে বসো আমি আসছি।'

'খালি হাতে আসবেন না। প্লেট ভর্তি করে কিছু আনবেন।'

সবাই হাসে!

হাসি চাপতে চাপতেই মণিকা জানতে চায়, 'এমন করে বলতে আপনার লজ্জা করে না?'

'সরি! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আবার লজ্জা কিসের?'

'মা-মাসির কাছে আবার লজ্জা কিসের?'—বলেই মিসেস ব্যানার্জি চলে গেলেন।

মণিকা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে ওপাশের বসার ঘরে এসে বলল, 'বসুন।'

ক্যাপ্টেন বসল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মণিকার কাছে। খুব কাছে। একেবারে মুখের কাছে, কানের পাশে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আপনাকেই প্রথম মার্ডার করব। রক্তটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খুব বেশি দিন ধৈর্য ধরতে পারব না।'

ক্যাপ্টেন কোনোদিন এত কাছে, এত নিবিড় হয়ে এগিয়ে আসেনি। ক্যাপ্টেনের টানা বড় বড় নিশ্বাস মণিকার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অপারেশন থিয়েটারের ক্লোরফর্মের মতো ক্যাপ্টেনের নিশ্বাস যেন মণিকাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মুখে কিছু বলল না। শুধু অবাক-বিস্ময় মাখা মুগ্ধ নয়নে চাইল' ক্যাপ্টেনের দিকে।

মণিকা চলে যাবার একটু পরেই মিসেস ব্যানার্জি এলেন।

টুকটাক কথাবার্তা বলার পর মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'একবার তোমার সঙ্গে এলাহাবাদ ঘুরে আসব।'

'নিশ্চয়ই। মা-বাবা ভীষণ খুশি হবেন।'

ঘরে ঢুকতে গিয়ে মণিকার কানে কথাটা গিয়েছিল।

'তুমি ওর কথা বিশ্বাস কর মা?'

'কেন করব না?'

'গুরুজনেরা যখন কথা বলেন তখন মাঝখান থেকে হঠাৎ কোনো কথা না বলাই ভদ্রতা।' ক্যাপ্টেন বেশ গম্ভীর হয়ে বলে।

মণিকা হাসি চাপতে পারে না, 'আপনিও আমার গুরুজন নাকি?'

ক্যাপ্টেন আবার মিসেস ব্যানার্জির শরণাপন্ন হয়। 'আচ্ছা মাসিমা উনি আমার চাইতে বয়সে ছোট না?'

'তা তো বটেই।'

'আজকের থেকে আমি আর আপনাকে আপনি বলব না।' ক্যাপ্টেন সাফ জানায় মণিকাকে। মিসেস ব্যানার্জির দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক বলেছি না মাসিমা?'

'ও যখন তোমার চাইতে বয়সে ছোট তখন আর আপত্তি কি!'

মণিকা প্রতিবাদ করতে যাবার আগেই ক্যাপ্টেন বলল, 'দেখ তো মণিকা, আমার চা-টা হলো কিনা।'

মিসেস ব্যানার্জি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, 'না, না, আমিই যাচ্ছি।'

মিসেস ব্যানার্জি চলে যাবার পরই মণিকা বলল, 'আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো?'

ক্যাপ্টেন হঠাৎ মণিকার হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তোমার কিছু হয়নি?'

এই রাজভবনে বসেই একদিন পলিটিক্যাল লিডারের কাছে পুরনো দিনের গল্প শুনছিল ক্যাপ্টেন রায়। গভর্নরের সঙ্গে একদল পুরনো দিনের বিপ্লবীদের মিটিং ছিল। মিটিং শেষে সবাই চলে গেলেন। শুধু গেলেন না উনি। গভর্নরের প্রোগ্রাম সম্পর্কে এ-ডি-সি-র সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

কথায় কথায় আলোচনার মোড় ঘুরে যায়!

'জীবনে এই দ্বিতীয়বার গভর্নমেন্ট হাউসে এলাম।'

'মাত্র দুবার?'

'হ্যাঁ।' পুরনো দিনের বৃদ্ধ বিপ্লবী একবার যেন চারপাশটা দেখে নিলেন। 'দেশ স্বাধীন হবার পর আজই প্রথম গভর্নমেন্ট হাউসে এলাম।'

'তাই নাকি?'

বিপ্লবী ঘোষ মশাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আজই প্রথম।'

ক্যাপ্টেন রায় জানতে চাইল, 'এর আগেও কি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?'

বৃদ্ধ আর হাসি চাপতে পারলেন না।

ক্যাপ্টেন অবাক হয় ওর হাসি দেখে। জিজ্ঞাসা করে, 'হাসছেন যে?'

হাসি থামার পর ঘোষ মশাই শোনালেন পুরনো দিনের সে কাহিনি।

'পুলিশ কমিশনার টেগার্ড সাহেবের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছ। বিপ্লবীদের অ্যারেস্ট করে লালবাজারে আনার পর টেগার্ড সাহেব তাঁদের প্রথম অভ্যর্থনা জানাতেন মুখে থুতু ছিটিয়ে...'

'ক্যাপ্টেন অবাক হয়, 'থুতু ছিটিয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিপ্লবীদের হাজির করা মাত্রই উনি আগে ওদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতেন। টেগার্ড সাহেবের সঙ্গে সর্বদা একটা হেড কনস্টেবল ও একজন সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর থাকত। ওরা দুজনে অকথ্য অত্যাচার করতে ওইসব বিপ্লবীদের ওপর। টেবিলের ওপর বসে চুরুট খেতে খেতে টেগার্ড সাহেব সে দৃশ্য উপভোগ করতেন আর মাঝে মাঝে খেয়াল খুশি মতো বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের কাপড় তুলে বিশেষ বিশেষ স্থানে জ্বলন্ত সিগার চেপে ধরতেন।...

ক্যাপ্টেন শিউরে উঠে। 'বলেন কি জ্বলন্ত সিগার চেপে ধরতেন?'

'ইয়েস ইয়েস জ্বলন্ত সিগার! আপনার সঙ্গে যিনি কথা বলছেন তাঁর দেহেও এমনি অনেক স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখতে পাবেন।'

'মাই গড!'

'জ্বলন্ত সিগার তবু সহ্য করা যেত কিন্তু ওই দুজনের অত্যাচার সহ্য করা যেত না।'

'নিউ ইয়ার্স ইভ-এ তখন গভর্নমেন্ট হাউসে বিরাট পার্টি হতো। টেগার্ড সাহেবও আসতেন। জানতাম টেগার্ড সাহেবের ওই দুজন সাকরেদ একটু আধটু প্রসাদ পাবার পর নিজেদের সামলাতে পারবে না। তাই ওদের সঙ্গে একটু মোলাকাত করার জন্য...

'গভর্নমেন্ট হাউসে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে এলেন?'

'বৃদ্ধ আবার একটু হাসলেন। 'একজন গেস্টের ড্রাইভার হয়ে এসেছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? মাত্র একটা কার্তুজই খরচ করেছিলাম...'

গভর্নমেন্ট হাউসে ফায়ারিং-এর খবর শুনেই উত্তেজিত হয় এ-ডি-সি। 'দেন হোয়াট্ হ্যাপন্ড্?'

'বিশেষ কিছু না। টুকটাক আদর-আপ্যায়ন ও বিচারের প্রহসনের পর কিছুদিনের জন্য আন্দামান সেলুলার জেলে...'

ঘোষমশাই আর এগোতে পারলেন না। তিন-চারজন সোসাইটি লেডি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে এ-ডি-সি-র ঘরে ঢুকলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে একজন বললেন, 'উই উইল বি কামিং টু ইউ এগেন আফটার এ ফিউ ডেজ।'

'উইথ প্লেজার। আই উইল বি অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।' ক্যাপ্টেন ঈষৎ মাথা নিচু করে হাসি হাসি মুখে কথাকটি বলে বিদায় জানাল।

মেয়েরা চলে যাবার পর ঘোষমশাই বললেন, 'তখনকার দিনে পুরুষের চাইতে মেয়েরাই বেশি গভর্নমেন্ট হাউসে আসত, আজকালও কি...'

ঘোষমশাই আরো একটু কিছু বলে বোঝাতে চেয়েছিলেন তখনকার দিনে যেসব মহিলারা আসতেন *তাঁরা বিশেষ সতী-সাধ্বী পতিপ্রাণা ছিলেন না।* 'আজকাল কি শুধু সোশ্যাল ওয়ার্কাররাই আসেন?'

ক্যাপ্টেন কোনো জবাব দেয়নি। হঠাৎ টেলিফোন তুলে উত্তর এড়িয়ে গেল।

বৃদ্ধ বিদায় নেবার আগে বললেন, 'এইসব মেয়েদের দেখলে গান্ধীজির একটা কথা মনে হয়।'

'কোন কথা?'

'কদিন কলকাতা থেকে অনেক ঘোরাঘুরি করেও গান্ধীজি রাস্তাঘাটে মেয়েদের বিশেষ দেখতে না পেয়ে বলেছিলেন, 'বাঙালি মেয়েরা কি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে?'

আর আজকাল?

আফটারনুন ডিউটি। বিশেষ কাজের চাপ ছিল না। অফিসে বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে ঘোষ মশাই-এর কথা ভাবছিল ক্যাপ্টেন। হঠাৎ রিভলভিং চেয়ারটা ঘুমিয়ে নিয়ে পাম গাছের ফাঁক দিয়ে দূরের আকাশ দেখল। মনে পড়ল মিস শ্যামলী গুপ্তা ও আরো অনেকের কথা।

আবার সিগারেট টানে। চারপাশটা ধোঁয়ায় ভরে যায়। রাজভবনের শত শত অতিথির আগমন ও বিদায়ের ভিড়ের মধ্যেও মিস গুপ্তার আকস্মিক দৃষ্টি এড়ায় না। সোশ্যাল ওয়ার্কারের ছদ্মবেশে একটু যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠতা, পরে ইন্ডিয়ান হসপিটালিটির অছিলায় হোটেলে...গেস্টহাউসে—থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে আরো নিবিড়, আরো আপনভাবে মেলামেশা।

চমৎকার!

আর্মি অফিসারের পোশাকে, হাতে স্যাফরন কালারের আর্মডব্যাচ পরে এ-ডি-সি'র চাকরি করতে এসে বেশি কথাবার্তা বলতে পারে না ক্যাপ্টেন। বয়স তো হয়েছে, বুদ্ধি তো আছে, রক্তমাংসের মানুষের ইন্দ্রিয়ের জ্বালা তো অনুভব করতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে। সব কিছুই বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না।

মণিকাকে বলতেও দ্বিধা হয়।

মণিকা বসে থাকতে থাকতেই মিস গুপ্তার টেলিফোন এসেছিল বলে ওর কথাই সে বার বার জানতে চায়, শুনতে চায়। মিস গুপ্তার মতো আরো কতজনেই তো ক্যাপ্টেনকে টেলিফোন করে, নানা সময় দেখা সাক্ষাৎ করে, হাসি-ঠাট্টা করে। তাদের কথা মণিকা জানে না ; তাই শুনতেও চায় না।

ক্যাপ্টেন কিছু বলতে পারে না। বলতে দ্বিধা হয়, লজ্জা হয়, ঘেন্না হয়।

বাংলাদেশের বাইরে বড় হয়েছে, উত্তর-পশ্চিমে চাকরি করেছে। তাইতো বাংলাদেশকে স্বর্গ মনে করত। গভর্নরের এ-ডি-সি হবার মোহ তার ছিল না কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে এত নিবিড় পরিচয় হবার সুযোগ পাবে বলেই এই চাকরি নিয়েছিল। মনে মনে অনেক শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে এসেছিল বাংলাদেশে। ক্যাপ্টেন ভাবত ডেভিড হেয়ার, মেকলে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার করেছিলেন কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো পাশ্চত্যের নোংরামি এখানে পাত্তা পায়নি।

এ-ডি-সি-র চাকরি করতে এসে সব গোলমাল হয়ে গেল।

মণিকাকে অনেক অনুরোধ করেছিল, 'প্লিজ! ওদের কথা বলতে অনুরোধ করো না।'

'কেন বলো তো তুমি সব সময় ওদের কথা লুকোতে চেষ্টা করো?'

ক্যাপ্টেন মনে মনে ঠিক করল, না। আর লুকোবে না। সব কথা খুলে বলবে। হাজার হোক মণিকাকে নিয়ে ও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে। মনে হয় মণিকার মনেও টুকরো টুকরো স্বপ্ন জমতে শুরু করেছে। ঈশান কোণের কালো টুকরো মেঘের মতো ছোট-ছোট সন্দেহের কারণের মধ্যেও অনেক অশান্তির সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। রোগের জীবাণুর মতো সন্দেহের জীবাণুকেও নিপাত করতে হয়। তাছাড়া মণিকার কাছে লুকোবার কী আছে?

'বৃদ্ধ বর্মিজ অধ্যাপকের খবর নিতে গিয়ে তোমাকে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম।'

'কেন?'

'ফ্লাওয়ার ভাস-এর ফুল দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। তোমাকে দেখে মনে হয় যেন ভোরবেলার শিশির ভেজা চন্দ্রমল্লিকা। চমকে যাব না?' ক্যাপ্টেন যেন গর্বের সঙ্গে চাপা হাসি হাসতে হাসতে মণিকার দিকে তাকাল।

লম্বা লম্বা ভ্রু দুটোকে কুঁচকে উপরে টেনে মণিকা জানতে চাইল, 'তার মানে?'

'তার মানে তোমাকে দেখেই শুধু সুন্দরী নয়, পবিত্র মনে হয়েছিল।'

ক্যাপ্টেন বেশ সিরিয়াসলি বললেও মণিকা পাত্তা দিল না। 'তুমি কি ফ্ল্যাটারি শুরু করলে?'

'নট অ্যাট অল।'

'তবে।'

'তবে শোন।'

তারপর ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে শুরু করেছিল, 'দুটি অপরূপা সুন্দরী বা যুবকের মধ্যেও পার্থক্য থাকে।'

'থাকেই তো।'

'কিসের পার্থক্য?'

'অনেক কিছুরই পার্থক্য থাকতে পারে।'

'পার্থক্য থাকে শুধু মাধুর্যের। দেহ আর মনের সমন্বয়ে জন্ম নেয় মাধুর্য। দুটি মেয়ে সুন্দরী হতে পারে কিন্তু দুজনের মাধুর্য কিছুতেই সমান হতে পারে না।

মণিকা তখনও তর্ক করে, 'তা তো হবেই।'

'কেন বলো তো?'

মণিকা একটু থমকে দাঁড়ায়। দৃষ্টিটা সরিয়ে ঘুরিয়ে নেয় প্রায় নির্জন বোটানিকসের চারপাশ। হাঁটতে হাঁটতেই আনমনে দুটো একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। বাতাসে এক গোছা চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। তাঁদের শাড়ির আঁচলটা খানিকটা বন্ধন মুক্ত করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, সমুদ্র যেমন নদীকে আকর্ষণ করে ক্যাপ্টেনও মনে মনে তেমনি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করল।

মনে মনে বলল, মণিকা, যুগ যুগ আগে তুমিই বোধহয় হিমালয় দুহিতা পার্বতী ছিলে, তোমাকে দেখেই বোধহয় মহাদেবের...

মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখের ওপর পড়া চুলগুলো সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মণিকা ফিরে বলল, 'কিছু বলছ?'

ক্যাপ্টেন চমকে উঠে। 'না, না, কিছু বলছি না।'

'মনে হলো কি যেন বলছিলে।'

'কই না তো।'

'কিন্তু আমার যে মনে হলে তুমি বলছিলে।'

ক্যাপ্টেন হাসে। 'তুমি কি বলতো?'

'হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছ?'

'তুমি কেমন করে বুঝলে আমি কিছু বলছিলাম।'

'মনে হলো যেন তোমার কথা শুনতে পেলাম।'

ক্যাপ্টেন ভীষণ খুশি হলো কথাটা শুনে। আনন্দ খুশিতে সারা মুখটা জ্বল জ্বল করে উঠল। মণিকার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার হাতটা দাও তো।'

মণিকা কোনো প্রশ্ন করল না, প্রতিবাদ করল না। হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ক্যাপ্টেন মণিকার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ওকে একটু টানল। মণিকা হঠাৎ যেন বড় বেশি কাছে এলো।

ক্যাপ্টেন বলল, 'থ্যাঙ্কস, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস মণিকা। আর আমার ভয় নেই।'

মণিকার ইরানি ঠোঁটের কোণায় একটু তৃপ্তির হাসির রেখা ফুটে উঠল।

'কি হলো?'

'কি হয়নি বলো?'

ক্যাপ্টেনের হাতের মুঠোয় তখনও মণিকার হাত। তখনও দুজনে দুজনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখছে। মণিকা একটি কথাও বলল না।

'সত্যি, মনে মনে তোমাকে অনেক কথা বলেছিলাম। ভাবতে পারিনি তুমি জানতে পারবে, বুঝতে পারবে।'

মণিকা দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। ক্যাপ্টেন প্রায় কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, 'আমার মনের কথাও যখন শুনতে পাও তখন আর আমার ভয় নেই, চিন্তা নেই।'

ক্যাপ্টেন এবার আস্তে আস্তে হাতটা ছেড়ে দিয়ে আলতো করে ডান হাত দিয়ে ওকে একটু জড়িয়ে ধরে বলল, 'এবার তোমাকে সব কথা বলব। কিছুই 'লুকাব না।'

আনত নয়নেই মণিকা প্রশ্ন করে, 'কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু রূপ নয়। রূপসী অনেকেই। শ্যামলীও। কিন্তু লাবণ্য? সবার থাকে না। গন্ধ-স্পর্শ-রূপলাবণ্য সব নিয়েই ভালো লাগা। ফুলের মতো মানুষেরও রূপ-লাবণ্যই শেষ কথা নয়। সৌরভই বড় কথা। মানুষেরও সৌরভ আছে, গন্ধ আছে। যে মেয়েদের সে সৌরভ নেই, মিষ্টি গন্ধ নেই, তাদের রূপ-লাবণ্যের কি মূল্য?'

মণিকা কিছুতেই এসব বিশ্বাস করত না। তর্ক করত।

'আমি কি গোলাপ যে আমার গন্ধ থাকবে, সৌরভ থাকবে?'

'প্রত্যেক মানুষেরই দেহের একটা গন্ধ আছে...'

'গন্ধ আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। প্রতিটি অঙ্গের একটা গন্ধ আছে। সব অঙ্গের গন্ধ মিলিয়েই দেশের গন্ধ...'

আবার মাঝপথে বাধা দেয় মণিকা। 'কই আমি তো আমার দেহের কোনো গন্ধ পাই না।'

'পাবে না। তুমি তোমার দেহের গন্ধের সঙ্গে এত বেশি পরিচিত যে তা অনুভব করা সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি তোমার মাকে কাছে একটু টেনে নিও, একটু জড়িয়ে ধরো, একটা অতি পরিচিত সুন্দর গন্ধ পাবে।'

ক্যাপ্টেন একটু যেন সরে বসে। মুখটা মণিকার কানের কাছে নিয়ে একটু ফিস ফিস করে বলে, 'আমার দেহের গন্ধ পাচ্ছ!'

মণিকা হাসতে হাসতেই ভ্রু কুঁচকে বলে, 'আঃ কি যা তা বলছ?'

আর একদিন মধ্যমগ্রামের ফার্মে গিয়ে ক্যাপ্টেন আরো অনেক কথা বলেছিল।

'একটা ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে তুলে নিও। একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ পাবে...'

ফার্মের মধ্যে ছোট্ট রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মণিকা জবাব দেয়, 'বাচ্চাদের গন্ধ থাকে বলে কি বুড়োদেরও থাকবে?'

'একশো বার থাকবে। দেহ, মন, বয়স ও চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গন্ধ বদলায়।'

মণিকা তর্ক করে না কিন্তু ক্যাপ্টেনের যুক্তি মেনে নেয় বলেও মনে হয় না।

পরে ওই ছোট্ট কটেজের বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে ক্যাপ্টেন বলেছিল, 'শ্যামলীর রূপ আছে, যৌবন আছে, কিন্তু লাবণ্য নেই। প্রথমদিন তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমার লাবণ্য আর সৌরভে মুগ্ধ হয়েছিলাম।'

মণিকা ডান হাতে চায়ের কাপ ধরে থাকল কিন্তু বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'কচু!'

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসেছিল। মনে মনে বলেছিল, কিভাবে তোমাকে এসব কথা বোঝাই বলতো? দেহমনের অপব্যবহার হলে রূপ থাকতে পারে কিন্তু লাবণ্য-সৌরভ নষ্ট হয়ে যাবেই।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ওই মুচকি হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'শ্যামলীর রূপ-যৌবনের চাইতে তোমার লাবণ্য-সৌরভ অনেক বেশি লোভনীয়।'

'আঃ কি অসভ্যতা করছ? বোঝাবার ক্ষমতা নেই, শুধু অসভ্যতা করতে পারো।'

সামনের চেয়ারে বসে ক্যাপ্টেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বলে, 'বিয়ের আগে এর চাইতে বেশি বোঝান যায় না। বুঝলে?'

মণিকা তিড়িং করে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমার মতো অসভ্য আর্মি অফিসারকে বাংলাদেশের মেয়ে বিয়ে করবে?'

মেয়েরা অনেক কথাই এড়িয়ে যায়, স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করে কিন্তু তাই বলে মনে মনে অনুভব করে না, তা নয়। বাড়ি ফিরে গিয়েও বার বার মনে পড়েছিল ক্যাপ্টেনের কথা।

মনে মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করেছিল।

কলেজে রোজ অর্পিতার পাশে বসত কিন্তু যেদিন অর্পিতা না আসত সেদিন লিলির পাশে ওকে বসতে হতো, সেদিন কি বিশ্রী লাগত! কেন অধ্যাপক মণ্ডের ছেলে? 'জান সিস্টার, বাড়িতে ঢুকেই আমি বুঝতে পারি তুমি আছ কি নেই।'

মণিকা জানতে চাইত, 'কেমন করে?'

'মেয়েদের একটু ফ্লেবার আছে। মা-মারা যাবার পর সে গন্ধ আর পেতাম না। কিন্তু তুমি আসা-যাওয়া শুরু করার পর আবার যেন সেই হারিয়ে যাওয়া গন্ধটা খুঁজে পাচ্ছি।'

তবে কি ক্যাপ্টেনের কথাই ঠিক? উপরের ঘরে একলা শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে দূরের আকাশ দেখতে দেখতে কতবার ভাবছিল এইসব কথা। পাশ ফিরল। ও পাশের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। নিজের সৌরভে যেন নিজেই মাতাল হলো।

শুধু সে রাত্রে নয়, পরের কয়েকটা দিন নিজেকে নিয়েই মেতে রইল মণিকা। একটু একলা থাকলেই বড় বেশি নিজেকে দেখে। আপাদ-মস্তক দেখে। সর্বাঙ্গ দেখে। ওর লাবণ্য আছে? সৌরভ আছে?

আছে বৈকি! তা নইলে রাজভবনের আকর্ষণ তুচ্ছ করে ক্যাপ্টেন ছুটে আসে? হাই সোসাইটিতে একটু মর্যাদা পাবার জন্য কলকাতার কত মেয়ে এ-ডি-সি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। ক্যাপ্টেনের সঙ্গেও তো কত মেয়ের আলাপ। তবুও যখন–

ক্যাপ্টেনকে যেন আরো ভালো লাগে। বড় বেশি ভালো লাগে। কৃতজ্ঞতায় সারা মনটা ভরে যায়। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। শুধু দেখতে? সামান্য একটু আদর করতে, একটু ভালোবাসতে। একটা গান শোনাতেও ইচ্ছে করছে।

গভর্নরের ওপর ভীষণ রাগ হয় মণিকার। এত ট্যুরে যাবার কোনো অর্থ হয়?–প্রতি মাসেই ট্যুর? যেন ক্যানভাসার, হেড অফিসে বেশিদিন থাকার হুকুম নেই। আচ্ছা ট্যুরে যাবে যাও, বক্তৃতা দিতে ভালো লাগে, দাও। তাই বলে সব সময় ক্যাপ্টেন রায়কে কেন? আর কি কোনো এ-ডি-সি নেই? আচ্ছা ও যদি ম্যারেড হতো? ছেলে-মেয়ে থাকত?

ছি, ছি। এমন করে একজন ইয়ংম্যানের লাইফ্ নষ্ট করে?

কলকাতা থেকে বর্ধমান-বাঁকুড়া-বীরভূম ঘুরে আসতে কতদিন লাগে? একদিন-দুদিনই তো যথেষ্ট! সাতদিন ধরে ঘুরে বেড়াবার কোনো অর্থ হয়? বর্ধমান পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে গভর্নরের যাবার কি দরকার? দেশে কি কোনো শিক্ষাব্রতী নেই? ভি-আই-পি চাই? ভালো কথা? ভাইস চ্যান্সেলার বা এডুকেশন মিনিস্টার তো আছেন। আরো বড় ভি-আই-পি? কেন চীফ মিনিস্টার? তাঁর তো কাজ আছে, লাটসাহেবের মতো বক্তৃতা দিলেই চলবে না!

বর্ধমান পাবলিক লাইব্রেরিতে যাবার তবু অর্থ হয় কিন্তু দুর্গাপুরে? লাটসাহেব কি ইঞ্জিনিয়ার? কলকারখানা দেখে উনি কি বুঝবেন? বুঝি আর না বুঝি তবুও যেতে হবে। লেকিন, মাগার করে বক্তৃতা দিতে দিতে ওয়ার্কারদের বলতে হবে দেশের ফয়দার জন্য আরো পরিশ্রম করতে হবে, আরো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। না জানি দেশের ফয়দার জন্য লাটসাহেব নিজে কত খাটছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন।

মেজাজ গরম হয়ে যায় মণিকার।

দুর্গাপুর থেকেও ফিরবেন না। রামপুরহাটে সিল্ক উইভার্স কোঅপারেটিভেও যেতে হবে। কেন? দুচার গজ সিল্কের কাপড় প্রেজেন্ট পাবেন বলে?

গভর্নরের ওপর যত রাগ হয়, ক্যাপ্টেনকে তত বেশি ভালো লাগে, তত বেশি কাছে পেতে ইচ্ছা করে।

জানালা দিয়ে দূরের আকাশের তারাগুলো দেখে। চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসে। তবুও মনে হয় ওরা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

রাতের তারা মিলিয়ে যায় ভোরের আকাশে। কিন্তু রাতের স্বপ্ন? সে তো মিলিয়ে যায় না, হারিয়ে যায় না।

ঘুমের ঘোরেই মণিকা বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে, হাতটা যেন কাকে খুঁজছে।

সারাদিনই খোঁজে। দৃষ্টিটা চলে যায় কতদূরে, এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায়ের কাছে।

মাকে ধরা দেয় না, কিন্তু নিজের কাছে? প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে। ধরা পড়ে সকালে, দুপুরে। সন্ধ্যায়, রাত্রে।

নীচের থেকে বাবার গলার আওয়াজ শুনতে পায়, 'হ্যাঁগো, খুকু কোথাও বেরিয়েছে নাকি?'

শুয়ে শুয়েই টাইমপিসটা দেখে। ছি, ছি! এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছে? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। সারা রাত্তিরের স্বপ্ন বিধ্বস্ত চোখেমুখে একটু জল দিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। ঢিলেঢালা জামাকাপড় ঠিক করে নেয়। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে চিরুনিটা তুলতে গিয়েই থমকে যায়।

...কদিন তোমার চিন্তায় চিন্তায় কি হয়েছি বলো তো! এবার ট্যুর থেকে ফিরে এসো। মজা দেখাব। তোমার জন্য কী বেইজ্জত হচ্ছি দেখছ? সাড়ে আটটা বাজে, এখনও আমি নীচে নামিনি।...

মাথার ওপর দিয়ে কোনোমতে চিরুনিটা বুলিয়ে নিয়ে দুহাত দিয়ে খোঁপা করে নেয়। হুড়মুড় করে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

সিঁড়ির মুখেই মা-র সঙ্গে দেখা। 'কাল কত রাত্তির অবধি নভেল টভেল পড়লি?'

মণিকা মুহূর্তের জন্যে ভাবে। এই বিপদে লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এমন বুদ্ধি দেবার জন্য ভীষণ ভালো লাগে মা-কে। জড়িয়ে ধরে মা-কে। 'কি করে বুঝলে বলতো মা?'

'তুই মা হলে তুইও বুঝবি।'

মণিকা আর দাঁড়ায় না মা-র সামনে, চলে যায় বাবার স্টাডিতে।

'তুমি আমাকে ডাকছিলে বাবা?'

হাতের বইটা নামিয়ে রেখে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'না ডাকছিলাম না। তবে আজ তুই চা দিতে এলি না দেখে খোঁজ করছিলাম।'

'কাল শুতে শুতে একটু রাত হয়েছিল বলে আজ উঠতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

মণিকা বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর বাবা ডাক দিলেন, 'হ্যাঁরে তোর মনে আছে তো আজ বলাই-এর ওখানে যেতে হবে?'

মাথাটা ঘুরিয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে আলতো করে বাঁধা খোঁপাটা খুলে গেল। মুখে কিছু বলল না, ভ্রু কুঁচকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? ভুলে গিয়েছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁ, ঠিক মনে ছিল না।'

মণিকা চলে যায়। একটু দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।

দ্বিধা হবে না?

ডক্টর ব্যানার্জি বলাই বলতে অজ্ঞান। একে বাল্যবন্ধুর ছোট ভাই, তারপর নিজের প্রিয় ছাত্র। সেবার হাই ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল একমাত্র ওই। তাছাড়া সে কৃতী, সে সাকসেসফুল। ডক্টর ব্যানার্জির দুর্বলতা থাকার কারণ আছে বৈকি!

নিজের ঘরে চুপ করে বসে থাকতে থাকতেই মণিকা ভাবে, বাবার জন্য মা-ও বলাই-বলাই করে অস্থির। তাছাড়া মাসিমা-মাসিমা করে ন্যাকামি করে যে!

একটা ফ্রেঞ্চ কনস্ট্রাকশন ফার্মের রিজিওন্যাল রিপ্রেজেনটেটিভকে নিয়ে এত মাতামাতি করার কি আছে? না হয় হাজার হাজার টাকা রোজগারই করেন! ঘন ঘন বিদেশ গেলেই কি মাথা কিনে নিয়েছে?

সব কথা মা-বাবাকে বলা যায় না। মণিকাও বলেনি কিন্তু তাই বলে তো সে কথা ভুলে যায়নি।

কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। বাবা-মা রেঙ্গুনে। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা ভিজিটিং আওয়ার্সে জামা-কাপড়, খাবার-দাবারের কয়েকটা প্যাকেট নিয়ে কৃতী বলাই হাজির হলো মণিকার হোস্টেলে। মণিকা প্রথমে চিনতে পারেনি।

বলাই বুঝতে পারল। কি চিনতে পারছো?'

একটু লজ্জিত হয়ে মণিকা বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আমি বলাইদা। তোমার বাবার ছাত্র। এবার মনে পড়েছে?'

মনে পড়বে না? বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু কানাইবাবু। ওর রাঙা জেঠু। একে তাঁর ছোট ভাই, তারপর বাবার প্রিয় ছাত্র।

খুশিতে মণিকা হাসে। 'আপনি বলাইদা?'

'হ্যাঁ।'

বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল।

'চলুন ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসি।'

উত্তর দেবার আগেই হাতের ঘড়িটা দেখল। ওদিকে তাকিয়ে ইসরায় ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলল।

'না, আজ আর বসব না। আমি আজকাল প্রায়ই রেঙ্গুনে যাতায়াত করি আর সময় পেলেই তোমার বাবার কাছে চলে যাই। মাসিমা এগুলো তোমার জন্য পাঠিয়েছেন...'

'একটু তো বসবেন?'

বলাই আদর করে মণিকার গালে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'না, না আজ আর বসব না।'

কোটের পকেটে হাত দিয়ে দুটো চিঠি বের করে মণিকার হাতে দিল, 'এই চিঠি দুটো রাখো। একটা তোমার আরেকটা তোমার হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের।'

'এক কাপ চাও খাবেন না?'

এবার স্নেহের শাসন। 'তুমি ছোট হয়ে আমাকে কি খাওয়াবে, আমি তোমাকে খাওয়াব।'

সেদিন বলাইদা আর অপেক্ষা করল না। চলে গেল।

বলাইয়ের গাড়িটা গেট দিয়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওই দিকেই চেয়ে রইল মণিকা।

বেশ লাগল। হাসি-খুশি-প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা একটা সার্থক মানুষ মনে হলো বলাইদাকে।

ডক্টর ব্যানার্জি হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানিয়েছিলেন যে আমার বাল্যবন্ধু ও মণিকার লোক্যাল গার্ডিয়ান প্রফেসর কানাই সরকারের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই ও আমার ছাত্র বলাই সরকার মণিকাকে দেখাশুনা করবে।

রাঙা জেঠু তখন প্রায়ই কলকাতার বাইরে যেতেন। ছোটখাটো নানা কারণে মণিকার বেশ অসুবিধাই হতো। দু-একদিনের ছুটি পেলেও রাঙা জেঠুর চিঠির অভাবে চুঁচুড়ায় ছোট মাসির কাছে যেতে পারত না। তাইতো বাবার চিঠিটা পেয়ে মণিকা খুশি হয়েছিল।

বলাই মাসে দু-একদিন কয়েক মিনিটের জন্য মণিকাকে দেখে যেত। সব সময়ই কিছু না কিছু প্রেজেন্টেশন, খাবার-দাবার নিয়ে আসত। কদাচিৎ কখনও সময় থাকলে একটু আধটু গল্পগুজব করত দুজনে। কখনও কখনও আরো দুচারজন মেয়ে ঘিরে বসত, গল্প করত।

বলাই ব্যাংককে বদলি হবার আগে মণিকা বলেছিল, 'আপনি চলে যাবার আগে আমাকে একবার চুঁচুড়া ঘুরিয়ে দেবেন।'

একটা ছুটির দিনে সকালে বলাই নিজেই গাড়ি নিয়ে হাজির হলো মণিকার হোস্টেলে। একদিনের ছুটিতে মণিকা চললো মাসির বাড়ি। বলাইদার গাড়িতে চড়ে চুঁচুড়া যেতে মণিকার সে কি আনন্দ!

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাবার সময় বলাই জিজ্ঞাসা করল, 'সোজা মাসির বাড়িই যাবে?'

'কেন আপনি অন্য কোথাও যাবেন?'

স্টিয়ারিং ডান হাতে ধরে বাঁ হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিতে নিতে জবাব দেয় বলাই, 'তুমি চাও তো খানিকটা ঘুরে আসতে পারি।'

ছুটির দিনে এমন মুক্তির আনন্দের আমন্ত্রণ পেয়ে মণিকা মনে মনে চঞ্চল হয়, উত্তেজিত হয়। অথচ...

'কোথায় যেতে চান?'

'আমি তো ফুরসৎ পেলেই হাজারিবাগ চলে যাই।'

'হাজারিবাগ?'

'সিঁথির মোড় ছাড়িয়ে টবিন রোডের মোড় পার হলো।'

'হাজারিবাগ বলে চমকে ওঠার কি আছে? দরকার হলে একদিনেই ঘুরে আসা যায়।'

'একদিনেই?'

'নিশ্চয়ই।'

ডানলপ ব্রিজের কাছে বলাই স্টিয়ারিং ঘোরাল। ট্রেন লাইন ধরে গাড়ি চললো দক্ষিণেশ্বর-বালি ব্রিজের দিকে।

একবার মনে হলো ঘুরেই আসে হাজারিবাগ। বেশ মজা হবে। আবার ভাবে, না, না। একলা একলা বলাইদার সঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে?

গাড়ি বালি ব্রিজে। গঙ্গার হাওয়ায় চুলগুলো উড়ে উড়ে মণিকার মুখে পড়ছে। আঁচলটাও উড়ছে। বলাই একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দেখে নেয়।

শেষ পর্যন্ত চুঁচুড়া ঘুরেই এলো। তবুও বেশ ভালো লাগল। কলেজ-হোস্টেলের নিয়মতন্ত্রের বাইরে এই একদিনের মুক্তির আনন্দ যেন ভোলা যায় না।

বলাই সিঙ্গাপুর বদলি হবার পরও মনে পড়ত। মাঝে মাঝে। কখনও কখনও। কলেজের ঘণ্টা, হোস্টেলের ঘণ্টা, আর ওই উঁচু লোহার গেটটার মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখতে রাখতে

হাঁপিয়ে উঠলেই মনে পড়ত।

উপরের ঘরে চুপ করে বসে বসে সেসব কথা মনে পড়ছিল মণিকার। হাঁটুর পর কনুই রেখে হাতের পর মুখ দিয়ে কিছুটা উদাস হয়ে ভাবছিল।

রাতের স্বপ্ন চোখে নিয়েই ঘুম থেকে উঠেছিল। বেশ লাগছিল। আলাপের পর রাগ শুরু হবার মুখেই সেতার থেমে গেলে যেমন বিরক্ত লাগে, ঠিক তেমনি অস্বস্তিবোধ করছিল মনে মনে।

শুধু চুঁচুড়া ঘুরেই যদি সব শেষ হতো তাহলে হয়তো এমন বিচ্ছিরি লাগত না। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে রেঙ্গুনে যাবার পর যদি...

ভারতেও খারাপ লাগে মণিকার। বার বার সরিয়ে দেয় টুকরো টুকরো চিন্তার মেঘগুলো। আকাশটা একটু পরিষ্কার হলেই দেখতে পায় ক্যাপ্টেনকে কিন্তু সঙ্গেই সঙ্গেই আবার কোথা দিয়ে যে ওই স্মৃতি বোঝাই মেঘগুলো হাজির হয় তা মণিকা বুঝতে পারে না।

তাছাড়া ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছে। ক্যাপ্টেনকে নিয়ে মনে মনে অনেকদূর এগিয়েছে। ভবিষ্যতের ছবিটাও মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ঠিক এমন সময় মনটা বিক্ষিপ্ত হবে, ভাবতে পারেনি।

উপর থেকে নীচে নেমে এলো। এঘর-ওঘর ঘোরাঘুরি করল। খবরের কাগজটা একবার হাতে তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়েই নামিয়ে রাখল। এমন বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কাগজ পড়া যায়?

সিঁড়ি দিয়ে দু-এক ধাপ উপরে উঠতেই মা পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে তুই বাথরুমে-টাথরুমে যাবি না? কখন জলখাবার খাবি?'

মণিকা পিছন ফিরে বলল, 'শরীরটা যেন কেমন করছে। এক্ষুনি কিছু খাব না।'

'কিছু ঔষধপত্র খাবি?'

'না, না। একটু শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

উপরে নিজের ঘরে সত্যি মণিকা শুয়ে পড়ল। এই সকালবেলাতেই দিনের শেষের ক্লান্তি আর অবসাদ যেন ওকে ঘিরে ধরল।

...রেঙ্গুন। ইউনিভার্সিটির পাশেই ইউনিভার্সিটি এভিনিউ ও প্রোম রোডের প্রায় কোণাতেই ডক্টর ব্যানার্জির কোয়ার্টার। কলকাতা থেকে এসে ভীষণ ভালো লাগল এই কোয়ার্টারকে। চার পাঁচখানি বড় বড় ঘর। তাছাড়া প্যাগোডার মতো একটা ছোট্ট আউট হাউস ধরনের আরেকটা ঘর সামনের লনের এক কোণায়। পিছনের দিকটা আরও চমৎকার। গাছপালা লতাপাতা। একটা ছোট্ট বটানিকস্।

বাড়িতে ঢুকে এক মিনিট বসল না, মুখে একটু জল পর্যন্ত দিল না। প্রায় ঘণ্টখানেক ধরে শুধু বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল।

'মা, তুমি যে এখানে এসে একেবারে সিজনড্ ইন্টিরিয়র ডেকরেটর হয়ে গেছ দেখছি।'

মিসেস ব্যানার্জি মুচকি হাসেন। 'আমি কিচ্ছু করিনি। প্রায় সারা বাড়িটাই বলাই সাজিয়ে দিয়েছে।'

প্রথমটা শুনে চমকে উঠেছিল মণিকা। বলাইদা রেঙ্গুনে?

উপরের ঘরে চুপটি করে শুয়ে শুয়ে মনে করছিল সেসব স্মৃতি। প্রথম কিছুদিনের মিষ্টি স্মৃতি। হৈ হৈ করার কথা! উঃ! কি ঘুরেই বেড়িয়েছে। সারা শহরটাকে চষে খেয়েছে দুজনে। তারপর গেছে রয়্যাল লেকের ওরিয়েন্ট ক্লাবে।

সাপুড়ের মতো শুধু বাঁশি বাজিয়েই চলেছিল বলাই। আর যেন কোনো অভিসন্ধি ছিল

না ওর। ছেলেদের মতো সারা পুকুর জুড়ে জাল ফেলেছে, বুঝতে দেয়নি শিকারের পরিকল্পনা। অনেক পরে ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে এনেছে। সাপুড়ের মিষ্টি বাঁশি আর শোনা যাচ্ছিল না। থেমে গেছে। শিকার যে হাতের মুঠোয়। তখন আর বেরুবার পথ নেই, পালাবার উপায় নেই।

সকালেই বেরিয়েছে মণিকাকে পেগু দেখিয়ে আনবে বলে। বিকেলেই ফিরবে! প্রোম রোড দিয়ে এসে মন্টগুমারি স্ট্রিট পার হয়ে বলাই নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল।

'চল একটু নামি।'

'কেন?'

'একটু কিছু খেয়ে নেব!'

'সে কি? আপনি ব্রেকফাস্ট করেননি?'

'না।'

মণিকা একটু রাগারাগি করলেও শেষ পর্যন্ত উপরে গেল।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল।

মণিকাকে ভিতরের স্টাডিতে নিয়ে বলল, 'একটু বসো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিতর থেকে কতকগুলো বিরাট বিরাট প্যাকেট নিয়ে এলো। 'এই নাও এগুলো তোমার।'

'তার মানে?'

আবার তর্ক। আবার কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত খুলল।

কপালে হাত ঠেকিয়ে মণিকা বললে, 'মাই গড! করেছেন কি?'

'আবার তর্ক করছ? এই জাপানিজ সিল্কের শাড়িটা পরবে?'

'না, না। এখন নতুন শাড়ি পরব কেন?'

'আবার কেন? সব কেন-র কি কারণ থাকে?'

'হাউ ডু ইউ লাইক দিস কিমানো?'

মণিকা আর জবাব দেয় না। শুধু বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বলাই-এর দিকে।

'একটা অনুরোধ রাখবে?'

'বলুন'।

'আগে বলো রাখবে কিনা?'

'পারলে নিশ্চয়ই রাখব।'

'না পারার মতো কিছু বলব না।'

'তাহলে নিশ্চয় রাখব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে ছুঁয়ে বলো।'

মণিকা হেসে ফেলে। 'কি ছেলেমানুষি করছেন।'

মণিকা ওর গায়ে হাত দিতেই বলাই ওই হাত ধরে টেনে নিল, 'লক্ষ্মীটি এই কিমানোটা পর।'

অবাক-বিস্ময়ে হাসিতে-খুশিতে ভ্রু-দুটো টেনে উপরে তুলে মণিকা বলল, 'এই কিমানোটা পরব।'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো কিমানো পরতে জানি না।'

উপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব ভাবছিল। পাশ ফিরে শুয়ে ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মনে মনে কত প্রশ্ন আসে। কত কথা আসে। কত ভাবনা আসে।

বিছানা ছেড়ে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসল। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখল। সেদিন কিমানো পরাতে গিয়ে বলাইদা যে হঠাৎ পাগলামি করেছিল, আমার জীবন বসন্তের যে মধু...

না, না। আর ভাবতে চায় না মণিকা। কিন্তু ভয় করে। ধরা পড়বে না তো ক্যাপ্টেনের কাছে? স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হবে না তো?

সেই একটা দিনের স্মৃতি যখন মনে পড়ে, মণিকা শিউরে ওঠে। একটা দিন কোথায়? কয়েক ঘণ্টা! না তাও না। বড় জোর আধ ঘণ্টা। বরং পনের-বিশ কি পঁচিশ মিনিটই হবে। কিন্তু ওই কয়েকটা মিনিটেই জীবনের বনিয়াদ ধরে টান পড়েছিল। ঝড় বৃষ্টি বা সাইক্লোন নয়। ভূমিকম্প। পলকেই সবকিছু। দীর্ঘদিনের সাধনায়, অনন্ত পরিশ্রম করে যে সৌধ সৃষ্টি হয়, প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই তারও জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয় ওই কয়েকটি মুহূর্তের ভূমিকম্পে।

সেদিনের ওই কয়েকটা মিনিটেই মণিকার জীবন নাট্যে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করল। এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। এই পৃথিবীতে কোটি-কোটি বলাইদা ছড়িয়ে আছে। শিক্ষাদীক্ষা আচার আদর্শের পিছনে লুকিয়ে থাকে ইন্দ্রিয়। লোলুপ ইন্দ্রিয়। শিকারি ইন্দ্রিয়। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ওদের ওই লোলুপ ইন্দ্রিয়ের কাছে বলিদান যাচ্ছে কত মণিকার যক্ষের ধন। কোনো না কোনো বলাইয়ের হাতে তিলে তিলে সঞ্চিত যক্ষের ধন হারাতেই হয়। কিন্তু তার পরিবেশ আছে, মানসিক প্রস্তুতি আছে। যেখানে সে প্রস্তুতি নেই, সহজ সরল স্বাভাবিক পরিবেশ নেই, নেই সামাজিক স্বীকৃতি, সেখানেই দ্বিধা, সঙ্কোচ। মনের মধ্যে কত প্রশ্ন আসে যায়। যে চাওয়া, যে পাওয়ার মধ্যে পরিপূর্ণ তার সৌন্দর্য নেই, সৃষ্টির আনন্দ নেই, যে স্ফুলিঙ্গ কল্যাণ দীপশিখা জ্বালায় না কিন্তু সারা জীবন মনকে তিলে তিলে দগ্ধ করে—মণিকা তা ভুলবে কেমন করে?

তাছাড়া বলাইদা কেমন শঠতা করে, চতুরতার সঙ্গে...

মণিকা রাগে জ্বলে ওঠে। না, কিছুতেই ওর ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাবে না। বাবা-মা বললেও না। কোনো অছিলায় এড়িয়ে যাবে।

মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করে মণিকা। নাকি অসহায়! ওই মুহূর্তের জন্যই।

ক্যাপ্টেনের নির্ভর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কথা মনে পড়ে। কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে ওর সঙ্গে। কত জায়গায়। কত বিচিত্র পরিবেশে। সকাল, সন্ধ্যায়। কখনও বা রাত্রে। কলকাতায়, উপকণ্ঠে। গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্ন, ব্লুফক্স, বা ক্যালকাটা ক্লাবে, ফোর্ট উইলিয়ামের অফিসার্স মেসে। লাঞ্চ, ডিনার ককটেল ক্যাবারেতেও। রাজভবনের ঘরে একা একা কাটিয়েছে সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা। কিন্তু কই, কোনো দিনের জন্যও বলাইয়ের মতো কোনো সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ওর যৌবন দুর্গ আক্রমণ করেনি? দখল করতে চায়নি! বড় জোর হাতটা চেপে ধরে মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিস ফিস করে বলেছে, 'এই ধূসর জীবনের গোধূলিতে আর কতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব?'

নয়তো বলত, 'জানত, Waiting is the hardest time of all.'

মণিকা বলত, 'Everything comes to those who can wait.'

ক্যাপ্টেন হাতটা আর একটু চেপে ধরে বলেছে, 'সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে, সে ছবি মিশে যায় নির্ঝর—কল্লোলে...'

সুরের দোলা মণিকার মনেও ঝঙ্কার দেয়। হাঁটু মুড়ে বসে হাঁটুর পর মুখ রেখে একটু হাসে।

একবার দেখে নেয় ক্যাপ্টেনকে। চোখের কোণায় স্বপ্নের বিদ্যুৎ-স্পর্শ।

ক্যাপ্টেন বলে, 'উত্তর দিতে পারছ না তো?'

'সত্যি উত্তর চাও?'

'নিশ্চয়ই।'

মণিকা একটু ভাবে। একটু ডুব দেয়। হয়তো একটু অনুভব করে 'তবে শোন—'

'ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,'

যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।

কোথা সে যে আছে সঙ্গোপনে

প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে।'

আরো কত কি হতো! কিন্তু ও তো কোনোদিন কোনো অন্যায় দাবি করেনি।

অন্যায়?

মাঝে মাঝেই মনে হতো ক্যাপ্টেন অপূর্ণতার বেদনায় বড়ই পীড়িত। মণিকারই খারাপ লাগত। কখনও কখনও মনে হতো, সব কিছু উজার করে ক্যাপ্টেনকে সুখী করে, পরিপূর্ণ করে, পরিতৃপ্ত করে।

পারত না। মনের ইচ্ছা মনেই থাকত। প্রকাশ করত না। তবুও দ্বন্দ্ব দেখা দিত মনের মধ্যে। কেন নিজের দাবিতে এগিয়ে আসতে পারে না? যেদিন সে দাবি নিয়ে এগিয়ে আসবে : আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে, আমাকে প্রাণের মধ্যে টেনে নেবে, সেদিন তো আমি বাধা দেব না, আপত্তি করব না। বরং ওর ঐশ্বর্যে নিজেকেও...

দূরের শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে আরো কত কি ভাবে মণিকা।

এক্ষুনি যদি ওকে পেতাম তাহলে হয়তো আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতাম না। বাবা-মাকে বলতাম...

সত্যই কি বলতে পারতাম?

কেন বলব না? অন্যায় কিছু নয়।

সম্ভব হলে আজই সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে লাল টকটকে বেনারসি পরে যেতাম ওই ব্রিলিয়ান্ট বলাইয়ের...

বহু অসম্ভবের মতো এটাও সম্ভব হলো না মণিকার। তবে নিজে গেল না। বাবা-মাকে বললে শরীরটা খারাপ।

ডক্টর ব্যানার্জি দু-একবার বললেন। 'তুই বাড়িতে শুয়ে থাকবি আর আমরা নেমন্তন্ন খেতে যাব?'

'তাতে কি হয়েছে? আমি কি কোনোদিন নেমন্তন্ন খাইনি?'

'কিন্তু ও তোর কথা বার বার করে বলেছিল।'

এ-কথার কি জবাব দেবে মণিকা। মনে মনে ভাবল, বার বার করে, বলবে না? কিমানো পরাবার স্মৃতি কি ভুলতে পারে? তাছাড়া হয়তো নতুন করে...

মা বললেন, 'থাক থাক। ও বরং নাই গেল। আজ সকাল থেকেই ওর শরীরটা ঠিক নেই।'

ওঁরা চলে গেলেন। মণিকা ডক্টরের স্টাডিতে গিয়ে বসল। চাকরটা ঘরদোর ঠিক করতে ভিতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে চাকরটা এসে একটু ছুটি চাইল। 'দিদিমণি, আমি একটু ঘুরে আসব?'

হাতের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'যা। তাড়াতাড়ি আসিস।'

'দরজাটা আটকে দেবেন।'

'দিচ্ছি।'

একটু পরে দরজাটা বন্ধ করে আসতে আসতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'কি হলো তুমি এলে না?'

'না।'

'শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু ঘুরে গেলে মন ভালো লাগত না?'

'না।'

'বাড়িতে একলা একলা...'

'খুব ভালো লাগছে।'

'আমি তোমাকে নিয়ে আসব?'

'কেন টোকিও থেকে আবার নতুন কিমানো এনেছেন নাকি?'

আর নয়। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখল মণিকা।

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না ; দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না সেই স্মৃতি। সেই কয়েকটি মুহূর্তের বিন্দু বিন্দু অনুভবের টুকরো টুকরো স্মৃতি। অন্যায় হলেও অবিস্মরণীয়। রিসিভার নামিয়ে রাখলেই কি সেসব ভুলা যায়!

কত প্রশ্ন, পাল্টা প্রশ্ন আসে মনে। সে কথা সবাই জানে, যার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, লজ্জা-ঘৃণার অনুভূতি আর পাঁচজনে ভাগ করে নেয়, তার জন্য বেশি চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু যে কথা যে কাহিনি, যে ইতিহাস বাইরের দুনিয়ার কেউ জানে না, যে আনন্দ বেদনার ভাগ অপরকে দেওয়া যায় না, তা যেন কিছুতেই ভুলা যায় না।

সন্ধ্যায় অন্ধকারটা একটু গাঢ় হলো। শূন্য বাড়িটায় নিঃসঙ্গ মণিকার মনও যেন অন্ধকারে ভরে গেল। চেয়ারে বসে টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে হাতে পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই একবার নিজেকে দেখে। ভালো করে দেখে।

হঠাৎ 'বেল' বেজে উঠল। চারকটা নিশ্চয়ই বিড়ি খেয়ে ফিরে এসেছে। মণিকা উঠল না। চুপ করে বসে বসেই আরো ভালো করে নিজেকে দেখল। নিশ্বাসটা যেন একটু চঞ্চল, বুকের স্পন্দন যেন একটু বেশি জোরে শোনা যাচ্ছে।

আবার বেল বাজল। পর পর দুবার বাজল।

বেশ বিরক্ত হয়ে মণিকা উঠে গেল দরজা খুলতে।

ক্যাপ্টেন? ফিরে এসেছে? মণিকা থমকে দাঁড়ায়, চমকে ওঠে।

'তুমি?'

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েই ক্যাপ্টেন জবাব দেয়, 'সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

ক্যাপ্টেন ভেতরে পা দিয়ে ওর ঠিক সামনে দাঁড়াতেই মণিকা যেন মাতাল হয়ে ওঠে। দুটো হাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, 'কি আশ্চর্য লোক বলতো তুমি।'

ক্যাপ্টেন অবাক না হয়ে পারে না। এই সেই মণিকা? যার গাম্ভীর্য, যার সংযম, যার সংযত আচরণ দেখে সে এক ধাপ এগোতে পারত না, এই সেই মণিকা? হঠাৎ এমন কালবৈশাখীর মাতলামির নেশা চাপল কেন ওর মাথায়?

'কেন বল তো?'

দরজার মুখেই বড় বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুজনে। তবু হুঁশ নেই।

ক্যাপ্টেন হুঁশ ফিরে পায়। 'কি ব্যাপার? বাড়িতে কেউ নেই নাকি?'

'না।'

'কেউ না?'

'না।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'চাকরটাও নেই?'

'না।'

এবার ক্যাপ্টেন নিজেই দরজাটা বন্ধ করে মণিকাকে একটু কাছে টেনে নেয়। হাত দিয়ে মুখটা একটু তুলে ধরে।

'কি হয়েছে?'

মণিকা জবাব দেয় না, দিতে পারে না। সে কি বলতে পারে যে নেকড়ে বাঘটা তাকে একবার আক্রমণ করে পরাজিত করেছিল, যে একবার তার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, যৌবনের উপবন উপভোগ করেছে, সে আশেপাশেই রয়েছে? একথা কি বলা যায়?

ক্যাপ্টেন ডান হাত দিয়ে মণিকার চিকন কোমরটা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠে যায়।

দূরের আকাশে মিট মিট করে তারা জ্বলছে, আশেপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠছে। মণিকার অন্ধকার ঘরে এবার জ্বলে উঠল দুটি হৃদয় প্রদীপ।

মণিকা যেন আত্মসমর্পণের প্রস্তুতিতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নদীর জলে যখন শূন্য কলসি ভরা হয়, তখন বগ্ বগ্ করে কত আওয়াজ, কত বুদ্ বুদ্। যখন ভরে যায়? সব কলরব—কোলাহল স্তব্ধ হয়।

মণিকাও পূর্ণ মন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ক্যাপ্টেনের পাশে।

আরও কয়েকটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার মুহূর্ত কেটে গেল।

অফিসার্স মেসে, ক্লাবে-হোটেলে, পার্টিতে-ডিনারে বা কখনও কখনও মানুষের ভিড় থেকে দূরে, বহু দূরে ক্যাপ্টেন অনেক মেয়ের দেখা পেয়েছে। দেখা পেয়েছে রাজভবনে, দুর্গাপুর স্টিল টাউনের রানিকুঠিতে, জলপাইগুড়ির সার্কিট হাউসে। দেখা পেয়েছে নানা বেশে, নানা রং-এ নানা পরিবেশে! কিন্তু স্তব্ধ পরিবেশে এমন আত্মসমর্পণের নেশায় মশগুল আর কাউকে দেখেনি।

একি সেই মণিকা? নাকি অপারেশন থিয়েটারের পেসেন্ট? ক্লোরোফর্ম করা হয়ে গেছে! সার্জেন যা খুশি...

ক্যাপ্টেন ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয় মণিকাকে। একটু বেশি কাছে। এমন করে আর কোনোদিন কাছে টানেনি। অন্যদিন হলে মণিকা হয়তো লজ্জায় মুখে কিছু বলত না তবে হাতটা নিশ্চয়ই সরিয়ে দিত। সরিয়ে দেবে না কেন? এত অর্থপূর্ণ জড়িয়ে ধরাকে এখনই মেনে নেবে কেন? আজ কিচ্ছু বললে না।

'মণিকা?'

কথা বলে না।

'আজ তোমার কি হয়েছে বলতো?'

আরো কয়েকবার পীড়াপীড়ির পর ছোট্ট জবাব দেয় মণিকা, 'শরীরটা ভালো নেই।'

'শরীর না মন?'

জবাব আসে না এ প্রশ্নের।

'তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড় ক্লান্ত।'

মণিকা আবার চুপ করে যায়।

দুটো বালিশ টেনে ক্যাপ্টেন এবার মণিকাকে শুইয়ে দেয়। একটু হাত বুলিয়ে দেয় ওর মাথায়, মুখে।

মণিকা এবার ক্যাপ্টেনের হাতটা নেয় দুহাতের মধ্যে।

'ক-দিন ধরেই তোমার কথা ভাবছি।'

ক্যাপ্টেন খুশি হয়। 'কেন?'

সে কথার জবাব দেয় না মণিকা। শুধু বলে, 'তুমি আমাকে খুব ভালোবাস, তাই না?'

ক্যাপ্টেনের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'তাই নাকি?'

সেই আবছা অন্ধকারেই জানালা দিয়ে ঠিকরে পড়া সামান্য আলোতেই দেখা গেল মণিকার মুখেও বেশ একটা চাপা তৃপ্তির হাসি।

'তুমি এত ভালো কেন বলতো?'

'তুমি খারাপ হতে দাও না বলে।'

'যদি কোনোদিন না দিই?'

'তোমারই লোকসান'

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মণিকা বললে, 'ঘোড়ার ডিম!'

হঠাৎ খুব জোরে বেল বেজে উঠল। চমকে উঠল দুজনে।

মণিকা তাড়াতাড়ি উঠে বসে আলতো করে খোঁপাটা বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'চাকরটা এসেছে নিশ্চয়ই।'

প্রায় সারা বাড়ি অন্ধকার। শুধু নিচের বারান্দায় একটা আলো। দুজনেই একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো।

ক্যাপ্টেন চলে গেল ডক্টর ব্যানার্জির স্টাডিতে। মণিকা টেবিল ল্যাম্পটার সুইচ টিপেই দরজা খুলতে চলে গেল।

দরজা খুলেই মণিকা চিৎকার করে বললে, 'এই তোর এক্ষুনি আসা হলো? তাড়াতাড়ি দুকাপ কফি কর।'

মণিকা স্টাডিতে আসতেই ক্যাপ্টেন বললে, 'তুমি তো দারুণ মেয়ে!'

একটু অবাক হয়ে মণিকা জানতে চাইল, 'কেন?'

ক্যাপ্টেন সে কথার জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তোমাকে দেখে যতটা সহজ-সরল মনে হয় তুমি তা না।'

মণিকার মনে খটকা লাগে। ওর অতীত জীবনের কোনো ইঙ্গিত পেল নাকি?

একটু চিন্তিত হয়ে ভ্রু কুঁচকে মণিকা জানতে চাইল, 'এতদিন পর হঠাৎ একথা বলছ?'

'নিজের অন্যায় ঢাকা দেবার জন্য চাকরটাকে বেশ সুন্দর ধমক দিলে তো!'

মণিকা আশ্বস্ত হয়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, 'অন্যায় আমার না তোমার?'

'আমি কি অন্যায় করলাম?'

'আমাকে একলা পেয়ে তোমার এমন সময় আসাটাই অন্যায় নয়?'

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন জবাব দিল, দরজা দিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই তুমি গলা জড়িয়ে ধরবে বলেই তো এলাম।'

রবিশঙ্করের সেতারের সঙ্গে এ যেন আল্লারাখার তবলা! যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব।

টেবিলের ওপাশ থেকে মণিকা এ-পাশে এসে দুহাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের মুখটা চেপে ধরে বলে, 'বার বার বললে আর কোনোদিন অমন করে কাছে টেনে নেব না।'

মণিকার হাতটা সরিয়ে ক্যাপ্টেন একটু চাপা গলায় জানতে চাইল, 'বার-বার না বললে রোজ রোজ অমন করে আদর করবে তো?'

'জানি না।'

কফি এলো। ঘরের কোণায় বড় সোফাটার সামনের টেবিলে কফির কাপ দুটো নামিয়ে রেখে চাকরটা জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমণি কিছু খাবেন?'

'না।'

'সারাদিনই তো কিছু খেলেন না।'

'তুই যা। তোর আর মাতব্বরি করতে হবে না।'

চাকরটা চলে গেল।

'কি ব্যাপার খাওনি কেন?'

'তোমার জন্য।'

'আমার জন্য?'

'আবার কি? তুমি একলা একলা স্ফুর্তি করবে, ঘুরে বেড়াবে আর আমি এখানে একলা-একলা...'

মণিকা আর বলতে পারে না।

নিঃসঙ্গতার এত বেদনা? ক্যাপ্টেন জানত না, ভাবত না।

'মাসিমা-মেসোমশাই কোথায়?'

'নেমন্তন্নে গেছেন।'

'তুমি গেলে না?'

'না।'

'কি বললে?'

'বললাম শরীর খারাপ।'

ক্যাপ্টেন একটু ভাবল। কফির কাপে একবার চুমুক দিল।

'চল একটু ঘুরে আসবে।'

'এখন?'

'হ্যাঁ।'

'ফিরতে ফিরতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'কখন ফিরতে চাও?'

'কিন্তু বাবা-মা'র সঙ্গে বেরুলাম না...'

শেষ পর্যন্ত সেদিন আর বেরুল না। ঠিক হলো পরের দিন বেরোবে। ক্যাপ্টেন হাতের প্যাকেটটা মণিকাকে দিয়ে বললে, 'এটা মাসিমাকে দিও।'

ক্যাপ্টেন ফিরে এল রাজভবনে। বড় কৌচটায় হেলান দিয়ে শুয়ে-শুয়ে পরপর দুটো

সিগারেট খেল।

চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে কত কি ভাবছিল ক্যাপ্টেন। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেও বুঝতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর বিরাট ট্রে করে আমজাদ ডিনার নিয়ে এসে দেখল এ-ডি-সি সাহেব ঘুমোচ্ছেন। দু-একবার ডাকল। শেষ পর্যন্ত জবাব না পেয়ে আবার ওই ট্রে নিয়েই ফিরে গেল।

ক্যাপ্টেন ঘুমিয়ে পড়ে। হারিয়ে ফেলে সারাদিনের স্মৃতি। সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনা সোহাগ-ভালোবাসার স্মৃতি।

মণিকা?

দোতলার ওর ঘরে শুয়ে শুয়ে দূরের আকাশের অজস্র তারা দেখে আর হারিয়ে যায় নিজের স্মৃতির অরণ্যে। ঘুমোতে পারে না। কিছুতেই না। অনেক চেষ্টা করেও পারে না। ভাবে। কত কিছু, কত কিভাবে। আকাশ-পাতাল ভাবে।

ভাবে ক্যাপ্টেনকে। নিশ্চয় পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জিটা পরে উপুড় হয়ে দুটো বালিশ জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। নাকি ওই মোটা মোটা খাকির ইউনিফর্ম পরেই ঘুমোচ্ছে? কিচ্ছু বিচিত্র নয়। হয়তো ঘামে সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে গেছে! হয়তো...

ভীষণ অস্বস্তিবোধ করে মণিকা। এপাশ-ওপাশ করল কয়েকবার। একবার উঠে বসে। বিছানা ছেড়ে একবার জানালার ধারে দাঁড়ায়!

দূর থেকে একটা তারা ছিটকে পড়ল? নাকি চোখের ভুল?

মনটা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলেও মনটা ছটপট করে।

ও কি খেয়েছে?

ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে নিজেই মাথা নেড়ে বলে না, না। এতদিনের ট্যুরের পর আজই ফিরেছে। ফিরেই তো চলে এসেছে আমার কাছে। রাজভবনের ফিরতে ফিরতেও বেশ রাত হয়ে গেছে। এত ক্লান্তির পর আর কি ইউনিফর্ম ছেড়ে স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করতে পেরেছে?

নিশ্চয়ই অত ঝামেলার মধ্যে যায়নি। বড় কৌচটায় কাত হয়ে সিগারেট খেতে খেতে ঘুম এসে গেছে।

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

কতদিন দুপুরে গিয়ে দেখেছে সিগারেট খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেছে কার্পেটের ঠিক পাশেই। আচ্ছা যদি কার্পেটের উপর পড়ত? কার্পেটে আগুন লাগলে কি সর্বনাশ হতো বলো তো?

মণিকা ভীষণ রেগে যেত।

ক্যাপ্টেন হাসত। হাসতে হাসতেই ও মণিকার গাল দুটো চেপে ধরে বলত, 'জ্বলব না বলেই তো ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

'বাজে বকো না।'

'বাজে না মণিকা। তা না হলে ঠিক এই সময়েই এখানে আসবে কেন?'

সেকথা ভেবে মণিকা আর শান্তি পায় না। দূরের আকাশের ওই তারাগুলো যেন হঠাৎ একটু বেশি দপ্‌দপ্ করে জ্বলতে শুরু করেছে।

জানালার কাছে সরে আসে কিন্তু বিছানাতেও ফিরে যেতে পারে না। পায়চারি করে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু এখন এই রাত্রিতে কে ওর ঘরে গিয়ে দেখবে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কিনা? বেয়ারা-চাপরাশীরাও তো আর এখন ওর ঘরে যাবে না।

হা ভগবান। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মণিকা। কি বিশ্রী অশান্তি!

বিছানার উপর বসে বসে এবার ভাবে। হঠাৎ নিজের উপরই রাগ হয়। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। এতদিন পর কত ক্লান্ত হয়ে এলো। তবুও তো আমি ওকে কিছু খেতে দিলাম না। নিশ্চয়ই ভীষণ খিদে পেয়েছিল। শুধু এক কাপ কফি খাইয়েই...

আচ্ছা ও কি ভেবেছিল এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে? এমন সময় এলে তো মা কোনোদিন না খাইয়ে ছাড়েন না! তাছাড়া ও তো জানত না মা নেমন্তন্নে গেছেন। আমজাদ-রমজনেকেও হয়তো বলে এসেছিল ডিনার খাবে না।

দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে চুপচাপ বসে থাকে মণিকা। চুপচাপ বসে থাকলেও মনের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন চলে অবিশ্রান্ত ধারায়।

কি বিশ্রী অশান্তি! ষোল আনা দুশ্চিন্তা আছে, সে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতাও আছে কিন্তু নেই সে সুযোগ। এক বিচিত্র অনুভূতি। সব কিছু থেকেও কিচ্ছু করার নেই।

আচ্ছা একবার টেলিফোন করলে হয় না? নিজে যখন যেতে পারছি না তখন অন্তত টেলিফোনেও বলতে পারি, ইউনিফর্ম পরেই ঘুমোচ্ছ নাকি? পায়ের জুতো-মোজাও নিশ্চয়ই...

শেষে বলতে পারত, আর কত কাল আমাকে এমন দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হবে বলতে পার?...

কিন্তু টেলিফোন তো নীচে। পাশের ঘরেই বাবা-মা ঘুমোচ্ছেন। বারান্দার কোণায় তো আবার চাকরটা শুয়ে থাকে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে না হয় নীচে গেলাম। তবুও টেলিফোন করতে হলে তো আলো জ্বালাতেই হবে। তাছাড়া ও ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ। বাইরের একটু আবছা আলো আসারও পথ নেই।

আলো জ্বাললেই তো জানাজানি হয়ে যাবে। চাকরটা উঠে পড়বে, বাবা-মা টের পেতে পারেন। কি কৈফিয়ত দেব ওদের?

অন্ধকারে টেলিফোন করতে পারব না? কোনো কিছুতে ধাক্কাটাক্কা খেয়ে পড়ব না তো? তাহলে তো আরো কেলেঙ্কারি! বাড়িতে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

আর যেন ভাবতে পারে না। মণিকা ছটপট করে। বিছানা ছেড়ে আবার জানালার ধারে দাঁড়ায়। চারধারে তাকিয়ে দেখে। নিস্তব্ধ পৃথিবী। দিনের অশান্তি, দাপাদাপি নেই। বাতাসে আগুনের হলকা নেই। দিনের বেলায় অজস্র লালসার মোহে পাগলের মতো যারা ছুটে বেড়ায়, তারাও ঘুমোচ্ছে। দীন-দরিদ্রের দল সারাদিন ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করেছে, দিনের শেষে কোনোমতে একমুষ্টি অন্ন পড়েছে ওদের পেটে কিন্তু এই গভীর রাত্রিতে তারাও ঘুমোচ্ছে। কেউ প্রাসাদে, কেউ ফুটপাথে। তা হোক না। চিন্তা-ভাবনা-দুশ্চিন্তা থেকে এখন সবার ছুটি। ঠগ-জোচ্চোর লম্পট-বদমাইশরাও আর জেগে নেই।

দরজা খুলে ছাদে বেরিয়ে আসে মণিকা। একবার বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে। না, ওদের ঘরেও আলো জ্বলছে না। বৌদি তাহলে রোগের জ্বালা থেকেও একটু ছুটি পেয়েছেন,

একটু ঘুমিয়েছেন।

অন্যদিন যখনই ঘুম ভেঙেছে, তখনই দেখেছে ওদের ঘরে আলো জ্বলছে। একেবারে শেষ রাত্তিরের দিকেই তো উনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। তবে কি রাত অনেক হলো?

ছাদের এদিক-ওদিক ঘুরে মণিকা আবার ফিরে আসে ঘরে। ওই জানালার ধারে। একটু দাঁড়ায়, একটু পায়চারি করে, আবার একটু বসে।

তবে কি একবার আলো না জ্বালিয়েই পা টিপে টিপে নেমে যাব? খুব আস্তে আস্তে ফিসফিস করে কথা বললে কি কেউ শুনতে পাবে?

শেষ পর্যন্ত অন্ধকারেই পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। শেষ ধাপ পর্যন্ত নেমে গেল কিন্তু বারান্দায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। চাকরটা কোথায় শুয়ে আছে? এই এত রাত্রে এত অন্ধকারে যদি চাকরটার উপর গিয়ে পড়ে? তাহলে ও কি ভাববে?

তাছাড়া...

তাছাড়া আবার কি? ও যদি বলাইদার মতো মুহূর্তের জন্য পাগল হয়ে ওঠে? কিচ্ছু বলা যায় না। হাজার হোক পুরুষ! ঠিক জোয়ান না হলেও প্রৌঢ় নয়। বড় সর্বনাশা বয়স। এই রাত্রের অন্ধকারে ও নিজেকে বাঁচাবে কেমন করে? লজ্জায় চিৎকার পর্যন্ত করতে পারবে না।

ফিরে যাব? নীচে এসেও ফিরে যাব?

আবার আস্তে আস্তে উপরে উঠে যায় মণিকা। পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে একটু কাত হয়ে বসে বিছানায়। ঠিক করল ভোর হতে না হতেই টেলিফোন করবে ক্যাপ্টেনকে। তারপর দেখা হলে বলবে, যাকে ভালোবাস তাকে কাছে টেনে নেবার পৌরুষটুকুও তোমার নেই?

মনে মনে রিহার্সাল দেয় মণিকা।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। চাকরটার ডাকাডাকিতে।

চোখ মেলেই চাকরটাকে দেখে চমকে উঠে মণিকা! মুহূর্তের জন্য রাত্রের বিভীষিকার কথা মনে আসে।

পাশ ফিরতেই এক টুকরো রোদ্দুর চোখে এসে পড়ায় হুঁশ ফিরে আসে।

'চা এনেছিস?'

'হ্যাঁ এইতো।'

'রেখে যা।'

পাশ ফিরে শুয়ে চায়ের কাপে এক চুমুক দিতে না দিতেই মা এসে বললেন, 'হ্যাঁরে তোর টেলিফোন।'

'আমার টেলিফোন?'

মা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তোর টেলিফোন। তাড়াতাড়ি আয়।'

পুরো চা না খেয়েই নেমে গেল মণিকা।

'হ্যালো...'

'কিরে তোর যে কোনো পাত্তাই নেই?'

ক্যাপ্টেন নয়?

'কে বলছিস?'

'আজকাল কথা শুনেও বুঝতে পারিস না?'

সত্যি বুঝতে পারেনি মণিকা। একে ঘুম থেকে উঠেছে, তারপর ভেবেছিল গভর্নমেন্ট হাউস থেকে ফোন এসেছে। তাছাড়া ভিক্টোরিয়ার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ নেই বললেই

চলে। কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, তার ঠিকঠিকানাই নেই। দুচারজন ছাড়া আর কেউ কলকাতা নেই। আরতির সঙ্গে কদিন আগেই হঠাৎ দেখা হয়েছিল। তারপর ও কয়েকদিনের জন্য আবার দার্জিলিং চলে গিয়েছিল।

'ঘুম থেকে উঠেই তোর টেলিফোন ধরতে এলাম আর তুই বকতে শুরু করেছিস?'

'এখন ঘুম থেকে উঠলি?'

'তবে কি? আমি কে তোদের মতো প্রিজনার হয়ে গেছি?'

'ওসব বীরত্ব অন্যকে দেখাস। বল, কখন আসছিস?'

'তুই আয় না।'

'না, না তুই আয়। অনেক কথা আছে।'

মণিকা উত্তর দেবার আগেই আরতি আবার বলে, 'দেরি করবি না কিন্তু? আর মাসিমাকে বলে আসিস কখন ফিরবি ঠিক নেই।'

'তার মানে?'

'আয় না! দুজনে বেরিয়ে পড়ব।'

'নট এ ব্যাড আইডিয়া বাট...'

আরতি আর কথা বাড়ায় না। 'আর বকতে পারছি না, তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রাখার পর মণিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। কাল রাত্তিরের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল উৎকণ্ঠা ভরা প্রতিটি প্রহরের কথা, প্রতিটি মুহূর্তের বেদনা, জ্বালা।

ভেবেছিল ভোরবেলায় উঠেই ফোন করবে, দরকার হলে একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসবে।

ভোরবেলায় সম্ভব না হলেও একটু বেলা হলে নিশ্চয়ই যেত কিন্তু...

আরতির টেলিফোন এসেই সব গোলমাল হয়ে গেল। তবে...

হয়তো মনটা একটু হালকা হবে। একটু হাসি ঠাট্টা করে কিছু সময় কাটবে। নিজের কাছ থেকে নিজেকে আর এমন করে লুকিয়ে রাখতে হবে না। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

তাছাড়া আরতি ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ভিক্টোরিয়ায় পড়ার সময় ওরা পাশাপাশি ঘরে থাকত। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হলেই মাঝে মাঝে চলে যেত ওই লনের কোণায়। কত কথা, কত গল্প, গান হতো দুজনের।

বাংলার লেকচারার প্রফেসর রায়চৌধুরি আরতিকে একটু বেশি খাতির করতেন বলে অনেকেই সন্দেহ করত। ঠাট্টা তামাসাও করত। আরতি সবার কাছে স্বীকার করতে চাইত না কিন্তু রাত্রিবেলায় লনের ওই কোণায় বসে মণিকার সঙ্গে গল্প করতে করতে জানতে চাইত, 'আচ্ছা মণিকা তোর কি মনে হয় রে?'

'আগে বল তোর কি মনে হয়?'

হঠাৎ আরতি চঞ্চল হয়ে উঠত, 'জানিস আজকে কি হয়েছে?'

'কি?'

'আমি লাইব্রেরির ওই ভেতরের ঘরটায় একটা রেফারেন্স বই দেখতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা...'

'ওখানে আর কেউ ছিল?'

'না!'

'তোকে কিছু বললেন নিশ্চয়ই।'

'হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'চেহারাটা প্রতিদিনই আরো বেশি সুন্দর হচ্ছে,

এবার পড়াশুনাটাও একটু...'

মণিকা উত্তেজনায় আরতির হাতটা চেপে ধরে বলল,

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।'

সে সব দিনের কথা মনে হতেই মণিকা আপন মনে হাসতে হাসতে বার্মিজ ছাতাটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

হাসিমুখেই আরতি অভ্যর্থনা করল। ওটাই ওর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আরতির। একে সুন্দরী তারপর হাসি-খুশি। চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত! হয়তো প্রফেসর রায়চৌধুরিকেও। হয়তো আরো কাউকে। বা অনেককেই। পিছলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়েছে। সব সময়ই?

প্রাণ খুলে হাসতে হাসতেই সব কথা বলত মণিকাকে। আরতির সব কিছু মেনে নিতে পারত না। তবুও ভালো লাগত, ভালোবাসত।

'এখনও কি সবার কাছেই এমন হি-হি করে হাসিস্?'

'হাসব না কেন?'

'এত রূপ আর এত হাসি, ভালো না! কোনোদিন যে বিপদে পড়বি!'

দরজা দিয়ে বারান্দায় পা দিয়েই মণিকা বলল।

আরতি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিপদে যে পড়িনি সেকথা তোকে কে বলল?'

'পড়েছিস?'

'পড়ব না?'

'কার কাছে রে?'

আরতি এবার মোড় ঘুরতে চায়, চল চল, উপরে চল।

'আগে বল কার কাছে বিপদে পড়েছিস।'

'আঃ তুই উপরে চল না!'

'আই উইল নট মুভ অ্যান ইঞ্চ আনলেস...'

আরতি হাসতে হাসতে, মণিকার কানে ফিসফিস করে বলল, 'যদি বলি তোর বলাইদা!'

'বলাইদা।' প্রায় আঁতকে ওঠে মণিকা।

'কেন বলাইদা কি ভগবান?'

কোন জবাব দেয় না মণিকা। মুহূর্তের জন্য যেন পাথর হয়ে গেছে। মাথাটা যেন ঘুরে উঠল।

আরতি একটু পরে আবার বলল, 'তোর তো ধারণা বলাইদা একটা ডেমি-গড। বাট আই সে হি ইজ জাস্ট এ ম্যান।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কোনো কথা হলো না। সিঁড়ি দিয়ে আরতির বড়দা নেমে এলেন, 'কেমন আছ মণিকা?'

অনেকদিন পর বড়দাকে দেখে ভালো লাগল। সব চাইতে ছোট বোনের বন্ধু বলে স্নেহ করতেন ওকে।

মণিকা তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করল। 'ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন।'

'ভালোই আছি, তবে বয়স হয়েছে তো!'

বড়দা শেষে বললেন, 'এখন অফিস যাবার সময়। কথাবার্তা বলতে পারলাম না। আর একদিন

এসো।'

'আসব।'

বড়দা গাড়িতে উঠে চলে গেলেও মণিকা ওই দিকেই চেয়ে রইল।

'কি রে কি দেখছিস?'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে মণিকা উত্তর দেয়, 'কিচ্ছু না।'

'তবে ওদিকে চেয়ে আছিস যে?'

'ভাবছি...'

'কি ভাবছিস?'

'বড়দার কথা।'

আরতি কিছু বলল না। বড়দাকে ওরা সবাই ভীষণ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

উপরে থেকে আরতির মা ডাক দিলেন, 'কি রে তোরা ওপরে আসবি না?'

আর দেরি করে না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল দুজনেই।

আরতির মাকে প্রণাম করে মণিকা চলে গেল ওই বহুদিনের পরিচিত কোণার ঘরে। আরতির ঘরে। কতদিন কাটিয়েছে এই ঘরে। কত স্মৃতি জমে আছে এই ঘরে!

ঘরে ঢুকেই মণিকা দরজা বন্ধ করল।

'দরজা বন্ধ করছিস কেন?'

মণিকা সে কথার জবাব না দিয়ে আরতিকে টেনে এনে পাশে বসাল!

'বলাইদার কথা তো আগে বলিসনি?'

'তুই কি জানতে চেয়েছিস?'

লুকিয়ে চুরিয়ে কথা বলার বালাই নেই আরতির। 'তাছাড়া ভিক্টোরিয়া ছাড়ার পরই তো রেঙ্গুনে চলে গেলি...'

সব কথা খুলে বলেছিল আরতি। সেফ ডিপোজিট ভল্ট বা ফিক্সড ডিপোজিটে ওর বিশ্বাস নেই। ইন্টারেস্ট নেই। আরতি যেন জীবন্ত কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। জীবনের সম্পদ গচ্ছিত রাখে না, সঙ্গে সঙ্গে চেক কেটে উইথড্র করে বলে দেয় বন্ধুদের। মণিকাকে।

'বি-এ পাশ করার পরই বড়দা কলকাতা এসে গেলেন। আমি এখান থেকেই ইউনিভার্সিটি যাতায়াত করতাম। একদিন...'

কী ভীষণ বৃষ্টি হলো! ট্রাম-বাস তো দূরের কথা মানুষের হাঁটা চলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ওই টিপ-টিপ বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে একদল চলে গেল ওয়াই-এম-সি-এ রেস্টুরেন্টে। আরতি, শুভ্রা, জয়া আর সঙ্ঘমিত্রা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল মেট্রো। মার্লিন ব্র্যান্ডোর 'টি হাউস অফ দি আগস্ট মুন' দেখতে।

ইন্টারভ্যালের সময় ইনার-লবিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পপকর্ন খাবার সময় হঠাৎ বলাইদার সঙ্গে দেখা।

'আরে বলাইদা যে।'

বলাইদা খুশি হলেন আরতিকে দেখে। 'ভুলে যাওনি দেখছি!'

'ভিক্টোরিয়ায় পড়বার সময় আপনার এত চকলেট-কেক-পেস্ট্রি খাবার পরও ভুলে যাব?'

আরতি আলাপ করিয়ে দিল, এরা আমার বন্ধু। শুভ্রা, জয়া, সঙ্ঘমিত্রা। সবাই একসঙ্গেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি।

এবার বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'আওয়ার ইউনিভার্সাল বলাইদা! আসলে মণিকার বলাইদা

হলেও উই হ্যাভ এনজয়েড হিজ জেনরসিটি টু অফন্।'

'ডোন্ট সে অল দিস্।'

সিনেমা শেষ হবার পর বলাইদা ওদের চারজনকে নিয়েই গ্রান্ডে গেলেন। ওর ঘরে। চ-কফি-স্ন্যাকস-এ সেন্টার টেবিল ভরে গেল।

জয়া বলল, 'এই এত?'

আরতি সাবধান করে দেয়, 'ডোন্ট আর্গু! বলাইদা গত জন্মে আমাদের ঠাকুমা ছিলেন। তাই একটু ভালো করে না খাইয়ে শান্তি পান না।'

আরতি হাসে। বলাইদা ওর মাথাটা ধরে একটা ঝুঁকুনি দিয়ে বললেন, 'হাসতে শুরু করলে তো!'

আবার হাসতে হাসতে আরতি বলে, 'দিন, দিন একটু ভালো করে মাথাটা ধরে ঝাঁকুনি দিন তো! আপনার মতো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট-এর হাতে ঝাঁকুনি খেয়ে যদি ব্রেনটা একটু সতেজ হয়।'

কয়েকদিনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন বলাইদা। চা-কফি খাইয়ে বিদায় দেবার সময় বললেন, 'কালকে একবার টেলিফোন করবে তো?'

'কখন?'

'এনি টাইম ইউ লাইক।'

পরের দিন দুপুরের দিকে একটা ক্লাশ করেই আরতি ইউনিভার্সিটি থেকে চলে গিয়েছিল বলাইদার হোটেলে। বেশ লাগল। এত বড় হোটেলে আসার একটা রোমাঞ্চ আছে বৈকি! ছাত্রজীবনে যে আনন্দ, যে সম্মান পাবার নয়, আরতি তাই পেয়েছে। খুব খুশি।

সেই চির-পরিচিত হাসিটি সারা মুখে ছড়িয়ে বলাইদাকে বললে, 'এসে গেছি তো?'

একটু আদর করে বলাইদা বললেন, 'এই হাসিটুকু এনজয় করার জন্যই তো আসতে বলেছি।'

আরতি আরো খুশি হয়।

তারপর লাঞ্চ। ওই ঘরে বসেই। ঠিক খিদে না থাকলেও আরতি বিশেষ আপত্তি করল না। খেতে খেতে হাসি-ঠাট্টা।

'তোমার হাসি আমি মুভিতে তুলে রাখব।'

'মুভিতে?'

মুভিতে আরতিকে ধরা হলো। তার হাঁটা-চলা ওঠা বসা! সব কিছু।

'একেবারে ওই কোণা থেকে একবার জোরে জোরে এদিকে এসো তো।'

'এবার টায়ার্ড হয়ে গেছি। আর পারছি না।'

'এখনই টায়ার্ড?'

'কাল বৃষ্টিতে ভিজে সারা শরীরটা বেশ ব্যথা হয়েছে।'

'ব্যথা?' বলাইদা মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন। 'সেকথা আগে বলোনি কেন?'

'...জানিস মণিকা, এক গেলাস গরমজলে কি একটা ওষুধ মিশিয়ে বলাইদা আমাকে খেতে দিলেন। বললেন পনের-বিশ মিনিট রেস্ট নাও। সব সেরে যাবে।'

'তারপর?' মণিকা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে থাকতে জানতে চায়।

'আস্তে আস্তে ঔষুধটা খেলাম। সারা শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠল। আর শুরু হলো আমার হাসি। কথায় কথায় হাসি। আমি বেশ বুঝতে পারলাম বলাইদা আমার কাছে এসেছেন, কথায় কথায় আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন, আদর করছেন...'

'তুই কিছু বলছিলি না?'

'না। কেমন যেন একটা নেশার ঘোরে মজা লাগছিল। তাছাড়া কথায় কথায় এত হাসি পাচ্ছিল যে কি বলব?...

'তোকে কি হুইস্কি-টুইস্কি খাইয়েছিলেন?'

'তা জানি না রে। বোধহয় ব্র্যান্ডি! নিশ্চয়ই ডোজটা বেশ বেশি ছিল আর তাই আমার নেশা হয়েছিল।'

আরতি একটু থামে। একবার ভালো করে মণিকাকে দেখে নেয়।

'আমার' পর খুব ঘেন্না হচ্ছে, তাই না?'

মণিকা একটু হাসে। বোধহয় একটু কষ্ট করেই হাসে। 'ঘেন্না হবে কেন?' যে বন্ধু এমন গোপন কথা খুলে বলতে পারে, তার' পর রাগ হয়?'

আরতি আবার শুরু কর।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সারা শরীর দিয়ে আগুন বেরোতে শুরু করল। নিজেই বোধহয় কিছু কাপড়-চোপড় সরিয়ে বড় কৌচটায় শুয়ে পড়লাম। মনে আছে বলাইদা আমাকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন...'

'হতচ্ছাড়ি মেয়ে কোথাকার!' মণিকা যেন স্বগতোক্তি করে।

আরতি খিল খিল করে হাসে। 'কি করব বল? আই ওয়াজ হেলপ্‌লেস।'

'থাক থাক! আর শুনতে চাই না তোর কীর্তি।'

'খুব রেগে গেছিস তো?'

'রাগব কেন?'

'আমার কীর্তি-কাহিনি শুনে রাগ হয়নি?'

'না।'

'তবে অমন করে কথা বলছিস কেন?'

তাইতো? মণিকা নিজেই যেন একটু অবাক হয়। হাত দিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে বাইরের শূন্য আকাশ দেখতে দেখতে উত্তর দিল, 'হয়তো দুঃখে।'

'কিসের দুঃখ কার জন্য দুঃখ?'

'তোর জন্য। হয়তো বলাইদার জন্যও।'

আরতি এবার একটু সিরিয়াস হয়।

'দ্যাখ মণিকা, একটা কথা বলি। এমনি টুক-টাক অ্যাকসিডেন্ট বহু মেয়ের জীবনেই ঘটে কিন্তু আমরা স্বীকার করতে পারি না। স্বীকার করতে চাই না...'

মণিকা প্রতিবাদ করে। কিন্তু ঠিক আগের মতো জোর করে নয়। 'তুই যেন সব মেয়ের কথা জানিস!'

'সবার কথা না জানলেও ভিক্টোরিয়া আর ইউনিভারসিটির কিছু মেয়ের কথা জানি...'

মণিকার মনে দ্বিধা আসে। আর এসব আলোচনা করতে চায় না। 'এই সবই আলোচনা করবি নাকি বেরুবি।'

আরতি উঠে দাঁড়ায় 'দাঁড়া। কিছু খাওয়া-দাওয়া করি। তারপর তোর কথা শুনি!'

'আমার আর কি কথা শুনবি?'

'গতবার তো শুধু ফটোটা দেখিয়েই পালিয়ে গেলি। কিছুই তো শোনা হলো না।'

'শোনাবার মতো এখনও কিছু হয়নি!'

'লুকোবার মতো কিছু না হলেও শোনাবার মতো নিশ্চয়ই অনেক কিছু হয়েছে।'

একটু লজ্জা, একটু দ্বিধা এলেও আরতির মতো বন্ধুকে কিছু না বলে শান্তি পাচ্ছিল না মণিকা।

'জানিস আরতি আমি যেন মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। ঠিক ভালো লাগছে না। তাছাড়া...'

'তাছাড়া কি?'

'ও এমন একলা একলা থাকে যে বড় দুশ্চিন্তা হয়। কাল সারারাত তো ঘুমোতেই পারিনি।'

'কেন?'

'নানা কারণে।'

আরতি হাসে। বলে, 'যাই বলিস খুব ইন্টারেস্টিং হাজব্যান্ড হবে তোর। একবার আলাপ করিয়ে দিবি না?'

ঠিক লাঞ্চ টাইমে মণিকা রাজভবনে টেলিফোন করল।

'কি, খেতে বসেছ?'

'না। একটু দেরি আছে।'

'আমি আসব?'

'বারণ করেছি কোনোদিন?'

'লাঞ্চ খেয়েই তো আবার গভর্নরের কাছে দৌড়বে?'

'ইউ আর মোর ইম্পার্ট্যান্ট দ্যান গভর্নর টু মি।'

'তাইতো কেবল ট্যুর করে করে ঘুরে বেড়াও।'

আরতি হঠাৎ টেলিফোনটা কেড়ে নেয় মণিকার হাত থেকে।

'গুড আফটারনুন। আমি আরতি। মণিকার সঙ্গে আমিও থাকতে পারি তো?'

'উইথ প্লেজার।'

নর্থ গেট পুলিশ অফিসের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল! মণিকা একবার বাইরের দিকে মুখ বাড়াতেই সার্জেন্ট হাত নেড়ে ট্যাক্সিকে ভিতরে যেতে বলল। মার্বেল হলের সামনে পোর্টিকোতে ট্যাক্সি থামতেই একজন বেয়ারা এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল, মণিকা ব্যাগ থেকে টাকা বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে ফিরতেই দু'জন বেয়ারা সেলাম দিল। লিফট-এর সামনে আসতেই লিফট্-ম্যানও সেলাম দিল।

মণিকাকে নিয়ে ফিস ফিস আলোচনার দিন শেষ হয়েছে রাজভবনে। নর্থ গেট পুলিশ অফিস থেকে শুরু করে সমস্ত বেয়ারা চাপরাশী-লিফট্ম্যানরাই চিনে গেছে মণিকাকে। আমজাদ, রমজান থেকে নটবর সবার সঙ্গেই ওর বেশ ভাব। ক্যাপ্টেন হঠাৎ কাজে বেরিয়ে গেলে মণিকা তো ওদের সঙ্গেই গল্প করে।

লিফট্-এ উঠতেই মণিকা বলল, 'কি নটবর, তোমার ছেলের মুখে ভাত দেবে কবে?'

নটবর কৃতজ্ঞতায় প্রায় গলে যায়। 'আর আমাদের ছেলের আবার মুখে ভাত!'

'আঃ। ওসব কথা বলে না। দিন ঠিক করে আমাকে খবর দিও।'

নটবর আর উত্তর দিতে পারে না। লিফ্ট-এর দরজা খুলে দিয়ে মুখ নীচু করে শুধু মাথাটা কাত করে।

করিডোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে আরতি বললে, 'তুই তো বেশ জমিয়েছিস!'

দরজা নক্ করে ভিতরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন অভ্যর্থনা করল, 'আসুন, আসুন।'

মণিকা আলাপ করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু আরতি। ভিক্টোরিয়ায় একসঙ্গে পড়তাম। তারপর এম-এ পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গেল।'

ক্যাপ্টেন মণিকাকে একটু শাসন করল, 'পুরো নামটা না বললে কি আলাপ করানো হয়?'

মণিকা উত্তর দেবার আগেই আরতি বললো, 'আমি মিসেস আরতি সরকার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

বড় কৌচটায় ওরা দু'জনে আর ছোট কৌচে ক্যাপ্টেন বসল।

'মিঃ সরকার কি কলকাতাতেই থাকেন?'

মণিকা বললে, 'না উনি কার্শিয়াং-এর ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার।'

'হোয়াট এ লাকি গার্ল? ইন্ডিয়াতে থেকেও সারা বছর কন্টিনেন্টাল ক্লাইমেট এনজয় করেন?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আরতি জবাব দেয়, 'হ্যাঁ! তা বটে! দ্বারভাঙা বিল্ডিং ছেড়ে ডি-এফ-ও'র বাংলো! তাছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কফিহাউস বা বেকার ল্যাবরেটরির মাঠে আড্ডা না দিয়ে কিছু চোর-জোচ্চোর কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে নিত্য সন্ধ্যা কাটান নট এ ব্যাড থিং।'

একটু থেমে আরতি হাসতে হাসতে বলে, 'তাই না?'

মণিকা একটু শাসন না করে পারে না। 'আলতু-ফালতু বকবি না তো আরতি। তোর মতো সুখে কটা মেয়ে থাকে বল তো?'

'সুখ?' আরতি মুহূর্তের জন্য সিরিয়াস হয়। পরমুহূর্তে রং বদলায়। হাসতে শুরু করে। 'এক্সকিউজ মি ক্যাপ্টেন রয়, আপনি কি আমাদের লাঞ্চ খাওয়াবেন?'

'একশো' বার। উইথ প্লেজার, বাট...'

মণিকা জিজ্ঞাসা করল, 'আমজাদ কোথায়?'

'একটু বাইরে পাঠিয়েছি। এক্ষুনি আসবে।'

'কিছু আনতে পাঠিয়েছ।'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

ক্যাপ্টেন উঠে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম এনে মণিকার হাতে দিল। 'আজ সকালেই মা-র কাছ থেকে পেলাম...'

'তোমার আজ জন্মদিন?'

'হ্যাঁ।'

আরতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা এগিয়ে দিল, 'উইস ইউ বেস্ট অফ লাক ক্যাপ্টেন।'

হাসি মুখে হ্যান্ডসেক করে ক্যাপ্টেন বলল, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

মণিকা আবার প্রশ্ন করে, 'কই আমাকে তো কিচ্ছু বলোনি?'

'মা-র টেলিগ্রামটা পাবার পরই তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। শুনলাম বেরিয়ে গেছ।'

'তুমি টেলিফোন করেছিলে?'

'একবার না, কয়েকবার।'

এর মধ্যে দরজা নক্ করেই আমজাদ একটা বড় প্যাকেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। 'লিজিয়ে সাব।'

'প্যাকেটটা খুলে আন।'

মণিকা জানতে চাইল, 'কিসের প্যাকেট?'

'মা কিছু মিষ্টি-টিষ্টি পাঠিয়েছেন আর কি! একটু আগেই আই-এ-সি থেকে জানাল,

এলাহাবাদ থেকে একটা প্যাকেট এসেছে। তাই ভাবলাম মা-র দেওয়া মিষ্টিটা খেয়েই লাঞ্চ খাব।'

আরতি বলল, 'চলুন লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। উই উইল সেলিব্রেট ইওর বার্থডে।'

আমজাদ প্যাকেটটাকে খুলে ঘরে ঢুকতেই মণিকা এগিয়ে গেল, 'দাও।'

আমজাদ ফিরে যাচ্ছিল। মণিকা বলল, 'দাঁড়াও আমজাদ, চলে যেও না।'

প্যাকেট থেকে একটা মিষ্টি বের করে আমজাদকে দিয়ে বলল, 'আজ তোমাদের সাহেবের জন্মদিন। তাইতো এই মিষ্টি এলাহাবাদ থেকে মা পাঠিয়েছেন।'

আমজাদ হাত তুলে কপালে ঠেকাল, 'আল্লা সাহেবের ভালো করুন।'

'যাও এবার তুমি লাঞ্চ দেবার ব্যবস্থা কর।'

আমজাদ চলে গেল। মণিকা দুটো মিষ্টি বের করে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিল, নিজেরাও দু'জনে নিল।

হঠাৎ আমজাদ ফিরে এলো। 'সাব, দশ মিনিট টাইম নিচ্ছি।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

দশ মিনিট নয়, পনের-কুড়ি মিনিট পরে বুড়ো রমজানই প্রথম ঘরে ঢুকল। হাতে একটা বিরাট ফুলের তোড়া। পিছনে আমজাদ, গঙ্গা, নটবর ও তিন চারজন।

ফুলের তোড়াটা ক্যাপ্টেনকে এগিয়ে দিয়ে রমজান বলল, 'বহুত বহুত মুবারক হো সাব।'

গঙ্গার হাতে বিরাট একটা কেক। আমজাদ আর ওরা ডাইনিং টেবিলে লাঞ্চ রাখল।

মণিকা খুব খুশি। আরতিও। ক্যাপ্টেন একটু বিস্মিত। মুগ্ধ।

বড় আনন্দে কাটল সারাদিন। সারা সন্ধ্যা। খাওয়া-দাওয়া হাসি-ঠাট্টা-গান।

শেষে আরতিকে নামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন মণিকাকে পৌঁছতে গেল। গাড়ি থেকে নামবার আগে মণিকা একটু নীচু হয়ে ক্যাপ্টেনকে প্রণাম করল।

ক্যাপ্টেন মণিকার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'একি করছ?'

'আমজাদ-রমজান কত কি তোমাকে দিল। আমি না হয় শুধু একটা প্রণাম করেই শ্রদ্ধা জানালাম।'

কদিন পরেই গভর্নর দার্জিলিং যাবেন। গ্রীষ্মাবকাশে। ডারবি-সায়ারের কেডলস্টন হলের অনুকরণে ক্যাপ্টেন ওয়েট যখন কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসের পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন গরমের দিনে এর বাসিন্দাকে পালিয়ে যেতে হবে ভাবেননি। যার জন্য এই প্রাসাদের জন্ম, সেই লর্ড ওয়েলেসলীও কল্পনা করেননি। বিয়াল্লিশ বছরের উন্মত্ত ওয়েলেসলী সব ঋতুতেই সমানভাবে খুশিতে থেকেছেন এই গভর্নমেন্ট হাউসে।

তারপর যুগ পাল্টে গেল। ক্লাইভ স্ট্রিটের সাহেব-সুবাদের সঙ্গ দেবার জন্য ওয়েলেসলির উত্তর সাধকরা দার্জিলিং যাতায়াত শুরু করলেন।

ওয়েলেসলি-কার্জন-বেন্টিকের চৌদ্দ পুরুষকে গালাগালি দিয়ে যারা এই গভর্নমেন্ট হাউস দখল করল, তারাও হয়তো এই ক্লাইভ স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গীর সাহেব-সুবাদের মুখ চেয়েই

দার্জিলিং শৈল শিখরে বসে বসে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে ঠাট্টা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না।

তাই তো লাটসাহেবকে আজও গরমের দিনে পালাতে হয় লর্ড ওয়েলেসলির স্বপ্নের প্রাসাদ ছেড়ে।

কলকাতায় তবু ভিজিটার্স আসে, মিটিং-কনফারেন্স-সেমিনার আছে। ভাগ্য ভালো হলে ঘুষখোর সরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকিতে তৈরি নতুন সরকারি অপকর্মশালার উদ্বোধন করার সুযোগও জুটে যায়। ফটো তোলার আরো অনেক সুযোগ আছে কলকাতায়। কিন্তু দার্জিলিং-এ? থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। সেই বাজার, মোটর স্ট্যান্ডের পাশে লয়েড জর্জ বোটানিক্যাল গার্ডেনে একদিন ঘুরে-বেড়ান, ন্যাচরাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে গিয়ে বোকার মতো হাঁ করে থাকা, অবজারভেটরি হিলস্-এ গিয়ে ঘোমটা দেওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা।

দার্জিলিং-এ লাটসাহেবের আরো কিছু কম্ম আছে। একদিন লেবং-এর রেস কোর্সে গিয়ে খচ্চরের দৌড় দেখে হাসি মুখে কোনো মাতাল জুয়াড়ির হাতে কাপ-মেডেল তুলে দিতে হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার মতো এগুলো সব লাটসাহেবকেই করতে হয়। সরকারি ভাষায় প্রিসিডেন্ট হয়ে গেছে। প্রিসিডেন্ট-এর মতো কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ছাড়াও লাটসাহেবকে আরো আরো কিছু পূজা-পার্বণ-ব্রত পালন করতে হয় শৈল শিখরে গিয়ে। কোটিপতি পাটের দালালেরা মেয়ের আর্ট একজিবিশন ওপন্ করতে হয়। ইনভিটেশন কার্ডে অবশ্য লেখা থাকে ওপনিং অফ আর্ট সেলুন। একবার-আধবার ক্যাপিট্যাল থিয়েটার বা রিন্‌ক সিনেমায় গিয়ে কিছু ব্যভিচারিণীদের চ্যারিটি শো-তে মদত করতেও হয় লাটসাহেবকে। এসব না করলে বর্ষায় তিস্তা ভদ্র হয়ে উত্তর বাংলার মানুষদের শান্তিতে থাকতে দেবে, এমন কোনো কারণ নেই। তবু করতে হয়। করতে হয় বাজেট বরাদ্দের কয়েক লক্ষ টাকা হরির লুঠের বাতাসার মতো উড়াবার জন্য। হাজার হোক সারা বাংলার জনপ্রতিনিধিদের পাশ করা বাজেটের তো একটা প্রেস্টিজ আছে?

তেনজিং হিমালয়ের ছাদে চড়ার পর সারা দেশের ভি-আই-পিদের মতো লাটসাহেবকেও পাহাড়-প্রেমিক হতে হয়েছে। যে লাটসাহেব দার্জিলিং বা বেনারসের কোনো পুরনো সিঁড়ি দিয়ে দু-ধাপ উঠতে পারেন না, তাঁকে মাউন্টিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালের তৈরি তিন পাতা টাইপ করা বক্তৃতা রিডিং পড়ে পর্বতারোহণে উৎসাহ দিতে হয় একদল ছেলেমেয়েকে।

আগের দিনে জমিদারবাবুরা আদুরে বারবনিতা গোলাপির বিড়ালের বিয়েতে লক্ষ টাকা ওড়াতেন। একালে লাটসাহেবের ফালতু লাটসাহেবিপনায় লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ছে বলেই বোধহয় জমিদারের বিড়ালের বিয়ে বন্ধ হয়েছে।

যে যাই হোক। লাটসাহেব রওনা হবার পনের দিন আগেই অ্যাডভান্স পার্টি চলে গেছে। দার্জিলিং রাজভবনেও বহু ছোট-বড় মাঝারি কর্মচারী আছেন। তাঁরা সব কিছুই জানেন। সবকিছু ব্যবস্থাই করতে পারেন। তবু অ্যাডভান্স পার্টিকে যেতেই হয়। বিড়ালের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য অ্যাডভান্স পার্টিতে ডেপুটি সেক্রেটারি ও এ-ডি-সি লেফট্‌ন্যান্ট ভাটিয়া আর কিছু অফিস স্টাফ চলে গেছে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে শুধু একটি পার্থক্য হয়েছে। সে হচ্ছে হিজ এক্সেলেন্সির সিকিউরিটি। গভর্নরের ডিভ্যালুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি ব্যবস্থারও অধঃপতন হয়েছে। একজন ছোকরা সাব-ইন্সপেক্টরই এখন মহামান্য রাজ্যপালের একমাত্র ত্রাণকর্তা। অ্যাডভান্স পার্টিতে তাই কোনো সিকিউরিটি অফিসার থাকেন না।

দিল্লীর কিছু হাফ-গেরস্ত, হাফ-সাহেবরা প্রতি সামারে যেমন অন্তত একবেলার জন্য মুসৌরি

ঘুরে এসে অক্ষয় প্রেস্টিজের অধিকারী হন, কলকাতার কিছু মানুষের মধ্যেও এ রোগ আছে। টাইগার হিলে গভর্নরের মুচকি হাসি না দেখে কলকাতার কিছু মানুষ পার্ক স্ট্রিটের কেক খেতে পারেন না। গভর্নরের অ্যাডভান্স পার্টি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরাও গরম জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা শুরু করেন।

ক্যাপ্টেন এসব জানে। জানে আরো অনেক কিছু। জানে অ্যাডভান্স পার্টি চলে যাবার পরই শুরু হবে বিশ্বনিন্দিত কলকাতা রেডিও স্টেশনের অনুরোধের আসর! যে এ-ডি-সি গভর্নরের সঙ্গে যাবার জন্য থেকে যান, তাঁকেই এই অনুরোধের আসরের জ্বালা সহ্য করতে হয়। নিয়মিত, প্রতি বছর। বৈচিত্র্য নেই সে অনুরোধে। তাছাড়া এসব রিকোয়েস্ট আসেও ওই একই অতি পরিচিত মহল থেকে। ওরা উত্তর বা দক্ষিণ কলকাতার লোক নন। মধ্য কলকাতারও না; কলকাতায় বাস করেও কলকাতাবাসী নন যাঁরা, সেই লাউডন-রডন-ক্যামাক-ময়রা স্ট্রিটের কিছু মানুষের কাছ থেকেই এসব অনুরোধ আসে, আসবে। ওরা সত্যি বিচিত্র! ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের প্লেনে চড়ে কাঠমাণ্ডু যেতে ওদের প্রেস্টিজে লাগে কিন্তু বিলেত-আমেরিকা গিয়েও ভব্য-সভ্য হবার সুযোগ পান না বিশেষ। তবে হাতের কাছে বি-ও-এ-সি বা প্যান-এমের টাইম টেবিল রাখেন প্রায় সবাই। ফিফথ্ এভিনিউ বা অক্সফোর্ড স্ট্রিটে সপিং করার সৌভাগ্য না হলেও নিউ মার্কেটের নিন্দায় পঞ্চমুখ।

ওরা আরো অনেক কিছু। কলকাতায় থেকেও বেলেঘাটা নারকেলডাঙ্গা-উল্টাডাঙ্গা দেখেন না। ওরা জলযোগের পয়োধি পেলেও দূরে সরিয়ে রাখেন কিন্তু ক্রেডিটে ফেরাজিনির কেক না খেয়ে পারেন না। স্বপ্ন দেখেন সুইস আলপস্-এর, যান শুধু দার্জিলিং।

অনুরোধ আসে ওই ওদের কাছ থেকে। প্রস্তাবিত, সম্ভাবিত আক্রমণের জন্য ক্যাপ্টেন রায় প্রস্তুত হচ্ছিল।

এই অনুরোধ-উপরোধ নিয়ে ঝামেলার শেষ নেই। কিছু লোককে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে অসন্তুষ্ট করতে হয় বহুজনকে। এবার তাই ক্যাপ্টেন রায় আগে থেকেই সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে গভর্নরের কাছেই চলে গেল।

'স্যার! আই অ্যাম সিওর প্রত্যেক বছরের মতো এবারও বহু রিকোয়েস্ট আসবে...'

'ডু ইউ থিঙ্ক সো?'

'ডেফিনিটলি। বহু চিঠিপত্র অলরেডি এসে গেছে। কালকের পেপারে আপনার দার্জিলিং যাবার ডেট অ্যানাউন্স হবার সঙ্গে সঙ্গে পার্সোন্যাল রিকোয়েস্ট আসা শুরু হবে। দ্যাট ইজ হোয়াই...'

'অফিসিয়্যাল প্রোগ্রাম কতগুলো আছে?'

'একটা।'

'ওনলি ওয়ান?' অবাক, বিস্ময়, হতাশায় গভর্নর এ-ডি-সি'র দিকে চাইলেন!

'ইয়েস স্যার।' খুব নরম গরম গলায় ক্যাপ্টেন রায় জানাল।

দার্জিলিং-এ গভর্নর থাকবেন তিন সপ্তাহ আর সরকারি এনগজেমেন্ট মাত্র একটা? হ্যাঁ। ওই রকমই হয়। দিল্লিতে হোম মিনিস্টারের করকমলে প্রতিদিন প্রতি রাত্রি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে ও চীফ মিনিস্টারের সানুগ্রহে গভর্নর হলে এর চাইতে বেশি অনার পাওয়া যায় না। গভর্নর ও তার এ-ডি-সি দু'জনেই একথা জানেন। তাই কেউই আর এ বিষয়ে আলোচনা করলেন না।

'সরকারি প্রোগ্রাম কি?'

'স্যার, টু গিভ অ্যাওয়ে সার্টিফিকেটস টু গ্রামসেভিকাস্।'

মর্মাহত হলেন হিজ এক্সেলেন্সি। যারা বি-ডি-ও'র আন্ডারে চাকরি করবে, তাদের সার্টিফিকেট দিতে হবে ওকে? তবে সান্ত্বনা এই যে ডেভলপমেন্ট কমিশনার তাঁর বক্তৃতায় নিশ্চয়ই বলবেন, গ্রাম বাংলার রূপ বদলাবে তোমরা—ইউ গার্লস। বি কেয়ারফুল, কি দারুণ রেসপন্সিবিলিটি তোমাদের এবং তাইতো হিজ এক্সেলেন্সি ইউ ভেরি কাইন্ডলি প্রেজেন্ট হিয়ার টু-ডে। কলকাতার খবরের কাগজে এ অনুষ্ঠানের রিপোর্ট ছাপা না হলেও পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের কাগজে ছবি ও রিপোর্ট ভালোভাবেই বেরোবে।

সরকারি নেমন্তন্নর অভাবে চুপচাপ তো রাজভনের মধ্যে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে থাকা যায় না। গভর্নর তাই এ-ডি-সি'কে বললেন, 'না, না, ডোন্ট ডিসঅ্যাপয়েন্ট অল অফ্ দেম্।'

'বাট স্যার, কতজনকে আর খুশি করতে পারব? তাছাড়া ইউ আর গোয়িং দেয়ার টু টেক রেস্ট।'

'নো, নো। পাবলিক রিকোয়েস্ট করলে আই মাস্ট ট্রাই টু অনার দেম।'

কিছু লোকের তৈল মর্দন পাবার জন্য গভর্নর ব্যাকুল ছিলেন। তাছাড়া কোনো ইনভিটেশন না থাকলে ওর ফ্যামিলীর লোকজনই বা ভাববেন কি?

'স্যার সেক্রেটারি ওয়াজ সাজেস্টিং যে ডেইলি একটা এনগেজমেন্ট নেওয়াই ঠিক হবে।'

শেষে গভর্নর জানালেন যে বেশি অনুরোধ-উপরোধ এলে মাঝে-মাঝে দুটো-তিনটে এনগেজমেন্ট থাকলেও আপত্তি নেই।

দারিদ্র্যের প্রতিযোগিতা নেই কিন্তু ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতার শেষ নেই। গ্রীষ্মের দার্জিলিং-এ দেখা যায় সেই প্রতিযোগিতা। কলকাতার ইমপোর্টেড ব্যবসাদার আর লোক্যাল প্লান্টর্সরা পাগল হয়ে ওঠেন নেশায়। মিস এটা সেনের চারটি পেন্টিং কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিল্পপতি সানইয়াল ওর আর্ট সেলুনের ওপেনিং-এ সভাপতির পদ কিনলেন। কেন? চীফ গেস্ট যে গভর্নর। ওভার নাইট সানইয়াল সাহেবকে নিয়ে মেতে উঠলেন সোসাইটি লেডিরা। দার্জিলিং 'সামার কুইন' প্রতিযোগিতায় ওকে চিফ গেস্ট করার প্রস্তাব এলো বহুজনের কাছ থেকে।

মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলের ডাইনিং হলের এসব আলোচনা, জিমখানা ক্লাবের বিলিয়ার্ড রুমে পৌঁছতে দেরি লাগেনি। প্লান্টার্স খৈতান সাহেবদের বাগান কিনে সাহেব হবার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া বাপ-দাদা কলকাতার স্টক-এক্সচেঞ্জ আর খিদিরপুরের তিন-চারটে কলকারখানা সামলাতে এত মত্ত যে জুনিয়র খৈতান নতুন বিজনেস সামলাতে এসে প্রমত্ত হবার অফুরন্ত সুযোগ পাচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন রায় এইসব নোংরা প্রতিযোগিতার নেপথ্য কাহিনি সব জানে। প্রতিবছর এর পুনরাবৃত্তি হয়। এবার না হবার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি ক্যাপ্টেন। তাইতো অনুরোধ আসার আগেই সেক্রেটারি আর হিজ এক্সেলেন্সির সঙ্গে আলাপ করে নিল।

পরের দিন খবরের কাগজে গভর্নরের দার্জিলিং প্রোগ্রাম বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল হাই সোসাইটির পাগলামি। লেটফ্ন্যান্ট ভাটিয়া চলে গেছে। নর্ম্যাল এ-ডি-সি ইন ওয়েটিং-এর কাজ তো আছেই, তারপর সারাদিন এই ঝামেলা। দিনরাত্রি—চব্বিশ ঘণ্টা। তাছাড়া প্রায় রোজই একবার ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দমদম যেতে হয় কোনো না কোনো গেস্টকে রিসিভ বা সি-অফ্ করতে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অতিথিদের দেখাশুনাও করতে হয় ওকেই।

শান্তশিষ্ট ক্যাপ্টেনও যেন মেজাজ হারিয়ে ফেলে। অধিকাংশ গেস্টদের ডিপারচার হচ্ছে ভোরবেলায়। ছটা নাগাদ। পাঁচটায় উঠেই ক্যাপ্টেনকে তৈরি হতে হয় ওদের বিদায় জানাবার

জন্য। তাছাড়া যেখানে বাগের ভয়, সেখানেই রাত হয়। সিঙ্গাপুরে সিয়াটো কনফারেন্সের জন্য ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি, টার্কিশ ডিফেন্স মিনিস্টার, ইটালিয়ান ফরেন মিনিস্টার আর ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইরান সিঙ্গাপুরের পথে দমদম হয়ে গেলেন। পরপর তিনদিন মাঝরাতের পর বা শেষ রাতের গভর্নরের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেনকে অভ্যর্থনা জানাতে হল। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতের ঘুমটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হল।

একদিন মাত্র মিনিট পনেরোর জন্য মণিকাদের ওখানে গিয়েছিল। তাছাড়া রোজ টেলিফোনে কথা বলবারও সুযোগ থাকে না। মণিকাও দুদিন রাজভবনে এসেছিল। দেখা হয়েছিল একদিন।

'কেমন আছ?'

'খুব ভালো।'

ঠোটের কোণায় সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে মণিকা বলল, তা আমি জানি। খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজে ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে ছবি বেরোচ্ছে, ভালো থাকবে না?"

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে ক্যাপ্টেন ওপাশের কৌচটা ছেড়ে মণিকার পাশে এসে বসল। একবার হাসল, একবার চাইল। আলতো করে আঙুল দিয়ে মণিকার আধোবদন তুলে ধরল।

'দারুণ রাগ করেছ, তাই না?'

মণিকা জবাব দিল না। মুখটি আবার নিচে করল।

ক্যাপ্টেন একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'আরতি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

আবার একটু নিস্তব্ধতা।

'আচ্ছা আরতি বোধহয় ঠিক হ্যাপি নয়, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে মণিকা জবাব দেয়, 'হু ইজ হ্যাপি?'

ডান হাত দিয়ে মণিকাকে কাছে টেনে নিয়ে মুখখানা তুলে ধরে বলে, 'তুমি তো সুখী।'

'ঘোড়ার ডিম।'

'ঘোড়ার ডিম? বলো কি?'

মণিকা কি জবাব দেবে? চুপ করে থাকে।

ক্যাপ্টেন আবার বলে, 'সেদিন রাত্রের পরও তুমি কি একথা বলছ?'

'বলব না? সেদিন রাত্রের পর তুমি আমাকে উপেক্ষা করে চলেছ, আমি সুখী হব না?'

একটু আদর-টাদর করে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্যাপ্টেন সেদিন নিজে গিয়ে ছেড়ে এসেছিল মণিকাকে।

রাজভবনে ফিরে এসে চুপচাপ বসে বসে ভাবছিল মণিকার কথা! অনেকক্ষণ, অনেক কিছু। ধীরে ধীরে কত কাছে এসে, কত নিবিড় হয়েছে। কত গভীর হয়েছে, দুটি প্রাণের বন্ধন। প্রথম দিনের প্রথম অধ্যায়ের ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন—সাধনা আজ পূর্ণ। তবুও কেন এই অপূর্ণতার বিস্বাদ? মণিকা কেন এখনও বিবর্ণ? পূর্ণ হয়েও পরিপূর্ণ হয় না কেউ। কেন?

সেন্টার টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে কৌচে প্রায় শুয়ে পড়ে ক্যাপ্টেন। সিগারেট খেতে খেতে দৃষ্টিটা ঘুরে যায় বাইরের দিকে রাজভবনের চারপাশের শ্যামল সীমান্তে। মাটির তলায় লুকিয়ে থাকে বীজ। অঙ্কুরিত হবার সাধনায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। একদিন সে সাধনার শেষ হয়। ধরিত্রী বিদীর্ণ করে সে বীজ আত্মপ্রকাশ করে, সূর্যের আলো দেখে সে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে আবার পাগল হয়ে ওঠে। সূর্যের হাসি দেখার পর পরই সদ্য অঙ্কুরিত বীজ চারপাশে দেখে বিরাট বনানী। ওরা সবাই আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়ে দশ দিকে নিজেকে বিস্তারিত করেছে। প্রচার করেছে নিজের সাফল্য, কৃতিত্ব, অস্তিত্ব। ওই বিরাট বনানীর মতো নিজের কৃতিত্ব প্রচারের জন্য সদ্যজাত শিশু—মহীরুহ আবার নতুন নেশায় মেতে ওঠে। ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে আশা—নিরাশা। আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে শান্তি পায় না ওরা। ফুলে ফলে নিজেকে সাজাতে চায়। চায় আরো কত কি!

প্রকৃতির কি বিচিত্র খেয়াল? গাছপালা পশুপক্ষী মানুষ—সবাই এক সুরে, এক ছন্দে বাঁধা। কেউ থামতে চায় না।

মণিকাও না। এক স্বপ্নের পরিণতিতে জন্ম নিয়েছে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা। নতুন প্রত্যাশা। হয়তো নতুন দাবিও। সে কি অন্যায়?

অন্যায় কেন হবে? তবে এত ব্যস্ততা কেন। এত হতাশ হবার কি আছে?

আপন মনে ক্যাপ্টেন ভাবে। স্বপ্ন কি ওর নেই? মণিকাকে নিয়ে কত কি ভাবে, কত কি আশা করে! কত অপূর্ণ বাসনা চাপা দিয়ে রেখেছে হাসি মুখে। কর্তব্যের আড়ালে, সামাজিক পরিবেশের চাপে।

মণিকাকে কি সব কথা বলা যায়? সারাদিন সবার সঙ্গে ওকে হাসতে হয়, কিন্তু...কিন্তু কি?

ক্যাপ্টেন মণিকার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে। উৎকণ্ঠাভরা আরো একটা দিনের শেষ হয়।

দিন ফুরিয়ে যায় কিন্তু উৎকণ্ঠা? চিন্তা? ব্যথা—বেদনা, হতাশা? সব লুকিয়ে থাকে। চাপা থাকে।

সব কিছু চাপা দেবার জন্যই তো এলাহাবাদ ছেড়ে পালিয়েছিল। ভেবেছিল দৈনন্দিন জীবনেরা উত্তেজনায় ভুলতে পারবে সেই অবিস্মরণীয় নাতিদীর্ঘ ইতিহাস। ভেবেছিল মত্ত—প্রমত্ত থাকবে। দিনের বেলায় কাজের নেশায়, রাত্রে অফিসার্স ক্লাবে, বারে। বোতল বোতল হুইস্কি গলা দিয়ে ঢেলে মুছে ফেলবে সব স্মৃতি।

পারেনি। বহু চেষ্টা করেও পারেনি। প্রথম প্রথম অনেক দূর এগিয়েছিল। পরে ফিরে এসেছে। ও পথ ছেড়ে দিয়েছে। পুরনো বন্ধুরা তো ক্যাপ্টেন রায়কে দেখে অবাক হয়। চব্বিশ ঘণ্টা সিগারেট খাবে কিন্তু কোনো অকেশন না হলে এক পেগও খাবে না।

কি করে ক্যাপ্টেন? হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মা ওর দুটি হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন?

অনুরোধ?

না, না। ওকে কি অনুরোধ বলে? দুই হাত ধরে ভিক্ষা চেয়েছিলেন মা। জননী। গর্ভধারিণী। চির কল্যাণী, চির শুভাকাঙ্ক্ষিনী।

'তুই নিজেকে যদি অমন শেষ করে দিস তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচব বল তো?'

প্রয়াগ সঙ্গমের ধারে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মা-র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল ক্যাপ্টেন। পরে মনে মনে বলেছিল, আমার জন্য আর ওই হতভাগিনীকে চোখের জল ফেলতে হবে না। না। কোনোদিন না। এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কে আমার জন্য এমন করে...

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মনে পড়ছিল সেই সর্বনাশা দিনগুলোর কথা। স্মৃতি। বেদনা।

মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে মনটা আরও পিছিয়ে যেতে চায়। ভয়ে আঁতকে ওঠে। পারে না। রাগে, দুঃখে, ঘেন্নায় সারা শরীরটা জ্বলতে থাকে। একটা অব্যক্ত বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বহুকাল ভুলে ছিলেন। নিজের কথা চিন্তাই করতেন না

ক্যাপ্টেন। দিনরাত্রির লীলাখেলার মধ্য দিয়ে শ্লথ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সে ভবিষ্যতের কাছে কোনো প্রত্যাশা ছিল না ওর, কেন দাবি ছিল না, দিনের আলোয় কোনো স্বপ্ন জন্ম নিত না, রাত্রের অন্ধকারে কোনো স্বপ্ন মিলিয়েও যেত না।

বেশ ছিলেন ক্যাপ্টেন। কলকাতায় এসেও বেশ ছিলেন। আমজাদ রমজানের কাছে গল্প শুনে বেশ কাটছিল দিনগুলো। কোনো শূন্যতা অনুভব করতেন না। রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত না কোনো দিন। বৈভব তীর্থ গভর্নমেন্ট হাউসে থেকেও বেশ নিরাসক্ত ছিলেন ক্যাপ্টেন রায়।

প্রলোভন যে আসেনি, তা নয়। এসেছে। কখনও মিস গুপ্তা বা মিসেস রায়চৌধুরির কাছ থেকে, কখনও আবার কোনো অতিথিনীর কাছ থেকে। আরো কত জায়গা থেকে। মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। মনে কোনোদিন আলোড়ন আসেনি। উত্তাপ বোধ করেছেন মনে মনে কদাচিৎ।

কিন্তু হঠাৎ সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল।

"A gentle shock of mind surprise.
Has Carried far into his heart the voice
Of mountain torrents."

একটু পরে আবার সহেন্দহ দেখা দিয়েছিল। তবে কি–

"Two lovely black eyes,
Oh, what a surprise!
Only for telling a man he was wrong,
Two lovely black eyes!"

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ঠিক, নাকি চার্লস কোবর্ণ? বিচার করতে পারেনি ক্যাপ্টেন। সার্জেন যেমন সবার অপারেশন করতে পারেন কিন্তু নিজের স্ত্রী? ছেলেমেয়ের? পারেন না। কেন ডাক্তাররা? নিজের চিকিৎসা কখনও করেন না, করতে পারেন না। ক্যাপ্টেনও পারেননি। কে ঠিক? কোনটা ঠিক?

তিনি শুধু জানলেন অজ্ঞাতসারেই নিজের হাতেই গাড়ির স্টিয়ারিংটা ঘুরে গেল। কেন, কেমন করে? জানেন না। জানবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বহুদিন জানতে চান কি। কি প্রয়োজন? কি সার্থকতা? জীবনের সব প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়? কেউ পায়নি, কেউ পাবে না। যৌবনেই জীবনের এই মর্মকথা জেনে গেছেন ক্যাপ্টেন। নিজের জীবন নিয়ে মর্মে মর্মে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন যে!

মণিকা অভিমান করেছে। হয়তো রাগও। কিন্তু ক্যাপ্টেন কি করে বোঝাবেন সব কথা? রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়তে চাইলেই কি তা সম্ভব? বিধাতা-পুরুষ ক্যাপ্টেনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। তিনি তো চাননি কারুর জীবন নিয়ে খেলা করতে। মণিকাকে নিয়েও নয়। কখনই নয়। যে সম্মান, ভালোবাসা, ঐশ্বর্য মণিকা ওকে দিয়েছে, তা নিয়ে কি খেলা করা যায়? আর কেউ পারলেও ক্যাপ্টেনের সে ক্ষমতা নেই, ইচ্ছাও নেই।

মণিকা নিশ্চয়ই একটু আহত মন নিয়ে ফিরে গেছে কিন্তু তিনি তো চাননি ওর ভালোবাসার অমর্যাদা করতে, চাননি ওকে আহত করতে। সেকথা বোঝাবেন কেমন করে। বরং ক্যাপ্টেন স্বপ্ন দেখেন মণিকাকে সসম্মানে ওর জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে।

তাছাড়া মণিকার কাছে ক্যাপ্টেন কৃতজ্ঞ। অশেষ কৃতজ্ঞ। বহুদিন ধরে মহাশূন্যে বিচরণ করার পর মণিকাই ওকে ফিরিয়ে এনেছে এই পৃথিবীতে। প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতার রাজ্যে। দেহ ছিল কিন্তু তার চাইতে বেশি ছিল দাহ। মণিকাই মুক্তি দিয়েছে সে দাহ থেকে, সে অব্যক্ত অসহ্য বেদনা থেকে।

আরও অনেক কিছু দিয়েছে মণিকা। মানুষকে আর পৃথিবীতে নতুন করে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। ক্যাপ্টেন তো নিজেকেও ভালোবাসতে ভুলে গিয়েছিল। আজ সে নিজেকে ভালোবাসে। সকালবেলায় তাইতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাক ব্র্যাশ করতে করতে গান গায়, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে...'

আগে?

ইউনিফর্ম চাপিয়েই ক্যাপ্টেন খুশি থাকতো। কসমেটিক্স তো দূরের কথা, মাসের পর মাস আফনার সেভ লোশন পর্যন্ত কিনতে ভুলে যেত।

মনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, জীবনের প্রতি মুহূর্তের আশা-ভরসা, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে ক্যাপ্টেন আজ অনুভব করে মণিকাকে। মণিমালাকে?

মণিমালা?

'হ্যাঁ, মণিমালা। ক্যাপ্টেনের খুব বেশি অভিব্যক্তি নেই কিন্তু তাই বলে তার স্বপ্ন নেই? যেদিন মণিকাকে ও কাছে পাবে, নিজের করে পাবে, ফুলের জলসায় নীরব কবির মতো সলজ্জভাবে আসন্ন সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তের জন্য প্রতিক্ষা করবে, সেদিন থেকে ক্যাপ্টেন তো ওকে মণিমালা বলেই ডাকবে।

ক্যাপ্টেন জানে মণিকার কথা মাকে জানালে তিনি খুশি হবেন। নিশ্চিত হবেন। খুশি হবেন এই কথা ভেবে যে তাঁর একমাত্র পুত্র সুস্থ স্বাভাবিক হয়েছে। নিশ্চিন্ত হবার কারণও অনেক। এক মুহূর্তে একটা বুলেটের গুলিতে যে সুখের সংসারটা ছারখার হয়ে গিয়েছিল ক'বছর আগে, সে সংসার হয়তো সুখের, শান্তির হবে। এই ক'বছরের অস্বাভাবিক চাপা উত্তেজনাটা বিদায় নেবে। নিশ্চিন্ত হবেন না?

তাছাড়া একমাত্র ছেলে আর্মিতে, তাতেই মার ঘুম নেই। মার ধারণা যেখানেই যুদ্ধ-বিগ্রহ বা মারামারি কাটাকাটি হোক, তাঁর ছেলেকেই সব কিছু সামলাতে হবে। আর দিন-রাত্রির অত-শত বিপদের মধ্যে থাকলে কখন কি হয় বলা যায়? একে অমন চাকরি তার উপর সংসারধর্ম করল না। করতে পারল না। চিন্তার শেষ নেই মার।

মণিকার কথা জানলেই হল। হয়তো পরের ট্রেনেই ছুটে আসবেন। কিছু বলা যায় না। মণিকাকে দেখলে মার-র মাথার ঠিক থাকবে কিনা, তাই বা কে জানে? হয়তো মণিকারই হাত দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে ভিক্ষা চাইবেন তাঁর ছেলেকে বাঁচাবার জন্য। আরো কত কি করবেন, কে বলতে পারে?

তাছাড়া কিচ্ছু না জানিয়েও যদি মণিকার সঙ্গে মার আলাপ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও হয়তো মা প্রস্তাব না করে পারবেন না। অমন শান্ত–স্নিগ্ধ অথচ সুন্দরী মেয়েকে দেখলেই মার পছন্দ হবেই। আর পছন্দ হলে নিশ্চয়ই...

গান শুনলে? মণিকা যদি 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব' শোনায়? মা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, শেষের লাইনটা আর একবার কর না মা। বড় ভালো লাগে ওই কটি কথা! এই বলে হয়তো নিজের মনে মনেই আবৃত্তি করবেন—

'আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস–বিভাবরী–
হল না সারা, কত না যুগ ধরি
কেবলই আসি লব।'

ক্যাপ্টেন অনেকবার ভেবেছে মাকে সব কিছু জানাবে, কিচ্ছু লুকোবে না। দু'একবার চিঠি লেখার কাগজপত্র নিয়েও বসেছিল! শেষ পর্যন্ত লেখেনি। লিখতে পারেনি। নিজেকে বিচার করতে চেয়েছিল ভালোভাবে। বিচার করতে চেয়েছিল, কোনো মোহের ঘোরে ও মণিকাকে চাইছে না তো? একটু মোহ আছে বৈকি। হাজার হোক মণিকাকে দেখে, আলাপ করে, এত নিবিড় ভাবে মেলামেশা করে নিশ্চয়ই কিছুটা মোহ জন্মেছে কিন্তু শুধুই মোহ নয় তো? আপন মনে বিচার করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন চিঠিপত্র লেখার কাগজপত্তর সরিয়ে রেখেছে। নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। আরো ভালোভাবে নিজের মনকে, নিজের সত্তাকে বিচার করতে চেয়েছে। পরীক্ষা করতে চেয়েছে মণিকার প্রতি তার ভালোবাসা।

হয়তো মণিকাকেও পরীক্ষা করতে চেয়েছে! আর্মি অফিসারদের প্রতি কিছু মেয়ের মোহ থাকে, আকর্ষণ থাকে। দুর্বলতাও থাকতে পারে। দুনিয়ার সবার থেকে নিজেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে দেখার লোভ কোনো মেয়েই সামলাতে পারে না। সর্বত্র, সব পরিবেশেই। কুলি-মজুর, কেরানী-অফিসার, বীমার দালাল, বিজনেসম্যান যাকেই বিয়ে করুক না কেন, বিয়ের পর মেয়েরা অনন্যা হয়ে ওঠে। গভর্নরের এ-ডি-সি-কে বিয়ে করে সে হয়তো সেই আত্মতৃপ্তি একটু বেশি করে উপলব্ধি করার প্রয়াস পারে। এ-ডি-সি-র প্রতি আকর্ষণ হবার আরো অনেক কারণ আছে। যুক্তিতর্কে সে কারণ না টিকলেও আছে। থাকে। ক্যাপ্টেন তা জানে। বুঝতে পারে। মণিকাও সেই মরীচিকার মোহে এগিয়ে আসেনি তো? যৌবনের মোহনায় দাঁড়িয়ে জোয়ারের টানে কিছু দূর ভেসে যেতে চায়নি তো? উত্তাল উন্মত্ত যৌবনের মোহনা থেকে দূরে এসে ভাঁটার টানেও মণিকা ভালোবাসবে তো? নিজের মনপ্রাণ সত্তা দিয়ে ক্যাপ্টেনের কল্যাণ চাইবে তো?

ক্যাপ্টেন এখন নিশ্চিন্ত। মণিকাকে নিয়ে মনের দ্বন্দ্ব, শঙ্কা ভালোভাসার পলিমাটির তলায় বহুদিন আগেই চাপা পড়েছে। ওকে না পাবার জন্য মণিকার মনে অব্যক্ত ব্যথা, শূন্যতা ক্যাপ্টেন বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। বেশ লাগে। এতকাল তো ওর জন্য কেউ এমন শূন্যতা অনুভব করেনি। ভালো লাগবে না?

ক্যাপ্টেন নিজেও তো ওই একই ব্যথা বেদনা শূন্যতা অনুভব করছিল। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে। রাজভবনের আকর্ষণ, সোসাইটির গ্ল্যামার, লাঞ্চ-ডিনার—কক্‌টেলের হার্সিঠাট্টাতেও নিজেকে ভরিয়ে তুলতে পারছিল না। বড় বেশি অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছিল। সবকিছু পেয়েও যেন ওর অভাব মিটছিল না। কিছুতেই না।

অ্যাডভান্স পার্টি চলে যাবার পর কয়েকটা দিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। তারপর যখনই একটু সময় পেল, কাগজপত্র নিয়ে বসল মাকে চিঠি লিখতে। আর দেরি করতে পারল না, চাইল না।...মা'র জ্বর হলে, সদ্যজাত শিশুরও জ্বর হয়, সর্দি লাগে। আজ আমি বড় হয়েছি। তোমার জ্বর হলে সর্দি লাগলে আমার হয় না। হতে পারে না। তোমার দুধ খেয়ে, কোলে চড়ে আমি বড় হয়েছি। আর ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে আমার স্বতন্ত্র সত্তা। জন্ম নিয়েছি আবার আমি। দূরের মানুষের কাছে আমি একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ। একটা পরিপূর্ণ সত্তা। কিন্তু তা কি হয়? সে কি সম্ভব। আজ আমার মুখে হাসি না দেখলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে না, আমার দুঃখে তোমার চোখের জলের বন্যা বইবে। আমার মনের শূন্যতায় তোমার মনপ্রাণ হাহাকার করে। এসব তো আমি জানি। তাইতো তোমার মুখোমুখি হতে আমার এত ভয়, এত দ্বিধা।

আমি নিরুপায় হয়ে অদৃষ্টের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাবতে পারিনি তোমার

চোখের জল মোছাতে পারব, মনের শূন্যতা, হাহাকার দূর করতে পারব। বহুদিন বহু বছর ভাবতে পারিনি। কলকাতা এসেও না। কিন্তু—

এতক্ষণ বেশ লিখছিল। এবার ক্যাপ্টেন একটু থামল। একটা সিগারেট ধরাল। দু-একবার টান দিল। একটু ভাবল, একটু হাসল।

একটু লজ্জা করল নাকি।

হয়তো হবে। মা-র কাছে আবার লজ্জা কিসের? তাছাড়া অমন মা কজনের হয়?

সিগারেটটা অর্ধেক না খেয়েই ফেলে দিল। আবার লিখতে শুরু করল।

...তোমার অব্যক্ত ইচ্ছায় যে আমার জীবনটা এমন মোড় ঘুরবে ভাবতে পারিনি। প্রথমে বেশ কিছুকাল দ্বিধা ছিল, সঙ্কোচ, সন্দেহ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে আপন মনে বিচার করেছি। তবুও মনে হচ্ছে, না জীবনটা সত্যিই মোড় ঘুরছে, মনে হচ্ছে মণিকাকে নিয়ে নতুন জীবন সম্ভব হতে পারে।

মণিকার সম্পর্কে তোমাকে বেশি কিছু লিখব না। তুমি নিজে এসে দেখবে, বিচার করবে। আমার দৃষ্টি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই তোমার দেখার শুরু হবে। আমার অদেখা, অজ্ঞাত তুমি দেখতে পারবে, জানতে পারবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই গভর্নর দার্জিলিং যাচ্ছেন। আমিও ওর সঙ্গে যাব তবে দু' একদিন পরেই ফিরব। কলকাতা দিয়ে অনেক ভি-আই-পি যাতায়াত করবেন এর মধ্যে। ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি ও আরো দু'একজন হয়তো এক রাত্রি রাজভবনের থাকতেও পারেন। সেজন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে। তুমি ওই সময় এসো। মণিকাদের ওখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করব। ওর বাবা ডক্টর ব্যানার্জি ও মিসেস ব্যানার্জি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। মনে মনে দু'জনেই অনেকটা এগিয়েছি। তবুও আমি কোনো পাকা কথা দিইনি, দিতে পারিনি। আর কাউকে না হোক মণিকাকেই তো সব কথাই বলতে হবে। আমার পক্ষে সেসব কথা বলা অসম্ভব। কোনোদিন কাউকে আমি ওই কাহিনি বলতে পারব না। সব কিছু শুনেও যদি ও রাজি হয় তাহলে ডক্টর ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রীকে বলা ভালো হবে।

মণিকা জানতে পারল না এই চিঠির কথা। ক্যাপ্টেন কিচ্ছু বলল না। দার্জিলিং যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ কাটিয়েছিল ওদের ওখানে। খাওয়া-দাওয়ার আগে ঘণ্টা খানেকের জন্য দু'জনে একটু ঘুরতেও গিয়েছিল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবে?'

'যেখানে খুশি।'

'কোথায় গেলে তুমি খুশি হবে?'

'আমাকে খুশি করার জন্য তোমার এত চিন্তা?'

ক্যাপ্টেন সেকেন্ড গিয়ার দিয়ে একটু হাসতে হাসতে জানতে চাইল, 'তোমাকে খুশি করার জন্য আমার একটুও চিন্তা নেই?'

মণিকাও হাসল। অভিমান-মেশা সামান্য বিদ্রুপের হাসি। 'আমাকে সুখী করা ছাড়া তোমার আর কি চিন্তা?'

ক্যাপ্টেনের কাছে মণিকার অনেক আশা, অনেক দাবি। সে আশা, সে দাবি মেটাতে পারছে না ক্যাপ্টেন। মণিকা যেন আর সহ্য করতে পারে না। অভিমান তো হবেই। হয়তো দুঃখও। লুকিয়ে লুকিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জলও পড়তে পারে। মণিকার কথায় ইঙ্গিত পায় ক্যাপ্টেন।

থার্ড গিয়ার দিয়েই স্পীড দেয় না ক্যাপ্টেন। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আরেক হাতে একটা সিগারেট বের করে দুটি ঠোঁটের মাঝে নেয়। নিউ আলিপুর ছাড়িয়ে বড় রাস্তা এসে গেছে। মিন্টটা একটু দুরেই। ক্যাপ্টেন দু'একবার চাইল মণিকার দিকে।

'খুব রাগ করেছ?'

'কার ওপর রাগ করব?'

'তোমার এই ড্রাইভারের ওপর।'

'তোমার ওপর রাগ করবার কি অধিকার আমার?'

'সে প্রশ্নের জবাব পরে দেব! আগে স্বীকার কর রাগ করেছ।'

'বিন্দুমাত্রও না।'

'তবে যে লাইটারটা জ্বেলে ধরছ না?'

মণিকা সত্যি এবার লজ্জা পায়। প্রফেসর মণ্ড চুরুট মুখে দিলেই ও লাইটার জ্বালত। বেশ লাগত। ডক্টর ব্যানার্জির ওসব নেশাফেশা নেই, মণিকার লাইটার জ্বালার নেশাটাও বন্ধ ছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কাছে পাবার পর থেকেই আবার শুরু করেছিল। ক্যাপ্টেন সিগারেট তুলতে না তুলতেই মণিকা লাইটার জ্বেলে ধরত। অভিমানী মন খেয়াল করেনি ক্যাপ্টেনের মুখে সিগারেট। অভিমানী হলেও সে তো ওকে অবজ্ঞা করতে চায়নি।

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটি স্বীকার করল, 'সরি, ক্ষমা কোরো।'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে মণিকার মুখের 'পর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ফাইনাল বিচারের রাত্রি সমাগতপ্রায়'। তখনই তোমার বিচার হবে।'

ঠিক বুঝতে পারে না মণিকা। 'তার মানে।'

'একটু ধৈর্য ধর।'

বেহালা-ঠাকুরপুকুর পার হয়ে চলে গিয়েছিল ওরা। ড্যাসবোর্ডের আবছা আলোয় মণিকাকে বারবার দেখছিল ক্যাপ্টেন। লুকিয়ে লুকিয়ে আড়চোখে।

হঠাৎ ধরা পড়ে মণিকার কাছে। 'অমন করে বারবার কি দেখছ?'

'তোমাকে?'

'আমাকে কোনোদিন দেখনি?'

'নিশ্চয়ই দেখেছি।'

'তবে আবার অমন করে দেখছ কেন?'

'দেখছি তুমি আরো কত সুন্দর হয়েছ'।

'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা করব কেন?'

না, না। আর পারে না ক্যাপ্টেন। বাঁ হাতটা দিয়ে মণিকার একটা হাত চেপে ধরে। একটু চাপ দেয়। একবার তুলে নিয়ে নিজের মুখের পর দিয়ে বুলিয়ে নেয়। আর্মি অফিসারের পোশাক পরেও ক্যাপ্টেনের মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। একটু যেন অসংযত হয় মন।

'তুমি জানো না মণিমালা, তুমি আমার কি উপকার করেছ...'

মণিকা অবাক না হয়ে পারে না, 'মণিমালা? মণিমালা কে?'

বলতে চায়নি, হঠাৎ মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছে।

'কে আবার? তুমি।'

'কই কোনোদিন তো মণিমালা বলে ডাকতে শুনিনি।'

'ভেবেছিলাম তোমার-আমার জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় রাত্রিতে তোমার নতুন নামকরণ করব।'

মণিকা নিশ্চয়ই মনে মনে খুশি হয়। আপনমনে কি যেন ভাবে। হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনের একটু হিসাব-নিকাশ করে নেয়।

স্লো-স্পিডে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এক হাতেই ক্যাপ্টেন স্টিয়ারিং ধরে আছে। দু'এক মিনিট কেটে গেল।

মাণিক চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি?'

'মিথ্যার' পর ভিত্তি করে তো তোমাকে পেতে চাই না। সব সত্য জানিয়েই তোমাকে চাইব।'

'তার মানে?'

'আমার সব কথা তোমাকে জানাব না?'

'কেন আমি কি সব কিছু জানি না?'

'আমি জোচ্চর-লম্পটও তো হতে পারি।'

মণিকা রেগে যায়। 'বাজে বকো না।'

দু'জনের কেউই আর এগোয়নি। গাড়ি ঘোরাবার পরই কথার মোড় ঘোরাল ক্যাপ্টেন। 'আচ্ছা তুমি আমজাদ-রমজানকে কি বলেছ?'

'কি বলেছি?'

ক্যাপ্টেন সরাসরি সে কথার জবাব দেয় না। একটু হাসে। একবার ভালো করে মণিকাকে দেখে। 'আমি সিগারেট খেতে খেতে ঘুমোই বলে এত দুশ্চিন্তা?'

মণিকা জবাব দেয় না।

বাঁ হাত দিয়ে ক্যাপ্টেন মণিকাকে একটু কাছে টেনে নেয়। মণিকা আপত্তি করে না। 'আমার জন্য তুমি এত ভাব?'

একটু চুপ করে থেকে মণিকা বলে, 'শুধু আমি কেন? আরো অনেকেই নিশ্চয়ই ভাবেন।'

'অনেককেই আর কোথায় দেখলে?'

এত কথা হল কিন্তু চিঠির কথা বলল না ক্যাপ্টেন। রাত্রে খেতে বসে মণিকার মাকে বলল, 'মাসিমা, এবার বোধহয় আমার মা আসছেন।'

'কবে আসছেন?'

'ঠিক জানি না তবে দু'এক উইকের মধ্যেই।'

মণিকা শুধু শুনল। কিচ্ছু বলল না।

ডক্টর ব্যানার্জি জানতে চাইলেন, 'তোমার বাবাও আসছেন?'

বাবা যে কোনোদিন তাঁর পুত্রের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না, সে কথা কি বলতে পারে? 'না। এখন তো ওঁর হাইকোর্ট খোলা।

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'তোমার মা'কে আবার রাজভবনেই তুলো না যেন। আমাদের এখানেই...'

'তুমি বরং কালকেই ওর মাকে একটা চিঠি লিখে দিও।'

স্বামীর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন মিসেস ব্যানার্জি।

মনে মনে খুশি হলেও ক্যাপ্টেন বলল, 'না, না, ওসব ঝামেলার কি দরকার। মা আমার ওখানেই থাকবেন!'

প্রতিবাদ করলেন ব্যানার্জি-দম্পতি, 'এতে আবার ঝামেলার কি আছে?'

ওদের সামনে বেশ গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও হঠাৎ ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কিন্তু মণিকা কি তা পছন্দ করবে?'

জবাব দেবে কি মণিকা? লজ্জায় জিভ কেটে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। ব্যানার্জি-দম্পতিও দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

কি আর করবে ক্যাপ্টেন? একটু স্বাভাবিক হবার জন্য মণিকার মাকে বলল, 'আচ্ছা মাসিমা, তিনজন নিয়েই তো আপনার সংসার। আপনি আর মেসোমশাই মাকে এখানে থাকার কথা বললেন অথচ মণিকা একটা কথা বলল না...'

আর মণিকা চুপ করে থাকে না। 'রাজভবনের স্টাফদের সবাই কি মিন-মাইন্ডেড হয়?'

পরের দিনই ক্যাপ্টেন গভর্নরের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেল। লেফটন্যান্ট ভাটিয়াকে গভর্নরের সব প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দিয়েই ক্যাপ্টেন ফিরে এলো তিন দিনের দিন।

ফিরে এসেই ডাক দেখল। মা-র চিঠি না দেখে মনে একটু খটকা লাগল ক্যাপ্টেনের। তবে কি মা-র মত নেই? না, না, তা কেমন করে হয়? আমার মা-কে আমি চিনি না? তবে কি মা অসুস্থ? নাকি বাবাকে নিয়েই আবার কিছু হল?

সেই ঘটনার পর বাবার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই ক্যাপ্টেনের। নববর্ষ-বিজয়ার পোস্টকার্ডও আসে না, যায় না। মা-র চিঠিতে অনেক কথা, অনেক খবর থাকে কিন্তু বাবার বিষয়ে কিচ্ছু লেখেন না। তাইত বার বার ভাবছিল বাবাকে নিয়েই আবার কোনো ঝামেলা হল নাকি?

অন্যান্য চিঠিপত্র পড়তে না পড়তেই টেলিফোন এলো। গভর্নমেন্ট হাউস পি-বি-এক্স থেকে অপারেটর ফোন করছে। 'স্যার গতকাল এলাহাবাদ থেকে ট্রাংকল এসেছিল...'

অপারেটরকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, কলিং পার্টি কে ছিল?'

'আপনার মা।'

'মা?'

'ইয়েস স্যার।'

'কি বললেন?'

'আমি বলছি আপনি আজ ফিরবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

খবরটা শুনে মনটা অনেক আশ্বস্ত হল কিন্তু শরীরটা ঠিক ভালো লাগছিল না। ভীষণ মাথা ধরেছিল। সারা গা-হাত-পা কেমন ব্যথা লাগছিল। এক কাপ কফি আর একটা স্যারিডন ট্যাবলেট খেয়ে একটু শুয়ে পড়ল। একটা সিগারেটও ধরাল। দু'চার টান দেবার পর আর সিগারেট খেতেও ইচ্ছা করল না। ফেলে দিল। ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা নতুন বেয়ারা ডিনার এনে দরজা নক্ করল কয়েকবার। কোনো জবাব পেল না। ফিরে গেল। ট্রে ভর্তি ডিনার নিয়ে ফিরে যেতে দেখে আমজাদ জিজ্ঞাসা করল, 'সাব নেই হ্যায় কামরামে?'

'বোধহয় না। নক্ করেও জবাব পেলাম না।'

আমজাদের সন্দেহ হল। এইতো একটু আগেই দার্জিলিং থেকে ফিরলেন। আবার এক্ষুনি বেরিয়ে যাবেন? এ-ডি-সি সব বাইরে গেল আমি তো দেখতে পেতাম। আমি দেখতে না পেলেও আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে যেতেন।

'চলিয়ে মেরে সাথ। সাব শো গ্যায়া হোগা।'

আমজাদ নক্‌ করেও জবাব পেল না। তারপর হাতলটা ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। সব টায়ার্ড হয়ে শুয়ে পড়েছেন।'

নতুন বেয়ারাটা টেবিলে খাবার রাখল। আমজাদ আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'সাব, সাব!'

ক্যাপ্টেন অঘোরে ঘুমুচ্ছে!

আমজাদ আবার ডাকল, 'সাব, খানা তৈয়ার হ্যায়। সাব!'

ওরা জানে ক্যাপ্টেনের ঘুম খুব পাতলা। একবার ডাকলেই উঠে পড়েন। শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো? সন্দেহ হল আমজাদের। আরো কয়েকবার ডাকল! তারপর একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এ-ডি-সি সাহেবের কপালে হাত দিল আমজাদ। আপন মনেই বলে উঠল, 'সাব কা বুখার হুয়া।'

দার্জিলিং কলকাতার ঠাণ্ডা গরমে এমন হতেই পারে। দু'তিনদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেবকে তো দু'তিনদিন শুয়ে থাকলে চলবে না। অনেক ভি-আই-পিকে তার রিসিভ—সি-অফ করতে হবে। আমজাদ ভেবে-চিন্তে ডাক্তার সাহেবকে খবর দিল।

ডাক্তার সাহেব একটু পরেই এলেন। ভালোভাবেই দেখলেন। না বুকে কোনো কমপ্লিকেশন নেই। সাডেন চেঞ্জ অফ ক্লাইমেট হয়েছে।

ক্যাপ্টেন বললে, 'কি কাণ্ড বলুন তো! এত রাত্তিরে আমজাদ আবার আপনাকে ডিসটার্ব করল!'

'না, না। ডিসটার্বের কি আছে?' একটু হেসে বললেন, 'একটা ক্যাপসুল পাঠিয়ে দিচ্ছি একটু কিছু খাবার পর ওটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে আবার আসব।'

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের রিং শুনে। রিসিভারটা তুলতেই অপারেটর বলল, 'স্যার, ট্রাংকল ফ্রম এলাহাবাদ।'

অনেক দিন বাদ মা-র সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। জানালেন, মণিকার মা-ও একটা সুন্দর চিঠি লিখেছেন। কালই জবাব দিয়েছি, হয়তো আজই পাবেন।

'তুমি কি আসছ?'

'আসব না? আজই বোম্বে মেলে রওনা হচ্ছি তুই হাওড়ায় থাকবি তো?'

ক্যাপ্টেন মজা করে বলল, 'আমাকে স্টেশনে যেতে হবে?'

'বাঁদরামি করিস না...'

এলাহাবাদ ট্রাংক-অপারেটর জানাল, 'টাইম ইজ ওভার।'

মা-র সঙ্গে কথা বলার পর ক্যাপ্টেনের খেয়াল হল, শরীরটা ঝরঝরে হয়েছে। মনেই হচ্ছে না গতকাল অসুস্থ ছিল। তাছাড়া মা-র আসার খবর পেয়ে যেন মনটাও বেশ খুশিতে ভরে গেল।

ক্যাপ্টেন উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল। ঝুঁকে দেখল গাছপালার পাতায় পাতায় সূর্যের আলো লুকোচুরি খেলছে। সামনের লতায় পাতায় শিশির খুঁজে না পেলেও রাত্রির শান্তি তখনও

দিনের কল্লোলে একেবারে হারিয়ে যায়নি।

একটু জোরে জোরে নিশ্বাস নিল। বুকটা জুড়িয়ে গেল। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া যে তখনও কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের দীর্ঘঃনিশ্বাসের ভয়ে পালিয়ে যায়নি। বেশ লাগল।

বাতাস যেন ওর কানে কল্যাণের আগমনী বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ক্যাপ্টেন মনের আনন্দে দু' লাইন গানও গাইল—'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে, সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে। অরূপবীণা...'

তাইতো! মণিকা বা মাসিমাকে তো বলা হল না মা আসছেন। আসছেন মানে? আজই বোম্বে মেলে রওনা হচ্ছেন।

'জানো মণিমালা, এক্ষুনি মা ট্রাংক কল করেছিলেন।'

'কি ব্যাপার?'

'তোমাকে দেখতে আসছেন...'

'সত্যি?' বলে ফেলেই বোধহয় মণিকার ভীষণ লজ্জা হল। হয়তো এমন করে আগ্রহ দেখান ঠিক হয়নি। হয়তো বাবা-মা কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। 'দাঁড়াও খবরটা মা-কেও দিচ্ছি।

খবরটা শুনে মণিকারও মাও খুশি হলেন। সত্যিই যে খুশি হয়েছিলেন, তা বোঝা গেল পরের দিন সকালে হাওড়া স্টেশনে।

ক্যাপ্টেন বেশ খানিকটা আগেই স্টেশনে পৌঁছেছিল। দমদমে একজন গেস্টকে সি-অফ করে সোজা এসেছিল। ফুল ইউনিফর্মে। সঙ্গে তকমা আঁটা উর্দিপরা অর্ডালি লখন সিং। রাজভবনের গাড়ি থেকে লখন সিং-কে নিয়ে নামতেই প্ল্যাটফর্মের কিছু লোক একবার দেখে নিল। জি-আর-পি'র একটা কনস্টেবল সেলামও দিল।

ক্যাপ্টেন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল। একবার হাতের ঘড়িটা দেখল। ট্রেন আসতে মিনিট পনেরো বাকি। প্লাটফর্মে পায়চারি করার জন্য একটু এগোতেই ক্যাপ্টেন আবাক হয়ে গেল।

'একি মাসিমা, আপনিও এসেছেন?' এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কার সঙ্গে এলেন?'

'উনিও এসেছেন।'

'সে কি? মেসোমশাইও এসেছেন?'

শুধু ক্যাপ্টেন নয়, ওর মা ট্রেন থেকে নেমেই ওদের পেয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'একি আপনারা কষ্ট করে এলেন কেন? মণিকাই তো নিয়ে যেতে পারত।'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'আপনি দয়া করে আমাদের ওখানে আসছেন আর আমরা আসব না।'

মণিকার মা বললেন, 'আপনার কথা এত শুনেছি যে দেখার আগ্রহটা চেপে রাখতে পারলাম না?'

ক্যাপ্টেনের মা বললেন, 'আমিও কি আপনাদের বিষয়ে কম জানি? আপনাদের না দেখলেও আপনারা আমার অপরিচিত নন।'

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মণিকা বাড়িতেই আছে?'

ওর মা জানালেন, 'হ্যাঁ।'

গাড়িতে মালপত্র চাপানো হতেই ওরা রওনা হলেন।

দুটো গাড়ি পর পর থামতেই মণিকা বেরিয়ে এসে ক্যাপ্টেনের মাকে প্রণাম করল। ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'দীর্ঘজীবী হও মা!'

সবাই মিলে ড্রইংরুমে গিয়ে বসে খোসগল্প শুরু করলেন। খানিকটা পরে মণিকার মা ভেতরে চলে গেলেন। নিশ্চয়ই সংসারের তদারকির জন্য। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ক্যাপ্টেনের মাকে বললেন, 'আর এখন গল্প করবেন না! এবার হাত মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিন।'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে জানাল, 'মাসিমা, আমি যত বেশি খাই, আমার মা তত কম খান। ব্রেকফাস্ট—ট্রেকফাস্টের ঝামেলা মা'র নেই।'

'সে কি? এখন কিছু খাবেন না?'

মিসেস ব্যানার্জি একটু অবাক হলেন।

'সকালে আমি কিছু খাই না।'

'সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসে একটু কিছু মুখে দেবেন না, সে কি কথা?'

ব্যানার্জি-দম্পতি সত্যি একটু অস্বস্তিবোধ করছিলেন। তাইতো ক্যাপ্টেন আবার বলল, 'স্নান-টান সেরে এক গেলাস সরবৎ ছাড়া আর কিছু খান না।'

'চলুন আপনারা ব্রেকফাস্ট খাবেন। আমি বসে বসে গল্প করব এখন।'

এতক্ষণে মণিকা বলল, 'আপনি বরং স্নানটা সেরে নিন।'

'একটু গল্প-টল্প করি। তারপর স্নান করব এখন। এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

মণিকার মা আবার ভেতরে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেনের মা এবার মণিকাকে বললেন, 'চল মা, তোমাদের বাড়িটা ঘুরে দেখি।'

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন।'

একতলা ঘুরে দোতলায় গিয়ে মণিকা বলল, 'এটাই আমার ঘর।'

'তা আমি জানি।'

মণিকা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশ ফিরে চাইল। 'আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ মা। আমি জানি। মানিক আমাকে সব কিছু লেখে।'

'সব কিছু?' মণিকা লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

'আমি তোমার এই ঘরে তোমার কাছেই থাকব কেমন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাছাড়া এ বাড়িতে তুমিই তো আমার সব চাইতে আপন।'

মণিকা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্যাপ্টেনের মা এবার মণিকার মুখখানা তুলে ধরে বললেন, 'সত্যি বলছি মা। মানিকের চিন্তায় আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না। কোন দোষ না করলেও ভগবান ওকে বড় শাস্তি দিয়েছেন।

মণিকা একবার মুহূর্তের জন্যে ওর দিকে তাকিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

ক্যাপ্টেনের মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

মণিকা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না কিন্তু অজস্র অজানা সম্ভাবনার জন্য বিশ্রী অস্বস্তিবোধ করল সারাদিন।

শুধু কি অস্বস্তি?

উৎকণ্ঠাও। ক্যাপ্টেনের জন্য একটা চাপা উৎকণ্ঠাও বোধ করল। জীবনে কী এমন আঘাত পেয়েছে ও? তাই কি ও এতটা সংযত, সংহত?

সমবেদনাও বোধ করল। মনটা ভীষণ নরম হয়ে গেল। নিজের সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসে ওর অতীত জীবনের সব দুঃখ, সব অভাব মুছে ফেলে দিতে চাইল।

সারাটাদিন বেশ কাটল। হাসি, গল্প, গান। রেঙ্গুনের গল্প, এলাহাবাদের গল্প। ক্যাপ্টেনের

ছোটবেলার গল্প। আরো কত কি। বুড়ো অধ্যাপক মণ্ডকে নিয়েই কাটল বেশ কিছুক্ষণ!

ব্রেকফাস্টের পরেই ক্যাপ্টেন চলে গিয়েছিল গভর্নমেন্ট হাউসে। অনেক কাজ ছিল। তবুও ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিফোন করছিল। মাকে, মাসিমাকে, মণিকাকে।

'তুমি কখন বেরুবে?'

'কোথায় আর বেরুব?'

'বিজয়া মাসিমার সঙ্গে দেখা করবে না?'

'আজকে আর যাচ্ছি না।'

'এমনি তো একটু ঘুরতে বেরুবে।'

'নারে বাবা না। আজ আমি কোথাও বেরুব না। এদের সঙ্গে গল্পগুজব করি। কাল–পরশু দেখা যাবে।'

ক্যাপ্টেন বুঝল জোর আড্ডা জমেছে। 'তাহলে আজ আর আমাকে দরকার নেই?'

'দরকার থাক আর নাই থাক, তোর কাজকর্ম শেষ হলে চলে আসিস।'

পরে একবার মণিকাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মাকে কেমন লাগছে?'

'তোমার চাইতে ভালো।'

'নিশ্চয়ই! সে বিষয়ে আবার ডাউট আছে নাকি? আফটার অল সি ইজ মাই মাদার।'

'তাই নাকি?'

'এক্সকিউজ মি ইওর এক্সেলেন্সি! ডু ইউ নিড ইওর এ-ডি-সি এনি টাইম টু-ডে?'

মণিকা ফিস ফিস করে বলেছিল, 'আই ডোন্ট নিড ইউ বাট তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

বিকেলে দিকে ক্যাপ্টেন এসেছিল। কিছুক্ষণ গুল্পগুজব করে চলে যাচ্ছিল। মা বললেন, 'আমার ফেরার টিকিটটা কাটতে ভুলিস না।'

'তুমি কবে যাবে?'

'ভাবছি পরশু চলে যাব।'

মিসেস ব্যানার্জি প্রতিবাদ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। 'তাই কি হয়? সপ্তাহ খানেক তো থাকুন, তারপর দেখা যাবে।'

'ওকে যে একলা রেখে এসেছি। বেশি দিন থাকি কি ভাবে?'

হঠাৎ মণিকা বলে ফেললো, 'তাহলে এখন এলেন কেন?'

'কি করব মা? অনেকদিন ছেলেটাকে দেখি না ; তাছাড়া তোমাদের দেখতেও ভীষণ ইচ্ছা করছিল।'

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'তাই বলে আপনি পরশু যেতে পারবেন না।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'তুমি বরং আজকের দিনটা চিন্তা কর। কাল আমাকে তোমার ডিসিশন জানিয়ে দিও।'

'তোর ওসব চালাকি ছাড়। এই করে করে তুই আমাকে সেবারের মতো করবি ভাবছিস, তাই না?'

'সত্যি সেবার মাকে মীরাটে আনিয়ে কি কাণ্ডটাই না করেছিল। আজ না কাল, কাল না পরশু করতে করতে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিল।

ক্যাপ্টেন চলে যাবার পর ওর মা মীরাট ষড়যন্ত্রের কাহিনিটা শোনালেন। 'মানিকটা যে কী, বুঝি না। এত বড়ো হল কিন্তু এখনও ছেলেমানুষি গেল না।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ডক্টর ব্যানার্জি স্টাডিতে বসে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। অনেক

কথার মাঝখানে ডক্টর ব্যানার্জি হঠাৎ বললেন, 'একটা ভালো ছেলের হাতে এই মেয়েটাকে তুলে দিতে পারলে আমরাও দু'জনে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

'ওর জন্য আর এত দুশ্চিন্তার কি আছে? মণিকার মতো মেয়েকে ঘরে নিতে পারলে অনেকেই খুশি হবেন।'

ব্যস। ওই পর্যন্তই। দু'পক্ষের কেউই আর এগোতে পারেননি। ডক্টর ব্যানার্জি তাড়াহুড়ো করতে চাননি। ক্যাপ্টেনের মা এগোতে পারেননি নিজের সংকোচের জন্য।

গল্পটল্প করে উপরে যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল।

'আমার জন্য তোমার শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গেল, তাই নাম মা?'

'না, না, এমন কি রাত হল?'

সেই শুরু।

ক্যাপ্টেনের মা শোবেন বলে মণিকার ঘরে নীচের থেকে একটা খাট এনে পাতা হয়েছে। দুটো সিঙ্গলবেডের খাটের মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁক।

'খাটটা একটু এগিয়ে নিই, কি বল মা! এত দূরে থাকলে তোমার সঙ্গে গল্প করব কেমন করে।'

মণিকাই খাট দুটোকে টেনে পাশাপাশি করল।

'দু'জনেই শুয়ে পড়লেন।

'তোমার এত কাছে শুলে তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

'না, না, অসুবিধে হবে কেন? আমি তো ভেবেছিলাম এই একটা খাটেই শোব কিন্তু মা বললেন আপনার কষ্ট হবে।'

তারপর কিছু মামুলি কথাবার্তা।

'মানিকের চিঠিতে পড়তাম তোমরা খুব ভালো লোক কিন্তু সত্যি ভাবিনি তোমরা এত ভালো।'

মণিকা প্রথমে কিছু জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, 'নিশ্চয়ই খুব বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখেন।

খানিকটা লজ্জা-দ্বিধার সঙ্গে কথা কটা বলল। ক্যাপ্টেনের মা-র কাছে ক্যাপ্টেনকে কি বলে উল্লেখ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ক্যাপ্টেনকে ক্যাপ্টেন বলাটা উচিত মনে হল না। উনি বা ও বলতেও লজ্জা করল।

'বাড়িয়ে লেখার ছেলে ও না! তুলাদণ্ডের বিচার করে ও কথা বলে, চিঠি লেখে...'

কথাটা শেষ হবার আগেই একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'...ওরা বাব জাজ্ হয়েও বিচারে ভুল করেছেন কিন্তু মানিক?...'

আবার থামলেন। আবার বললেন, 'অসম্ভব।'

মণিকাটা চুপ করে শুয়ে আছে। মুখোমুখি।

'মানিক যে বিচারে ভুল করে না, তার প্রমাণ চাও?'

মণিকা হাসল। 'আপনি মা হয়ে ওকে বেশি চিনবেন, না কি আমি?'

'প্রফেসর মণ্ডকে দেখাশুনা করতে গিয়ে যখন তোমার সঙ্গে, তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে ওর আলাপ হল তখনই আমাকে জানাল। আজ সারাদিন তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে ওর সেই চিঠিটার কথা ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'আলোটা জ্বাল।'

মণিকা উঠল। আলোটা জ্বালল।

'আমার স্যুটকেসটা খোল।'

মণিকা স্যুটকেসটা খুলতেই বললেন, 'উপরের শাড়িটার তলায় একটা লম্বা খাম আছে না?'

শাড়িটা তুলতেই খাম পেল।

'এদিকে নিয়ে এসো।'

মণিকা খামটা নিয়ে খাটের উপর বসল।

ক্যাপ্টেনের মা বললেন, 'ভেতরের চিঠিটা পড়ে দেখ।'

'আপনার চিঠি আমি পড়ব?'

'পড় না। মার কাছে লেখা ছেলের চিঠি পড়তে লজ্জা কি?'

ছোট্ট চিঠি।—'প্রফেসর মণ্ড যে আসছেন, সেকথা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। সেদিন ওই বৃদ্ধ অধ্যাপককে দেখতে গিয়ে আলাপ হল একটা বাঙালি মেয়ের সঙ্গে। মণিকা ব্যানার্জি। তারপর ওর বাবা-মা'র সঙ্গে। ডক্টর ব্যানার্জি রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন এবং সেই সূত্রে ওদের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। তুমি তো জান আমি তোমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারলেই সবচাইতে ভালো থাকি। খুব বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার মোটেও ভালো লাগে না, পছন্দও করি না। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে আমার অনেক দ্বিধা অনেক ভয়। তবুও ওদের সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। ডক্টর ব্যানার্জি দেবতুল্য লোক আর ওর স্ত্রী? মাসিমা? তোমার দ্বিতীয় সংস্করণ। তোমার এই হ্যাংলা ছেলেটাকে কি আদর-যত্ন করেই খাওয়ান!...'

চিঠিটা পড়তে পড়তেই মণিকা হাসল।

'হাসছ কেন?'

'এইসব হ্যাংলা-ট্যাংলা লেখার কোন মানে হয়।'

উনিও হাসতে হাসতে বললেন, 'ওর কথা বাদ দাও।'

মণিকা আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করল...'মণিকা? রূপ-যৌবন শিক্ষা-দীক্ষা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণচূড়ার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজের অহমিকা প্রচার করতে শেখেনি কিন্তু কাছে এলেই রজীনগন্ধার মতো সৌরভে ভরিয়ে দেয় সবাইকে। গভীরতা আছে কিন্তু উচ্ছলতা নেই! তুমি যখন কলকাতা আসবে, তখন আলাপ করিয়ে দেব। নিশ্চয়ই ওদের সবাইকে তোমার ভালো লাগবে।...'

চিঠিটা পড়া শেষ হল। তবুও মণিকা মনে মনে আবৃত্তি করল, কৃষ্ণচূড়ার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজের অহমিকা প্রচার করতে শেখেনি কিন্তু কাছে এলেই রজনীগন্ধার মতো সৌরভে ভরিয়ে দেয় সবাইকে।

চিঠিটা খামে ভরে আবার স্যুটকেসের মধ্যে রেখে সুইচটা অফ করল। ক্যাপ্টেনের মা-র পাশে শুয়ে পড়ল।

'তোমাদের সঙ্গে দু'চার দিন মেলামেশা করেই ওই চিঠি লিখেছিল...'

রাত্রিতে নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'জনে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ক্যাপ্টেনের মা বললেন, 'অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি কিন্তু...'

গলা দিয়ে যেন কথা বেরুতে পারল না।

মণিকা একটু অস্থির, একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, 'কিন্তু কি...'

'তুমি কি আমাদের ক্ষমা করতে পারবে?'

'একি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি মা।'

মণিকা একটু থতমত খায়। তবু বলে, 'আপনারা আবার অন্যায় কি করলেন যে ক্ষমা চাইছেন?'

'হয়তো ইচ্ছা করে করিনি কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্যায় করেছি বৈকি।'

গলার স্বরটা ভেজা ভেজা। হয়তো দু'এক ফোঁটা চোখের জল পড়তেও শুরু করেছে। মণিকা সাহস দেবার জন্য বলল, 'কিছু না কিছু অন্যায় সব মানুষেই করে তার জন্য এত...'

'ঘটনাটা যে বড়ই লজ্জার, বড়ই দুঃখের।'

ওই অন্ধকারের মধ্যে ছলছল জলভরা কাতর দুটি চোখ দেখতে পেল মণিকা। 'ওসব ভুলে যান। অত চিন্তা করার কি আছে?'

'তুমি ক্ষমা করলে, তুমি ভিক্ষা দিলে হয়তো সত্যি ভুলে যাব, হয়তো...'

'ছি ছি, আপনি অমন করে বলবেন না।' মণিকা দুটি হাত দিয়ে বৃদ্ধার দুটি হাত চেপে ধরল।

'এই রাত্রির অন্ধকারেও তোমাকে সে কথা বলতে ভয় করছে, লজ্জা করছে...'

'কি দরকার সে কথা বলার?'

'তোমাকে না বললে তো চলবে না মা।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ মা।'

মণিকা ঘাবড়ে গেল। 'আপনি কাঁদছেন?'

মণিকা তাড়াতাড়ি উঠে বসে হাত দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল। 'আপনি একটু ঘুমোন।'

'সারাটা বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। তোমাকে সবকথা না বলা পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না।'

'বলুন না কি কথা।'

'বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'সবকথা শোনার পর আমাকে, মানিককে, মানিকের বাবাকে ক্ষমা করতে পারবে কি? ঘেন্নায় আমাদের দূরে ঠেলে দেবে না তো?'

মণিক দু'হাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার ওইসব কথা বলছেন?'

'বলব না মা?'

রাত্রি আরো গভীর হল। গভীর হল দুটি প্রাণ, দুটি মন ক্যাপ্টেনের মা আর দূরে সরে থাকতে পারলেন না, লুকিয়ে রাখতে পারলেন না মনের কথা।

'...তিন পুরুষ ধরে এলাহাবাদে ওদের বাস। যথেষ্ট সম্মান সম্ভ্রম নিয়েই বাস করছিলেন। আজও সে সম্মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়নি সত্য কিন্তু হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে সারা সংসারটা ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে গেল।'

'ভূমিকম্প?'

'তার চাইতেও খারাপ মা। মানিক কমিশনড্...অফিসার হল। ওর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগে পড়লাম আমরা দু'জনে। বেনারসের একটা মেয়ে পছন্দ করা হল। বাবা-মা নেই। গরিব মাসির কাছে মানুষ হয়েছে। দেখতে শুনতেও বেশ। তাছাড়া বি-এ পাশ ছিল। জাস্টিস রায়ের

ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে ওরা তো হাতে স্বর্গ পেলেন।...'

মণিকা একটু উতলা হয়ে পড়ে, 'তারপর?'

'খুব ধুমধাম করে বিয়ে-বৌভাতও হল। মানিকের একদম ছুটি ছিল না বলে বৌভাতের পরের দিনই চলে গেল পাঠানকোট।'

মণিকা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে শুনল।

'মাস খানেক বেশ কাটল। খুব আনন্দে কাটল। কিন্তু তারপর একদিন কয়েক মিনিটের মধ্যে..'

থেমে গেলেন। আর যেন বলতে পারছিলেন না। গলার স্বরটা আরো ভারি হয়ে উঠেছিল। লজ্জায়, ঘেন্নায়, দুঃখে কিছুক্ষণ বাক-শক্তি রহিত হয়ে বসে রইলেন।

না, না, চুপ করে বসে থাকলে চলবে কেন? এই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই সব কিছু বলতে হবে, সব কিছু ফয়সালা করতে হবে।

...'আমি গঙ্গা পুজো দিতে গিয়েছিলাম ত্রিবেণীতে। সঙ্গমে সন্ধ্যার সময় একলা একলা যাওয়া ঠিক হবে না বলে চাকরটাও গিয়েছিল আমার সঙ্গে। ফাঁকা বাড়িতে শুধু পুত্রবধূকে পেয়ে ওর মাথায় যে কি ভূত চাপল, জানি না। হঠাৎ উত্তেজনায় উনি কয়েক মুহূর্তের জন্য পশু হয়ে গিয়েছিলেন।...

আবার একটু থামতে গিয়েছিলেন। উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে। গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। তবুও থামতে পারলেন না।

'...এই কলঙ্ক নিয়ে মেয়েটা বাঁচতে চাইল না। আলমারির লকার থেকে রিভলভার বের করে নিজেকে শেষ করে দিল...'

মণিকা তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'সে কি?'

'হ্যাঁ মা।'

এখানেই শেষ করেননি সে সর্বনাশা কাহিনি। বলেছিলেন কিভাবে সব ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হয়। দুনিয়ার সবাই জানল, জাস্টিস রায়ের পুত্রবধূ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে কিন্তু স্তম্ভিত জাস্টিস রায় স্ত্রীর কাছে, একমাত্র পুত্রের কাছে সব কথা বলেছিলেন। নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

'জানো মা, ওর মতো দেবতুল্য মানুষ হয় না। কিন্তু তবুও কেমন করে মুহূর্তের উত্তেজনায় উনি এমন কাজ করলেন, তা ভেবে পাই না। মানিককে উনি নিজের প্রাণের চাইতেও ভালোবাসেন। তবুও এসব হল কেমন করে, ভেবে পাই না।'

কাঁদতে কাঁদতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বৃদ্ধা।

'তারপর থেকে মানিক আর এলাহাবাদ যায়নি। আর ওর বাবার অবস্থা দেখলে তুমি চোখের জল রাখতে পারবে না। এত বড় অন্যায় করেও কোনো শাস্তি না পেয়ে মানুষটা যে কিভাবে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্ত জ্বলেপুড়ে মরছে, তা তুমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না মা...

মণিকাও স্থির থাকতে পারেনি। রায় পরিবারের সর্বনাশা কাহিনি শুনতে শুনতে চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেছে।

'এই অর্ধমৃত স্বামী আর ঘর ছাড়া পুত্র নিয়ে আমি যে কিভাবে বেঁচে আছি, তা ভাবতে পার মা? মানিককে কি আমি কোনোদিন ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারব না? ওর বাবা কি মৃত্যুর আগে আর মানিককে দেখতে পারবে না?...'

না, না, আর না। আত্মসমর্পণ করতে লজ্জা কি? এই বাকি রাতটুকুর মধ্যে যদি আত্মসমর্পণ

করে ক্ষমা না পাই, তবে তো ভোরের আলোয় মুখ দেখাতে পারব না।

দু'হাত দিয়ে মণিকার মুখখানা চেপে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, 'তুমি কি পার না মা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করতে, আমাদের সবাইকে বাঁচাতে?'

মণিকাও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ক্যাপ্টেনের মা-র বুকের মধ্যে নিজের মুখটা লুকিয়ে রেখে শুধু একবার চীৎকার করে বলে উঠল, 'মা!'

'মা?'

মণিকা আবার কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, 'অমন করে কাঁদতে নেই মা!'

'মা?'

'আমি তোমার মা? তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে? তুমি কি আমাদের ক্ষমা করলে মণিকা?'

মণিকা আর একটি কথারও জবাব দিতে পারল না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

'একটু আলোটা জ্বালবে মা?'

'কেন?'

'তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে মা।'

মণিকা তবুও চুপ করে বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে রেখে পড়ে থাকে। ক্যাপ্টেনের মা আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'একটু আলোটা জ্বাল না মা! তোমাকে যে ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে।'

নববধূর মতো দ্বিধা সংকোচে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে আলো জ্বেলেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্যাপ্টেনের মা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে নিজের চোখের জল মুছে উঠে গেলেন মণিকার কাছে। আঁচল দিয়ে মণিকার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেলেন।

মণিকা ঝপাং করে একবার ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেই দু'হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আনন্দেও দু'জনের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ মণিকার মুখটা তুলে ধরে বললেন, 'একটা জিনিস দেখবে?'

'কি?'

'এসো।'

নিজেই নিজের স্যুটকেসটা খুলে কাপড়-চোপড়ের নীচে থেকে একটা ফটো বের করে বললেন, 'মানিক কমিশনড্ অফিসার হবার পর ওর বাবার সঙ্গে এই ছবিটা তোলা হয়।'

মণিকা একটু অবাক হয়েই ফটোটা দেখল। পুত্রের গর্বে জাস্টিস রায়ের চোখ মুখ জ্বল জ্বল করছে। অথচ এই মানুষটাই...

দুর্ঘটনা কার জীবনে কখন ঘটে যায় তা বলা যায়?

হঠাৎ দু'জনের খেয়াল হল পূর্বের আকাশটা ফর্সা হয়ে উঠেছে। মণিকা সুইচটা অফ্ করে দিয়ে বলল, 'মা, এসব কথা কিন্তু আমার বাবা-মা বা অন্য কাউকে বলবেন না।'

'আচ্ছা।'

'আর এলাহাবাদে গিয়েই একবার বাবাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

'দেব?'

'নিশ্চয়ই! কয়েকটা মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু ওই কটা মুহূর্তটা তো জীবন নয়। জীবন অনেক বড়। অনেক ব্যাপ্ত।'

তিন মাস পর।

ক্যাপ্টেন, আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে ট্রান্সফার হল। ইমিডিয়েটলি জয়েন করতে হবে। তাইতো বাসা ভাড়া করে কলকাতাতেই সব কাজ সেরে নেওয়া হল।

ওয়ান আপ দিল্লি মেলের এয়ার-কন্ডিসনড্ বগীর সামনে বেশ ভিড় জমে গেছে। জনে জনে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা দু'জনে। গুরুজনদের প্রণাম করল, মাথায় তুলে নিল আশীর্বাদ।

'দশ-পনের দিনের মধ্যেই আসবেন তো বাবা?'

'আসব মা।'

'ঠিক বলছেন তো?'

জাস্টিস রায় হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি আমার মা, তুমি আমার চিফ্ জাস্টিস! তোমাকে কি মিথ্যা কথা বলতে পারি?'

সবাই হাসল। বৃদ্ধ আমজাদ শুধু একবার মাথা নিচু করে চোখ দুটো মুছে নিল।

ট্রেন ছাড়ল।

কূপের মধ্যে গিয়েই ক্যাপ্টেন একে একে সব লাইটগুলো অফ করে দিল।

'একি? এখুনি আলো অফ্ করছ কেন?

মণিকাকে দু'হাত দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মণিমালা এখনও আলো অফ্ করব না?'

ডিপ্লোম্যাট



হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম ;
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।

কর্মজীবন আর সংসারজীবনের দুটি গোলপোস্টের মাঝখানে দায়িত্ব কর্তব্যের ফুটবল পেটাতে পেটাতেই অধিকাংশ মধ্যবিত্তের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কিছু মানুষের বিচরণক্ষেত্র আরো বিস্তৃত, আরো রঙিন। কিছুটা বিস্তৃত, কিছুটা রঙিন হওয়া সত্ত্বেও সমাজসংসারে এদের নোঙর বাঁধা। চৌরঙ্গির অলিতে-গলিতে ঘোরাঘুরি বা সন্ধ্যার অন্ধকারে মিউজিয়ামের পাশে লুকিয়ে রিকশা চড়ে যৌবনের অলকা-নন্দা-অমরাবতী ভ্রমণের মেয়াদ কতটুকু, মীর্জাপুর বা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ঘরবাড়ি ছেড়ে বোম্বে সেল্স অফিসের মিস সোদ্ধিকে নিয়ে মেরিন ড্রাইভ বা চার্চ গেটের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করারই বা স্থায়িত্ব কতক্ষণ?

দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে স্বাধীনতা উপভোগের পর্ব শেষ হয়। সূর্যাস্তের পর সব পাখি ফিরে আসে ঘরে। শনি-মঙ্গল-রাহুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতেই একদিন সব থেমে যায় প্রায় সবার।

ডিপ্লোম্যাট-কূটনীতিবিদরা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। মীর্জাপুর বা রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ছেলে হয়েও সারা দুনিয়ায় তাঁদের বিচরণ, তাঁদের সংসার। বিশ্বসংসারের কত রঙ-বেরঙের নারী-পুরুষের সঙ্গে তাঁদের লেনদেন। দেশে-দেশে ছড়িয়ে থাকে এঁদের স্মৃতি, প্রাণের মানুষ, মনের টুকরো টুকরো স্বপ্ন।

তরুণ মিত্র যেদিন ফরেন সার্ভিসে ঢুকে কূটনীতিবিদদের তালিকায় নিজের নাম জুড়েছিলেন, সেদিন সত্যি উনি তরুণ ছিলেন। সেদিনের পর মিসিসিপি-ভলগা-গঙ্গা বেয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। অনেক জল-ঝড়, অনেক শীত-বসন্ত পিছনে ফেলে এসেছেন।

ফায়ার প্লেসের ধারে রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বাকি হুইস্কিটা হঠাৎ গলায় ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তরুণ মিত্র। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে চলে গেলেন স্টাডিতে। অতি পরিচিত পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালেন। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ, মহাসাগরের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ল্যান্ডিং এয়ার-ক্রাফট্-এর কমান্ডারের মতো খুঁজতে লাগলেন রানওয়ে। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির বোঝা নিয়ে মনের বিমান ল্যান্ড করাতে গিয়ে অনেকগুলো এয়ার-পোর্টের অনেক রানওয়ের হাজার হাজার আলো জ্বলে উঠল। দিল্লি...কায়রো...লন্ডন...মস্কো নিউইয়র্ক...হংকং...টোকিও এবং আরো কতো! এক সঙ্গে যেন সমস্ত কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ল্যান্ডিং সিগন্যাল আর নির্দেশ

পেলেন ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্র।

আরো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দুপা ডানপাশে সরে এলেন। চোখের সামনে নজরে পড়ল দিল্লি।

'সো ইউ হ্যাড অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টে ইন ঘানা...' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি ও ইউনাইটেড নেশানস ডিভিশনের হেড, পরমেশ্বরন হাসতে হাসতে ছোট্ট মন্তব্য করলেন।

তরুণ মিত্র বলল—'হ্যাঁ স্যার।'

মুহূর্তের জন্য দুজনেই চুপচাপ। তরুণ আবার বলে, 'আক্রায় পোস্টিং পেয়ে মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভালোই...'

পরমেশ্বরন ওয়ারলেস ট্রানস্ক্রিপ্টের ফাইলটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'ব্ল্যাক আফ্রিকায় পোস্টিং না পেলে কোনো ডিপ্লোম্যাটই ঠিক পুরোপুরি ডিপ্লোম্যাট হতে পারে না।'

'আজ সত্যি সত্যিই সে-কথা বিশ্বাস করি।'

রেঙ্গুন থেকে ঘানা। তরুণ মোটেও খুশি হতে পারেননি! ভেবেছিলেন কন্টিনেন্টে পোস্টিং পাবেন। কিছুদিন আগে ফরেন সার্ভিস ইন্সপেক্টরেটের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি রেঙ্গুনের ইন্ডিয়ান এম্বাসী ভিজিট করতে এসে বলেছিলেন, 'ঠিক মনে নেই, বাট সামওয়ান টোল্ড মী যে তুমি এবার কন্টিনেন্টে কোনো পোস্টিং পাবে।'

ফরেন সার্ভিসের অধিকাংশ নবীন কূটনীতিবিদদের মতো ব্ল্যাক আফ্রিকার নাম শুনেই তরুণের পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরকে পর্যন্ত মনের কথা জানিয়েছিল। অ্যাম্বাসেডর তরুণের কথা শুনে শুধু মুচকি হেসেছিলেন, মুখে কিছু বলেননি। প্রায় মাসখানেক পরে অ্যাম্বাসেডর একদিন তরুণকে ডেকে বললেন, 'স্পেশ্যাল সেক্রেটারি তোমাকে ঘানাতেই চান।'

সুতরাং আর অযথা বাক্যব্যয় না করে তরুণ কোকো আর সোনার দেশ ঘানায় গিয়েছিল। গিনি উপসাগরের পাড়ের আক্রায় কাটিয়েছে তিন বছর। কিন্তু গিনি উপসাগর বা দূরের দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের গর্জন ছাপিয়ে কানে এসেছে প্রেসিডেন্ট নক্রুমার তীব্র অহমিকার অসহ্য উল্লাস।

স্নিগ্ধ, শান্ত, বিচিত্র প্রকৃতির ছোট্ট কালো দুরন্ত ছেলে হচ্ছে ঘানা। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে চলে গিয়েছে তুলনাহীন বালুকাময় বেলাভূমি। সেই সুন্দর সুদীর্ঘ বেলাভূমি কখন যেন হারিয়ে যায় ঘন-কালো বনানীর মধ্যে। এই সীমাহীন অরণ্য আর বালুকাময় বেলাভূমিতেই লুকিয়ে আছে সোনার সংসার। তাই তো নাম ছিল গোল্ডকোস্ট! পশ্চিম আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেবার পর এলো ডেন আর ডাচরা। ফেরিওয়ালা সেজে ব্যবসা করতে এলো ইংরেজ। দেখতে দেখতে একদিন ফেরিওয়ালাই হলো মালিক।

তারপর প্রায় একশ' বছর ধরে চলল ইংরেজের লুটপাট। জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে গেল ম্যাঙ্গানিজ আর কোকো। শত শত বছরে প্রকৃতির আশীর্বাদে যে বনানী গড়ে উঠেছিল, জাহাজ বোঝাই করে তাও নিয়ে গেল। হাজার হাজার সিন্দুক বোঝাই করে নিয়ে গেল সোনা আর হীরের তাল।

ইংরেজ যখন গোল্ডকোস্টের অনন্ত সম্পদ লুটপাটে মত্ত, তখন সবার অলক্ষে চব্বিশ বছরের এক স্কুলমাস্টার পাড়ি দিলেন আমেরিকা। নিঃসম্বল এই কৃষ্ণকায় রোমান ক্যাথলিক যুবক নিদারুণ শীতের রাতে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়েছেন। 'ব্ল্যাক নিগার' বলে ধিকৃত হয়েছেন

আমেরিকার দ্বারে দ্বারে। কিন্তু তবুও তার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। দুটি ব্যাচিলার্স আর দুটি মাস্টার্স ডিগ্রী নেবার পর এলেন অ্যাটলান্টিকের এপারে, ভর্তি হলেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে।

এমনি করে বারো বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনার পর ছত্রিশ বছরের নক্রুমা ১৯৪৭ সালে ফিরে এলেন নিজের জন্মভূমিতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেশায় মাতাল করে তুললেন সত্তর লক্ষ দেশবাসীকে। সত্তর লক্ষ কৃষ্ণকায় সিংহের বজ্রমুষ্টিতে ইংরেজ না পালিয়ে পারল না।

সেদিন এই সত্তর লক্ষ মানুষ হাসিমুখে নিজেদের ভবিষ্যৎ তুলে দিল রাষ্ট্রনায়ক নক্রুমার হাতে।

ঘানার মানুষগুলো কালো কিন্তু বড় হাসি-খুশি ভরা। আনন্দে মেতে উঠতে বোধ করি এদের জুড়ি নেই সারা আফ্রিকায়। দূরাগত মানুষদের এরা বড় ভালোবাসে, বড় সমাদার করে। নিমন্ত্রণ করে বাদামের সুপ খাওয়ায়।

ঘানায় না গেলে কি তরুণ এসব জানত? জানত না। ঘানায় না গেলে আরো অনেক কিছু জানতে পারত না। আক্রা যে এত সুন্দর, এত আধুনিক শহর, তাও জানত না। অন্তরে অন্তরে নিজেদের ঐতিহ্যের জন্য অস্বাভাবিক গর্ববোধ করা সত্ত্বেও ঘানার মানুষ ভয়ে ভয়ে পশ্চিমী আধুনিকতাকে দূরে ঠেলে রাখেনি। তাই তো আক্রায় রয়েছে লা'রন্দির মতো বিখ্যাত নাইটক্লাব।

তিন তিনটি বছর আক্রায় কাটিয়ে এসে তরুণের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।...

মিঃ পরমেশ্বরন লাইটার দিয়ে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন। তরুণের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে একটু হাসলেন। প্রশ্ন করলেন, 'প্রেসিডেন্ট নক্রুমাকে কেমন লাগলো?'

'অফিসিয়ালি অর আন-অফিসিয়ালি জানতে চাইছেন?'

'তুমি সত্যি ডিপ্লোম্যাট হয়েছ। টেল মী ইওর পার্সোনাল ওপিনিয়ন।'

'একজন অসামান্য প্রতিভা, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে...'

'তবে কি?'

'যেভাবে চলছেন তাতে কিছুই বলা যায় না।'

'তার মানে?'

'প্রায় তিনশো কোটি টাকা ধার নেবার পরও যে দেশের অর্থনীতি টলমল করছে, সেই দেশের প্রেসিডেন্ট যদি উনিশ-কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজের মর্মর-মূর্তি তৈরি করতে যান, তাহলে দেশের মানুষ কতদিন বরদাস্ত করবে তা বলা কঠিন।'

'ইউ আর রাইট মাই বয়।'

এবার তরুণ হাসিমুখে বলে, 'তবে স্যার, প্রেসিডেন্ট নক্রুমা হ্যাজ এ চার্মিং পার্সোনালিটি। এমন ব্যক্তিত্ব যে কেউটে সাপকেও বশ করতে পারেন।'

'সাপুড়ে কিন্তু সাপের ছোবলেই মরে, তা জান তো?'

'দ্যাটস রাইট স্যার।'

তরুণ মিত্র সম্পর্কে পরমেশ্বরনের হৃদয়ে বেশ কিছুটা কোমল জায়গা রয়েছে। কনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে তরুণকে ভালোবাসার অনেক কারণ আছে। স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, ইন্টেলিজেন্ট। যে কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাছাড়া কূটনৈতিক দুনিয়ার গোপন খবর জোগাড় করতে তরুণের জুড়ি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে খুব বেশি নেই।

কেন, সেবার? টোকিও থেকে প্যান আমেরিকান ফ্লাইটে দিল্লি ফেরার পথে দুজন পাকিস্তানী

ডিপ্লোম্যাট ওর সহযাত্রী ছিলেন। পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাটরা ভাবতে পারেননি তাঁদের পিছনেই ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের তরুণ মিত্র বসেছিলেন। ওঁদের কথাবার্তায় তরুণ জানতে পারে, ইউ-এস-এয়ারফোর্সের একদল সিনিয়র অফিসার মাসখানেকের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত দেখতে আসবেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই কয়েক হাজার অফিসারের কোয়ার্টার তৈরি করা সম্ভব হবে? তাও আবার গিলগিট-পেশোয়ারের মতো জায়গায়!

জহুরীর কাছে কাঁচ আর হীরের পার্থক্য ধরতে যেমন কষ্ট হয় না, বুদ্ধিমান ডিপ্লোম্যাটের কাছেও তেমনি এই সব টুকরো টুকরো খবরের অনেক দাম, অনেক গুরুত্ব। তরুণ বেশ অনুমান করতে পারল পাকিস্তানে নাটকীয় কিছু ঘটছে।

পালামে যখন ল্যান্ড করল তখন সন্ধ্যা সাতটা। অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। এয়ারপোর্ট থেকেই জয়েন্ট সেক্রেটারিকে টেলিফোন করল, কিন্তু পেল না। খবরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিনা দ্বিধায় স্বয়ং ফরেন সেক্রেটারিকেই ফোন করল, 'স্যার, মাপ করবেন, বাট দেয়ার ইজ সামথিং ভেরী ইম্পর্টান্ট। জয়েন্ট সেক্রেটারিকে না পেয়ে আপনাকেই বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।'

পালাম থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তরুণ ছুটে গিয়েছিল আকবর রোডে ফরেন সেক্রেটারির বাড়ি। বলেছিল, 'স্যার, ওঁদের কথা শুনে মনে হলো ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয়। সন্দেহটা আরো গাঢ় হলো যখন দেখলাম ওঁরা ব্যাংককে নেমে সিঙ্গাপুরের প্লেন ধরতে ছুটে গেলেন। আই অ্যাম সিওর ওঁরা কে-এল-এম ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর থেকে কলম্বো হয়ে করাচি গেলেন।'

ডিনারের সময় হয়েছিল কিন্তু ডিনার না খেয়েই বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হলেন ফরেন সেক্রেটারি। ড্রাইভারকে গাড়ি আনার কথা বলে ভিতরের ঘরে গিয়েই প্রাইম মিনিস্টারকে টেলিফোন করে শুধু বললেন, 'খুব জরুরি ব্যাপার। এক্ষুনি একটু দেখা করতে চাই স্যার।'

ফরেন সেক্রেটারি তরুণকে নিয়ে তক্ষুনি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে গেলেন। আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে উঠে এলেন প্রাইম মিনিস্টার। সব শুনে বেশ চিন্তিত হলেন। ছোট্ট একটা মন্তব্য করলেন, 'ইন্টেলিজেন্স কিছু সন্দেহ করছিল বেশ কিছুকাল ধরেই।'

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টরকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠানো হলো প্রাইম মিনিস্টার্স হাউসে। তিনজনে মিলে শলাপরামর্শ শুরু হবার আগেই তরুণ বিদায় নিল।

এ খবর ফরেন মিনিস্ট্রির অনেকেই অনেক কাল জানতেন না। পরে অবশ্য অনেকেই জেনেছিলেন। স্ট্যালিনের রাজত্বকালে মস্কোর ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে পরমেশ্বরন যখন পলিটিক্যাল কাউন্সেলার, তরুণ তখন তাঁর অধীনে কাজ করেছে এবং একবার নয়, অনেকবার কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

পরমেশ্বরন তরুণকে নিজের কাছে রাখতে পারলে সব চাইতে সুখী হন। সব সময় তা সম্ভব হয় না। তবে ঘানা থেকে ফেরার আগেই তরুণকে ইউনাইটেড নেশনস পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন পরমেশ্বরন।

'জান তো এবার তুমি ইউনাইটেড নেশনস-এ যাচ্ছো?'

হাসি হাসি মুখে তরুণ উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ স্যার।'

'বছর দুই-তিন ওখানে থাকলে তুমি একটি কমপ্লিট ডিপ্লোম্যাট হবে।' পরমেশ্বরন একটু থেমে আবার বলেন, 'মেন পলিটিক্যাল কমিটিতে কাজ করলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি তোমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে!' -

টেলিফোন বেজে উঠল। কথা বললেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তরুণ বলল, 'মেন পলিটিক্যাল কমিটিতে তো পার্লামেন্টের একজন মেম্বার থাকবেন।'

'হ্যাঁ, একজন এম-পি থাকবেন। তিনি তো তোমাদেরই তৈরি বক্তৃতা শুধু রিডিং পড়বেন। তবে ওঁদের নিয়ে কোনো ঝামেলা হয় না। ওঁরা সরকারি পয়সায় কয়েক মাস নিউইয়র্কে থাকতে পারলেই মহা খুশি। তারপর খবরের কাগজের পাতায় যদি দু প্যারা বক্তৃতা ছাপা হয় তাহলে তো কথাই নেই।'

তরুণ মুচকি মুচকি হাসে। বিদেশে থাকবার সময় কয়েকজন ওই ধরনের লোকের দর্শনলাভও হয়েছে ওই সামান্য অভিজ্ঞতাতেই।

যাই হোক সারা পৃথিবীর টপ ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে মেশবার এমন সুযোগ আর পাবে না। লিফট-এ উঠতে নামতে, ক্যাফেটেরিয়াতে চা-কফি-লাঞ্চ খেতে খেতে দু-চারজন ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবেই।

দিল্লিতে আসতে না আসতেই তরুণ আবার ইউনাইটেড নেশনস-এ যাচ্ছে শুনে অনেকেই চমকে উঠলেন। ডিপ্লোম্যাটদের কাছে এর বিরাট মর্যাদা।

সন্ধের পর কনস্টিটিউশন হাউসের ওই একখানা ঘরের আস্তানায় তরুণ পা দিতে না দিতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'কনগ্র্যাচুলেশনস।'

তরুণ চমকে গেল। এরই মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেছে? টেলিফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল, হয়তো কাল ভোরেই দালালের দল হাজির হবে। বলবে, 'এক্সকিউজ মী স্যার। আপনি তো আবার বিদেশে যাচ্ছেন। আপনার টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টার, ক্যামেরা, বাইনোকুলার, ডিনার সেট, ওভার কোট, নাইলন শার্ট ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু কিনতেই আমরা রাজি।'

ভাবতেও গা-টা ঘিনঘিনিয়ে উঠল!

কিন্তু কি করবে? এর নাম দিল্লি! দেওয়ালে গান্ধীর ফটো লটকিয়ে ফ্রীজে বিদায় লুকিয়ে রাখাই এখানকার সামাজিক মর্যাদার অন্যতম নিদর্শন। অতীত দিনের বনেদী বাঙালির বাড়ির বৈঠকখানায় যেমন আলমারি ভর্তি 'সবুজপত্র' দেখা যেত, তেমনি আজকের দিল্লির সম্ভ্রান্ত মানুষের ড্রইংরুমে দেখা যায় ওয়াইন গ্লাস আর ডিক্যান্টার-এর প্রদর্শনী। সারা পৃথিবীর মধ্যে দিল্লিই একমাত্র শহর যেখানে ড্রইংরুমে ফ্রীজ রেখে প্রচার করা হয় ঐশ্বর্যের মহিমা।

এসব দেখতে ভারি মজা লাগে তরুণের। কূটনীতিবিদদের কদর সব দেশেই আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ কূটনীতিবিদ বা এম্বাসীর কর্মী দেখলে একটু যেন বেশি গদগদ হয়ে পড়ে। টাটা কোম্পানি বা বামা শেলের অফিসার এবং ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের চাইতে রেঙ্গুন বা ওয়াশিংটন ভারতীয় দূতাবাসের কেরানীর মর্যাদা এখানে অনেক বেশি। সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট হলে তো কথাই নেই! হবে না? ওঁরা যে বিদেশে ঘুরে বেড়ান, টেপ-রেকর্ডার ট্রানজিস্টার-নাইলনের শার্ট আনতে পারেন! ভারতবর্ষের মানুষ নাকি ত্যাগ-তিতিক্ষার আদর্শে দীক্ষিত! অথচ একটা সুইস ঘড়ি বা জাপানী ক্যামেরা দেখলে তো অধিকাংশ মানুষের জিভের জল গড়ায়!

তবে হ্যাংলামিটা যেন দিল্লিতেই বেশি।

'গুডমর্নিং।'

'গুডমর্নিং!'

'মিস ভরদ্বাজ বলছি। চিনতে পারেন?'

'মাই গড! যাকে দেখলে অ্যাম্বাসেডররা পর্যন্ত গাড়ি থামিয়ে লিফট দেন, তাঁকে তরুণ মিত্র ভুলবে?'

মিস ভরদ্বাজ কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু বেশ বোঝা গেল বড় খুশি হয়েছেন। ছোট্ট একটু মিষ্টি হাসির রেশ ভেসে এলো টেলিফোনে।

তরুণ মিত্র আবার বলেন, 'বলুন কি খবর? কেমন আছেন?'

'মেনি থ্যাঙ্কস! ভালোই আছি।'

ইতালীয়ান এম্বাসির এক ককটেল পার্টিতে মিস ভরদ্বাজের সঙ্গে তরুণ মিত্রের প্রথম আলাপ। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর মিস ভরদ্বাজ আজেবাজে খদ্দেরের কাজ পছন্দ করেন না। শুধু বিদেশি ডিপ্লোম্যাটদের কাজ করেন উনি। ইতালীয়ন অ্যাম্বাসেডরের সিটিংরুম ও ড্রইংরুমও ডিজাইন করেছেন মিস ভরদ্বাজ। এ কাজ খুব বেশি দিন করছেন না। নতুন বিজনেস শিকারের আশায় কূটনৈতিক দুনিয়ায় নিত্য ঘোরাঘুরি করছেন।

দিল্লির ইন্টিরিয়র ডেকরেটররা শুধু ড্রইংরুম বা অফিসরুমই সাজিয়ে-গুছিয়ে দেন না, মনে হয় ভালো ভালো খদ্দেরদের মনের অন্দরমহলও সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে ভালোবাসেন। তাছাড়া দেশি বিদেশি ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে একটু নিবিড় করে মেলামেশায় ওদেরও আরো অনেকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মিস ভরদ্বাজ সবে এই পথে পা দিয়েছেন। মিস প্রমীলা কাউলের মতো নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি অর্জনে এখনও অনেক দেরি।

মিস কাউলকে নিয়ে কত বিদেশি ডিপ্লোম্যাট যে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, তার হিসাব দেওয়া মুশকিল। জংপুরার বীরবল রোডে মিস কাউলের ফ্ল্যাটে যান। সকাল, দুপুরে, বিকেলে—যখন ইচ্ছা। সব সময়ই দু-চারজন ডিপ্লোম্যাটকে দেখতে পাবেন। অবশ্য সন্ধের পর মিস কাউলকে আর পাবেন না। পার্টি, ককটেল, ডিনার। সব শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়। একটা, দেড়টা, দুটো, আড়াইটে। উইক-এন্ডের পার্টিগুলো থেকে ফিরতে কখনও কখনও আরো দেরি হয়। মিঃ পার্কার, মিঃ বার্গম্যান বা আরো অনেকে অজন্তা-ইলোরা বা খাজুরাহের প্রাণহীন মর্মরমূর্তি দেখতে যাবার সময় প্রাণচঞ্চল মন-মাতানো মিস কাউলকে পাশে না পেলে শান্তি পান না।

দিল্লিবাসী বিদেশি ডিপ্লোম্যাটদের অনেকেই সামারে পাড়ি দেন নিজের নিজের দেশে। বিদেশি কূটনীতিবিদদের চারপাশে রোদন ভরা বসন্ত। মিস কাউলের মতো যাঁরা পার্কারের সঙ্গে একই প্লেনে সামার-কোর্সে যোগ দেবার জন্যে সেই সুদূর সাগর পারের অচিন দেশে যেতে না পারেন, তাঁরা তখন চেমসফোর্ড ক্লাবে বিজনেসম্যান আর কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গ দান করেন। হয়তো মুসৌরী বা নৈনীতাল ঘুরে আসেন।

মিস ভরদ্বাজ অবশ্য এখনও বিদেশি ইউনিভার্সিটির সামার কোর্সে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পাবার মতো হতে পারেননি। তবে—। যাক গে সেসব।

কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, কখনও আবার কিছু না বলেই মিস ভরদ্বাজ তরুণের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করলেন।

'কি ব্যাপার?' তরুণ মিস ভরদ্বাজকে অভ্যর্থনা জানাতে জানাতে প্রশ্ন করে।

'কেন, ডিসটার্ব করলাম নাকি?'

'মাই গড! ব্যাচিলার তরুণ মিত্রের ফ্ল্যাটে আপনার মতো অতিথির বিশেষ আগমন হয় না তো, তাই...।'

'সো হোয়াট?'

তরুণ মিস ভরদ্বাজকে অভ্যর্থনা করে ড্রইংরুমে বসায়। গাড়োয়ালী ভৃত্যকে কফি দিতে বলে।

তরুণের ধারণা দিল্লির মেয়ে আর মাছির চাইতে অসভ্য কিছু হতে পারে না। এরা যে কোথা থেকে কিসের জীবাণু-বীজাণু এনে ছড়িয়ে দেবে, তা কেউ টের পাবে না। মিস ভরদ্বাজ নিবিড়ভাবে মিশতে চাইলেও তরুণ পারে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে। মামুলি কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টা আর কফির পরই ইতি টানতে চায় সে। 'এক্সকিউজ মী মিস ভরদ্বাজ, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে...। সী ইউ এগেন।'

মিস ভরদ্বাজ তবু তরুণের আশেপাশে ভনভন করতে ছাড়ে না। সময় সুযোগ পেলেই হাজির হয়। এমনি করেই একদিন থলি থেকে বেড়ালছানা বেরিয়ে পড়ে।

'আই ওয়াজ টয়িং উইথ দি আইডিয়া অফ গোয়িং টু দি স্টেটস।'

'তরুণ খুশি হয়ে বলে, 'আমেরিকা যাবেন? খুব ভালো কথা।'

'কিন্তু...।'

'কিন্তু আবার কী?'

'ইউ মাস্ট হেল্‌প মী।'

'বলুন না কি সাহায্য করতে হবে?'

'ইন্ডিয়ান ডেলিগেশনে একটা টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট...।'

'আই অ্যাম সরি মিস ভরদ্বাজ, ও তো আমার ক্ষমতার বাইরে তাছাড়া...।'

'তাছাড়া আবার কি?'

তরুণ মিত্র মিস ভরদ্বাজকে খুশি করেনি। কিন্তু বছর খানেক পরেই এই অনন্যার দেখা পেয়েছিল নিউইয়র্কে।...

তরুণের ভারি মজা লাগে দিল্লির কথা ভাবতে। আজকের মতো তখন কার্জন রোডে এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স হস্টেল, আশেপাশের এম-পিদের বাংলোগুলোকে উপহাস করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াননি। কার্জন রোডের নোংরা স্যাঁতসেঁতে ব্যারাক কনস্টিটিউশন হাউস নাম নিয়ে তখন আভিজাত্যের বড়াই করত। হরেক-রকমের নারী-পুরুষের বাস ছিল, এই কনস্টিটিউশন হাউসে। রাত দশটা সাড়ে দশটায় ডাইনিং হলের সার্ভিস বন্ধ হতো কিন্তু ঘরে ঘরে অমৃতরসধারা পানের উৎসব শুরু হতো তারপরে। সাধারণ মানুষের আসা-যাওয়ার পালা বন্ধ হতো, শুরু হতো অস্বাভাবিক অসাধারণের আবির্ভাবের পর্ব। সামনের রিসেপশন কাউন্টার এড়িয়ে ওঁরা যাতায়াত করতেন মাঝরাতের আবছা আলোয়। ওই রাতের অন্ধকারে কতজনের সৌভাগ্যসূর্য উঠত, আবার অস্ত যেতো।

চেক ন্যাশনাল ডে-র পার্টি অ্যাটেন্ড করে মিঃ ভোঁসলের বাড়িতে ডিনার খেয়ে ফিরতে ফিরতে তরুণের অনেক রাত হয়ে গেল। কনস্টিটিউশন হাউসের বড় বড় আলোগুলো তখন নিভে গেছে, ফাঁকা দিল্লি শহরটা প্রায় গ্রামের মতো নিঝুম হয়ে পড়েছে। আবছা আলোতে ঘরের চাবিটা দেখবার সময় স্ফুলিঙ্গের মতো এক টুকরো হাসির ঝলক তরুণের কানে আসতেই–

মিস ভরদ্বাজ বললেন, 'দাউ টু-উব্রেটাস!'

'তার মানে?'

'এত সহজ কথাটা বুঝলেন না?'

'আই অ্যাম সরি মিস ভরদ্বাজ।'

ওই আবছা আলোতেই মিস ভরদ্বাজের বিদ্রূপ মাখা হাসি ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্রের দৃষ্টি এড়াল না। করিডরের পিলারটায় হেলান দিয়ে মিস ভরদ্বাজ বললেন, 'আপনিও তাহলে মাঝরাতের খদ্দের।'

মিথ্যা তর্ক করে সময় নষ্ট করে না তরুণ মিত্র। 'একটু ভুল হলো মিস ভরদ্বাজ। আপনার মতো আমি মাঝরাতের খদ্দের নই, আমি দোকানদার। খদ্দের আসে কিন্তু ফিরিয়ে দিই।...আচ্ছা, গুড নাইট।'

সে রাত্রে তরুণ মিত্র আর কিছু জানতে পারেনি, কিন্তু স্থির জানত মিস ভরদ্বাজ আমেরিকা যাবেনই।

কি করবেন মিস ভরদ্বাজ! শেরওয়ানী-চাপকান পরা পলিটিসিয়ানগুলো যেন এক-একটা নেকড়ে বাঘ। শিকার ধরতে এদের জুড়ি বোধকরি ভূ-ভারতে নেই। জর্ডনের জল না হলে যেমন খ্রিস্টানদের কোনো শুভ কাজ হয় না, আমাদের দেশেও তেমনি পলিটিসিয়ান না হলে কোনো কর্ম বা অপকর্ম সম্ভব নয়। একজিবিশন ওপন করতে এসে বনবিহারীলাল মিস ভরদ্বাজের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এই ওয়ান্ডারফুল ডেকরেশন করেছে এই সুইট ছোট্ট মেয়েটা!'

বাহাদুর শার পর বিহারীলালই দিল্লির সর্বময় অধীশ্বর হয়েছেন। তাঁর এই প্রশংসায় জেনারেল সেক্রেটারি মিসেস খাতুন পর্যন্ত গলে গেলেন, 'হাঁ জী, এহি লেড়কী আকেলা সব কুছ...'

সেই হলো শুরু। শেষ? সেকথা তরুণ মিত্র জানে না। যে দেশে বাঈজীবাড়ি আর ধর্মশালা প্রায় সমান সমান, সে দেশের পবিত্র মাটিতে মিস ভরদ্বাজের কাহিনির যে কোথায় শেষ তা সে জানে না। ডিপ্লোম্যাট তরুণ মনে মনে ভাবে ডিপ্লোম্যাসী রপ্ত করবার জন্য পয়সা খরচা করে জেনেভায় যাবার কোনো অর্থ হয়? দেশের অসংখ্য মেয়েগুলোর সর্বনাশ করেও যাঁরা দেশনেতা বলে পূজ্য, বেবী ফুডে ভেজাল দেবার পরও যাঁরা ধর্মশালা গড়ে হাততালি আদায় করতে পারেন, তাঁদের চাইতে বড় ডিপ্লোম্যাট আর কোনো দেশে পাওয়া সম্ভব!

দুই

ইউরোপের সবচাইতে গরিব দেশ পর্তুগালে আইন আছে, রাজধানী লিসবনে সবাইকে জুতো পরতে হবে। পয়সা কোথায়? লিসবনে হাজার হাজার মানুষের জুতো কেনার সামর্থ্য নেই। তবুও জুতোর মতোই একটা কিছু পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই হতভাগ্য মানুষের দল। দূর থেকে পুলিশ দেখলেই পরে নেবে। আবার পুলিশ একটু দূরে চলে গেলেই খুলে পকেটে রেখে দেয়।

চোখ মেলে চারদিক দেখলেই এসব দেখা যায়, জানা যায়। টুরিস্টদের মতো শুধু বাহ্যিক চোখের দেখাই ডিপ্লোম্যাটদের কাজ নয়। আরো অনেক কিছু দেখতে হয়, জানতে হয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। দশটা-পাঁচটার চাকরি করলে ডেপুটি সেক্রেটারি দায়িত্ব শেষ হয়, কিন্তু কেনসিংটনে বা ফিফথ্ অ্যাভিনিউতে ককটেল পার্টিতে গিয়ে ছ পেগ আট পেগ হুইস্কি খাবার পরও ডিপ্লোম্যাটকে সতর্ক থাকতে হয় গোপনে খবর জানার জন্য। হাজার হোক ডিপ্লোম্যাটরা মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বীকৃত গুপ্তচর ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্রেন্ডশিপ, আন্ডারস্টান্ডিং শুধু বকুনি মাত্র। ক্লোজ কালচারাল টাইস্ তেল দিয়ে খবর জোগাড় করার কায়দা মাত্র। অন্যান্য দেশের মতিগতি বুঝে নিজের দেশের সুবিধা করে দেওয়া অর্থাৎ স্বার্থরক্ষাই ডিপ্লোম্যাসির একমাত্র ধর্ম। এসব কথা সারা পৃথিবীর সমস্ত ডিপ্লোম্যাটরা জানেন। ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরাও জানেন।

সব জেনেশুনেও চলেছে এই লুকোচুরি খেলা। এক-এক দেশে এক-এক রকমের লুকোচুরি খেলা চলে। মস্কো বা ওয়াশিংটনের যে কোনো ডিপ্লোম্যাটিক মিশনে যান। দেখবেন, কেউ

কোনো ঘরে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন না। বাইরে বরফ পড়ছে, তবু পরোয়া নেই। ভেতরের গার্ডেনেই কথাবার্তা হবে। কেন? কেন আবার, জুজুর ভয়। কোথা দিয়ে কে সব কিছু টেপ রেকর্ড করে নেয়! আজকাল তো পয়সা দিলেই ওয়াচ রেকর্ডার পাওয়া যায়। ডিপ্লোম্যাটদের পিছনে টিকটিকি ঘোরাঘুরি করেই। টেলিফোনে কথাবার্তা নিরাপদ নয়। বড় বড় দেশের অনেক সামর্থ্য, কত কিছুই তারা করতে পারে। কিন্তু ওই ছোট্ট দেশ আফগানিস্থান! এমনই জুজুর ভয় যে কাবুলে সব ডিপ্লোম্যাটকেই টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখতে দেখা যাবে।

আরো কত কি আছে! তবুও এরই মধ্যে হাসিমুখে কাজ করে যান ডিপ্লোম্যাটরা। সুন্দরী যুবতী আর মদের প্রতি পৃথিবীর প্রায় সবদেশের মানুষের দুর্বলতা। বিশেষ করে উপঢৌকন হিসেবে, সৌজন্য হিসেবে যখন এসব আসে, তখন অনেক মানুষই লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। মদ বা মেয়েদের বর্জন করে ডিপ্লোম্যাসী করা অনেকটা কলের জলে কালীপুজো করার মতো। কাজকর্মের তাগিদেই রোজ সন্ধেয় ডিপ্লোম্যাটদের, ককটেল–লাউঞ্জ স্যুট পরে মদ খেতে হয়, মেয়েদের সঙ্গে নাচতে হয়, খেলতে হয়, হাসতে হয়। বারুদ নিয়ে খেলা করলেও বারুদের আগুনে পুড়তে পারেন না ডিপ্লোম্যাটরা। আরো অনেক সতর্কতা দরকার। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা সিভিল সাপ্লাই অফিসার বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঘুষ খেলে ক্ষতি হয় কিন্তু দেশ রসাতলে যায় না। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের থার্ড সেক্রেটারি বা একজন অতিসাধারণ অ্যাটাচি ঘুষ খেলে দেশের মহা সর্বনাশ হতে পারে। এভাবে বহু দেশের বহু সর্বনাশ হয়েছে, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় হবে।

বড় বড় দেশের তুলনায় ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের মাইনে অ্যালাউন্স অনেক কম। তবুও সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেলামেশা করতে হয় ওঁদের। চারিদিক থেকে প্রলোভন কম আসে না।

ইউনাইটেড নেশনস্-এর করিডরে বা কাফেতে মাঝে মাঝে দেখা হতো দুজনের। 'হাউ ডু ইউ ডু,' 'ফাইন, থ্যাঙ্ক ইউ' পর্যায়েই পরিচয়টা সীমাবদ্ধ ছিল। কদাচিৎ কখনও ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে দেখা হতো, সামান্য কথাবার্তা হতো। এর বেশি নয়।

কিছুকাল পরে আর্ট সেন্টার অফ দি ওরিয়েন্টের আমন্ত্রণে যশস্বিনী ভারতীয় নর্তকী কুমারী পদ্মাবতী আমেরিকা ভ্রমণ শেষে এলেন নিউইয়র্ক। ইন্ডিয়ান মিশনের উদ্যোগে ও নিউইয়র্ক সিটি সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় এই যশস্বিনী নর্তকীর নাচ দেখাবার ব্যবস্থা হলো।

পরের দিনই ভদ্রলোক ইউনাইটেড নেশনস্-এ মিঃ নন্দাকে ধরলেন। 'ইন্ডিয়ান মিউজিক, ইন্ডিয়ান ডান্স আমার ভীষণ ভালো লাগে। যদি কাইন্ডলি মিস পদ্মাবতীর প্রোগ্রাম দেখার...।'

মিঃ নন্দা বললেন, 'নিশ্চয়ই। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত করে বলবার কী আছে?'

ভালো করে আলাপ-পরিচয়ের সেই হলো সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঘনঘটা দেখা দিল। একটা আমেরিকান প্লেন ইউনাইটেড নেশনস্-এ ডিউটি দেবার সময় উত্তর কোরিয়ার আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেলে চীনাদের গুলি খাবার পর। আরোহী ও বিমান-চালকদের সম্পর্কে কিছু জানা গেল না। প্রায় একবছর পর খবর পাওয়া গেল এগারো জন বিমান-চালক। ও তাঁদের সঙ্গীরা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

শুরু হলো মারাত্মক স্নায়ুযুদ্ধ। আশঙ্কা দেখা দিল বিশ্ব-যুদ্ধের। ইউনাইটেড নেশনস্-এ ঝড় বইতে লাগল।

এমন সময় ইউ-এন কাফেতে নন্দার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা।

'আপনি বলেছিলেন আপনার কাছে সিটারের অনেক রেকর্ড আছে...।'

'হ্যাঁ, আছে।'

বেশি কিছু নয়, সামান্য টেপ করার অনুমতি চাইলেন। অনুরোধটা ঠিক পছন্দ না করলেও ভদ্রতার খাতিরে না বলতে পারলেন না মিঃ নন্দা। বললেন, 'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তবে কদিন একটু ব্যস্ত...।'

'কারেন্ট ক্রাইসিস নিয়ে ব্যস্ত বুঝি?'

যাই হোক কদিন পর ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই টেপ রেকর্ডার নিয়ে নন্দার ফিফটি সিক্স স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে হাজির হলেন। ডাইরেক্ট রেকর্ডিং চ্যানেলে টেপ রেকর্ডারটা ফিট করে খোস-গল্প শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ আজেবাজে কথাবার্তা বলার পর এলো সেই প্রশ্ন, 'এতবড় ক্রাইসিসে আপনারা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই?'

নন্দা বললো, 'আর সবার মতো আমরাও চিন্তিত।'

'দ্যাটস্ ট্রু, বাট ইন্ডিয়ার তো একটা স্পেশ্যাল পজিশন আছে। বোথ আমেরিকা আর চীনের বন্ধু হচ্ছে একমাত্র ইন্ডিয়া।'

'আরো অনেক দেশ আছে।'

'তবুও...।

'ওয়ার্লড ওয়ার হলে আমাদের এরিয়ার অনেক দেশের ক্ষতি হবে। তাই আমরা চাই ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যাক।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ইউ আর পারফেক্টলি রাইট মিস্টার নন্ডা। আমি সিওর, তোমরা চুপচাপ বসে থাকবে না। তাই না?'

উদাসীন ভাবে মিঃ নন্দা উত্তর দিলেন, 'জানি না। আমার মতো চুনোপুঁটি ডিপ্লোম্যাট কি এসব খবর জানতে পারে?'

নন্দা যে ইন্ডিয়ান মিশনের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করছিলেন, এ খবর ভদ্রলোক নিশ্চয়ই জানতেন। তা না হলে ওদের মিশনের পার্টিতে নন্দাকে এতবার করে যাবার কথা কেউ বলতো না এবং ভদ্রলোকও 'সীটার' রেকর্ড করার জন্য ওর ফ্ল্যাটে যেতেন না।

অবস্থা আরো জটিল হল। ওয়াশিংটনের হুমকি আর পিকিংয়ের অবজ্ঞা চলল সমান তালে। তাড়াহুড়ো করে আমেরিকা ফরমোজার সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করল, মার্কিন নৌবহরের সেভেনথ ফ্লীট চীনের চারপাশে মহড়া দিতে শুরু করল। তবুও চীন বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বার-বার বলল, 'হুঁশিয়ার আমেরিকা।'

ডালেস-ম্যাকার্থীর মতবাদের জোর যখন কমতে শুরু করেছে ঠিক তখন এই আন্তর্জাতিক ঘন-ঘটায় আমেরিকা আবার ক্ষেপে উঠল। ভারতবর্ষ সত্যি চিন্তিত হলো। এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত বলে দুনিয়ার খবরের কাগজে খবর ছাপা হলো। অনেকেই আশা করছিলেন ইউনাইটেড নেশনস-এ ভারত কিছু করবে ও পিকিং-এর সঙ্গে দিল্লির নিশ্চয়ই কথাবার্তা হয়েছে।

মিসিসিপি-ইয়াংসী নদীর জল আরো গড়াল। ইউনাইটেড নেশনস্-এর সেক্রেটারি জেনারেল দাগ হ্যামারশিল্ড গেলেন পিকিং। জানুয়ারি মাসের প্রাণান্তকর শীতের মধ্যেও হাসিমুখে চীনা নেতাদের সঙ্গে দিনের পর দিন কথাবার্তা বললেন। এক ফাঁকে ছ-মাইল দূরে দুঃসাহসিকা মহারাণীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক 'সামার প্যালেস' দেখলেন। এই প্যালেসের পাশে ওই সুন্দর লেকের স্বচ্ছ জলে হ্যামারশীল্ড হয়তো নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখার অবকাশ পাননি।

যদি সে প্রতিবিম্ব দেখতে পেতেন তবে নিশ্চয়ই অন্তরের অস্থিরতা বুঝতে পারতেন। সেক্রেটারি জেনারেল শূন্য হাতেই ফিরে গেলেন ইউইয়র্ক। তবে কেউ কেউ বললেন, আশা পেয়েছেন। আমেরিকাকে আর একটু শিক্ষা দিয়ে চীনারা ওই আটক বিমানচালকদের মুক্তি দেবে।

এবার সারা পৃথিবীর দৃষ্টি পড়ল দিল্লির উপর।

ঠিক এমন সময় নন্দা বদলি হলেন আমাদের হংকং মিশনে। 'সীটার' প্রেমিকের মতো কিছু ডিপ্লোম্যাট অনুমান করলো, স্পেশ্যাল অ্যাসাইনমেন্টে নন্দা হংকং যাচ্ছে।

সহকর্মীদের সহযোগিতায় ঘর-বাড়ি দেখে সংসার পাতার আগে নন্দা কয়েকদিনের জন্য হোটেলে আশ্রয় নিলেন। মান্দারিন বা হংকং হিলটনে থাকার মতো ট্যাকের জোর কোনো ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটেরই নেই। নন্দারও ছিল না। তাই তো তিনি আশ্রয় নিলেন উইনার হাউসে।

পর পর কদিন রাত্রে ডিনার খাবার সময় পাশের টেবিলে এক ভদ্রলোককে দেখেই নন্দার সন্দেহ হলো। পরে ইন্ডিয়ান মিশনের এক সহকর্মীর সঙ্গে কাম্ লিঙ্ ক্যান্টনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়েও এক কোণায় ডাইনিং হলের ওই ভদ্রলোককে দেখলেন। আবার একদিন উইনধাম স্ট্রিটে মার্কেটিং করার সময় মহাপ্রভুর পুনর্দর্শন হওয়ায় নন্দার আর সন্দেহ রইল না।

নন্দা সতর্ক হয়ে গেলেও বুঝতে দিল না। মিশনের দু একজনকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখল। তারপর একদিন ডিনার টেবিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো।

'তোমাদের ইন্ডিয়ার মতো চার্মিং ও ফ্রি সোসাইটির কোনো তুলনা হয় না।'

'মেনী থ্যাঙ্কস্ ফর দি কমপ্লিমেন্টস্।'

'সত্যি বলছি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড চালাতে গিয়ে কত দেশই ঘুরলাম কিন্তু ইন্ডিয়া ইজ ইন্ডিয়া।'

চিকেন-ফ্রায়েড রাইস আর পোর্ক শেষ করে কফির পেয়ালায় হাত দিতেই রাজনীতি এসে গেল।

'আই অ্যাম সিওর ইন্টারন্যাশনাল আফেয়ার্সে ইন্ডিয়া ইউনিক রোল প্লে করবে।'

নন্দা ছোট্ট উত্তর দেয়, 'আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আজকাল সব দেশ...।'

দিন কয়েকের মধ্যেই দুজনের আলাপ বেশ জমে উঠল ও একই সময় ডিনার খাওয়া শুরু হলো।

একদিন ভদ্রলোক যেন একটু তাড়াহুড়ো করে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে উঠে গেলেন। 'এক্সকিউজ মী, সিঙ্গাপুর থেকে একটা টেলিফোন আসার কথা!'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নন্দার খেয়াল হলো ভদ্রলোকের সিগারেট, লাইটার আব পার্স ডিনার টেবিলে পড়ে আছে। কফি খাওয়া শেষ করে নন্দা তিনটিই হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের ঘরে গিয়ে ফেরত দিল।

'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্! পার্সে অনেকগুলো ডলার আছে। অন্য কোথাও ফেললে আর উপায় ছিল না।'

নন্দা জানতেন, দিল্লি থেকে পিকিং-এ ও পিকিং থেকে দিল্লিগামী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের দেখাশুনা ও লেনদেনের দায়িত্ব যে কূটনীতিবিদদের উপর থাকবে, তাঁদের এমন টোপ অনেকেই গেলাতে চাইবে।

প্রলোভন কি শুধু বাইরে থেকে আসে? বিদেশ-বিভুঁইতে সব মানুষেরই কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দেয়। সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। পটুয়াটোলার গিরীশবাবুর মতো লোকও পুজোর ছুটিতে সপরিবারে বেনারস বেড়াতে গেলে দু-একদিন গান-বাজনা শোনার জন্য রাত করে ধর্মশালায় ফিরলে তাতে কেউ কিচ্ছু মনে করত না। কারুর বা আহার-বিহারের তীব্র শাসনে শৈথিল্য

দেখা যায়। কলকাতায় যারা চা-সিগারেট খায় না, তারাই বিলেতে গিয়ে বাঁদরের মতো মদ গেলে। পরিচিত সমাজ-জীবন থেকে মুক্তি পেলে সব মানুষই বেশ একটু পাল্টে যায়। প্রথম প্রথম ফরেন পোস্টিং পেলে অনেক ডিপ্লোম্যাট আত্মগরিমায় বিভোর হয়ে পড়ে, শৈথিল্য দেখা দেয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে। শৈথিল্য দেখা দেয় আরো অনেক কারণে। তবে সুন্দরী যুবতীর খপ্পরে পড়লে কথাই নেই।

'মে আই কাম ইন?'

দরজা একটু ফাঁক করে একজন ছিপছিপে সুন্দরী ভারতীয় মেয়ে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করতে চমকে গেল থার্ড সেক্রেটারি সেনগুপ্ত। মুহূর্তের জন্য মনের মধ্য দিয়ে একটা আনন্দ তরঙ্গের ঢেউ খেলে গেল।

একঝলক দেখে নিয়ে সেনগুপ্ত উত্তর দিল, 'ইয়েস প্লিজ।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে হাত থেকে বড় ট্রাভেলিং ব্যাগটা নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল, 'এক্সকিউজ মী, আর ইউ মিঃ সেনগুপ্তা?'

'দ্যাটস্ রাইট।'

এবার পরিষ্কার বাংলায়, 'নমস্কার।'

সেনগুপ্ত চেয়ারে বসে রইল কিন্তু মনটা আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে নেচে উঠল। ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলল, 'নমস্কার।'

মেয়েটি একটু হাসল। বলল, 'বসতে পারি?'

সৌজন্য দেখাতে ত্রুটি হবার জন্য লজ্জিত হল ডিপ্লোম্যাট সেনগুপ্ত। 'আই অ্যাম সরি, বসুন, বসুন।'

ইউরোপে এই হচ্ছে সেনগুপ্তের প্রথম পোস্টিং। রেঙ্গুনে থাকার সময় ভারতীয়দের সান্নিধ্য-লাভ এত দুর্লভ ছিল না কিন্তু বেলজিয়ামে এই একটা বছর ভারতীয় সান্নিধ্য লাভ প্রায় একেবারেই হয়নি। লন্ডনে ইন্ডিয়ান হাই-কমিশনে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা ভারতীয় দেখলে বিরক্ত হন। ব্রাসেলস্, দি হেগ বা স্ক্যান্ডেনেভিয়ার অন্যত্র যাঁদের চাকরি করতে হয়, তাঁরা ভারতীয় দেখলে খুশি হন। বাঙালি বা বাংলা কথা জানা লোক তো দূরের কথা! বেলজিয়ামের স্পেশ্যাল স্টিল কেনার জন্য যে ডেলিগেশন এসেছিল তাতে একজন বাঙালি ছিলেন। ব্রাসেলস্-এর ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে কাজ করতে গিয়ে আর কোনো বাঙালির সাক্ষাৎ পায়নি সেনগুপ্ত। বহুদিন বাদে একজন বাঙালি মেয়ের আবির্ভাবে সেনগুপ্ত সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করল।

'কতদিন পর বাংলা কথা বললাম জানেন?'

সেনগুপ্তের সাধারণ বুদ্ধির জোরেই একথা জানা উচিত ছিল যে এ প্রশ্নের উত্তর সদ্য পরিচিত মেয়েটির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবুও।

'অনেকদিন পর।'

'অ্যাট-লিস্ট ছমাস হবে।'

'কেন, ব্রাসেলস্-এ বাঙালি নেই?'

'শুনেছি কয়েকজন আছেন, তবে এখনও কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি,' আক্ষেপ করে সেনগুপ্ত জানাল।

সেই হলো শুরু। তারপর! অসংখ্য ভারতীয় যুবক-যুবতীর মতো চিত্রলেখা সরকারও পড়াশুনা করার আশায় লন্ডন গিয়ে শেষ পর্যন্ত চাকরি নিল। দেখতে দেখতে বছর তিনেক কেটে গেছে লন্ডনে। গত বছর একদল ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'কোচে' করে কন্টিনেন্ট

ঘুরেছে কিন্তু ঠিক মন ভরেনি। ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী দেখেই ফিরে গিয়েছে। তাছাড়া এমন গ্রুপে নানা ধরনের বিচিত্র ছেলেমেয়ে থাকেই এবং দু-চারজনের ব্যবহার সহ্য করাই দায়। বিশেষ করে মিউনিখে বেভেরিয়ান ফোক্ ডান্স দেখতে গিয়ে প্রদীপ সরকার, বড়াল ও রায়চৌধুরীর...।

"বিশ্বাস করুন মিঃ সেনগুপ্ত, ওদের ওই বড় বড় জাগে করে দু-তিনবার বিয়ার খাবার পর এমন বিশ্রী অসভ্যতা শুরু করল যে কি বলব।'

হাসতে হাসতে এক গাল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সেনগুপ্ত বললো, 'আপনাদের মতো ইয়ং অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ মেয়েরা সঙ্গে থাকলে বেভেরিয়াতে গিয়েও ছেলেরা একটু মাতামাতি করবে না?'

সিগারেটের ধোঁয়া গোল গোল পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ নটরাজন ঘরে ঢুকে সেনগুপ্তকে একটা চিঠি দিয়ে বলল, 'হিয়ার ইজ এ ক্লোজড লেটার ফর ইউ।'

'ক্লোজড লেটার বাট কান্ট এক্সপোজ এনিথিং,' হাসতে হাসতে পাল্টা জবাব দেয় সেনগুপ্ত।

নটরাজন কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, 'অ্যাম্বাসেডর কাল এগারোটায় আমাদের মিট করছেন, জান তো?'

'জানি।'

নটরাজন বিদায় নিল।

চিত্রলেখা বললো, 'একটু সাহায্যের জন্য এম্বাসীতে এসে আপনার নেমপ্লেট দেখে ঢুকে পড়লাম।'

'বলুন না কি করতে হবে?'

'আমার এক পুরনো বন্ধুকে স্টেশনে এক্সপেক্ট করেছিলাম কিন্তু আসেনি। স্টেশন থেকে টেলিফোন করে জানলাম ও আর ওখানে নেই। অথচ...।

'নতুন ঠিকানাও জানা নেই, এবং যদি এম্বাসীতে লোক্যাল ইন্ডিয়ানদের ঠিকানা থাকে, তাহলে?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।' স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে চিত্রলেখার।

'আই অ্যাম প্লিজড টু ইনফর্ম ইউ মিস সরকার, ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে সব খবর পাওয়া যায়, শুধু ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ানদের বিষয় ছাড়া।' চরম সত্যি কথাটা হাসতে হাসতে বললো সেনগুপ্ত।

মিস সরকার কথা আশা নিয়ে এসেছিলেন এম্বাসীতে কিন্তু এমন মর্মান্তিক দুঃখসংবাদ এত সহজে জানতে পারবেন, ভাবতে পারেননি। বেশ মুষড়ে পড়লেন। মুষড়ে পড়বারই কথা। সারা বছর পরিশ্রম করে মাত্র দুসপ্তাহের ছুটি। সামান্য সঞ্চয় নিয়ে মিস সরকারের মতো অনেকেই বেরিয়ে পড়েন দেশ দেখতে। এদের পক্ষে হোটেলে বা মটেলে থাকা অসম্ভব। সেনগুপ্ত সেসব জানে। একটু ভাবল, একটু দ্বিধা করল। হয়তো মনে মনে একটু বিচারও করল।

সেনগুপ্ত বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রস্তাব করতাম।'

'না না, মনে কি করব।'

'যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পারেন। কোনো অসম্মান বা অসুবিধা হবে না।'

সেনগুপ্তের কথাটা শেষ হবার আগেই মিস সরকার বললেন, 'তা তো আমি বলছি না, তবে...!'

হাসতে হাসতে সেনগুপ্ত বলল, 'জাগ্ জাগ্ বেভেরিয়ান বিয়ার খেয়ে বেভেরিয়ান ফোক্ ডান্স দেখাব না। তবে আমার হাতের রান্না খেতে হবে।'

কলকাতা শহরে এমন প্রস্তাব করা বা গ্রহণ করা শুধু অন্যায় নয়, অসম্ভবও। কিন্তু ব্রাসেলস্ শহরে এমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সহজ নয়। তাছাড়া বছর তিনেক বিদেশে বাস করার পর আমাদের দেশের মেয়েদেরও পুরুষের সঙ্গে মিশতে অ্যালার্জি হয় না।

চিত্রলেখা মিঃ সেনগুপ্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল রান্না করা নিয়ে। চিত্রলেখা বলল, 'আমি থাকতে আপনি রান্না করবেন? অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না।'

'দু-একদিনের জন্য আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করায় আপনাকে খাটিয়ে নেব? অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না।'

তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো কেউই রান্না করবে না, বাইরে রেস্তোরাঁয় খাওয়া হবে। চিত্রলেখা আর সেনগুপ্ত গ্রান্ড প্লেসে ঘুরে বেড়াল, অপূর্ব গথিক্ স্থপতি দেখল, টাউন হলের সিঁড়িতে বসে গল্প করল। ব্রাসেলস্-এর বিশ্ববিখ্যাত ওপন-এয়ার ফ্লাওয়ার মার্কেটে ঘুরল ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর রেস্তোরাঁয় মহানন্দে বেলজিয়াম-বাসীদের প্রিয় হুইস্কি, সস্ দিয়ে গলদা চিংড়ি ও ওয়াটারজুই—চিকেনের ঝোল খেল।

ব্রাসেলস্ ত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় চিত্রলেখা নিজে হাতে রান্না করে সেনগুপ্তকে খাইয়েছিল। খাবার পর সেনগুপ্ত বলেছিল, 'কেন অভ্যাসটা নষ্ট করে দিলেন বলুন তো।'

চিত্রলেখা বলেছিল, 'আপনি কি আমার কম ক্ষতি করলেন?'

'তার মানে?'

'আত্মীয়স্বজন ছাড়া বিদেশ-বিভুঁইতে একলা একলা বেশ ছিলাম। এই আত্মীয়তা করে কেন আমার মনটাকে খারাপ করে দিলেন বলুন তো?'

আর সেনগুপ্তের? সত্যি, নিজের আত্মীয়-বন্ধু সমাজ-সংসার ছেড়ে একলা একলা বিদেশে-বাস যে কত মর্মান্তিক তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। দূর থেকে মনে হয় ডিপ্লোম্যাটরা কত সুখী। কত অফুরন্ত আনন্দের সুযোগ। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওদের কি ইচ্ছা করে না সাধারণ মানুষের হাসি-কান্নায় ফেটে পড়তে? কত কি ইচ্ছা করে।

তাই তো দুটি দিনের কাহিনি দুটি দিনেই শেষ হলো না। দুদিনের স্মৃতির সুর কানে বাজতে লাগল দুজনেরই। ডিপ্লোম্যাটকে কতরকমের হঠকারিতা করতে হয় কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা, হঠকারিতা করা যে কত বেদনার, কত দুঃসহ তা সেনগুপ্তের মতো নিঃসঙ্গ ডিপ্লোম্যাট ছাড়া কেউ বুঝবে না।

হাজার হোক হিউম্যান মেটিরিয়্যাল, মানুষ নিয়েই ডিপ্লোম্যাট ও ডিপ্লোম্যাসি। তাই তো মাঝে মাঝে মনটা উড়ে যায় চান্সেরী বিল্ডিং থেকে অনেক দূরে, ঘুরে বেড়ায় টুকরো টুকরো স্মৃতির রাজ্যে। চিত্রলেখার চিত্রকে ঘিরে।

তরুণ এসব জানে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে, আগ্নেয়গিরির আগুন যেমন সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, ডিপ্লোম্যাটদেরও মনের দুঃখ, প্রাণের আক্ষেপ নজরে পড়ে না। স্মৃতির জ্বালায় দগ্ধ হবে কিন্তু কর্তব্যে ত্রুটি হলে ক্ষমা নেই, মার্জনা নেই। হয়তো একটা গোপন খবর বেফাঁস বেরিয়ে যেতে পারে, একটা গোপন সংবাদ জানতে পেরেও ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে ভুলে যেতে পারে। হতে পারে অনেক কিছু, কিন্তু শিকার ফসকে গেলে ডিপ্লোম্যাটের ক্ষমা নেই।

তিন

এর আগেও যখন কায়রো এয়ারপোর্টে কয়েক ঘণ্টা থেকে আবার বিদায় নিয়েছে, তখন তরুণ ভাবতে পারেনি পরের বার এমন পরিবর্তন দেখবে। এই কায়রো এয়ারপোর্ট! এত বড়, এত চমৎকার!

এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনটা কায়রো এয়ারপোর্টের দীর্ঘ রানওয়ে পার হতে হতেই তরুণ জানলা দিয়ে অবাক বিস্ময়ে শুধু এয়ারপোর্ট টার্মিন্যাল বিল্ডিংটাই দেখছিল। বিস্ময় যত বেড়েছে টার্মিন্যাল বিল্ডিং তত কাছে এসেছে। সুন্দর স্যান্ডস্টোনের অপূর্ব আধুনিক বিল্ডিং। লম্বায় প্রায় এসপ্লানেড-ধর্মতলার মোড় থেকে পার্ক স্ট্রিট হবে। স্ফিংকস-পিরামিডের দেশ যে এমন করে সারা দুনিয়াকে চমকে দেবে, কেউ ভাবতে পারেনি।

ইতিহাসের কাছে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। মানুষের আসা-যাওয়ার কাহিনি চিরন্তন। নিত্য ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নয়। কায়রো রওনা হবার আগে তরুণ তিন-চার সপ্তাহ হিস্টোরিক্যাল ডিভিশনে কাজ করেছে। শুধু মিশর বা নাসেরের নয়, সারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে ইতিহাসের দ্রুত পট-পরিবর্তনে। ভূমধ্য সাগরের চারপাশে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের চার আনা ঘটনা ঘটেছে। ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি ছাড়াও কত রাজা-উজীরের আবির্ভাব ও বিদায়, কত শত শক্তিশালী শক্তির উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী এই শান্ত স্নিগ্ধ, সুন্দর ভূমধ্য সাগর। সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে, হয়নি শুধু মানুষের আর প্রকৃতির। আমাদের দেশে পচা ভাদ্দরের পর আশ্বিনের হাসি আর শিউলির খেলা দেখান প্রকৃতি, তেমনি লীলা আছে ভূমধ্য সাগরের চারপাশে। মৃত্যুর মতো স্তব্ধ বালুকাময় অনন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরের শেষ সীমায় ভূমধ্য সাগরের কোল ঘেঁষে পাওয়া যাবে মিষ্টি মাতাল হাওয়া, গাছে গাছে আছে ফল-ফুলের নিত্য সম্ভার। কেমন, মানুষগুলো? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা তো ভূমধ্য সাগর বা নীল নদের জলে খেলা করেছেন যুগে যুগে।

মরুভূমির দেশগুলো যেন কেমন হয়! মরুপ্রান্তরে কোনো প্রাসাদই যেন চিরকালের জন্য নয়। শুধু পিরামিড আর প্রাণহীন মমিগুলোই যেন উত্তরকালের জন্য একমাত্র উপহার!

দিল্লিতে ব্রিফিং-এর সময় জয়েন্ট সেক্রেটারি মিঃ রঙ্গস্বামী বলেছিলেন, অতীত জানবে কিন্তু অতীত দিয়ে বর্তমানকে বিচার করো না সব সময়। আলিবাবার চিচিং ফাঁক আর পাবে না মিডল ইস্টে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে ঠিকমতো বর্তমানকে জানাই ডিপ্লোম্যাটদের প্রধান কর্তব্য।

রঙ্গস্বামী আরো বলেছিলেন দেখ তরুণ, আমাদের মতো ডিপ্লোম্যাটদের সব ভালো, কেউ খারাপ নয়। ইন্ডিয়া তো বিগ পাওয়ার নয় যে নিজেদের ভালো-মন্দ অপরের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে! আলখাল্লা পরা আরবদের ভালোবাসবে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা কোরো ওদের অতীত ইতিহাসকে।

হিস্টোরিক্যাল ডিভিশনের একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর বলেছিলেন, সুয়েজ খাল শুধু পশ্চিমের সঙ্গে পুবের যোগসূত্র নয়। কায়রো হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম পীঠস্থান।

সত্যি তাই! ওই বিরাট বিরাট পিরামিডগুলো যেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আর ঠান্ডা লড়াইয়ের সিংহদ্বার। নীল নদ পাড়ের ওই বিরাট সিংহমূর্তি যেন পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে সতর্ক সংকেত। কিং ফারুকের ওই বিরাট দেহটা যেন অচলায়তনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিল। তিন কোটি মানুষকে পশুর মতো অবজ্ঞা করে মদির ছিলেন ক্লিওপেট্রার স্বপ্নে। নীল নদের

জল যে গড়িয়ে গড়িয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রাসাদের তলায় এসে পৌঁছেছিল, তা টের পাননি এই মূর্খ সম্রাট!

ইতিহাস বরদাস্ত করল না। যেমন বরদাস্ত করেনি নেপোলিয়ন বা মুসোলিনী বা হিটলারকে। মরুপ্রান্তরে ঝড় উঠল, অতীতের বেদুইনদের মতো বালির তলায় হারিয়ে গেলেন সম্রাট ফারুক।

তরুণ মুগ্ধ হয়ে দেখেছে ইতিহাসের এই নিঃশব্দ শোভাযাত্রা। যে তিন কোটি মানুষ একদিন অভুক্ত থেকেও পিঠে পাথর টেনে প্রাসাদের পর প্রাসাদ গড়েছে, তিলে তিলে মৃত্যুকে কাছে টেনে নিয়েছে, সভ্য পাশ্চাত্যের কাছে যারা উপহাসের পাত্র ছিল, আজ তারাই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যতম নায়ক। নীল নদের দেশের সুন্দরীদের নিয়ে যে পাচাত্যের মানুষ ছিনিমিনি খেলেছে যুগ যুগ ধরে, আজ তারাই মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের নায়িকা। ভাবলেও, দেখলেও ভালো লাগে। কায়রোয় গিয়ে বেলি ডান্স দেখাই যেন একমাত্র কাজ ছিল এই আহৃত অতিথিদের। আজ কায়রোর রাস্তায় সেই পশ্চিমীরাই নায়েব-গোমস্তার মতো আরবদের মোসাহেবী করছে। দেশটাই শুধু স্বাধীন হয়নি অতীতের অত্যাচার অবিচার থেকে, মানুষগুলোও স্বাধীন হয়েছে। সভ্যতার আদিমতম সুপ্রভাত থেকে ইতিহাসের পাতায় পাতায় মিশরের উল্লেখ, কিন্তু মিশরের আরবরা এই প্রথম আত্মমর্যাদার স্বাদ পেল।'

ইন্ডিয়ান এম্বাসীর কন্‌সুলার অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাটাচি জোসেফ রসিকতা করে বলে, 'ভারতবর্ষ স্বাধীন কিন্তু ভারতবাসীরা পরাধীন!'

মজা করে বললেও কথাটা সত্যি। জোসেফ আবার বলে, 'লালকেল্লায় তেরঙ্গা চড়াবার পরই তো আমাদের দেশের মানুষ সাহেব-সুবাদের পুজো করতে শুরু করল।'

আর কায়রোয়? আলখাল্লা পরা আরবদের দেখলে সাহেবের দল রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াবে। কলকাতায় রবীন্দ্র জয়ন্তীতেও অনেক দেশের ভাইস-কন্সালকে সভাপতিত্ব করতে দেখা যাবে, আর কায়রোয় অমন অনুষ্ঠানের ইনভিটেশন পেলে অ্যাম্বাসেডরের দল আনন্দে নাচতে থাকেন।

কায়রোকে কোনোদিন ভুলবে না তরুণ। কাজ করার এমন আনন্দ খুব বেশি দেশে পাওয়া যায় না। লন্ডন-ওয়াশিংটন-প্যারিস-রোম বা টোকিওর ইন্ডিয়ান মিশনে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই অভারতীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। কথায় কথায় নিজের দেশের মানুষকে অবজ্ঞা দেখানো একদল ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটের প্রায় ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেনসেলভিনিয়া অ্যাভিনিউর ইন্ডিয়ান চান্সেরীতে সারা সপ্তাহে একজন আমেরিকানের আগমন হবে না, কিন্তু যে দু-চারজন ভারতীয় আসেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলার ফুরসৎ হয় না ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের। কায়রোর ইন্ডিয়ান মিশনে কালো আদমীদেরই পূজা করা হয়।

জোসেফ বলত, 'অল গ্লোরি টু নাসের!'

ওই আড্ডাখানায় কে হঠাৎ বলে উঠত, 'কেন?'

জোসেফ নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠত, 'মাই ডিয়ার বেবিজ! তোমরা জান না, আমি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আমাদের মিনিস্ট্রির ক্যান্টিন কমিটির সেক্রেটারি পর্যন্ত হতে পারিনি, আর আমাদের ডিয়ার ডার্লিং নাসের চৌত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবী নাচিয়ে দিল!'

ডিয়ার ডার্লিং নাসেরই বটে। শুধু মিশরে নয়, সারা আরব দুনিয়ার যৌবনের প্রতিমূর্তি নাসের। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নারী-পুরুষের হৃদয়ে তাঁর আসন। পৃথিবীর অন্যতম ঘৃণিত মানুষদের সে যে সারা দুনিয়ার সামনে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। তাই তো আরব দেশে কালা ভারতীয়দেরও মর্যাদা।

কায়রোর কূটনৈতিক জগতে ইন্ডিয়ান মিশন সত্যি এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

বড় বড় দেশে ইন্ডিয়ান মিশনকে থোড়াই কেয়ার করে! প্যাঁচে না পড়লে ইন্ডিয়ার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার প্রশ্নই ওঠে না। কায়রোয় তা নয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নাসের ভারতের সঙ্গে পরামর্শ করবেনই। আন্তর্জাতিক পরিবারের মধ্যে ভারত-মিশর পরমাত্মীয়।

কায়রোকে তরুণ ভুলতে পারে না আরো অনেক কারণে।

ইন্ডিয়ান এম্বাসির একদল ডিপ্লোম্যাট ও তাঁদের স্ত্রীরা সেদিন দল বেঁধে 'কায়রো টাওয়ার' রিভলবিং রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গিয়েছিলেন। মিঃ অ্যান্ড মিসেস পুরি, মিঃ অ্যান্ড মিসেস সিং, মিঃ অ্যান্ড মিসেস মিশ্র, দিল্লির নর্দান টাইমসের স্পেশ্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা এবং আরো তিন-চারজন মিলে মহানন্দে ডিনার খাওয়া হলো। স্টিমড মিট আর জোসেফের কমেন্টারী—দুই-ই একসঙ্গে উপভোগ করলেন সবাই।

ডিনার খাওয়ার পর ইজিপসিয়ান ব্ল্যাক কফি খাবার সময় মিঃ পুরি কফির পেয়ালা তুলে প্রপোজ করলেন, 'আগামী জয়েন্ট ডিনারের আগে তরুণের বিয়ে করতেই হবে, নয়তো...'

জোসেফ ফোড়ন কাটল, 'নয়তো ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি বরবাদ হবেই।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার পথে মিঃ কলহান হঠাৎ একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'হাউ আর ইউ হাসান?'

'ফাইন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার,' হাসান উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দেয়।

সৌজন্যমূলক দুটো একটা কথা বলার পর মিঃ কলহান জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসান, হ্যাভ ইউ মেট আওয়ার নিউ কলিগ সেনগুপ্ত?'

'কই না তো।' বাঙালির সঙ্গে দেখা করার লোভে হাসান টেবিল ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'উনি আছেন নাকি আপনাদের দলে?'

মিঃ কলহান আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'দুই বাঙালি এক হয়েছে, এবার তো তোমরা সারা দুনিয়া ভুলে যাবে। সো ক্যারি অন মাই বয়েস! গুড নাইট!'

ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে বাঙালি যেমন দুর্লভ, পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে বাঙালির প্রাচুর্য ঠিক তত বেশি। এর কারণ অবশ্য পাকিস্তানের সামরিক একনায়কদের বাঙালি-প্রীতি নয় ; বরং ঠিক তার উল্টোটাই সত্য। বাঙালি সিনিয়র অফিসারদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা করাচি রাওয়ালপিন্ডির পাঠান বীরেরা খুব নিরাপদ মনে করেন না। সেজন্য পাকিস্তানের কৃষি, মৎস্য, পরিবার পরিকল্পনা বা রেডিওতে কিছু ছোট বড় বাঙালি অফিসার পাওয়া যাবে। সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টও বাঙালি হতে পারে কিন্তু তারপর খবরদার! জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা এস-পি বা হোম মিনিস্ট্রির গোয়েন্দা বিভাগে বা দেশরক্ষা দপ্তরে? নো অ্যাডমিশন ফর ইস্ট পাকিস্তানিজ! তাই তো পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসে কিছু বাঙালিকে ভর্তি করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে এবং করাচি রাওয়ালপিন্ডি স্ট্যাটিসটিক্স প্রচার করে বাঙালি-প্রীতির ঢাক বাজাচ্ছে।

যাই হোক, পাকিস্তান মিশনে বাঙালি দেখা যায়। চাকরির খাতিরে যাই করুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গের কোনো বাঙালিকে কাছে পেলে এঁরা সারা দুনিয়া ভুলে যান। রাজনীতির চাইতে পদ্মার ইলিশ মাছের বিষয় আলোচনা করাই পাকিস্তানের বাঙালি ডিপ্লোম্যাটরা বেশি পছন্দ করেন। ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যে সব বাঙালি আছেন, তাঁরাও এঁদের পেলে আর কাউকে চান না। তরুণও চায় না। এই তো রেঙ্গুনে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে কি আনন্দই করেছে।

সেও এক দুর্ঘটনা? রেঙ্গুন চিড়িয়াখানায় সেদিন লোকে লোকারণ্য। স্নেক-কিসিং—শঙ্খচূড় কোবরা সাপকে সাপুড়ে চুমু খাওয়ার খেলা দেখাবে বলে ভীষণ ভিড়। আমেরিকান টুরিস্টরা

তো ভয়ের চোটে কাছেই এগুলো না। একদল বর্মী ছেলেমেয়ের সঙ্গে কিছু ভারতীয়, কিছু চীনা লোকই সামনের দিকে ভিড় করেছিল। সাপকে চুমু খাওয়ার খেলা দেখতে দেখতে আব্বাসউদ্দীন মুগ্ধ হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই বাংলায় বলে উঠল, 'বাপরে বাপ!'

ব্যস! ওই বাংলা শুনেই তরুণ আলাপ করেছিল আব্বাসের সঙ্গে। আলাপের শেষে 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ' বলেই তরুণকে ছেড়ে দেয়নি সে। হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে আম্মাজানকে জানিয়েছিল বাঙালি ধরে এনেছে।

ওই প্রথম দিনের পর আম্মাজানের স্নেহের আকর্ষণে তরুণ নিজেই যেত। ছুটির দিনে তরুণকে রান্না করে খেতে হয়নি কোনোদিন! আম্মাজানের হুকুম ছিল, 'ছুটির দিনেও যদি আমার এখানে খেতে না পার তবে আর আসতে হবে না। আমাকে আম্মাজান বলেও ডাকবে না, বুঝলে!'

তরুণ মুখে কিছু উত্তর দেয়নি, মুখ নিচু করে মুচকি হেসেছিল।

বেশ কেটেছে রেঙ্গুনের দিনগুলো। কখনও কিচেনের দোরগোড়ায় চেয়ার টেনে নিয়ে আম্মাজানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে, কখনও আবার আব্বাসের লুঙ্গি পরেই সোফায় শুয়ে শুয়ে টেপ রেকর্ডারে ভাটিয়ালী গান শুনেছে।

হাসান পরিবারের সঙ্গেও তরুণের হৃদ্যতা হতে সময় লাগল না।...

'দেশের কথা বলো না ভাই, শুনলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়,' প্রায় ছল ছল চোখে তরুণ হাসানকে বলতো।

মন খারাপ হবে না? ঢাকা-উয়াড়ীর অলিতে-গলিতে যে ওর জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় স্মৃতি মিশে আছে। পোগোজ স্কুলে পড়া, পুরনো পল্টন, রমনা বা বুড়ীগঙ্গার পাড়ে বিকেলবেলা ঘুরে বেড়ান, খেলাধুলো করা, আড্ডা দেওয়ার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভালো লাগে না। লন্ডন, মস্কো, ওয়াশিংটনও ভালো লাগে না। নাইল হিলটনের ডিনার খাবার চাইতে মণি কাকিমার হাতের নারকেলের গঙ্গাজলি বা ঢাকাই পরটা অনেক অনেক বেশি ভালো লাগত।

হাসানের স্ত্রী রাবেয়া, কারমান্নেসা স্কুলের ছাত্রী। কারমান্নেসা স্কুলের কথা মনে হলেই যে মনে পড়ে যায় আরেক জনের কথা। মুহূর্তের মধ্যে মনটা যেন পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী- বুড়ীগঙ্গার মতো মাতলামি শুরু করে দেয়।...

উয়াড়ীর রামকৃষ্ণ মিশন রোডের প্রায় মোড়ের মাথাতেই ছিল তরুণদের বাড়ি। বুড়োরা বলতেন, বরদা উকিলের বাড়ি। অল্পবয়সীর দল বলতেন, কানাই উকিলের বাড়ি। তরুণের দাদু বরদাচরণ সেনগুপ্ত সেকালের মস্ত নামজাদা উকিল ছিলেন। ফৌজদারি মামলায় ঢাকা-ময়মনসিংয়ে বরদা সেনগুপ্তের জুড়ী ছিল না কেউ। বড় বড় মামলায় চট্টগ্রাম-সিলেট থেকেও ডাক পড়ত।

বরদাচরণের সাধ ছিল তিন ছেলেকেই ওকালতি পড়ান। তা হয়নি। বড় দুই ছেলে কোর্ট-কাছারির ধার দিয়েও গেলেন না। বড় ছেলে পোস্টাফিসে ও মেজ ছেলে রেল কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। বরদা উকিলের সাধ পূর্ণ করলেন ছোট ছেলে কানাইবাবু। বাপের মতো পসার বা নাম ডাকা না হলেও উয়াড়ীর মধ্যে ইনিও বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

বাবা কানাইবাবুর মতো তরুণও পড়ত পোগোজ স্কুলে, খেলত রমনার মাঠে। বাকি সময় কাটাত টিকাটুলির গুহবাড়িতে। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণের মিষ্টি মধুর সোনালী দিনগুলিতে গুহবাড়িই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে

বলেই মানুষ পৃথিবীতে আছে, নয়তো কোথায় সে চলে যেত! প্রত্যেক মানুষের জীবনেও এমনি একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করে—যে শক্তি তাকে প্রেরণা দেয়, শক্তি জোগায়। যার জীবনে এই অদৃশ্য শক্তির প্রেরণা নেই, সে মহাশূন্যে বিচরণ করে।

টিকাটুলির গুহবাড়ির ইন্দ্রাণীকে ঘিরেই তরুণের জীবনের সব স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল। সে কাহিনি কেউ জানত, কেউ জানত না। কিন্তু ওরা দুজনে জানত, বিধাতাপুরুষ ওদের বিচ্ছিন্ন করবেন না, করতে পারেন না। বুড়ীগঙ্গার জল শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু তরুণের জীবন থেকে ইন্দ্রাণী বিদায় নিতে পারে না বলেই সেদিন মনে হতো।

মনে তো কত কিছুই হয়। ভেবেছিল কি অমন সর্বনাশা দাঙ্গায় সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? কোর্টে অতবড় মামলায় জেতার পর তরুণের মার জন্য অমৃতি কিনে বাড়ি ফিরছিলেন কানাইবাবু! সে অমৃতি আর খাওয়া হলো না তরুণের মার। একটা ছোরার আঘাতে সব আনন্দ চিরকালের মতো শেষ হলো তাঁর।

সারা ঢাকা শহরটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। কত সংসারে যে আগুন লাগল, তার ইয়ত্তা নেই! কত নিরপরাধ মানুষের রক্তে যে বুড়ীগঙ্গার জল লাল হলো, সে হিসাবও কেউ রাখল না।

বাবার মৃতদেহ কোনোমতে দাহ করে বাড়ি ফিরে এসে ওই লাইব্রেরি ঘরে পাথরের মতো বসে রইল তরুণ। যখন হুঁশ হলো তখন সারা টিকাটুলি প্রায় শ্মশান হয়ে গেছে। পাগলের মতো চিৎকার করে সারা টিকাটুলি ঘুরেও ইন্দ্রাণীর হদিস পেল না তরুণ।...

টিকাটুলির শ্মশানের আগুন আজো তার মনের মধ্যে অহরহ জ্বলছে। মাকে হারাবার পর নিঃসঙ্গতা যত বেড়েছে ইন্দ্রাণীর কথা তত বেশি মনে পড়েছে।

হাসানের স্ত্রী রাবেয়ার কথায় তাই তো তরুণ হারিয়ে ফেলে নিজেকে। হাজার হোক ডিপ্লোম্যাট। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'দিদি ওসব কথা আর বলো না। তার চাইতে মাংসের গরম গরম পকোড়া খাওয়াও।'

পকোড়ার পর কফি খেতে খেতে হাসান বলে, রাবেয়া, অন্নদাশঙ্করের কবিতা পড়েছ?'

রাবেয়ার উত্তর পাবার আগেই হাসান আবার বলে—

'ভুল হয়ে গেছে
বিককুল
আর সব কিছু
ভালো হয়ে গেছে
ভাগ হয় নি কো নজরুল
অ্যান্ড হাসান অ্যান্ড তরুণ...

তরুণের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'উঁহু! হলো না।'

হাসান জিজ্ঞাসা করল, 'হলো না আবার কি?'

'হবে—নজরুল অ্যান্ড রাবেয়া অ্যান্ড...'

রাবেয়া মুচকি হাসতে হাসতে হাসানকে বলল, 'হেরে গেলে তো আমার ডিপ্লোম্যাট দাদার কাছে।'

হাসান আর হারতে পারে না। 'তুমি যদি অকে ডিপ্লোম্যাট কও, আমি হালা কমু।'

কি আনন্দেই কেটেছে কায়রোর দিনগুলো। রাজনৈতিক-কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অহর্নিশি ইন্ডিয়ান-পাকিস্তান এম্বাসির লড়াই চলত। ভারতবর্ষে মুসলমান নির্যাতনের অলীক কাহিনি প্রচার

করে পাকিস্তান এম্বাসী আরবদের মন জয় করার চেষ্টা করত। আর অতীতের পশ্চিমী আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আরবদের জয়যাত্রাকে প্রতি পদক্ষেপে স্বাগত জানাত ইন্ডিয়ান এম্বাসী। বোম্বে থেকে জাহাজ বোঝাই করে হজযাত্রীরা মক্কা যান। অনেক স্পেশ্যাল প্লেনও যায় বোম্বে থেকে। ওমান উপসাগরের মুখে এমনি হজযাত্রী একটা ভারতীয় জাহাজের নজরে পড়ল দূরের একটা পাকিস্তানী কার্গো জাহাজ। কার্গোর ক্রেটগুলো দেখে সন্দেহ হয়েছিল ভারতীয় জাহাজের কয়েকজন অফিসারের। ক্যাপ্টেন একটা কোড মেসেজ রেডিও মারফত পাঠিয়ে দিলেন বোম্বে। কয়েকদিন পর কাবুল রেডিওর একটা ছোট্ট খবরে সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো। ইতিমধ্যে আম্মান থেকে একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেসপ্যাচে জানা গেল কদিন আগে একটা ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে জর্ডন ফরেন মিনিস্ট্রির একজন সিনিয়র অফিসার ইজরাইল-আরব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে মন্তব্য করেছেন যে বন্ধু মুসলিম রাষ্ট্রও যদি ওদের হেল্‌প করে তাহলে কি করা যাবে? এইসব বিন্দু বিন্দু খবর যখন এক করা হলো তখন আর সন্দেহ রইল না। এসব খবর কায়রোর ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে পৌঁছতে দেরি হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব দেশে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। পাকিস্তান ও পাক এম্বাসী কি ফাঁপরেই না পড়েছিল।

কায়রোয় ভারত-পাক এম্বাসীর মধ্যে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক মেঘ জমে উঠেছে, কখনও গর্জন—কখনও বর্ষণ হয়েছে, তখনও বেসুরো সুরে হাসান আর তরুণ গেয়েছে—

‘আমার সোনার বাংলা
　　আমি তোমায় ভালোবাসি!
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
　　আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
　　ঘ্রাণে পাগল করে,
　মরি হায়, হায় হায় রে—
ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে
　　আমি কী দেখেছি মধুর হাসি...’

রাবেয়া পাশের ঘর থেকে প্রায় তেড়ে এসে বলেছে, ‘এমন গর্দভ রাগিণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না...চল চল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। সিনেমায় যাবে না?’

আড্ডা দিতে দিতে হাসান আর তরুণের খেয়ালই ছিল না কায়রো প্যালেসের টিকিট কাটা আছে।

তিনজনে দল বেঁধে সিনেমায় গেছে, ওমর খৈয়ামে ডিনার খেয়েছে ও অনেক রাতে তিনজনে বাড়ি ফেরার পথেও অল-তাহরির স্কোয়ারে বসে গল্প করেছে।

ভোলা যায় কি সেসব স্মৃতি? তরুণ ভুলতে পারে না কায়রোকে। ভুলবে কেমন করে? কারমান্নেসা স্কুলের ছাত্রীকে দেখেই তো মনের মধ্যে অতীত দিনের ঝড় উঠেছিল। ইন্দ্রাণীর স্মৃতির আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছিল এই কায়রোতেই।

চার

ভাইকাউন্টের চারটে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। পাখাগুলো বন-বন করে ঘুরতে শুরু করল। তারপর কোনো ফাঁকে প্লেনটা পালামের মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করল। কাবুলের ইন্ডিয়ান এম্বাসীর সেকেন্ড সেক্রেটারি-ডেজিগ্নেট তরুণ সেনগুপ্তর মনটাও হঠাৎ উড়তে শুরু করল অতীত আকাশের কোলে।...

সেই কোনো সুদূর অতীতে আর্যরা এই পথ দিয়েই এসেছিলেন ভারতবর্ষে। কোথা থেকে এসেছিলেন, কে জানে। কেউ বলেন, পামির থেকে, কেউ বলেন, মধ্য ইউরোপ বা জার্মানী থেকে। মানব সভ্যতার প্রায় আদিমতম সুপ্রভাত আর্যরা আফগানিস্থানে বসেই লিখেছিলেন বেদ—ঋগ্বেদ। কলকাতার রাস্তায় ওই পাগড়ী পরা কাবুলীওয়ালাদের দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে, এঁদের ঘরের দাওয়ায় বসে আমাদের আর ওঁদের পূর্বপুরুষ লিখেছিলেন বেদ। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে আর্যদের কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনি। সভ্য আর্যদের বংশধর বলে গর্ব অনুভব করি আমরা কিন্তু বাইরের জগতে আর্য বলে প্রচার করতে কত কুণ্ঠা আমাদের। আর ওই কাবুলীরা? মুসলমান আফগানরা? সারা দুনিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে বলেন ওরা আর্য। ওদের যেসব বিমান সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পরিচয়পত্রে বড় বড় হরফে লেখা আছে আরিয়ানা আফগান এয়ার-লাইন্স। কাবুলের সব চাইতে প্রাচীন সরকারি হোটেলের নাম, হোটেল আরিয়ানা।...

ভাইকাউন্টের ডিম্বাকৃতি বড় জানলা দিয়ে তরুণ আর একবার নিচের দিকে তাকায়। কত গিরি-পর্বত নদী-নালা মাঠ-ঘাট পেরিয়ে এই পথ দিয়েই এসেছেন ইতিহাসের কত অসংখ্য নায়ক। আলেকজান্ডার, ইবন বতুতা, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর, বাবর ও আরো কত কে। এসেছিলেন কনিষ্ক, এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজকের দল। মার্কোপোলো পর্যন্ত লিখে গেছেন এই পথের কথা। হিমালয়ের এই অলিগলি ডিঙিয়েই আফগানিস্থান থেকে ভগবান বুদ্ধের বাণী ছড়িয়েছিল চীনে, জাপানে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরো কত দেশে।

উল্টো-পাল্টা, ছোট-বড়, সাদা-কালো মেঘের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ভাইকাউন্টটা। তরুণের চিন্তার ধারাটাও ওলট-পালট হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তাতে কি আসে যায়? তাতে কি ইতিহাসের গুরুত্ব কমে? নাকি কম রোমাঞ্চ লাগে? ইরাণের বিখ্যাত কবি তো বলে গেছেন, মা যি আঘায যি আনজাম-ই জাহান বে-খবর-ইম, আওয়াল-ও-আখের ই-ইন্ কুহনা কেতাব উফ্তাদ আস্ত। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিকথার প্রথম ও শেষ পাতাটাই খোয়া গেছে, তাই তো আদি-অন্তের হিসেব-নিকেশ পাওয়াই দুষ্কর। ভাইকাউন্টের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উল্টো-পাল্টা চিন্তা করতে করতে সান্ত্বনা পায় তরুণ।

মিঃ যোগীকে টোকিও থেকে কাবুলে বদলি করা হয়েছিল। বদলির অর্ডার পাবার পর প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম। টোকিও থেকে কাবুল! বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন চড়ার পর সাইকেল রিকশা। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে যোগীসাহেব আপীল করলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, স্ত্রীর স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া গোল্লায় যাবে। দোহাই আপনাদের।

শুধু যোগীসাহেব নয়, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের অনেকেরই এই মনোভাব। লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, প্যারিস, রোম বা টোকিও ছাড়া সারা দুনিয়াটা যেন মনুষ্য-বাসের অনুপযুক্ত। মস্কো বা ইউরোপের অন্য কোনো রাজধানীতে খুব জোর দু-তিন বছরের একটা টার্ম চললেও চলতে পারে, কিন্তু তাই বলে এশিয়া আফ্রিকায়? কল্পনা করতে পারেন না এঁরা। কিছু কিছু ইন্ডিয়ান

ডিপ্লোম্যাট আছেন যাঁরা অতীত দিনের প্রভুদের সমাজে মর্যাদা পাবার লোভে অথবা যৌবনের কোনো দুর্বল মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গিনীকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছেন। এখন এসব মেমসাহেবের দল মাইশোর সিল্কের শাড়ি পরেন, ইন্ডিপেনডেন্স ডে রিসেপশনের সময় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে 'নমসটে' করেন সত্য, কিন্তু ইন্ডিয়াতে থাকার কথা ভাবতেও ওদের গা'টা শিউরে ওঠে। কি বিশ্রী ফ্লাইজ! মসকুইটো! বেগার! নেকেড সাধুস্!

বরিশাল ঝালকাঠির পোলা হয়েও সরকারসাহেব এমনি এক মেমসাহেবের খপ্পরে পড়ে এক নাগাড়ে ষোল বছর ইন্ডিয়ার বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিলেন। ইন্ডিয়ার নন-অ্যালাইনমেন্ট ও অ্যাফরো এশিয়ান প্রেমের নীতি রক্ষা করার জন্য একবার দুবছরের জন্য কলম্বো ছিলেন। ব্যস! সরকারসাহেব সাউথ ব্লকে এসে প্রাইম মিনিস্টারের ঘরটা চিনলেও ফরেন সেক্রেটারির ঘরে যেতে হলে বেয়ারা-চাপরাশীদের জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না।

সরকারসাহেবের কথা তরুণ জানে। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করত না। ফরেন মিনিস্ট্রির মোটা মোটা নিয়ম-কানুনের বইতে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে, তিন বছর পর বদলি হতে হবে। একই রিজিয়নে পরপর পোস্টিং হবে না। দুটো টার্মের বেশি একসঙ্গে বিদেশে থাকা চলবে না এবং আরো কত কি। কিছু ডিপ্লোম্যাট ডিপ্লোম্যাসি করেন, কিছু ডিপ্লোম্যাট তৈল মর্দন করেন, কিছু আবার কাশ্মীরে শ্বশুরবাড়ি বলে এসব নিয়মকে এড়িয়ে চলছেন বেশ হাসিমুখে।

কেন মিঃ জোহর? বাইশ বছরই বিদেশে। মাঝে মাঝে তাজমহল দেখার জন্য সরকারি পয়সায় ইন্ডিয়া আসেন কিন্তু ইন্ডিয়াতে পোস্টিং? জোহরসাহেবকে সে কথা বলার সাহসও কারুর নেই, কেউ বলেন, মিসেস জোহরের স্বর্গত পিতা আর ফরেন মিনিস্টারি নাকি বন্ধু ছিলেন। কেউ বলেন, ওসব বাজে কথা। ফরেন সেক্রেটারির ছেলেকে জোহরসাহেব নিজের কাছে ভি-আই-পি সমাদরে রেখে ব্যারিস্টারি পড়িয়েছেন বলেই...। কেউ আবার ফিস-ফাস করেন, মিসেস জোহর এককালের নামকরা অভিনেত্রী। এখনও বহুজন তাঁর সাহচর্যে দু এক পেগ স্কচ পেলে ধন্য মনে করেন।

নানা মুনির নানা মত। কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা তা তরুণ জানে না। জানতে চায়ও না। তবে সে বেশ বুঝতে পারে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো জোহরসাহেবের কিছু আন্ডার গ্রাউন্ড কানেকশন আছে। আমাদের টপ এ-ওয়ান অ্যাম্বাসেডররা পর্যন্ত মিঃ ও মিসেস জোহরকে যেভাবে মর্যাদা দেন, মেলামেশা করেন, তা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।

যাকগে সেসব। যোগীর অত হাই কানেকশনস নেই। তবে তৈল মর্দন! জাপানী ট্রানজিস্টার, হংকং-এ ফ্রি পোর্ট তো আছে।

ইন্দুরকার তিন বছরের জন্যে কাবুল গিয়েছিল। ছবছর পরেও বদলি হতে চায়নি সে! ইন্দুরকার তরুণের সমসাময়িক, একই ব্যাচের ছেলে ওরা। দুজনের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব। দুজনে পৃথিবীর দুপ্রান্তে থাকলেও নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। ছাত্রজীবনে ইতিহাস পড়ে নয়, ইন্দুরকারের চিঠি পড়েই আফগানিস্থান সম্পর্কে তরুণের মনে গভীর আগ্রহ জন্মায়। তাই তো অনেক দিন আগে একবার সুযোগ মতো এক জয়েন্ট সেক্রেটারিকে বলেছিল, 'স্যার, শুনেছি কাটমান্ডু-কাবুলে অনেকেই পোস্টিং চান না। আই উইল বী গ্ল্যাড ইফ আই গেট এ চান্স টু সার্ভ দেয়ার।'

জয়েন্ট সেক্রেটারি মনে রেখেছিলেন তরুণের অনুরোধ। তাই তো মিনিস্ট্রির ট্রান্সফার-পোস্টিং কমিটির মিটিং-এ যোগীর আপীলের বিষয় উঠতেই তরুণের নাম উঠল।

যোগীর বদলে কাবুল চলেছে তরুণ সেনগুপ্ত। হিন্দুকুশ দেখবে, বামিয়ানে পৃথিবীর বৃহত্তম

বুদ্ধমূর্তি দেখবে, গজনী যাবে, কান্দাহার যাবে। আরো কত কি দেখবে সে। খুব খুশি। তারপর আছে বীণাদি!

'মে আই হ্যাভ ইওর অ্যাটেনশন প্লিজ!'

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ভাইকাউন্ট এসে গেল কাবুল।

বিমান থেকে বেরিয়ে আসতেই ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ মেটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল তরুণ। হাজার হোক সিনিয়র অফিসার! কৃতজ্ঞতা জানাল বারবার, 'সো কাইন্ড অফ ইউ...'

'ডোন্ট বী টু ফরম্যাল টরুণ! তুমি আসছ আর আমি এয়ারপোর্টে আসব না?'

থার্ড সেক্রেটারি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও কমার্শিয়াল অ্যাটাচি এবং আরো তিন-চারজন এসেছিলেন অভ্যর্থনা জানাতে। আলাপ-পরিচয় হলো সবার সঙ্গে।

যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে থাকেন তাঁরা এয়ারপোর্ট দেখেই সেই দেশ সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা করে নিতে পারেন। লন্ডন ও নিউইয়র্ক—দুটি এয়ারপোর্টই বিরাট ও অত্যন্ত কর্মচঞ্চল এবং আধুনিকতমও বটে। তবু বেশ বোঝা যায় যে, দুটি দেশের মাঝখানে রয়েছে অ্যাটলান্টিক! ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মস্কো এয়ারপোর্টও বিরাট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক মুহূর্ত দেখলেই দুটি দেশের জনজীবন সম্পর্কে একটা ধারণা করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

মস্কোর তুলনায় কাবুল এয়ারপোর্ট অনেক ছোট হলেও বেশ সুন্দর। রাশিয়ার সাহায্যে তৈরি কাবুল এয়ারপোর্ট বড় প্রাণহীন। তবুও ভালো লাগল তরুণের। দাঁড়িয়েই মনে পড়ল দমদম, পালাম...কোনো তুলনাই হয় না।

এম্বাসি থেকে তরুণের জন্য কোয়ার্টার ঠিক করা হয়েছিল কিন্তু মিঃ সেটা কিছুতেই ছাড়লেন না। 'বীণা উইল কিল মী, যদি তোমাকে বাড়ি না নিয়ে যাই।'

তরুণ এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরুবার সময় হাসতে হাসতে বললো, 'দ্যাট আই নো। তবে কি জানেন, একবার বীণাদির খাতির যত্ন পেতে শুরু করলে কি আর কোনোদিন নিজের কোয়ার্টারে যাব?'

অ্যাড অ্যাটাচি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে চান্সেরীতে চলে গেলেন। অন্যান্যদের কেউ চান্সেরী, কেউ বাড়ি গেলেন।

পাখতুনিস্থান অ্যাভিনিউ ধরে মিঃ মেটার গাড়িতে যেতে যেতে তরুণের মনে পড়ল অনেক দিন আগেকার কথা।—বীণাদি আর তরুণ একই সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেছিল। বিয়ের পর বীণাদি যেদিন মিঃ মেটার সংসার করা শুরু করেন, তরুণও সেইদিন প্রথম ফরেন পোস্টিং পেয়ে কাজ শুরু করে। একই প্লেনে দুজনে দিল্লি থেকে রোম গিয়েছিল কিন্তু তখন পরিচয় ছিল না। রোম এয়ারপোর্টে মিঃ মেটা একই সঙ্গে দুজনকে অভ্যর্থনা করেন।

ফরেন সার্ভিসের অফিসার বা তাদের পরিবারকে নিয়ে সাধারণ মানুষের বিচিত্র ধারণা। অনেকের ধারণা ওরা বোধ হয় দিনরাত্রি কেবল মদ খান, চরিত্র বলে কোনো পদার্থ ওদের নেই। সমাজ সংসারের বন্ধুহীন এই মেয়েপুরুষরা শুধু ফুর্তি করেই দিন কাটায়। কথাটা যে সর্বৈব মিথ্যা নয়, তা তরুণ বা বীণাদি জানে। কিন্তু তাই বলে কি ওরা মানুষ নয়? ফরেন সার্ভিসের অফিসার বা তাঁদের পরিবারের লোকজন তো রক্ত-মাংসের মানুষ। তাদের হৃদপিণ্ড আছে মন আছে ; আছে দয়া-মায়া—ভালোবাসা। আর আছে মনুষ্যত্ব।

একে সৌরাষ্ট্রের মানুষ, তারপর ভবনগর রাজ কলেজের ভূতপূর্ব লেকচারার। মিঃ মেটা নিতান্তই একজন শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। কিন্তু রোমের হাওয়া আর ইতালির মাটি কেমন যেন সবাইকে চঞ্চল করে তোলে। তারপর বীণাদির মতো সুন্দরী ও বিদুষী ভার্যা! মিঃ মেটা সত্যিই

চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মারলোত বা মার্টিনীর বোতল উজাড় না করেও মেটাসাহেব বেশ একটু মদির হয়ে উঠলেন। বীণাদিকে কেন্দ্র করে তার স্বামীর এই রোমান্টিক উন্মাদনা তাঁরও নিশ্চয়ই ভালো লাগতো। হাজার হোক কাকারিয়া লেক—অ্যাপলো বন্দর থেকে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে ইউরোপের আনন্দ-উৎসবের অন্যতম প্রাণবিন্দুতে এসে মিঃ মেটার মতো স্বামী পেলে যে কোনো ভারতীয় মেয়ের পক্ষেই অমন হওয়া স্বাভাবিক।

উইক-এন্ডে দুজনে মিলে ঘুরে বেড়ালেন ফ্লোরেন্স, সান মারিনো, ভেনিস, জেনোয়া, মিলান, পাডুয়া ও পিসা আরো কত জায়গা। চললেন আল্‌পসে, ভেসে বেড়ালেন সমুদ্র।

তারপর একদিন বীণাদিই বললেন, 'চলুন মিঃ সেনগুপ্ত ক্যাপরু বেড়িয়ে আসি।

তরুণ মনে মনে হাসে বীণাদির আকস্মিক পরিবর্তনে। বুদ্ধিমান কূটনীতিবিদ। একটু চিন্তা করেই কারণটা খুঁজে পায়। ইতালির মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চায়। আমেরিকানরা অর্থের নেশায় পাগল ; ইংরেজরা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে মত্ত, জার্মানরা শক্তিসামর্থ্য দেখাতে ব্যস্ত, কিন্তু ইতালির মানুষ জীবনের সমস্ত রস আহরণ করতে চায়। ছেলে-ছোকরা বুড়ো-বুড়ি যেই হোক, সবাই চায় প্রাণভরে হাসতে, কাঁদতে। শুধু হাসতে-কাঁদতে নয়, পৃথিবীর মধ্যে বোধ করি একমাত্র এরাই পারে প্রাণমন দিয়ে ঝগড়া করতে। দর্শক হতে এরা জানে না, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় প্রতিটি ঘটনায় এরা অংশ গ্রহণ করবে। রোম বা মিলানের রাস্তায় ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্ট হলে এরা কলকাতার মানুষের মতো শুধু ভিড় করে না, মতামত দেয়, ঝগড়া করে মারামারি করে। পরে আবার হাসতে হাসতে দল বেঁধে কোর্ট-কাছারিও যাবে। বিচিত্র এই দেশ। বিচিত্রতর এর মানুষজন। এমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে, হৃদয়-নিংড়ে চোখের জল ফেলতে আর কেউ পারে না।

বীণাদিও কি এই দেশে এসে এদেরই মতো জীবন-উৎসবে মেতে উঠেছে?

তরুণ ড্রাই মার্টিনির গেলাসে চুমুক দিয়ে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিঃ মেটাকে কথাটা বলল। মিঃ মেটা একটু লজ্জিত হলেন। কথার মোড় ঘোরাল তরুণ, ক্যাপরী গিয়ে কি হবে? তার চেয়ে চলুন গ্রান্ডসুইপে গিয়ে গল্প করতে করতে বাদাম চিবুই।

বীণাদি বললেন, 'বাজে কথা বাদে দিন। মোট কথা জেনে রাখুন, সামনের উইক-এন্ডে আপনি আমাদের সঙ্গে ক্যাপরী যাচ্ছেন।'

আত্মসমর্পণ করার আগে তরুণ বলল, 'অমন রোমান্টিক জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আই অ্যাম গিভিং ইউ দি লাস্ট চান্স টু থিংক ইট ওভার।'

নেপলস্-এর পাশে ক্যাপরী দ্বীপে গিয়েছিল ওরা তিনজনে। গান আর কাব্যের খ্যাতিসমৃদ্ধ এই ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল তিনজনেই। ফুল-পাতায় ভরা ব্লু-গ্রোতোতে ছবি তুলেছে, ছবির মতো সুন্দর অ্যানাক্যাপরী গ্রামে ঘুরেছে, মোর্গানো খেয়েছে, দড়ির জুতো কিনেছে। কিন্তু শেষে মেরিনা পিকোলো বীচ থেকে ফেরার পথে এক অপ্রত্যাশিত মোটর দুর্ঘটনায় নিদারুণভাবে আহত হলেন মিঃ মেটা।

সে ইতিহাস দীর্ঘ। তবে দুর্ঘটনার ফলে মেটা দম্পতির জীবনে একটা পাকাপাকি আসন হলো তরুণের। বীণাদির বিশ্বাস, তরুণের জন্যই মেটাসাহেব সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছেন। বীণাদি তাই কৃতজ্ঞ। মেটাসাহেবও ভুলে যাননি তরুণের সেবা-যত্ন তদ্বির-তদারক।

আর তরুণের? তার রুক্ষ জীবন-প্রান্তরে মেটা-দম্পতি এক পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বীণাদিকে সে এয়ারপোর্টে আশা করেনি। নিশ্চিত জানত সে খাবার-দাবার তৈরিতে এত ব্যস্ত থাকবে যে, এয়ারপোর্টে গিয়ে সময় নষ্ট করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তরুণকে দেখে বীণাদি যেন হাতে স্বর্গ পেল। 'তুমি এসে বাঁচালে আমাকে।'

'কেন বীণাদি?'

'দুদিন থাকলেই বুঝবে কেন।' বীণাদি প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন।

মিঃ মেটা বললেন, 'এত তুচ্ছ ব্যাপারে আমাদের কলিগরা নিজেদের ব্যস্ত রাখেন যে বীণা তা টলারেট করতে পারে না!'

তরুণ আক্ষেপ করে বলল, 'এইতো আমাদের রোগ।'

পরে লাঞ্চ খাবার সময় বীণাদি বলেছিলেন, 'জান ভাই, আজ প্রায় তিন মাস বাড়ির বাইরে যাই না বললেই হয়।'

'কেন?'

'লন্ডন, নিউইয়র্ক, রোম বা কলম্বোর মতো সোসাইটি বলে কোনো পদার্থ তো এখানে নেই। তোমার দাদার কলিগদের বাড়ি গিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে ডিউটি-ফ্রি ইমপোর্টের গল্প আর ভালো লাগে না।'

সত্যি, বিচিত্র আমাদের দেশ। বিচিত্রতর হচ্ছে ফরেন সার্ভিসের এক শ্রেণীর অফিসার। শুধু ফরেন সার্ভিস কেন? সব সার্ভিসেস-এরই এক অবস্থা। আজ যেসব আই-সি-এস গভর্নর হয়েও মনে শান্তি পান না, তাঁরা যৌবনে স্বপ্ন দেখতেন ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে রিটায়ার করার। দেড়শো বছরের ইংরেজ রাজত্বের মেয়াদ আর একটু বাড়লেই হয়েছিল আর কি! ওয়েলেসলী-সাজাহান-মথুরা রোডের বাংলো চোখে দেখতে হতো না, গোল মার্কেটের আশপাশের কোনো অলিগলিতেই এঁদের ভাবলীলা সাঙ্গ হতো। ফরেন সার্ভিসের সিনিয়রদের জীবনকাহিনি আরো চমকপ্রদ যে পুরী সাহেব স্বপ্ন দেখতেন হাথরাশ বা গোরক্ষপুরের ডেপুটি কমিশনার হয়ে রিটায়ার করার পর ড্রইংরুমে বার লাইব্রেরির ফেয়ারওয়েলের গ্রুপ ফটো টাঙাবেন, তিনি আজ লন্ডন-ওয়াশিংটন মস্কো-টোকিও ছাড়া পোস্টিং নেন না। কেন? উনি যে সাতচল্লিশ সালে ময়ূরের পালক পরে ফরেন সার্ভিসে জয়েন করে আজ টপ এক্সপার্ট।

সেই ডামাডোলের বাজারে আরো কত খাল-বিলের জল ঢুকে গেছে। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের কেমিস্ট্রির ডিমোনোস্ট্রেটর, লাহোর হেরল্ড-এর জুনিয়র সাব-এডিটর, আরউইন হাসপাতালের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কনট প্রেসের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার, কেষ্টনগর কলেজের লাইব্রেরিয়ান ও আরো কত বিচিত্র মানুষ ইমার্জেন্সী রিক্রুটমেন্টে ফরেন সার্ভিসের প্রথম বা দ্বিতীয় সারি দখল করল।

বীণাদির কথায় তরুণ অবাক হয় না। এরা সিঙ্গাপুর থেকে ডিউটি-ফ্রি ইমপোর্টের স্বপ্ন দেখবে, নাকি ভারত-আফগান মৈত্রীকে আরো দৃঢ় করবে?

বীণাদি বলতেন, 'আফগানিস্থানকে ওরা চিনবে? সে বিদ্যাবুদ্ধি বা ইচ্ছা আছে ওদের?'

মিঃ মেটা প্রতিবাদ করতেন, 'যত বুদ্ধি তোমার আছে।'

বীণাদি দুবছর কাবুলে আছেন। শুধু হিন্দুকুশের নতুন চ্যানেলই দেখেনি, ইন্ডিয়ান এম্বাসীর অনেক রথী-মহারথীর দুর্বলতার খবরও তিনি জানেন। তাই তো মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর কথায় প্রতিবাদ জানান, তোমাদের মতো বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকতে পারে, তবে মন আছে, ইচ্ছা আছে...।'

বীণাদি পলিটিক্যাল কাউন্সেলরকে কেন ড্রাই ফ্রুট কাউন্সেলার বলে ঠাট্টা করতেন, তা জানতে তরুণের সময় লাগেনি। কোনো জানাশুনা লোক কাবুল থেকে দিল্লি গেলেই হলো, পলিটিক্যাল কাউন্সেলার পাঁচ কিলো কিসমিস, পাঁচ কিলো ক্যাসুনাট জয়েন্ট সেক্রেটারির বড় মেয়ে পলির জন্য পাঠাবেনই। বেশি দিন এমন কোনো প্যাসেঞ্জার না পেলে প্লেনের পাইলট মারফত কিছু

না কিছু পাঠিয়েই দিল্লিতে একটা মেসেজ পাঠাবেন, পলি...সাজাহান রোড, নিউদিল্লি...প্লিজ কালেক্ট প্যাকেট পাইলট ফ্লাইট...ফ্লাইডে...।

চান্সেরীর ক্লার্করা তো ওকে ডি এফ সি—ড্রাই ফ্রুট কাউন্সেলার বলেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে।

চান্সেরীতে শুধু দিনগত পাপক্ষয় করত তরুণ। কাজ করে আনন্দ পায়নি একটুও। যে চান্সেরীতে চাঞ্চল্য নেই, উত্তেজনা নেই, কোনো রাজনৈতিক রেষারেষি নেই, সেখানে কি কাজ করে কোনো সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট খুশি হয়? পাখতুনিস্থান নিয়ে আফগানিস্থান-পাকিস্তানের রাজনৈতিক লড়াই চলছে। সেই সাতচল্লিশ থেকে পুস্তুভাষী আফগানরা সহ্য করতে পারে না পাকিস্তানকে। আর আফগানিস্থানের শতকরা ষাট-সত্তর জনই হচ্ছে পুস্তুভাষী। তবুও পাকিস্তান কেমন টুকটুক করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আর ইন্ডিয়ান এম্বাসী? স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরই যদি উদাসীন হন, যদি ডিপ্লোম্যাটিক রিসেপসনে রাজা বা প্রাইম মিনিস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাই তাঁর স্বপ্ন ও একমাত্র কাজ হয়, তবে এম্বাসী-চান্সেরীর অন্যেরা কি করবেন। পাকিস্তান এম্বাসীর প্রচার বিভাগ কেমন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে। আর ইন্ডিয়ান এম্বাসীর প্রেস অ্যাটাচির কৃপায় প্যারিস থেকে ছাপান ফ্রেন্টি জার্নাল ও তেহেরানে ছাপা পারসী ভাষার জার্নালের বান্ডিলগুলো স্টোরের মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। কাবুলের হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, এয়ারপোর্টে—সর্বত্র—পাকিস্তানের কত কি নজরে পড়বে। কাবুল ইউনিভার্সিটির রিডিংরুমে পাকিস্তানী প্রচার পুস্তিকার বন্যা বইছে। কিন্তু কোথাও ভারতবর্ষের কোনো কিছুর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না।

কি করবে তরুণ বা মেটা সাহেব? অসহায় হয়ে চাকরি করে গেছে।

চান্সেরীর বাইরে কিন্তু প্রাণভরে আনন্দ পেয়েছে, উপভোগ করেছে কাবুলবাসের প্রতিটি মুহূর্ত। এমন স্বাধীনতাপ্রিয় জাত ইতিহাসে বিরল বললেই চলে। সব কিছু বরদাস্ত করবে এরা, বরদাস্ত করবে না অন্য জাতের কর্তৃত্ব। শুধু আজ নয়, কোনো দিনই করেনি। প্রায় হাঁটতে হাঁটতেই দেশ দখল করেছেন আলেকজান্ডার, কিন্তু আফগানিস্থানে এসে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন পাঠানশক্তির মারাত্মক স্বাদ! পরবর্তীকালে শিক্ষা পেয়েছিল সাম্রাজ্যলোভী আরবরা। কেন ইংরেজরা? ঝড়ের বেগে এশিয়া-আফ্রিকার ডজন ডজন দেশ দখল করেছে, উড়িয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক। একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার বিরাট ইংরেজ বাহিনীর বিপর্যয় হয়েছে এই পাঠান বীরদের হাতে। যখন সামনা-সামনি পারেনি, তখন রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে চক্রান্ত করে খিড়কির দরজা দিয়ে কাবুলে সংসার পাততে চেয়েছিল বীরের জাত ইংরেজ। তাও পারেনি!

ইদানীংকালে আফগানিস্থান শত শত কোটি সাহায্য নিচ্ছে আমেরিকা-রাশিয়ার কাছ থেকে, কিন্তু তার জন্য মাথা হেঁট করছে না সে ; বরং সাহায্য নিয়ে কৃতার্থ করেছে ওদের। কাবুলে ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে আফগান সরকারের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট—হেড ক্লার্করাও নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁরা না এলে হোস্ট অ্যাম্বাসেডররা দুঃখ পান। তরুণ ভাবে নিজের দেশের কথা। একটা ফিল্ম শো দেখার জন্য ভি-আই-পি-দের কি ব্যাকুলতা!

কলকাতা বা দিল্লিতে আফগানদের নিয়ে কতজনকে হাসি-ঠাট্টা করতে শুনেছে তরুণ। শুনেছে ওরা নাকি পিছিয়ে থাকা মধ্যযুগীয়।

কলকাতা-দিল্লি-বোম্বের মিল্ক বুথের মতো সারা কাবুলে ছড়িয়ে আছে সরকারি 'নান'-এর দোকান। সরকার লরী ভর্তি আটা পৌঁছে দেয় এইসব দোকানে, কর্মচারীরা তৈরি করেন 'নান'।

সেই 'নান' খেয়ে বেঁচে থাকেন কাবুলের চার লক্ষ মানুষ। দীনদুঃখী থেকে প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ির ডাইনিং টেবিলে পর্যন্ত এই 'নান' পৌঁছে যায়। কোনো 'নান'-এর ওজন এক তোলা কম হবে না।

তরুণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'একটুও ওজনের হেরফের হয় না?'

সহিদুল্লা খাঁ হেসে ওঠে কথা শুনে।—'ওজনের হেরফের হবে কেন?'

হাসি থামলে খাঁ সাহেব বললেন, 'একবার ওজন কম দেবার দায়ে দুজনের ফাঁসি হয়। সেই থেকে...'

'ফাঁসি?'

'হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি।'

'কবছর আগের কথা?'

'তা জানি না। তবে বেশ কিছুকাল আগে।'

কিংবদন্তীর মতো এসব কাহিনি ঘরে ঘরে শোনা যায়। সঠিক খবর কেউ জানে না, তবে সবাই জানে ওজন কম দেবার সাহস কারুর নেই। আরো অনেক কিছু জানে ওরা। জানে মাঝরাতে কাবুলের নির্জন পথেও নিঃসঙ্গ অর্ধনগ্ন যুবতীর গায়ে হাত দেবার সাহস কোনো আফগানের নেই। 'কি বললে? চুরি-ডাকাতি? ডাকাতি করলে জোশন গ্রাউন্ডে শূলে চড়ানো হয়।' তরুণ বহুজনকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনি দেখেছেন?' কেউ দেখেনি। তবে সবাই জানে শূলে চড়ান হয়।

কাবুলের রাস্তায় উর্দীপরা পুলিশ ওয়ারলেস গাড়ি নিয়ে ছুটে বেড়ায় না, অ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্টের কৃতিত্ব সরকারি প্রেস নোটে প্রচার করার অবকাশ নেই আফগানিস্থানে। অনেক দেশের সঙ্গেই তুলনা করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় তরুণ।

মরুভূমি ও চিরতুষারাবৃত পর্বতের সমন্বয়-ভূমি আফগানিস্থান সত্যি বিচিত্র দেশ। অন্য দেশে সৎ মানুষ খেতে পায় না, কিন্তু অসৎ মানুষ জেলখানায় গিয়ে আহার-বিহার-প্রমোদ করে সরকারি খরচায়। আফগানিস্থানে? যে অসৎ, যে ঘৃণিত তাকে জেলখানায় পাঠায় শাস্তি দেবার জন্য। তাই তো সরকারি কোষাগার শূন্য করে কয়েদীদের সেবা-যত্ন আহার-বিহারের ব্যবস্থা নেই আফগানিস্থানে। কয়েদীদের আহার আসে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে। যে কয়েদীর আত্মীয়স্বজন নেই, সে হাতে-পায়ে হাতকড়া পরে শুক্রবারে শুক্রবারে ভিক্ষা করবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবং সেই ভিক্ষার পয়সায় তার দিন গুজরান হবে। এ ব্যবস্থা ভালো কি মন্দ, তা জানে না তরুণ। তবে জানে এর পেছনে যুক্তি আছে, কারণ আছে।

স্নিগ্ধ-রুক্ষ প্রকৃতির সন্তান আফগানরাও শান্ত, কখনও অশান্ত ; কখনও সৌজন্য-ভদ্রতার প্রতীক, কখনও নির্মম পাষাণ। শত্রু নিপাত করে এরা হাসিমুখে। আবার আশ্রয়প্রার্থী চরম শত্রুকেও সন্তান জ্ঞানে সমাদর করে। কিন্তু অপমানের প্রতিশোধ অপমান করেই নেবে, রামধনু গেয়ে নয়।

হঠাৎ ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে কাবুল ছাড়তে যেন তরুণের কষ্টই হচ্ছিল। সে রাত্রে সব কিছু একসঙ্গে মনে পড়ল। বছরের প্রথম তুষারপাতের সময় আফগানদের মতো 'বরফি' খেলার সময় কি মজাই না হয়েছিল বীণাদির সঙ্গে।

ফেয়ারওয়েল ডিনারের অতিথিরা একে একে সবাই বিদায় নিলেন। অত বড় ড্রইংরুমের তিন কোণায় তিনটি সোফায় তিনজনে চুপচাপ করে বসে রইলেন কতক্ষণ, কেউ জানে না।

অনেকক্ষণ পর বীণাদি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমাদের এতটা

ঘনিষ্ঠতা না হলেই ভালো হতো! যাদের থাকা না থাকার ঠিকঠিকানা নেই, যারা আজ কাবুলে কাল ক্যালিফোর্নিয়ায় বা কোরিয়ায়, তারা যে কেন মানুষকে ভালোবাসে, আপন করে, তা বুঝি না।'

মিঃ মেটা একটু সান্ত্বনা দেন, 'বছর তিনেকের মধ্যেই আবার যাতে আমরা একই মিশনে থাকতে পারি...।'

বীণাদি প্রায় গর্জে উঠলেন, 'বাজে বক্‌বক্ করো না তো! তোমার ওই ধাপ্পাবাজি অনেক শুনেছি।'

এবার তরুণ কথা বলে, 'নিত্য নতুন দেশ দেখছি আর তোমাদের ভালোবাসা পাচ্ছি বলেই তো আমি বেঁচে আছি। নয়তো আমি কি করে বাঁচি বল তো?'

এতদিন যে প্রশ্ন অনেক কষ্টে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবার বীণাদি সেই প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, ঢাকার কোনো খবর পেলে?'

অতি দুঃখেও তরুণ হাসে। বলে, 'আর কি খবর পাব? শেষ সর্বনাশের কনফারমেশন?'

'ছি ছি, ওকথা বলছ কেন?'—বীণাদি উঠে এসে তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা জানান।

একটু থেমে আবার বলেন, 'তুমি তো কোনো অন্যায় করনি তরুণ। দেখবে ভগবানও তোমার প্রতি অন্যায় করবেন না। একদিন তুমি ওকে খুঁজে পাবেই।'

পরদিন সকালে কাবুল এয়ারপোর্টে ভাইকাউন্টের চারটে ইঞ্জিন আবার গর্জে উঠল, পাখাগুলো বন বন করে ঘুরে উঠল। ঝাপসা চোখেও প্লেনের জানালা দিয়ে তরুণ যেন স্পষ্ট দেখে বীণাদিকে। আর প্লেনের গর্জন স্তব্ধ করে বীণাদির শান্ত কণ্ঠ শুনতে পায়, 'একদিন তুমি ওকে খুঁজে পাবেই।'

পাঁচ

খবরের কাগজ বা চলতি রাজনৈতিক ডিক্সনারীর ভাষায় 'বিগ পাওয়ারে'র ব্যাপারই আলাদা। ওখানে যে কি হয়, আর কি হয় না, তা স্বয়ং অলমাইটি গডও জানেন না। অনেকটা মধ্যযুগীয় হারেমের মতো আর কি! কিছু বোঝা যায়, কিছু দেখা যায়, কিছু শোনা যায়, কিছু অনুমান করা যায়। তবুও সব কিছু জানা অসম্ভব। ওদের ওখানে কে সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট বা প্রেস অফিসার বা গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তা স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরের অন্তর্যামীও জানেন না।

বিগ পাওয়ারের অ্যাম্বাসেডরদের অবস্থা অনেকটা বড় বড় কোম্পানির পাবলিক রিলেশান্স ম্যানেজারের মতো। কোম্পানির পরিচালনা বা অর্থকরী ব্যাপারে বা গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক রিলেশান্স ম্যানেজারের কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু প্রচার বেশি। অ্যাম্বাসেডর বক্তৃতা দেবেন, ছবি ছাপা হবে, এম্বাসীর সবাই তাঁকে মান্যগণ্য করবে, কিন্তু রাজনৈতিক চাবিকাঠি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যের কাছে থাকে।

ভাগ্যবান ডিপ্লোম্যাটেরও অভিভাবক থাকবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বিগ পাওয়ারের ডিপ্লোম্যাটদের প্রায় ছায়ার মতো অনুসরণ করে ওদেরই সহকর্মী—গোয়েন্দা। আবার এই গোয়েন্দাদের নজর রাখার জন্যও আছে ব্যাপক ব্যবস্থা—কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স!

বিগ পাওয়ারের চান্সেরীগুলো যেন এক-একটি সতীনের সংসার! কেউ কাউকে বিশ্বাস করে

না, কেউ কাউকে ছাড়তেও পারে না! তাই তো সবার মনেই সন্দেহ আর অশান্তি।

ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ওসব বালাই নেই। বিগ পাওয়ারের লুকোচুরি খেলার প্রয়োজন আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে এদের দেশে কত কি হচ্ছে। বিপরীত পক্ষের সেসব গোপন খবর জানার জন্য ওরা হরির লুঠের বাতাসার মতো শত-শত সহস্র-সহস্র কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করতে দ্বিধা করে না আমাদের দেশের মানুষকে খেতে-পরতে দেওয়ারই পয়সা নেই ; সুতরাং লুকিয়ে লুকিয়ে অপরের সর্বনাশ করার জন্য অর্থ ব্যয় করা অসম্ভব। আমাদের চান্সেরীগুলো সতীনের সংসার নয়। কিছু কিছু অহঙ্কারি বা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক থাকলেও অবিশ্বাসের অন্ধকার নেই কোথাও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের সবাই এক বৃহত্তর পরিবারের মতো বসবাস করেন। ভাগাভাগি করে নেন নিজেদের সুখ-দুঃখ।

ফরেন সার্ভিসে ঢুকে প্রথম ফরেন পোস্টিং পাবার পরই দয়ালের বিয়ে হলো। বিয়ের পর মৃণালিনীকে নিয়ে যখন বন-এ ফিরল, তখন কি কাণ্ডটাই না হলো।...

...কর্মচঞ্চল ফ্রাঙ্কফার্ট এয়ারপোর্টের চির কর্মব্যস্ত কর্মচারীরাও থমকে দাঁড়ালেন : শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মেয়ের দল সারি বেঁধে লাইন করে দাঁড়ালেন। কারু হাতে শাঁখ, কারুর হাতে বরণডালা। মাস্টার অফ সেরিমনিজ শ্রীবাস্তব কোনো ত্রুটি করেনি। এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছিল টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে, ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের কাছে এই অনন্য অভ্যর্থনা জানাবার। টেলিভিশন কোম্পানিতে খবর দিয়েছিল, ট্রাডিশনাল ইন্ডিয়ান ওয়েলকাম সেরিমনি 'টেক' করে টেলিকাস্ট করার জন্য।

এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনটা এসে থামতেই মাস্টার অফ সেরিমনিজ ইঙ্গিত করল। জন-পঞ্চাশেক ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দিতে দিতে গাইতে শুরু করল রাজস্থানী ফোক সঙ! এসো রাজপুত্র, এসো রাজকন্যা, নতুন জীবনের পরিপূর্ণ সুরাপাত্র পান কর। প্লেনের দরজা খুলতেই শুরু হলো শঙ্খধ্বনি। দয়াল আর মৃণালিনী মুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল দরজার মুখে। নিচে নেমে আসতেই মেয়েরা বরণ করল নববধূকে! ধুতি-পাঞ্জাবি শেরওয়ানী-চাপকান পরে পুরুষের দল মালা পরালেন দয়ালকে, মৃণালিনীর হাতে তুলে দিলেন ফুলের তোড়া।

অ্যাম্বাসেডর আসেননি ইচ্ছা করেই। তাই স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন, 'যাও, যাও, তুমি যাও। আমার সামনে হয়তো ওরা ঠিক সহজ হয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে না।'

মাস্টার অফ সেরিমনিজ সব অনুষ্ঠান শেষে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অ্যাম্বাসেডর-পত্নীকে। সন্তানতুল্য দয়ালকে আশীর্বাদ করলেন, নব-বধূর সিঁথিতে পরিয়ে দিলেন সিঁদুর।

সন্ধ্যায় জার্মান টেলিভিশনে এয়ারপোর্টের এই অনুষ্ঠান টেলিকাস্ট করা হলো। রাতারাতি দয়াল ও মৃণালিনী বিখ্যাত হয়ে গেল! বন-এ দয়াল মৃণালিনীকে নিয়ে কতদিন ধরে চলল আনন্দোৎসব।

সেদিন বন ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসীর যাঁরা দয়াল মৃণালিনীকে নিয়ে এই আনন্দোৎসব করেছিলেন, তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন সারা দুনিয়ায়। কেউ অস্ট্রেলিয়া, কেউ ভিয়েৎনাম, কেউ ওয়াশিংটন, কেউ মস্কো। কত কি হয়ে গেছে এর মধ্যে। কত উত্থান কত পতন। তবুও কেউ ভুলতে পারেননি দয়াল আর মৃণালিনীর কথা। যে মৃণালিনীকে নিয়ে ওঁরা এত আনন্দ করেছিলেন, সে মা হতে পারল না জেনে সবাই দুঃখিত, মর্মাহত। পর পর তিন তিনটি সন্তান নষ্ট হলো মৃণালিনীর। একটা ফুটফুটে সুন্দর শিশু দেখলে কাঙালিনীর মতো ছুটে যায় মৃণালিনী। চান্সেরীর বন্ধু-বান্ধবদের বাচ্চাদের নিয়েই আজ সে দিন কাটায়।

তরুণ দুঃখ পায় মৃণালিনীকে দেখে, সান্ত্বনা পায় দুঃখের এতগুলো অংশীদার দেখে।

মৃণালিনী তরুণকে বলত, 'জানেন ভাই, প্রথম প্রথম নিজেকে সামলাতে পারতাম না। একলা থাকলেই চুপচাপ বসে বসে চোখের জল ফেলতাম। পার্টিতে রিসেপশনে ককটেল-এ গিয়েছি কিন্তু মুহূর্তের জন্য মনে শান্তি পাইনি। কিন্তু আজ?'

বন্ধুপত্নীকে আর বলতে হয় না। বাকিটুকু তরুণ জানে। জানে নায়েক, রঙ্গস্বামী, চ্যাটার্জী, শ্রীবাস্তবের ছেলেমেয়েরাই ওর সারা জীবন জুড়ে রয়েছে। অস্ট্রিয়ায় থাকবার সময় মিসেস শ্রীবাস্তব অসুস্থ হলে দুটি বাচ্চাই তো মৃণালিনীর কাছে থেকেছে। ছোট বাচ্চাটা তো নিজের বাপ-মার কাছে যেতেই চায় না। দয়াল যেখানেই বদলি হোক না কেন, মৃণালিনীর একটা সংসার সেখানে আছে।

'আচ্ছা দাদা, তোমার বাচ্চা হলে আমার কাছে রাখবে তো?' মৃণালিনী সত্যি সত্যি জানতে চায় তরুণের কাছে।

'তরুণ মুচকি হাসে।

'হাসছ কেন দাদা?'

'হাসব না?' একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। একটু পরে, একটু যেন তলিয়ে যায়। বলে, 'ওসব কথা আজ ভাবি না, ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না।'

সত্যিই কি সেসব ভাবে না তরুণ? লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে নিঃসঙ্গ তরুণ নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখে। কত কি ইচ্ছে করে, কত কি মনে পড়ে তার।

'জান মা, কলেজের একজন লেকচারার আমার হাত দেখে কি বললেন?'

'কি বললেন?'

'বললেন আমার নাকি অনেক দেরিতে বিয়ে।' তরুণ মুচকি হাসে।

'বাপ-বেটায় বেরিয়ে যাবে আর আমি একলা একলা এই ভূতের বাড়ি পাহারা দেব তাই না?' মা বেশ রাগ করেই বলেন।

রাগ করবেন না? উনি যে বরাবর স্বপ্ন দেখছেন বি-এ পাস করার পরই ছেলের বিয়ে দেবেন, ইন্দ্রাণীর মতো একটা বউ আনবেন ঘরে। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে কতদিন ইন্দ্রাণীকে বলেছেন, 'দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলে আমার। খুব ইচ্ছা করে ছেলে-বউয়ের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই। ঢাকায় যেন আর টেঁকে না।'

'কেন মাসিমা, আমরা তো আছি,' হাসি হাসি মুখে ইন্দ্রাণী বলে।

'তোকে কি আর আমার কাছে চিরকাল ধরে রাখতে পারব মা? কত বড় ঘরে তোর বিয়ে হবে, কোথায় চলে যাবি তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে?' কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ছোট্ট নিঃশ্বাসও পড়ে।

পরে ইন্দ্রাণী তরুণকে বলেছিল, 'জান মাসিমা কি বলছিলেন?'

'কি?'

'বলছিলেন আমার কত বড় ঘরে বিয়ে হবে, আমি নাকি কোথায় চলে যাব।'

বইটা উল্টে রেখে তাচ্ছিল্য ভরে তরুণ জবাব দেয়, 'ডাকাতদের মতো কোঁকড়া চুল-ওয়ালা মেয়েকে রমনার কোচোয়ানরা ছাড়া আর কেউ বিয়ে করলে তো?'

চোখ দুটো ঘুরিয়ে ইন্দ্রাণী জবাব দেয়, 'তুমি বুঝি এবার পরীক্ষার পর কোচোয়ানগিরি শুরু করবে?'

তরুণ হাসতে হাসতে নিজের হার স্বীকার করে।

'এই বুদ্ধি নিয়ে তোমার কোন্ চুলোয় জায়গা হবে, তাই ভাবি। আমি না থাকলে যে তোমার

কি দুর্গতিই হবে?'

শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে এখন যৌবনের প্রতিটি দিন পাশে পাশে পেয়েছে ইন্দ্রাণীকে, সাহায্য নিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে।

সেদিনের ঢাকা হারিয়ে গেছে তরুণের জীবন থেকে, কিন্তু দূরে সরে যায়নি ইন্দ্রাণীর স্মৃতি। ডিপ্লোম্যাট তরুণ সেনগুপ্ত কত মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর স্মৃতি চাপা দিতে পারেনি কেউ। বিধাতাপুরুষের নির্দেশে সে যেন আজও তারই পথ চেয়ে বসে আছে। বন্ধু-বান্ধব সহকর্মীদের হাসিখুশিভরা সংসার দেখে তাঁদের ছেলেমেয়েকে আদর করে, ভালোবাসে। কত আনন্দ পায়। দিনের শেষে যখন নিজের শূন্য ফ্ল্যাটে ফিরে আসে, তখন পিকাডেলি সার্কাস–টাইমস স্কোয়ার–গিঞ্জার সব নিওন লাইটগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠলেও তরুণের অন্ধকার মনে একটুও আলোর ইসারা দিতে পারে না। ইন্দ্র-পত্নী ইন্দ্রাণীর মতো হয়তো তার ইন্দ্রাণী সুন্দরী ছিল না। সত্য, কিন্তু সে ছিল অপরূপা, অনন্যা। কিশোরী ইন্দ্রাণী যখন ম্যাট্রিক পাস করে ইডেন কলেজে ভর্তি হলো, শাড়ি পরতে শুরু করল, তখন যেন রাতারাতি ওর দেহে বন্যা এলো। চোখের নিমেষে যেমন পদ্মার ভাবান্তর হয়, ইন্দ্রাণীর সর্বাঙ্গে তেমন ভাবান্তর দেখা দিল। মেঘ দেখলেই যেমন মেঘনার জল নাচতে থাকে তেমনি তার অতদিনের অত পরিচিতা মেয়েটাকে দেখেও তরুণের মনে দোলা দিতে শুরু করল।

শীতের সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্ট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তরুণ একটু দাঁড়ায়। ফেন্সিং-এ ভর দিয়ে টেমস-এর দিকে তাকায়। চারিদিকে কুয়াশা যেন তরুণকেও গ্রাস করে।–এই ক'বছর ইন্দ্রাণী নিশ্চয়ই আরো পূর্ণ, পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ওর ওই স্বচ্ছ কালো চোখের বিদ্যুৎ আরো উজ্জ্বল আরো স্পষ্ট হয়েছে। ওর ওই ঘন কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো কোনোদিনই শাসন মানত না। যে একগোছা চুল সব সময় কপালের ওপর উড়ে বেড়াত, সেগুলো তো এতদিনে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ঘন কুয়াশা পাতলা হলো। ও-পারের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলের আলো যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তরুণের মনের স্বপ্নময় কুয়াশাও কেটে যায়, ফিরে আসে রূঢ় বাস্তবে, নির্মম ইন্দ্রাণী-বিহীন নিঃসঙ্গ জীবনে।

মনটা কদিন ধরেই ভালো না। ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে কাজ করতে একটুও ইচ্ছা করে না। বুড়ো-হাবড়া হাই-কমিশনার দেশসেবার বিনিময়ে কেনসিংটনের ওই বিরাট প্রাসাদ ও রোল্‌স রয়েস ভোগ করছেন। কিছু কাগজপত্র সই করতে হয় বটে, তবে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব-কর্তব্যের বালাই নেই। ডেপুটি হাই-কমিশনারই সর্বময় কর্তা।

ডেপুটি হাই-কমিশনার মিঃ ব্যাস নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের কূটনীতিবিদ। বেনিয়া ইংরেজ পর্যন্ত দর কষাকষিতে মাঝে মাঝে হার মানতে বাধ্য হয়। এর আগে উনি যখন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন তখন ভারতীয় ইমিগ্রান্টদের নিয়ে এক মহা হৈ-চৈ পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার কিছু সংবাদপত্র ও রাজনীতিবিদ এমন হাহাকার করে উঠলেন যেন কয়েকজন ব্ল্যাক ইন্ডিয়ানকে অস্ট্রেলিয়ায় পাকাপাকি ভাবে থাকার অনুমতি দিলে আকাশ ভেঙে পড়বে। মিঃ ব্যাস তখন কানে কানে ফিস-ফিস করে ওঁদের বলেছিলেন, 'কিছু মধ্যযুগীয় অধিবাসী ছাড়া অস্ট্রেলিয়ান বলে কোনো জাত নেই। তোমরা সবাই একদিন ইমিগ্রান্ট হয়েই এ দেশে এসেছিলে। সুতরাং ইন্ডিয়ানদের এত ঘেন্না করছ কেন?'

এই ছোট্ট একটা চিমটি কাটাতেই অস্ট্রেলিয়ার ওই সংবাদপত্র ও রাজনীতিবিদরা হুঁশ ফিরে পেয়েছিলেন এবং কাজ হয়েছিল।

কূটনীতিবিদ ব্যাস সাহেবের নিন্দা তাঁর চরম শত্রুরাও করবে না। তবে সন্ধ্যার পর বা কাজ কর্মের অবসরে সুন্দরী-সান্নিধ্য পেলে ভুলে যান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়। হাজার হোক সাবেকী মানুষ! শিকার করেন শুধু ভারতীয়।...

এড়িনবরা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য ভারতবর্ষ থেকে একদল শিল্পী এলেন লন্ডনে। কলকাতার মিস বলাকা রায় ও বোম্বের সুজাতাও এলেন। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মিঃ ব্যাস গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন, 'ডোন্ট বদার অ্যাবাউট আওয়ার আর্টিস্টস্। আমাদের আর্টিস্টদের থাকার ব্যবস্থা আমরাই করব।'

ব্যাস সাহেব আর্টিস্টদের জানিয়ে দিলেন, 'ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করলেই বড় বড় হোটেলে থাকতে হবে ও তার ফলে আপনাদের সীমিত ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে বিপদে পড়বেন। তাই আমরাই ব্যবস্থা করছি।'

কলকাতা থেকে মিস রায় লিখলেন, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ইনভিটেশন পাঠিয়েছেন বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাত্র ২৭ পাউন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর করেছে। দশ দিনের জন্য সাতাশ পাউন্ড! ভাবলেও মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম এসকর্ট হিসেবে ছোট ভাইকে সঙ্গে নেব, কিন্তু এই ফরেন এক্সচেঞ্জ...।'

শেষে লিখলেন, 'আপনার ভরসাতেই আসছি। দয়া করে দেখবেন। এয়ারপোর্টে যদি কাউকে পাঠান তবে বিশেষ কৃতজ্ঞ হবো।'

ব্যাস সাহেব মনে মনে হাসলেন। উত্তর দিলেন পরদিনই, 'কিছু ঘাবড়াবেন না মিস রায়। আপনাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য। সব ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। যদি কাইন্ডলি একুশে বি-ও-এ-সি ফ্লাইট থ্রি-সিক্স-ওয়ানে আসেন, তবে বড় ভালো হয়।'

ডেপুটি হাই-কমিশনার সাহেব এমনভাবে প্রোগ্রাম ঠিক করলেন যে, দুজন আর্টিস্ট একসঙ্গে এলেন না। তাছাড়া এক একজনকে এক-একটা হোটেলে ব্যবস্থা করলেন। কার্লটন টাওয়ারে সুজাতা, স্ট্রান্ড প্যালেসে মিস রায়। বোম্বের উঠতি নায়ক প্রেমকুমার? কেনসিনটন প্যালেসে।

সবাইকে এক কৈফিয়ত, 'লন্ডনে এখন পুরোপুরি টুরিস্ট সীজন ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক চাটার্ড ফ্লাইটে রোজ কয়েক হাজার আমেরিকান আর কানাডিয়ান আসছে। কিভাবে যে আমরা হোটেলে রিজার্ভেশন পেয়েছি, তা ভাবলেও অবাক লাগে।'

সুজাতা দেবী বছর তিনেক আগে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখে দেশে ফেরার পথে মাত্র দুদিনের জন্য লন্ডনে এসেছিলেন শুধু বোম্বের বাজারে নিজের দাম বাড়াবার জন্য। সুতরাং ধরতে গেলে তিনজনেই একেবারে আনকোরা। নিউকামারদের হাত করা খুব সহজ। টালিগঞ্জের ফিল্ম পাড়ায় বা পার্কস্ট্রিটের ওই দু-চারটে রেস্তোরাঁয় চালিয়াতি করা সহজ, কিন্তু লন্ডনের মতো মহা মহানগরে এসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে রীতিমতো কেরামতি দরকার। অজস্র অর্থ থাকলে তবু সম্ভব, কিন্তু সাতাশ পাউন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে?

হিথরো এয়ারপোর্টে মিঃ ব্যাস ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস রয়। দিজ ইজ ব্যাস।'

'গুড আফটারনুন! গুড আফটারনুন! আপনি নিজে কষ্ট করে এয়ারপোর্টে এসেছেন?'

কেবিন-ব্যাগ হ্যান্ড-ব্যাগ ঠিক করে ধরতে ধরতে বললেন, ছি ছি, আমাদের জন্য আপনাকে কি দুর্ভোগই না সহ্য করতে হলো।'

ব্যাস সাহেব মনে মনে ভাবলেন, 'আসব না সুন্দরী! তোমার মতো সুন্দরী অথচ ইগনোরেন্ট

গেস্টদের শিকার করবার জন্য রোজ এয়ারপোর্টে আসতে রাজি আছি।'

নিজের অজ্ঞাতেই ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল। '—হাজার হোক আপনি একজন সেলিব্রেটেড আর্টিস্ট। আপনাদের সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য।'

নিজের গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করে মিস রায়কে নিয়ে গেলেন স্ট্রান্ড প্যালেস। গাড়ি থেকে নামার আগে মিস রায়ের কোটের দুটো বোতাম আটকে দিয়ে উপদেশ দিলেন, 'বোতামগুলো ভালো-করে আটকে নিন। হঠাৎ কখন ঠাণ্ডা লেগে যাবে, তা টেরও পাবেন না।'

ফিল্ম স্টার হলেও বাঙালি মেয়ে তো! ব্যাস সাহেব অত আপন জ্ঞানে কোটের বোতাম লাগাবার সময় বলাকা রায় একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। কিন্তু একে লন্ডন, তারপর এমন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ; তাই আপত্তি করা তো দূরের কথা, হাসিমুখেই ধন্যবাদ জানিয়েছিল। তাছাড়া সিনেমা-অ্যাকট্রেস হয়েও কলকাতা শহরে ঠিক সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা পান না মিস রায়। একটু হাসি, একটু কথা, একটু মেলামেশা অনেকেই পছন্দ করেন, কিন্তু স্বীকৃতি-মর্যাদা দিতে ওঁদের বড় কুণ্ঠা। লন্ডনে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের এমন সহজ সরল মেলামেশা ও সাহায্যে মিস রায় বরং কৃতজ্ঞ হলেন।

একটু জল, একটু সার ছড়ালে ফসল হবেই। জমিটা উর্বর হলে সে ফসল আরো ভালো হয়।

এই সামান্য সৌজন্যের সার ছড়িয়েই ব্যাস সাহেব শান্তি পেলেন না। ওয়েস্ট মিনিস্টার, সেন্ট জেমস পার্ক, বাকিংহাম প্যালেস, রিজেন্ট পার্ক, হাইড পার্ক, মার্বেল আর্চ, জুলজিক্যাল গার্ডেন, কেনসিংটন গার্ডেন দেখালেন, বেড়ালেন! তারপর মিস রায় এডিনবরা থেকে ফিরে এলে উদার ডেপুটি হাই-কমিশনার সাহেব তাঁকে নাইট ক্লাব দেখালেন, উইক-এন্ডে ব্রাইটনের সমুদ্র পাড়েও নিয়ে গেলেন।

মৌমাছি শুধু মধুর জন্যই ফুলের কাছে যায়, ফুলের সৌন্দর্য বা সান্নিধ্য উপভোগের জন্য নয়। ব্যাস সাহেবও ঠিক তাই। নিজের কাজ-কর্ম কাউন্সিলার ও তরুণের উপর চাপিয়ে দিয়ে মিছিমিছি বলাকা রায়ের পিছনে ঘুরে বেড়াননি, একথা হাই-কমিশনের সবাই জানত।

মিসেস ব্যাস তখন ইন্ডিয়ায় থাকায় ব্যাস সাহেবের লীলাখেলা আরো জমেছিল। বলাকাকে বিদায় দেবার পর সুজাতাকে তো নিজের আস্তানাতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অনারে ডিনার-ককটেল হলো। ডেইলি মীরর-এর ফটোগ্রাফারকে এনে ফিচার ছাপাবার ব্যবস্থাও হলো।

বিদেশ-বিভুঁইতে বলাকা রায় বা সুজাতার মতো কত কে আসেন। ভারতবর্ষের পরিচিত সমাজ-সংসার থেকে দূরে এসে এঁরা যেন কেমন মুক্ত হন বহুদিনের বহু রীতিনীতি সংস্কার থেকে। কেমন যেন শিথিল হয় সব বন্ধন। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ দেখার আনন্দে মেতে ওঠে বলাকা রায়, সুজাতা ও আরো অনেকে। আর সেই বন্ধনহীন আনন্দের ফাটলের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ঢুকে পড়েন ব্যাস সাহেব।

যে তরুণ সারা জীবন ধরে ভালোবেসেছে, স্বপ্ন দেখেছে শুধু ইন্দ্রাণীকে, সে সহ্য করতে পারে না ব্যভিচারী ব্যাসকে। অথচ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অল্ডউইচের বিরাট হাই-কমিশনে শুধু ওই একটি মানুষকে নিয়েই তার সংসার! কূটনৈতিক দুনিয়ার বিরাট চাকচিক্য-রোশনাইয়ের মধ্যেও তরুণ যেন আলোর নিশানা খুঁজে পায় না। কতদিনের কত স্বপ্নের লন্ডনও যেন ভালো লাগে না তার। এত বড় শহরের এত পরিচিতের মধ্যেও নিঃসঙ্গতার দাহ যেন তাকে আরো পীড়া দেয়।

ছয়

কেনসিংটন গার্ডেনস্, হাইড পার্কের বাঁদিক দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে, তার নাম বেজওয়াটার রোড। এজওয়ার রোড ও পার্ক লেনের মোড়ে মার্বেল আর্চকে স্পর্শ করতেই বেজওয়াটার রোডের নাম হারিয়ে গেল, শুরু হলো অক্সফোর্ড স্ট্রিট।

সবুজের মেলার পাশের শান্ত বেজওয়াটার রোড নাম পাল্টাতেই চরিত্র হারিয়ে ফেলল। প্রাণ-চঞ্চল অক্সফোর্ড স্ট্রিট যেন মানুষের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার তীর্থক্ষেত্র। দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ-সম্ভোগের প্রদর্শনী হচ্ছে এই অক্সফোর্ড স্ট্রিট পাড়া। অক্সফোর্ড স্ট্রিট, বেকার স্ট্রিট, নিউ বন্ড স্ট্রিট, রিজেন্ট স্ট্রিট, উইগমোর স্ট্রিট, টটেনহোম কোর্ট রোড, চারিং ক্রশ ও আশপাশে মানুষ গিজগিজ করছে। সীমাহীন লালসা নিয়ে বেড়াচ্ছে সবাই।

অক্সফোর্ড স্ট্রিট সোজা আরো এগিয়ে গেল। মানুষের ভিড় একটু পাতলা হলো। রাস্তার নামও পাল্টে গেল। এবার নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রিট। এর পর আবার পরিচয় ও চরিত্র পাল্টে গেল ওই একই রাস্তার। হলো হাই হোবর্ন। আবার বদলে গেল। এবার শুধু হোবর্ন।

রাস্তাটা ধনুকের মতো একটু ডান দিকে বেঁকে যেতেই আরো কতবার ওই একই রাস্তার পরিচয় ও চরিত্র পাল্টে গেল।

বেশ মজা লাগে তরুণের। কোনোদিন কাজকর্মের মাঝে সুযোগ পেলে অফিস থেকে বেরিয়ে স্ট্রান্ড রোড ধরে এগিয়ে যায় চারিং ক্রশ। তারপর যেদিকে খুশি চলে যায়। হারিয়ে যায় সর্বজনীন মহামেলায়। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে হাজির হয় টি সেন্টারে।

শুধু ক্লান্ত হয়ে নয়, মাঝে মাঝে ভুল করে, অন্যমনস্ক হয়েও তরুণ হাজির হয় টি সেন্টারে।

কাউন্টারের কাছে যাবার আগেই মিস বোস এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান, 'আসুন, আসুন। এতদিন কোথায় ছিলেন?'

তরুণ একটু হাসে, এক ঝলক দেখে নেয় মিস বোসের অশান্ত, অবাধ্য চুলগুলো আর ওই দুটো মিষ্টি চোখ। তারপর বলে, 'কোথায় আর যাব?'

বন্দনা বোস বলে, 'আজও কি মানুষের শোভাযাত্রা দেখতে এদিকে এসেছেন?'

'যদি বলি আপনার কাছেই এসেছি।'

রাশ-আওয়ার না হলেও তখনও বেশ কিছু কাস্টমার ছিলেন। তবুও বন্দনা হেসে উঠল। ভ্রূ দুটো টেনে উপরে উঠিয়ে বলল, 'ফর গডস সেক, এমন মিথ্যা বলবেন না।'

'যাকগে, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। চলুন আপনার বাড়ি যাই।'

'এক্ষুনি?'

'তবে কি? মিসেস অরোরাকে বলুন আমাকে মাছ রান্না করে খাওয়াবেন বলে...।'

বন্দনা আবার একটু হেসেই চলে গেলেন মিসেস আরোয়ার কাছে।

দু-এক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এসে বললেন, 'আপনার বহিনজী আপনাকে ডাকছেন।'

হাইকমিশনের সবাইকেই মিসেস আরোরা একটু খাতির করেন। তবে তরুণকে উনি ভালোবাসেন। হাইকমিশনের আর কেউ ওঁকে বহিনজী বলেন না, উনিও আর কাউকে ভাইসাব বলেন না। লন্ডন শহরে এসব সম্পর্ক দুর্লভ হলেও মনটা তো ভারতীয়।

কদাচিৎ কখনও কখনও তরুণ এদিকে এলে বন্দনার সঙ্গে দেখা করবেই। সেবার চার্চ হলে নববর্ষ উৎসব আলাপ হবার পর থেকেই দুজনের মধ্যে একটা বেশ মৈত্রীর ভাব জমে উঠেছে। বন্দনায় ওই চুল আর ওই চোখ দুটো দেখে তরুণের যে অনেক কথা মনে পড়ে, অনেক স্মৃতি

ফিরে আসে। কিন্তু সেকথা একটি বারের জন্যও প্রকাশ করে না। তবে বন্দনা জানে, বোঝে, তরুণ তাকে পছন্দ করে, হয়তো একটু ভালোবাসে। সে পছন্দ বা ভালোবাসায় অবশ্য মালিন্যের স্পর্শ নেই। টি এক্সপোর্ট ব্যুরোর চেয়ারম্যানের মতো নোংরা চরিত্রের লোক তরুণ নয়, সেকথা বন্দনা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

বৃদ্ধ চেয়ারম্যানের কথা মনে হলে ঘেন্নায় বন্দনার সারা মন ঘিন-ঘিন করে ওঠে।

...বিশ্বের বাজারে ইন্ডিয়ান টি-র চাহিদা কমে যাচ্ছে। এককালে যেসব দেশে শুধু দার্জিলিং বা আসামের চা বিক্রি হতো, সেসব দেশের বাজারে সিংহল ও সাউথ আফ্রিকায় চায়ের বেশ চাহিদা হচ্ছে। লন্ডন চা নিলামের বাজারে ক'বছর আগেও ইউরোপ আমেরিকার কাস্টমাররা দার্জিলিং টি কেনার জন্য হুড়োমুড়ি করত। লন্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, জেনেভা, ব্রাসেলস, টারান্টা উরস্টার, জনারিও'র বড় বড় রেস্তোরাঁয় কবছর আগেও ইন্ডিয়ান চা সার্ভ করে নিজেদের কৌলিন্য প্রচার করত। বড় বড় নিওনসাইনের বিজ্ঞাপন দিত, 'ফর বেস্ট ইন্ডিয়ান টি, ভিজিট...।' কবছরের মধ্যে সব নিওনসাইনের আলো নিভে গেল।

কর্মবীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের প্রতিভাবান কমার্শিয়াল অ্যাটাচির দল এসব ব্যাপারে নজর দেবার তাগিদবোধ করলেন না। কলকাতা থেকে বেস্ট ইন্ডিয়ান টি-র স্যাম্পল প্যাকেট পেয়েই ওঁরা মহাখুশি রইলেন।

দু-চারটে খবরের কাগজের রিপোর্ট ও পার্লামেন্টে কিছু কোশ্চেন হবার পর কুম্ভকর্ণ ভারত সরকারের যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উদ্যোগ ভবনে নতুন ফাইলের জন্ম হলো, ততদিনে ওসব দেশের কয়েক কোটি মানুষের অভ্যাস পাল্টে গেছে। সাউথ আফ্রিকা ও সিংহল গ্যাঁট হয়ে বসেছে লন্ডন টি অকসানে।

রোগটা যখন ক্যান্সারের পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন সর্বরোগবিনাশিনী বটিকা আবিষ্কারের প্রয়াসে এক ডেপুটি মন্ত্রী তিন সপ্তাহে নটি দেশ ভ্রমণ করে দিল্লি ফিরে গেলেন। এই ভ্রমণে রোগের কোনো সুরাহা হলো না বটে, তবে ডেপুটি মন্ত্রীর গাল দুটি কাশ্মীরী আপেলের মতো লাল হলো।

প্রথম প্রিলিমিনারী রিপোর্ট ও প্রেস কনফারেন্স হতে দেরি হলো না। মাস তিনেকের মধ্যেই মিনিস্টর-ডেপুটি মিনিস্টার-সেক্রেটারির মিটিং হলো। পরের চার মাসে সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারিদের নিয়ে দু-তিনবার মিটিং করলেন। এর পর দুজন ডেপুটি সেক্রেটারি ও একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি টি এক্সপোর্টার্সদের সমস্যা ও মতামত জানার জন্য বারকয়েক কলকাতা-দার্জির্লিং গৌহাটি-শিলং ঘুরে এলেন পরের ছ-সাত মাসের মধ্যেই। জয়েন্ট-সেক্রেটারি দার্জিলিং গিয়ে একটু গ্যাংটক ঘুরে আসায় তাঁর মনে হলো পাঞ্জাবের বেড কভারের ডিমান্ড ওখানে বেশ ভালোই। দিল্লি ফিরে একটা রিপোর্টও দিলেন, বেড কভার বিক্রি হলে সিকিমের কমন ম্যান ভীষণ খুশি হবে ও ইন্ডিয়া-সিকিমের কালচারাল-সোস্যাল-ইকনমিক্যাল সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।

কেরালার কোট্টায়াম জেলার অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারি এই রিপোর্ট পড়েই বললেন, 'ডিড আই নট টেল ইউ যে ওখানে কেরালার কয়ার ম্যাটের ভীষণ ডিমান্ড আছে?'

'তাই নাকি?'

'তবে কি! সেবার শিলিগুড়ি এয়ারপোর্টে সিকিম প্যালেসের একজন হাই-অফিসারের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় উনিই জানালেন কয়ার ম্যাটকার্পেটের ভালো ডিমান্ড হতে পারে সিকিমে।'

'কোয়াইট ন্যাচারাল।'

'তাই তো বলেছিলাম, আপনি একবার কেরালা ঘুরে আসুন। তারপর একটা কমপ্রিহেনসিভ রিপোর্ট দিন।'

চায়ের সমস্যা চাপা পড়ল। জয়েন্ট সেক্রেটারি ছুটলেন কেরালা।

যাই হোক, এমনি করে আবার মন্ত্রী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে চা রপ্তানি শিল্পের প্রায় নাভিশ্বাস হয়ে ওঠার উপক্রম হলো। সার্জিক্যাল অপারেশন করে অনতিবিলম্বে রোগ সারাবার জন্য মিঃ বহুগুণার নেতৃত্বে সাতজনের এক কমিটি নিয়োগ করে বলা হলো সরকারি পয়সায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে চটপট রিপোর্ট দিন।

এই কমিটির শিরোমণি হয়েই বহুগুণা সাহেব লন্ডন এসেছিলেন। টি সেন্টারের ম্যানেজারের ঘরে হলো অফিস। অস্থায়ী আবাস-স্থান হলো কাছেরই মাউন্ট রয়্যাল হোটেলে।

দু-চার দিন টি সেন্টারে আসার পরই বহুগুণা সাহেব বললেন, 'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিসেস অরোরা, মিস বোস আমার কাজে একটু হেল্প করুন।'

কথাটা বলতে না বলতেই আবার বললেন, অবশ্য যদি আপনার এখানকার কাজের কোনো ক্ষতি না হয়।'

মিসেস অরোরা একজন সামান্য ম্যানেজার। চেয়ারম্যান বহুগুণা সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করার কথা উনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। উনি দিল্লিতে না থাকলেও ভূতপূর্ব সেন্ট্রাল মিনিস্টার বহুগুণা সাহেবের ইনফ্লুয়েন্সের কথা ভালোভাবেই জানেন। চায়ের রফতানির বাজার স্টাডি করতে এলেও এয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজার থেকে হাইকমিশনার পর্যন্ত ওঁকে নিয়ে মহাব্যস্ত। সুতরাং মিসেস অরোরা কৃতার্থ হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। যদি আমাকে দরকার হয়, বলতে দ্বিধা করবেন না।'

তোমাকে বহুগুণা সাহেবের দরকার নেই। তোমার বসন্ত বিদায় নিয়েছে। চৈত্র দিনের ঝরা পাতার বাজারে তোমাকে নিয়ে কি হবে।

'না, না, আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। মিস বোস হলেই সাফিসিয়েন্ট।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার। উই আর অ্যাট ইওর ডিসপোজ্যাল।'

'মেনী থ্যাঙ্কস মিসেস অরোরা।'

কয়েক দিন পর কমিটির অন্য সদস্যরা কন্টিনেন্টে চলে গেলেন।

বহুগুণা সাহেব একাই থেকে গেলেন লন্ডনে।

'আমি তো এখন একাই কাজ করব। আমি আর কেন একলা টি সেন্টারে যাই? তুমিই না হয় হোটেলে চলে এসো।'

চেয়ারম্যানের আদেশ শিরোধার্য করে নিল বন্দনা।

একদিন বেশ কেটে গেল।

পরদিন।

'এখন থেকে রোজ সকালেই আমি কেনসিংটনে হাই-কমিশনারের বাড়ি যাব। তুমি বিকেলের দিকেই এসো।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার।'

বন্দনা দরজা নক্ করার আগে একবার ঘড়িটা দেখে নিল। হ্যাঁ,, চারটেই বাজে।

'কাম ইন।'

আমন্ত্রণ শুনে ঘরে যেতেই হাসিমুখে বহুগুণা সাহেব অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

বন্দনা পাশের সোফাটায় বসে একটু মুচকি হেসে বললে, 'সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার।'

'দেখ বন্দনা, অত ফরম্যাল হবে না।'

বহুগুণা সাহেব বন্দনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার কাছে এত ফরম্যাল হবার দরকার নেই। বী ইনফরম্যাল, কম্‌ফর্টেবল।'

এই বলে বন্দনাকে নিয়ে বড় সোফাটায় পাশে বসালেন। 'বলো কফির সঙ্গে কি খাবে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। আমি এখন কিছু খাব না!'

'আবার ফর্মালিটি?' ডান হাত দিয়ে বন্দনাকে একটু জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বিলেতে থেকে একেবারে বিলেতী হয়ে গেছ? বলো কি খাবে?'

'ওনলি কফি স্যার।'

'তাই কি হয়?'

টেলিফোন তুলেই ডায়াল করলেন, 'রুম সার্ভিস! প্লিজ সেন্ড টু প্লেটস অফ চিকেন স্যান্ডউইচ, সাম পেস্ট্রি অ্যান্ড কফি ফর টু।'

বন্দনা ঈশান কোণে একটা ছোট্ট কালো মেঘ দেখতে পেল। মনের মধ্যে অনিশ্চিতের আশঙ্কা দোলা দিল। অনুমান করতে কষ্ট হলো না বহুগুণা সাহেবের অন্তরের ক্ষীণ আশা।

আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই বন্দনার। তাই যেন একটু মুচকি হাসল। লন্ডনে আসার প্রথম কয়েক মাসে এমনি কত বিপদের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল! শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে। তাই তো কেমন যেন একটু বিদ্রূপের হাসি উঁকি দিল তার ঐ দুটো ঠোঁটের কোণে।

'জান বন্দনা, এতবার তোমাদের এই বিলেতে এসেছি কিন্তু সব সময়ই কাজকর্ম নিয়ে এমন বিশ্রী ব্যস্ত থেকেছি যে কিছুই দেখা হয়নি।'

'তাই নাকি স্যার?'

'তবে কি! ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা উইন্ডসর ক্যাসেল-এর পাশ দিয়ে গেছি হাজার বার কিন্তু ভিতরে যাবার সময়-সুযোগ হয়নি।'

বন্দনা মনে মনে ভাবে, হোটেলের এই ঘরে মাঝে মাঝে তোমার আলিঙ্গন ও আদর উপভোগ করার চাইতে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান অনেক ভালো।

'আমিও যে সব কিছু দেখেছি তা নয়; তবুও চলুন না, সব কিছু দেখিয়ে দেব।'

'দ্যাটস লাইক এ ওয়ান্ডারফুল গার্ল,' বলেই বহুগুণা ডান হাত দিয়ে বন্দনাকে একটু কাছে টেনে আদর করলেন।

বন্দনা লোহার মতো শক্ত হয়ে থাকে, নিজের বুকের পর দুটি হাত রেখে ছোটখাটো আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করে।

'আঃ! তুমি বড় রিজিড, বড় কনজারভেটিভ। এতদিন বিলেতে থাকার পরও একটু ফ্রিলি মিশতে পার না? তাছাড়া আমার মতো ওল্ডম্যানের কাছে লজ্জা কি?'

'না না, লজ্জা কি!'

সকাল সাড়ে এগারটায় বাকিংহাম প্যালেসের সামনে একদল বাচ্চা ও টুরিস্টদের সঙ্গে বহুগুণা সাহেবকে 'চেঞ্জিং অফ দি গার্ড' দেখাল। তারপর ন্যাশনাল গ্যালারি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

'বুঝলে বন্দনা, এ তো মিউজিয়াম নয়, একটা দুনিয়া। ভালোভাবে দেখতে হবে। আর একদিন আসব। চলো আজকে একটু রিজেন্ট পার্ক বা কেনসিংটন গার্ডেনে যাই।'

সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই বহুগুণার আরো গুণ প্রকাশ পেল।

'শুনেছি তোমাদের এই লন্ডনে ওয়ার্ল্ড ফেমাস নাইট ক্লাব আছে। কে যেন বলেছিল 'ফোর

হানড্রেড ক্লাব', 'রিভার ক্লাব' ও আরো কি কি সব নাইট ক্লাব আছে। কত বারই তো এলাম অথচ কিছুই দেখলাম না। তুমি আমাকে একটু নাইট ক্লাব ঘুরিয়ে দাও তো।'

লন্ডনের নাইট ক্লাবগুলি যে পৃথিবীবিখ্যাত, তা, বন্দনা শুনেছে। কখনও দূর থেকে, কখনও পাশ দিয়ে যাবার সময় নাইট ক্লাবগুলোর নিওন সাইন দেখেছে। সেরকম বন্ধু ও অপব্যয় করার মতো টাকাকড়ি থাকলে হয়তো একদিন ভিতরে ঢুকে দেখত। সে সুযোগ ওর আসেনি। তবে শুনেছে সবকিছু। ও জানে যৌবনপসারিণীরা নাচে, দর্শকদের নাচায়। রাত যত গভীর হয় সবাই তত বেশি আদিম হয়। যৌবন-পসারিণীদের দেহ থেকে ধীরে ধীরে পোশাকের ভার যত কমে আসে দর্শকরা তত বেশি মদির হয়, উন্মত্ত হয়, আরো কত কি!

বহুগুণার মতো বৃদ্ধকে নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত 'ফোরহানড্রেড ক্লাবে' যাবার কথা ভাবতেও বন্দনার বিশ্রী লাগল। একবার ভাবল, মিসেস অরোরাকে বলে। তারপর মনে হলো, বহুগুণা সাহেবের এইসব গুণের কথা জানাজানি হলে ওকে নিয়েও নিশ্চয়ই সরস আলোচনা শুরু হবে। নিশ্চয়ই অনেকে অনেক কিছু ভাববে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এদিক-ওদিক সেদিক চিন্তা করে বন্দনা বলল, 'ঠিক আছে, আমি আপনার একটা রিজার্ভেশন করে দেব।'

'ইউ নটি গার্ল! আমাকে একলা একলা নেকড়ে বাঘের মুখে ঠেলে দিতে চাও?'

বন্দনার হাসি পেল।

নাইট ক্লাবে গেলেন বহুগুণা সাহেব। মিস বন্দনা বোসকে পাশে নিয়ে উপভোগ করলেন যৌবন-পসারিণীদের নাচ। লাস্ট ফাইন্যাল সিনে লাইট অফ হয়ে গেলে মুহূর্তের জন্য আতিশয্যের আধিক্যে বন্দনার হাতটা চেপে ধরলেন। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

বারোটা বাজার আগেই নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফেরার পথে বেশ একটু নিবিড় হয়ে বসলেন।

'জান বন্দনা, তোমাকে বলতে একেবারেই ভুলে গেছি। কাল সকালেই চারজন ব্রিটিশ অকসনার্স আসছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাইকমিশনের অফিস থেকে যে ব্রিফ দিয়েছে, তার বেসিসে তোমাকে আজ রাত্রেই একটা ছোট্ট নোট ঠিক করে দিতে হবে।'

'আজ রাত্রেই?' বন্দনা চমকে ওঠে। নাইট ক্লাব থেকে ফেরার পর বহুগুণা সাহেবের সঙ্গে হোটেলে ওই কাজ করতে হবে? 'আমি বরং স্যার কাল ভোরে এসেই...।'

কথা শেষ হবার আগেই বহুগুণা বাধা দিলেন, 'নট অ্যাট অল! আজ রাত্রেই ওটাকে রেডি করতে হবে।'

হোটেলের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বহুগুণা সাহেব নিজে বন্দনার কোট খুলে দিলেন। মুহূর্তের জন্য একবার যেন কী ভীষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আগুনের হল্কার মতো নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর! চিড়িয়াখানার নেকড়ে বাঘও তখন ওঁকে দেখলে হয়তো ভয় পেত।

বহুগুণা সাহেব আরো এগিয়ে এলেন। বন্দনা একটু পিছিয়ে যেতেই বহুগুণা সাহেব দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'প্লিজ ডোন্ট ডিসিভ মি টু-নাইট।'

বন্দনার মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না। বহুগুণা সাহেব হঠাৎ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দানবের বেগে জড়িয়ে ধরলেন বন্দনাকে!

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দরজায় ঠক্-ঠক্ করে নক্ করল।

ঘরে আলো জ্বলে উঠল। বন্দনা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে পাশে সরে দাঁড়াল। বহুগুণা সাহেব একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাম ইন।'

দরজা খুলে অপ্রত্যাশিত ভাবে তরুণ সেনগুপ্ত একটা গোলাপি কভার নিয়ে ঘরে ঢুকল,

'এক্সকিউজ মি স্যার! দিল্লি থেকে একটা আর্জেন্ট মেসেজ আছে। আজ রাত্রেই রিপ্লাই দিতে হবে।'

'আজ রাত্রেই?'

'ইয়েস স্যার।'

একটা ব্রিটিশ নিউজ পেপারের রিপোর্টের ভিত্তিতে বহুগুণা সাহেবের কমিটি নিয়ে পার্লামেন্টে সর্ট নোটিশে কোশ্চেন টেবিল করেছেন আট-দশজন অপোজিশন এম-পি।

'স্যার আমাদের হাই-কমিশনের একজন স্টাফকে সঙ্গে এনেছি। আপনি কাইন্ডলি ওকে আপনার রিপ্লাইটা ডিকটেট করে নিচে একটা সই করে দেবেন। উই উইল সেন্ড এ কেবল টু ডেল্‌লি!'

এবার তরুণ বন্দনার দিকে তাকায়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য হয়ত স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'এক্সকিউজ মি মিস বোস, চলুন আমাদের অফিস কারে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।'

বন্দনা সেদিন মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়েছিল ভগবানকে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল তরুণকে।

সেই থেকে তরুণের প্রতি বন্দনার একটা অদ্ভুত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। হয়তো ভালোওবাসে। বন্দনা বুঝতে পারে তরুণ যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়ায়। ওর মতো এক সাধারণ মেয়ের দুটি চোখের ছোট্ট দুটি তারার মধ্য দিয়ে বিরাট এক দুনিয়া দেখছে। যেন ক্যামেরার ছোট্ট লেন্সের মধ্য দিয়ে সুন্দর অরণ্য-পর্বতের ছবি তোলা। ক্যামেরাম্যান প্রকৃতির ওই অনন্য সৌন্দর্যকে বন্দী করতে চায়, উপভোগ করতে চায় সর্বক্ষণ। তাই তো সে ক্যামেরার লেন্সকে যত্ন করে, ভালোবাসে। বন্দনা জানে সে শুধু ক্যামেরার লেন্সমাত্র, অপরূপ প্রকৃতি নয়।

তবু তার ভালো লাগে, তবু সে খুশি। তরুণ মাছ খেতে চাইলে সে এক পাউন্ড-দেড় পাউন্ড খরচা করে মাছ কেনে, মাংস কিনে কত যত্ন করে রান্না করে।

গ্যাসে মাছটা চাপিয়ে দিয়ে কোণার সোফাটায় বসে বন্দনা প্রশ্ন করে, 'একটা কথা বলবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'কাকে আবার!'

'আপনি জানেন আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি বিশ্বাস করি আপনি মিথ্যা কথা বলেন না।'

'না, না, মিথ্যা বলব কেন? খুঁজি না কাউকে। তবে মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার কথা, ছেলেবেলার কথা, ছাত্রজীবনের কথা।'

একটু নিবিড় হয়ে মিশলেই বেশ বোঝা যায় তরুণ যেন কারুর ভালোবাসার কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পৃথিবীতে থেকেও সে যেন এক মহাশূন্যে বিচরণ করছে। পুরুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, কিন্তু মেয়েদের? অসম্ভব।

তরুণের জীবনের, মনের দুঃখের ইঙ্গিত পাবার জন্য বন্দনা যেন ওকে আরো ভালোবাসে।

তরুণও ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে বন্দনাকে। কি নিদারুণ পরিশ্রম করে মেয়েটা ক'টা বছরে সারা পরিবারকে রক্ষা করল।

দুটি বছরে দুজনে কত কাছে এলো।

'বন্দনা, এবার তো আমার যাবার পালা।'

'তোমার ট্রান্সফার অর্ডার এসে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

বন্দনা যেন বাক্‌শক্তিটাও হারিয়ে ফেলল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তরুণ একটু কাছে টেনে নেয় বন্দনাকে। মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'আমার একটা কথা শুনবে বন্দনা?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি একটা বিয়ে কর।' তরুণের দৃষ্টিটা ঘুরে আসে লন্ডনের মেঘলা আকাশের কোল থেকে। 'আমার খুব ইচ্ছা করে তোমার বিয়েতে আমি খুব হৈ-চৈ করি, খুব মজা করি, খুব মাতব্বরি করি।'

'আর একটা বছর। ছোট ভাইটা যাদবপুর থেকে বেরিয়ে যাক। তারপর তুমি একটা ছেলে ঠিক করে দিও, নিশ্চয়ই বিয়ে করব।'

বন্দনার এমন সুন্দর আত্মসমর্পণে মুগ্ধ হয় তরুণ। এমন অধিকার কজন আধুনিকা দিতে পারে অপরিচিত ডিপ্লোম্যাটকে?

'নিশ্চয়ই আমি ছেলে খুঁজে দেব। তবে বিলেতি বাঁদরদের সঙ্গে কিন্তু আমি বিয়ে দেব না!'

বন্দনা শুধু মাথা নিচু করে হাসে।

দুদিন পরে হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে তরুণ বিদায় নিল। বন্দনা ওই এয়ারপোর্টের ভিড়ের মধ্যেই প্রণাম করে বলল, 'আমাকে কিন্তু ভুলে যেও না।'

'পাগলী মেয়ে কোথাকার।'

সাত

উনিশশো ষাট সালের তেসরা মে তুরস্কস্থিত মার্কিন বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে একটা ছোট্ট খবর প্রচার করা হলো : আদানা এয়ার-বেস্ থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা বিমান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উড়বার পর নিখোঁজ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ওয়্যার সার্ভিসের অসংখ্য চ্যানেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ছোট্ট খবরটি ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়। কিন্তু কেউই বিশেষ গ্রাহ্য করল না। কোনো কাগজে খবরটা বেরুল, কোনো কাগজে বেরুল না। ডিপ্লোম্যাটরাও বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

দুদিন পর পাঁচই মে সুপ্রিম সোভিয়েটের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভ ঘোষণা করলেন, একটা পরিচয়বিহীন মার্কিন বিমান সোভিয়েট ইউনিয়নের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করায় গুলি করে নামান হয়েছে।

চমকে উঠল দুনিয়া।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াশিংটন থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হলো, ১৯৫৬ সাল থেকে যে ইউ–টু বিমান পৃথিবী থেকে অনেক উঁচু আবহাওয়া সম্পর্কিত গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, এমনি ওই বিমানের পাইলট তুরস্কের লেক ভ্যান-এর উপর দিয়ে ওড়ার সময় জানায় তার অক্‌সিজেন সাপ্লাইতে গণ্ডগোল হচ্ছে। হয়তো এমনি পরিস্থিতিতে বিমানটি রাশিয়ায় ঢুকে পড়ে।

শুধু এইটুকু বলেই ওয়াশিংটন থামল না। ওই একই ঘোষণায় জানাল নিরস্ত্র ওই পাইলটের

নাম।

ওয়াশিংটন থেকে মস্কোতে একটা নোট পাঠিয়ে আবহাওয়ার তথ্য সন্ধানী ওই বিমানের বিশদ খবরও জানতে চাইল।

মার্কিন সরকার স্থির ধরে নিয়েছিলেন যে পাইলট ফ্রান্সিস গ্রে পাওয়ার্স বেঁচে নেই। বিমানটিকে গুলি করে নামাবার পর সে বেঁচে থাকতে পারে না।

সেই আশায় ও ভরসায় ৬ মে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে জোর গলায় প্রচার করা হলো, সোভিয়েট আকাশ-সীমা লঙ্ঘনের কোনো কথাই উঠতে পারে না।

সেই তেসরা মের ঘোষণার পর ক্রুশ্চভ কদিন ধরে শুধু মুচকি মুচকি হাসলেন। সাতই মে আর সে হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। সুপ্রিম সোভিয়েটে বক্তৃতা দেবার সময় ইউ–টু বিমানের নাড়িনক্ষত্র জানিয়ে ঘোষণা করলেন, ফ্রান্সিস গ্রে জীবিত ও সোভিয়েট কারাগারে। ফ্রান্সিস গ্রে স্বীকারোক্তি করেছে যে, তার সঙ্গে প্রচুর টাকা, আত্মহত্যার সরঞ্জাম, সোনা, অস্ত্রশস্ত্র ও এক থলি ভর্তি ঘড়ি ও আংটি ছিল।

এই বক্তৃতার শেষে ক্রুশ্চভ নরওয়ে, তুরস্ক ও পাকিস্তানকে সতর্ক করে বললেন, যেসব দেশ থেকে এইসব গোয়েন্দা বিমান উড়বে, তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

মার্কিন সরকারকে কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করলেও ক্রুশ্চভ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সম্পর্কে একটুও কটু কথা বললেন না।

সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটরা ক্রুশ্চভের এই রসিকতা ঠিক হয়তো ধরতে পারলেন না। সবাই ভাবলেন, হয়তো তেমন কিছু হবে না।

সাতই মে ওয়াশিংটন থেকে আবার বিবৃতি। প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই তাঁরা স্বীকার করলেন গোয়েন্দা বিমানের অভিযান কাহিনি–তবে ঠিক অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এবার শুধু ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দ নয়, সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটরাও মুখ টিপে হাসতে শুরু করলেন। আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তাহলে সরকারের বিনা অনুমতিতেই এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আর কোনো গত্যন্তর না থাকায় শেষ পর্যন্ত ইউ–টু ফ্লাইট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ঘোষণা করলেন এগারোই মে।

ওইদিন প্রায় একই সময়ে মস্কোর ফরেন করেসপনডেন্টদের ক্রুশ্চভ নেমন্তন্ন করে ইউ–টু ফ্লাইটের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম দেখালেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাইক্লোন উঠল। আমেরিকার দুই দোস্ত–ফরাসি ও ব্রিটিশ সরকার ভাবল যে ওদের দেশের উপর দিয়েও নিশ্চয়ই অমনি গোয়েন্দা বিমান ঘুরে বেড়ায়। জ্ঞাতিশত্রু।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্রুশ্চভের ধমক খেয়ে নরওয়ে প্রতিবাদপত্র পাঠাল ওয়াশিংটনে। ব্ল্যাক সী-র এ-পারের তুরস্ক, প্রভুসেবা করতে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হবে ভাবতে পারেনি। মার্কিন সাহায্যে তুরস্ক বেঁচে আছে বলে নরওয়ের মতো প্রতিবাদও পাঠাতে পারল না ওয়াশিংটনে। ফাঁপরে পড়ল পাকিস্তান। আয়ুব খাঁ একই সঙ্গে কবছর দুধ আর তামাক খাচ্ছিলেন কিন্তু এবার ক্রুশ্চভের ধমক খেয়ে তাঁর পাতলুন ঢিলা হয়ে গেল।

কদিন পরই প্যারিস সামিট! দীর্ঘদিনের পৃথিবীব্যাপী প্রচেষ্টার পর বিশ্বের চার মহাশক্তি বিশ্ব সমস্যার সমাধানের আশায় কদিন পরই প্যারিসে বসবে। তারপর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ক্রুশ্চভের আমন্ত্রণে যাবেন সোভিয়েট ইউনিয়ন। এমনি এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তের ঠিক আগে অ্যালান ডালেস পাঠালেন ইউ–টু?

অভাবিত আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়করা। সবার মুখে এক কথা, প্যারিস সামিট হবে তো? ক্রুশ্চভ আসবেন তো?

শেষ পর্যন্ত ওরলি এয়ারপোর্টে এরোফ্লোটের স্পেশ্যাল প্লেন ল্যান্ড করল। হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন ক্রুশ্চভ।

আঠারোই মে প্যারিসে সারা দুনিয়ার সাংবাদিকদের একটা গল্প শোনালেন ক্রুশ্চভ। –ছেলেবেলায় বড় গরিব ছিলাম আমরা। আমরা দুঃখী মা একটু দুধ, একটু ক্ষীর অতি যত্নে লুকিয়ে রাখতেন আমাদের দেবার জন্যে। কোথা থেকে একটা বিড়াল এসে ওই দুধ ওই ক্ষীর একটু খেয়ে গেলে মা রাগে দুঃখে জ্বলে উঠতেন। শেষকালে বিড়ালটার মুণ্ডু ধরে ওই ক্ষীরের মধ্যে ঘষে দিতেন। কেন জানেন? বিড়ালটাকে শিক্ষা দেবার জন্য।

গল্পটা বলে ক্রুশ্চভ সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের দেশের মানুষের একটু দুধ, একটু ক্ষীর যে সব ছ্যাবলা বিড়াল চুরি করে খেতে চায়, তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে একটু নাক ঘষে দেব। আর কিছু নয়।

শীর্ষ সম্মেলন শুধু বর্জন করেই শান্ত হলেন না ক্রুশ্চভ, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করতে নিষেধ করলেন।

যত সহজে এসব ঘটনাগুলো খবরের কাগজের রিপোর্টাররা লিখতে পারেন, ডিপ্লোম্যাটদের পক্ষে ঠিক তত সহজে এর তালে তালে চলা সহজ নয়! যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির সেই স্মরণীয় দিনগুলিতে মস্কো, লন্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন ও ইউনাইটেড নেশন্‌স্থিত ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের দিবারাত্র শুধু ওয়ারলেস ট্রান্সক্রিপ্টের ফাইল নিয়ে কাটাতে হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন এমন মহিলার সন্তান, ছেলে না মেয়ে, তা অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক জানেন বলে দাবি করেন। কিন্তু রাশিয়া বা ক্রুশ্চভের মনে কি আছে তা কেউ বলতে পারেন না। তবুও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতবর্ষ প্রায় একই পথের পথিক। তাই তো দুনিয়ার নানা কোণা থেকে সম্ভাবিত সোভিয়েট পদক্ষেপ সম্পর্কে ভারতীয় দূতাবাসে ঘন ঘন তাগিদ।

বাইরের দুনিয়াকে না জানালেও মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস-এর ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরা অনুমান করলেন, ক্রুশ্চভ ওইখানেই যবনিকা টানবেন না। নতুন রঙ্গমঞ্চে এবার নাটক শুরু হবে।

মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস থেকে ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক মিশন টপ সিক্রেট কোডেড্ মেসেজ পাঠালেন দিল্লিতে। সতর্ক করে দেওয়া হলো সম্ভাবিত সোভিয়েটের পদক্ষেপ সম্পর্কে। দিল্লিতে ক্যাবিনেট ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে একবার ওই নোট নিয়ে আলোচনাও হলো। মোটামুটিভাবে ঠিক করা হলো বিশ্বশান্তির জন্য ক্রুশ্চভের আবেদন অগ্রাহ্য করার প্রশ্নই ওঠে না।

তারপর সত্যি একদিন এরোফ্লোটের ইল্যুসিন চড়ে ক্রুশ্চভ এলেন নিউইয়র্ক, এলেন এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাতিন আমেরিকা থেকে আরো অনেকে। মার্কিন ডিপ্লোম্যাসির রাহুর দশা যেন শেষ হয় না।

ডিপ্লোম্যাট ও সাংবাদিকদের অনেক বিনিদ্র রজনী যাপনের পর এরোফ্লোটের ইল্যুসিন আবার ক্রুশ্চভকে নিয়ে নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল। উড়ল আরো অনেক বিমান। বিদায় নিলেন এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাতিন আমেরিকান নেতৃবৃন্দ।

অনেক দিন পর ডিপ্লোম্যাটরা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

'মিশ্র, আর খেও না!'

'প্লিজ ডোন্ট স্টপ মি টু-নাইট। আই মাস্ট ড্রিংক লাইক ফিস।'

ইন্ডিয়ান মিশনের তিন তলার রিসেপশন হলের জানলা দিয়ে মিশ্র একবার বাইরের আকাশটা দেখে নিয়ে তরুণকে বলল, 'ইজিপশিয়ান গার্ডেনে নাচ দেখতে যাবে?'

'এত ড্রিংক করার পর কি ইজিপশিয়ান গার্ডেনের বেলি ড্যান্সারদের বেলি দেখার অবস্থা থাকবে?'

'আই অ্যাম নট এ পিউরিটান লাইক ইউ।'

'তবু...।'

'ওই তবু টুব ছেড়ে দাও। আমি তো তুমি নই যে কবে কোনোকালে এক মেয়ের প্রেমে পড়েছি বলে আর কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাব না?'

অ্যাম্বাসেডর এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে মিশ্রের পাশে এসে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন, ''মিশ্র আর ইউ হ্যাপি?'

গেলাসের বাকি স্কচটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে মিশ্র জবাব দিলেন, 'সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার! লাইফে আপনার মতো বস আর স্কচ হুইস্কি পেলে আমি আর কিছু চাই না।'

ইন্ডিয়া শো-রুমের মিস মাজিথিয়াকে প্রায় পাশে আবিষ্কার করতেই অ্যাম্বাসেডর সরে গেলেন।

মিশ্র এগিয়ে এলেন, 'হাউ আর ইউ ডিয়ার ডার্লিং সুইটহার্ট?'

বাঁ চোখটা একটু ছোট করে, ডান চোখে একটু ঈষৎ দুষ্টু ইঙ্গিত ফুটিয়ে মিস মাজিথিয়া বললেন, 'ডোন্ট বি সিলি ইউ নটি বয়!'

'সুইট ডার্লিং, স্কচ পেলে দুনিয়া ভুলে যাই, আর তোমাকে পেলে স্কচও ভুলে যাই।'

মিস মাজিথিয়া তরুণকে বললেন, 'ডু ইউ বিলিভ হিম, মিস্টার সেনগুপ্ত?'

'সার্টেনলি আই বিলিভ মাই কলিগ।' তরুণ হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

'এত বিশ্বাস করবেন না, বিপদে পড়বেন।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় তরুণ, 'যেমন আপনি বিপদে পড়েছেন, তাই না?'

হাসতে হাসতে বললেও বিদ্রূপটা কাজে লাগে। মিস মাজিথিয়া স্কচ হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান।

মিস মাজিথিয়াকে অমনভাবে পালিয়ে যেতে দেখে তরুণ না হেসে পারে না। মিশ্রকে নিয়ে নেপথ্যে অনেক আলোচনা, সমালোচনা হয়। কোনো আড্ডাখানায় নিউইয়র্কবাসী দু'পাঁচজন ভারতীয় এক হলেই মিশ্রের নিন্দা হবেই। কিছু হাফ বেকার-হাফ এমপ্লয়েড ছোকরা তো রেগে বলেই ফেলে, 'স্কাউন্ড্রেল, ডিবচ, ড্রাংকার্ড।'

বলবে না? মিশ্র যে মেয়েদের সাবধান করে সতর্ক করে দেন ওইসব নোংরা ছেলেগুলো সম্পর্কে। 'মিস যোশী, ইউ আর এ গ্রোন আপ গার্ল। লেখাপড়াও শিখেছ, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তোমার চাইতে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। একটু সাবধানে থেকো।'

মিস যোশী শুধু বলেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

তখন বয়সটাই এমন যে কারুর উপদেশ শুনতে মন চায় না। আগ্নেয়গিরির মতো দেহের মধ্যে যৌবনের আগুন লুকিয়ে লুকিয়ে টগবগ করে ফুটছে। ফিফথ্ অ্যাভিনিউ আর টাইমস্ স্কোয়ারে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আগ্নেয়গিরি যেন আর শাসন মানতে চায় না, অধিকাংশ মেয়েরা সে শাসন মানেও না। সে শাসন মানবে কেন? ফিফথ্ অ্যাভিনিউ-টাইমস্ স্কোয়ার দিয়ে সন্ধ্যার

আমেজী পরিবেশে একটু ধীর পদক্ষেপে মিস যশোদা যোশীর মতো মেয়েরা যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন কে যেন বার বার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'বিশ্ব সংসারে এসেছ দুদিনের জন্য। আনন্দ কর, উপভোগ কর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখ তোমার মতো মেয়েরা কিভাবে রসের মেলায় পসারিণী হয়ে...!'

মিশ্রের উপদেশ বেসুরো ঠেকে যশোদার কানে। তবুও যে সে শুনেছে, তার জন্যই মিশ্র কৃতজ্ঞ। যশোদা তো অপমান করেও বলতে পারত, 'আমি কি করি বা না করি সেটা নান্ অফ্ ইওর বিজনেস।'

ঘরপোড়া গরু যে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়! মিশ্রও তাই তো এসব মেয়েরা বিদেশে এসে এমন স্বচ্ছন্দ হয়ে ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে ভয় পায়।

'জান তরুণ, কাল রাত্রে চৌবের বাড়ি থেকে আমার ফিরতে ফিরতে রাত দেড়টা-দুটো হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো সিগারেট নেই। টাইমস্ স্কোয়ারের কাছে গাড়ি পার্ক করে সিগারেট কেনার জন্য দু পা এগিয়েই দেখি দ্যাট স্কাউন্ড্রেল মালহোত্রার সঙ্গে যশোদা...।'

তরুণ বলল, 'ওদের নিয়ে তুমি অত ভাববে না।'

বোতলখানেক হুইস্কি খেয়েও মিশ্র বেহুঁশ হয় না। একবার মাথা নিচু করে কি যেন ভাবেন। 'না ভেবে যে থাকতে পারি না তাই। ওদের দেখলেই যে আমার অমলার কথা মনে হয়।'

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে মিশ্র পাথরের মতো নিশ্চুপ নিশ্চল হয়ে বসে পড়েন। চোখের জলও গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

তরুণের মনে পড়ল সেই পুরনো দিনের কথা...।

সেকশন অফিসার প্রকাশচন্দ্র প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে তরুণকে খবর দিল, 'জানেন স্যার, জেনেভা থেকে এক্ষুনি একটা মেসেজ এসেছে, মিশ্র সাহেবের মেয়ে সুইসাইড করেছে।'

তরুণ চমকে ওঠে, 'হোয়াট আর ইউ সেইং? অমলা সুইসাইড করেছে?'

পাঁচ হাজার মাইল দূরে ছিলেন মিশ্র। কিন্তু খবরটা ওয়েস্ট ইউরোপিয়ান ডেস্কে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল দিল্লি মহারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘরে ঘরে। বাইরের দুনিয়ার লোক মিঃ মিশ্রকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবলেও ফরেন মিনিস্ট্রির সবাই তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, আপনজ্ঞান করে।

যে সমস্যার কথা কাউকে বলা যায় না, মিশ্র সাহেবকে হাসিমুখে সে কথা বলা যায় ; যে সমস্যার সমাধান করতে আর কেউ পারবেন না, তাও মিশ্র সাহেব হাসতে হাসতে ঠিক করে দেবেন। সন্ধ্যার পর হুইস্কি না খেয়ে যেমন তিনি থাকতে পারেন না, তেমনি সহকর্মী ও বন্ধুদের উপকার না করেও স্থির থাকতে পারেন না।

লাঞ্চের পর অফিসে এসেই মিশ্র টেলিফোনের 'বাজার' বাজিয়ে হীরালালকে তলব করলেন, 'চলে আসুন।'

মিশ্র তখনও সিগারেট খাচ্ছেন। তিন-চারটে ফাইল নিয়ে হীরালাল ঘরে ঢুকতেই কেমন যেন খটকা লাগল। ভ্রূ-কুঁচকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতেই বুঝলেন হীরালাল বেশ চিন্তিত।

হীরালাল মিশ্র সাহেবের সামনে ফাইলগুলো নামিয়ে রাখলেন।

মিঃ মিশ্র সিগারেটের শেষ টানটা দিতে দিতে বাঁকা চোখে আরেকবার হীরালালকে দেখে নিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

'না স্যার, তেমন কিছু না।'

'দেখ হীরালাল, আমার কাছে বলতেও তোমার দ্বিধা হয়?'

সকৃতজ্ঞ হীরালাল বলে, 'আপনার কাছে আর কি দ্বিধা করব। তবে...।'

'তবে আবার কি? টেল মি ফ্র্যাঙ্কলি হোয়াট্‌স রং উইথ ইউ?'

হীরালাল আর চেপে রাখতে সাহস করে না। জানে এবার না বললে বকুনি খাবে।

'কালকেই চিঠি পেয়েছি আবার মেয়েটার শরীর খারাপ হয়েছে, অথচ...।'

'আপনি তো জানেন আমার ডিক্সনারিতে 'ইফস্‌' অ্যান্ড 'বাটস্‌' লেখা নেই।'

ড্রয়ার থেকে বার্কলে ব্যাঙ্কের চেক বই বের করে একশো পাউন্ডের একটা চেক দিলেন হীরালালকে। 'পাতিয়ালার ওই অপদার্থ শ্বশুরবাড়িতে মেয়েটাকে আর ফেলে না রেখে এখানেই নিয়ে আসুন।'

'আপনি আবার...।'

'ফরেন সার্ভিসে কাজ করে বড় বেশি ফরম্যালিটি করতে শুরু করেছেন। আচ্ছা, আজ যদি আমারই দুতিনটে মেয়ে থাকত?'

এরপর কি আর কিছু বলা যায়? না। হীরালাল টেবিলের ওপর ফাইলগুলো রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল!...

'কি বললে? ব্যাভেরিয়ান বিয়ার খেতে ইচ্ছা করছে?'

'তারপর ওই তাজ-এ একটু সিম্পল চিকেন রাইস-এর লাঞ্চ', ছোকরা ডিপ্লোম্যাট বড়ুয়া আর্জি পেশ করে।

'দ্যাখ ছোকরা, তুমি তো জান আমি ডিসআর্মামেন্ট—সামিট—বিগ পাওয়ার রিলেশান্স ডিল করি। সুতরাং এত ছোটখাটো সামান্য বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আমার কাছে এসো না।'

প্রাইমিনিস্টার, ফরেন মিনিস্টার, ফরেন সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ক্লার্ক বেয়ারারা পর্যন্ত মিশ্রকে ভালোবাসে। ভালো না বেসে যে উপায় নেই।

সেই মিশ্র সাহেবের আদুরে দুলালী অমলা আত্মহত্যা করেছে শুনে সবাই মর্মাহত হলেন।—

বছর খানেক পরে তরুণ মিঃ মিশ্রকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। সন্ধ্যার পর বোতল বোতল মদ গেলেন আর ইয়ং ইন্ডিয়ান মেয়ে দেখলেই বলেন, 'মনে হয় অমলাও ওদের মতো কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক্ষুনি দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে।'

'অমলা তখন আট-ন' বছরের হবে আর কি। মিসেস মিশ্র মারা গেলেন ক্যান্সারে। বহুদিন ধরেই ভুগছিলেন। বিশেষ করে শেষের বছর দুয়েক অমলার সব কিছুই মিশ্র সাহেব করতেন। স্ত্রী মারা যাবার পর মুষড়ে পড়লেও অমলাকে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে অমলা বড় হলো। সেই ছোট্ট কিশোরী অবলা অমলা প্রাণ-চঞ্চলা হয়ে উঠল। দিগন্তবিস্তৃত অতল সমুদ্রের এই ছোট্ট দ্বীপে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুললেন মিশ্র সাহেব।

ঘরে কোনো ভাইবোন—মাকে না পেয়ে সাহচর্যের জন্য অমলা বাইরের দুনিয়ায় তাকিয়েছিল। কত ছেলে, কত মেয়ে ছিল তার বন্ধু। মিঃ মিশ্র বাধা দেননি, বরং উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সাহচর্য, বন্ধুত্বের সুযোগ এমন সর্বনাশ!

'হ্যাঁ হ্যাঁ তরুণ, ওই ছোকরাগুলো দেহের আগুন, যৌবনের জ্বালা, চোখের নেশা চরিতার্থ করার জন্য যদি অমলার মতো ওই যশোদারও চরম সর্বনাশ করে? যদি নিজের লজ্জা লুকোবার জন্য অমলার মতো যশোদাও যদি...।'

আর বলতে পারেন না। কাঁপা কাঁপা হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরেন তরুণকে। ছলছল

চোখ দুটো জলে ভরে যায়।

একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'এই বিশ-বাইশ বছরের মেয়েগুলোকে সুন্দর শাড়ি পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘুরতে দেখলেই কেবল অমলার কথা মনে হয়।'

তরুণ কি জবাব দেবে? কিচ্ছু বলতে পারে না। একটু সন্তানস্নেহ দেবার জন্য এমন কাঙালকে কি বলবে সে? মায়ের কোল খালি করে শিশু সন্তান চলে গেলে সে মা উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। মিশ্র সাহেবের মনের মধ্যে অমনি জ্বালা করে দিন-রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা।

'আচ্ছা তরুণ, অনেকে তো অন্যের মাকে মা বলে ডাকে, অন্যের বাবাকে বাবা ডাকা যায় না?'

এবার তরুণের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আর যেন সে সহ্য করতে পারছে না। শুধু বলে, 'নিশ্চয়ই ডাকা যায়।'

হাসিতে লুটিয়ে পড়েন মিশ্র। 'ডোন্ট টক ননসেন্স তরুণ। তুমি কি ভেবেছ আমি মাতাল হয়েছি? যা বোঝাবে তাই বুঝব?'

ইউ-টু ফ্লাইট, প্যারিস সামিট ও তারপর ইউনাইটেড নেশনস নিয়ে এতদিন ব্যস্ত থাকায় বেশ ভালো ছিলেন মিঃ মিশ্র। একটু অবসর পেয়ে আবার সব অতীত ভিড় করছে ওর কাছে।

পার্টি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। প্রায় সবাই চলে গেছেন। এক কোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিশ্র তরুণের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

ধীরে ধীরে অ্যাম্বাসেডর এসে পাশে দাঁড়ালেন। মিশ্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কাল কত তারিখ মনে আছে?'

'টুমরো ইজ টোয়েন্টি সেকেন্ড।'

'কাল আমার মেয়ে আসছে, তা জান?'

'সিওর স্যার। বি-ও-এ-সি ফ্লাইট সিক্স-জিরো-ওয়ান।'

অ্যাম্বাসেডর খুশিতে হেসে ফেললেন। 'দ্যাটস্ রাইট। আমি তো আবার পরশু দিনই জেনেভা যাচ্ছি। সুতরাং ভুলে যেও না টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট গার্ল।'

'নো স্যার, নট অ্যাট অল।' মিশ্র এবার একটু মুচকি হাসতে হাসতে বলেন, 'ইফ আই মে সে ফ্রাঙ্কলি স্যার, রীনা আপনার চাইতে আমাকে বেশি পছন্দ করে।...'

অ্যাম্বাসেডর তরুণের কানে কানে বললেন, 'প্লিজ টেল মিশ্র যে আমি তার জন্য আনন্দিত।'

আর কোনো কথা না বলে অ্যাম্বাসেডর বিদায় নিলেন। 'গুড্ নাইট! সী ইউ টুমরো।'

'গুড নাইট স্যার।'

আট

কবি রবার্ট ফ্রস্ট রসিক ছিলেন। কবির মতে ডিপ্লোম্যাটরা মহিলাদের জন্মদিন মনে রাখেন, ভুলে যান তাঁদের বয়স। জন্মদিনের ওই আনন্দটুকু, ওই রসটুকুই কূটনীতিবিদদের প্রয়োজন ; কালের যাত্রায় বিলীয়মান যৌবনের হিসাব রাখতে তাঁদের আগ্রহ নেই।

ডিপ্লোম্যাট হয়েও অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জি মহিলাদের জন্মদিনই মনে রাখেন না, স্মরণ রাখেন তাদের বয়স। বিলীয়মান যৌবনের হিসাব। শুধু আনন্দ, শুধু রস, শুধু মধু পান করেই উনি নিজের মনকে খুশি রাখতে পারেন না। বেদনাবিধুর আবছা অন্ধকার মনের কথাও তিনি জানতে চান।

হঠাৎ দেখলে ঠিক টপ্ কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট বলে মেনে নিতে মন চায় না। আর পাঁচজন ডিপ্লোম্যাটের মতো চাকচিক্য স্মার্টনেস, গ্ল্যামার একেবারেই নেই। মাথায় টপ হ্যাট বা হাতে লম্বা সরু ছাতা না থাকলেও পরনে পুরনো কালের ইংরেজদের মতো ঢিলেঢালা থ্রি-পিস্ স্যুট। সিলভার চেন-এর সঙ্গে মোটা পকেট ওয়াচ্ না ব্যবহার করলেও অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জিকে অনেকটা কেম্ব্রিজের বিখ্যাত সেলউইন কলেজের ওরিয়েন্টাল অধ্যাপক মনে হয়।

সবাই যে অ্যাম্বাসেডর রঘুবীর হবেন তার কি মানে আছে? ভরা যৌবনে আই. সি. এস. হয়ে দেশে ফেরার বছরখানেকের মধ্যেই রঘুবীর দেরাদুনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। মাস ছয়েক ঘুরতে না ঘুরতে লাহোরের স্যার বীরেন্দ্রবীরের পুত্র রঘুবীর প্রভুভক্তির অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। গান্ধীজি ও সঙ্গীদের 'টিল দি কোর্ট রাইজ' পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

ঘটনাটা নেহাতই সামান্য। তবু এমন সুযোগ তো বার বার আসে না! মীরাট থেকে মজঃফরনগর, রুরকি, দেরাদুন হয়ে গান্ধীজি মোটরে মুসৌরী যাচ্ছিলেন। মীরাট আর মজঃফরনগরে মিটিং ছিল কিন্তু রুরকি বা দেরাদুনে কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। তবে অভ্যর্থনার জন্য দেরাদুন শহরের ধারে বেশ ভিড় হয়েছিল।

রঘুবীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট পাঠালেন, 'দেরাদুন শহরে মিলিটারি অ্যাকাডেমির ছেলেরা হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইচান্স গান্ধীজি যদি ক্লক টাওয়ারের পাশ দিয়ে যাবার সময় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন তবে মিলিটারি অ্যাকাডেমির ছাত্ররাও নিশ্চয়ই...। তাছাড়া যেমন অভ্যর্থনার উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছে তাতে রিস্ক না নেওয়াই ঠিক হবে।'

সুতরাং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টম জোন্স্ সাহেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রঘুবীর আদেশ জারী করলেন, 'মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইজ হিয়ারবাই নোটিফায়েড দ্যাট ইন দি ইন্টারেস্ট অফ সিকিউরিটি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ল অ্যান্ড অর্ডার ইন দি রিজিয়ন, আপনি ও আপনার সাঙ্গপাঙ্গরা দেরাদুন শহরে যাবেন না।

দেরাদুন শহরের প্রান্তে কয়েকশো দেশি-বিদেশি সিপাহি নিয়ে রঘুবীর মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানালেন।

গাড়ি থেকে নেমে একটু মুচকি হেসে গান্ধীজি বললেন, 'কত দিনের জন্য অতিথি হতে হবে?'

রঘুবীর জানালেন, 'না না, ওসব কিছু না। তবে স্যার, দেরাদুন শহরটা এড়িয়ে যান।'

গান্ধীজি আইনজীবীর মতো পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মহামান্য সরকার মুসৌরী যাবার জন্য নতুন কোনো রাস্তা তৈরি করছেন নাকি?'

'নো স্যার, দিস ইজ দি ওনলি রোড টু মুসৌরী।'

তবে কি আমি উড়োজাহাজ...।

গান্ধীজি দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতেই রঘুবীর গ্রেপ্তার করে কোর্টে নিয়ে গেলেন। বিচারে 'টিল দি কোর্ট রাইজ'...

সেই রঘুবীর স্বাধীন ভারতবর্ষের অ্যাম্বাসেডর হয়ে আমেরিকায় গিয়ে বললেন, 'তোমাদের অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন আর আমাদের গান্ধীজি বিশ্বমানব-সমাজের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত।' ইতালীতে অ্যাম্বাসেডর হবার পর ভ্যাটিকান-প্রধান পোপের কাছে পরিচয়পত্র দেবার সময় বললেন, 'ত্রাণকর্তা যীশুকে আমি দেখিনি। কিন্তু ভারত-ত্রাণকর্তা মহাত্মা গান্ধীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই মহামানবের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে আমি মহাপ্রাণ যীশুকে উপলব্ধি করেছি।'

রঘুবীর সাহেব অ্যাম্বাসেডর হয়ে নানাভাবে দেশসেবা করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। আমরা বাঙালিরা বড়বাজার-পোস্তার হোলসেলার দেখেই কুপোকাৎ। সুতরাং জার্মান-ভারতের সে বাণিজ্য চুক্তির হিসেব রাখাই আমাদের পক্ষে দায়। একশো পঁয়ত্রিশ বেসিকের কেরানী বা একশো পঁচাত্তরের লেকচারার হয়েই মাটির পৃথিবী থেকে যাঁদের উদাস দৃষ্টি নীল আকাশের কোলে উড়ে যায়, তাঁদের পক্ষে কি শত শত সহস্র কোটি টাকার বিজনেসের অনুমান করা সম্ভব? ওঁরা বলেন মিলিয়ন, বিলিয়ন। বাঙালি ইন্টেলেকচুয়ালরা খবরের কাগজের প্রথম পাতা পড়েই গরম হন। কিন্তু যাঁরা ওই মিলিয়নের-বিলিয়নের প্রসাদ পান তাঁরা খবরের কাগজের প্রথম পাতার চাইতে ভিতরের পাতার স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোম্পানি মিটিং-এর রিপোর্ট বেশি পড়েন।

অ্যাম্বাসেডর রঘুবীরের জীবন-সঙ্গিনীর আদরের ছোট ভাইও খবরের কাগজের ওই ভিতরের পাতার পাঠক ছিলেন। ভাগ্যবান ছোট শালাবাবু জিজাজীর কাছে একবার আব্দার করেছিলেন, 'ইন্দো-জার্মান ট্রেডের কিছু একটা পাওয়া যায় না?'

'হোয়াই নট? একটু মনে করিয়ে দেবার জন্য দিদিকে বলে দিও।'

রাইন নদীর জলে ওয়াটার জেট লঞ্চে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে দূরের কারখানার চিমনিগুলো চোখে পড়তেই মিসেস রঘুবীর স্বামীকে বলেছিলেন, 'তোমার মনে আছে আমার ওই ছোট্ট ভাইয়ের কথা?'

'হাঁ জী।'

কদিন বাদেই বিখ্যাত এক জার্মান ফার্ম থেকে কোয়েরি এলো, মিলিয়ন মিলিয়ন মার্ক-এর মেসিনারী ইন্ডিয়াতে পাঠাতে হবে কিন্তু আমরা অফিস খুলব না, রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ ও এজেন্সী দিতে চাই।

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পাইপটা নামিয়ে রাখলেন রঘুবীর। তারপর বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এত বড় ব্যাপার, আমাকে একটু ভাবতে হবে।'

'বেশ তো ভাবুন না। তবে দেখবেন ওই ফার্ম যেন আর কোনো ফেমাস ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের কাজ না করে।'

অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতে বললেন, 'ইউ আর মেকিং মাই টাস্ক মোর ডিফিকাল্ট?'

'ইওর এক্সেলেন্সি অ্যাম্বাসেডর্স আর নট ফর অর্ডিনারী...।' এক সপ্তাহ পরে তাগিদ এলো অ্যাম্বাসেডরের কাছে। জবাব গেল ইন্ডিয়াতে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে।

তিন সপ্তাহ পরে অ্যাম্বাসেডর রঘুবীর রেকমেন্ড করলেন জলন্ধরের ছোট শালার ফার্মকে।

ফরেন সার্ভিসের দুচারজন বিশ্বনিন্দুক বলেন, ছোট শালাবাবু গুরু দক্ষিণাস্বরূপ জামাইবাবুকে দিল্লিতে ফ্রেন্ডস কলোনীর একটা আড়াই লাখ টাকার কটেজ উপহার দিয়েছেন।

রঘুবীরের মতো আরো অনেক আদর্শহীন বীর আছেন ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে। অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জি একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। টেবিলে যদি ফাইলের স্তূপ না থাকে তবে সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক জমান নিজের ঘরে। নানা কথার পর থার্ড সেক্রেটারি হঠাৎ বলে ওঠেন, 'স্যার, আপনার মতো সহজ সরল মানুষ ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোম্যাসিতে যে কিভাবে সাকসেসফুল হলেন, তাই ভেবে অবাক হই।'

হাসতে হাসতে অ্যাম্বাসেডর জবাব দেন, 'ভেরী সিম্পুল রঙ্গস্বামী।'

'To Thomas Moore'-এ ব্যায়রন বলেছেন,

"Here's a sigh to those who love me,

And a smile to those who hate,
And, whatever sky's above me,
Here's a heart for any fate."

আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

"নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলই করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।।"

এই হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেবের জীবন দর্শন। দৃষ্টিটা একটু সুদূরপ্রসারী! তাই তো মিশ্র সাহেবের মাতলামীর পিছনে তাঁর অশান্ত স্নেহকাতর পিতৃ-হৃদয়টাই ওঁর চোখে পড়ে।

'জান তরুণ, এর চাইতে বড় সর্বনাশ, বড় ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আর নেই। শিশুর জন্মের পর মায়ের বুক স্তন্যরসে ভরে যায়। কিন্তু ভাগ্যের দুর্বিপাকে যদি সে শিশু মায়ের কোল খালি করে হঠাৎ চিরকালের জন্য লুকিয়ে পড়ে তবে ওই বুকের যন্ত্রণায় মা পাগল হয়ে ওঠেন।'

এবার মুখটা উঁচু করে মিঃ ব্যানার্জি বলেন, 'ওটা শুধু দেহের যন্ত্রণা নয়, ওর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যর্থ মাতৃত্বের বেদনা।'

তরুণ কথা বলতে পারে না। শুধু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জির দিকে।

ইন্টার-সেশন পিরিয়ডে নেশনস্ হেড কোয়ার্টাসে বেশি ভিড় থাকে না। এমন কি ওই ছোট্ট ক্যাফেটেরিয়াটাও যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। অধিকাংশ দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি-অ্যাম্বাসেডররা হয় ছুটিতে না হয় বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। জুনিয়র ডিপ্লোম্যাটরাও একটু ঢিলে দেন কাজকর্মে।

সেদিন সকালে ট্রাস্টিশিপ্ কাউন্সিলের একটা ছোট্ট সাব-কমিটির মিটিং ছিল। আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে অত বিরাট ইউনাইটেড নেশনস হেডকোয়ার্টারটা প্রায় খালি হয়ে গেল। আট তলায় ইন্ডিয়ান ডেলিগেশনের ঘরে মিঃ ব্যানার্জি আর তরুণ বসে কথা বলছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নোংরামি থেকে হঠাৎ যেন ইউনাইটেড নেশনস হেডকোয়ার্টার্স একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। তাই তো মনের কথা, প্রাণের ভাষা বলতে পারছিলেন অ্যাম্বাসেডর সাহেব।

দৃষ্টিটা হাডসন নদীর এপার-ওপার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে নীল আকাশের কোলে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন মিঃ ব্যানার্জি। রিভলভিং চেয়ারটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মিশ্রকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। রীনাকে কাছে পেলে ওর মনের শূন্যতা, ব্যর্থ পিতৃত্বের জ্বালা যেন আমাকে আরো বেশি আপসেট করে দেয়।'

মিসেস ব্যানার্জি ভাবতে পারেননি ব্যানার্জি সাহেব এখনও ইউ এন-এ আছেন। তরুণের ফ্ল্যাটে ফোন করে জবাব না পেয়ে ভাবলেন নিশ্চয়ই ওরা দুজনে কোনো জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন। ওদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়েই এয়ারপোর্ট রওনা হতে হবে। তাই তো মিশ্রকে ফোন করলেন। 'ভাইসাব, ব্যানার্জি সাহেবের কি খবর বলো তো?'

'কেন এখনও ফেরেননি?'

'না। কোনো জরুরী কাজে গিয়েছেন কি?'

তেমন কোনো জরুরী কাজের কথা তো আমি জানি না। আচ্ছা একবার তরুণকে ফোন করছি।'

'তরুণও বাড়িতে নেই...।'

মিসেস ব্যানার্জির কথা শেষ হবার আগেই মিঃ মিশ্র বললেন, 'দেন ডোন্ট ওরি। দুজন সেন্টিমেন্টাল বেঙ্গলী ঠিক কোথাও বসে আকাশ দেখছেন, না হয় আমার দুঃখের ব্যালান্স-সীট মেলাচ্ছেন।'

মিশ্রের কথা শুনে মিসেস ব্যানার্জিও হেসে ফেলেন। 'তাহলে ভাই একটু দেখুন না। আবার তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে রীনাকে আনতে...।'

'তাতে ব্যানার্জি সাহেবের কি? সে তো আমার আর আপনার চিন্তা।'

মিশ্র টেলিফোন নামিয়ে রেখে আর দেরি করলেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হলেন ইউ এন-এ। গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে দেখলেন দুটি পরিচিত গাড়ি প্রায় পাশাপাশি রয়েছে। অ্যাম্বাসেডর সাহেবের ড্রাইভারটাও কোথাও আড্ডা দিতে গেছে। মিশ্র দুষ্টুমি করে এমনভাবে নিজের গাড়িটা পার্ক করলেন যে ওই দুটি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব! লিফট দিয়ে উঠতে উঠতে যদি ওই দুজন সেন্টিমেন্টাল বাঙালি নেমে আসেন, তাহলে বুঝবেন, যার সুখ-দুঃখের ব্যালান্সসীট তৈরি করতে ওরা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন সে এসে গেছে।

অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জির ঘরের সামনে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়ালেন মিঃ মিশ্র। একবার ভাবলেন নক করবেন ; আবার ভাবলেন, না-না, ওসব ফর্মালিটির কি দরকার।

আস্তে দরজাটা ঠেলে মিশ্র ভিতরে ঢুকতে দুজনেই অবাক!

অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জি আর তরুণ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'মিশ্র, ইউ আর হিয়ার?'

হাসিমুখে মিশ্র জবাব দেয়, 'হোয়াট এলস কুড আই ডু?'

একবার নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিশ্র অ্যাম্বাসেডর সাহেবকে বললেন, 'স্যার, মিসেস ব্যানার্জি বলছিলেন আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে তবে উনি এয়ারপোর্ট...।'

'ও, তাই তো!'

তাড়াহুড়ো করে সবাই উঠে পড়লেন। নিচে এসে গাড়িতে উঠবার সময় মিঃ ব্যানার্জি বললেন, 'তোমরাও বরং আমার ওখানেই চল। হোয়াট এভার ইজ দেয়ার, উই উইল শেয়ার ইট।'

মিশ্র হাসতে হাসতে বলেন, 'স্যার, রীনাকে যখন প্রায় আমাকেই দিয়ে দিয়েছেন তখন আর খাওয়া-দাওয়া শেয়ার করতে লজ্জা কি?'

মিশ্র আর মিসেস ব্যানার্জি এয়ারপোর্টে হাজির হবার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, বি-ও-এ-সি অ্যানাউন্সেস দি অ্যারাইভাল অফ ফ্লাইট সিক্স-জিরো-ওয়ান ফ্রম লন্ডন।

রীনা টিপ করে মাকে একটা প্রণাম করেই মিঃ মিশ্রকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি জানতাম আংকল, তুমি আসবেই!'

রীনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মিশ্র উত্তর দিলেন, তোমরা যা এক-একটা বিচিত্র শত্রু! তোমাদের কি চোখের আড়ালে রাখা যায়?'

রীনা আংকলের মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলছে।

মিশ্র একগাল হাসি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডোন্ট ওরি ডিয়ার ডার্লিং মামি!'

মিসেস ব্যানার্জির মুখ খুশির আলোয় ভরে গেলেও একটু যেন বিরক্তির সুরে বললেন,

'আংকলকে বিরক্ত করা শুরু হলো, তাই না?'

আংকল মনে মনে হাসেন। ভাবেন পৃথিবীর সব রীনারাই যদি ওর গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিসফিস করে অমন আব্দার করত, তাহলে হয়তো অমলাকে...!

সেদিন রাতে মিশ্রের থার্টিটু স্ট্রিট ও ইস্টের ফ্ল্যাটে বিরাট উৎসবের আয়োজন হলো রীনার আনারে। অ্যাম্বাসেডর ও মিসেস ব্যানার্জি ছাড়াও ইন্ডিয়ান ডেলিগেশনের প্রায় সবাই এলেন।

নবাগত ইনফরমেশন অ্যাটাচি ভার্মা তরুণকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, ''কি ব্যাপার, মিঃ মিশ্রর এমন ডিনারে কোনো ড্রিংকস নেই?'

'রীনার সামনে ড্রিংক করেন না।'

'কেন?'

'বলেন মেয়েদের সামনে ড্রিংক করা উচিত না তাছাড়া...।'

'তাছাড়া কি?'

'তাছাড়া বলেন, রীনাকে কাছে পেলে ওঁর কোনো দুঃখ থাকে না, সুতরাং ড্রিংক করবেন কেন?'

এত বিরাট ব্যাপক আয়োজন। তরুণ খাবে কি? শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখে মিশ্রকে। কপালের সেই চিন্তার রেখাগুলো কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে, ক্লান্ত মানুষটির বিষণ্ণ শূন্য দৃষ্টি যেন আর নেই। কাজকর্মের পর যে মিশ্র রোজ সন্ধ্যার পর নিজেকে ভুলে যান, স্থবির হয়ে বসে বসে শুধু বোতল বোতল মদ গেলেন, তিনি যেন নবযৌবন ফিরে পেয়েছেন। কত চঞ্চল, কত প্রাণবন্ত! কত সুন্দর, কত প্রিয়!

তরুণ এগিয়ে গেল অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জির কাছে। 'স্যার, আপনি বাড়ি যাবেন না? রাত্রেই তো সব পেপার্স ঠিকঠাক করে রাখতে হবে, নয়তো কাল যাবেন কি করে?'

'যাব কি, এখনও খাওয়াই হয়নি।'

'সে কি?'

'আজ কি আমাকে দেখার সময় আছে মিশ্রের?' অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতেই বললেন।

তরুণও হাসে। 'তা ঠিকই বলেছেন স্যার। রীনাকে কাছে পেলে উনি প্রায় পাগল হয়ে ওঠেন।'

একটা ছোট্ট চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অ্যাম্বাসেডর। তারপর বললেন, রীনাকে নিয়ে ওঁর মাতামাতি দেখতে বেশ লাগে। জান তরুণ, নিজের স্ত্রীকে, নিজের সন্তানকে তো সবাই ভালোবাসে। কিন্তু যখন আর পাঁচজনে ওদের ভালোবাসে তখনই তো সত্যিকার সার্থকতা।'

তরুণ কোনো জবাব দেয় না। অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জির হৃদয়বত্তা মুগ্ধ করে ওকে।

'তাছাড়া আর একটা দিক আছে। যাঁরা অন্যের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, স্নেহ করে, তাঁদের মহত্ত্বের কি তুলনা হয়?'

ডিসআর্মামেন্ট কন্ট্রোল কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য মিঃ ব্যানার্জি পরের দিন জেনেভা চলে গেলেন।

রীনার পনের দিনের ছুটি ফুরোতেও সময় লাগল না। মিশ্র আবার ফিরে পেলেন তাঁর পুরনো দিনের যন্ত্রণা আর মদের বোতল। তরুণ ফিরে পেল তার ছন্দহীন জীবন।

পনেরটা দিন তরুণ শুধু দেখেছে মিশ্রের পাগলামি, আত্মভোলা মানুষটির অন্ধ স্নেহ। মনে মনে ভক্তি করেছে, শ্রদ্ধা করেছে ওই মাতালটিকে, যাঁকে একদল ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস বলে ডিবচ, স্কাউন্ড্রেল এবং আরো কত কি!

টেলিভিশনের পর্দায় বেসবল খেলা নিয়ে অতগুলো লোকের হৈ-চৈ শুনতে বড় বেসুরো লাগল। সুইচটা অফ করে কোণার সিঙ্গল সোফাটায় চুপ করে বসে পড়ল তরুণ।

আকাশ-পাতাল চিন্তা এল মনে। আস্তে আস্তে চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেল। দুনিয়াটা ধোঁয়াটে, ঘোলাটে মনে হলো। ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে হারিয়ে গেল ডিপ্লোম্যাট তরুণ সেনগুপ্ত। আস্তে আস্তে মনের পর্দায় কতকগুলো আবছা মূর্তি এসে ভিড় করল। কখন যে ভিড় সরিয়ে ইন্দ্রাণীর মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, তরুণ তা বুঝতে পারল না।

নিঃসঙ্গ তরুণ মাঝে মাঝেই এমনি দেখা পায় ইন্দ্রাণীর। মনে মনে কত কথা বলে, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখে। মাঝে মাঝে ওর ফাঁকা ফ্ল্যাটে এমন চিৎকার করে যে পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস রজার্স না ছুটে এসে পারেন না।

'সেনগুপ্টা! অয়ার ইউ শাউটিং টু সামবডি?'

লজ্জিত তরুণ বলে, 'আই অ্যাম সরি মিসেস রজার্স।'

'সরি হবার কিছু নেই, তবে তুমি তো ভীষণ চুপচাপ থাকো। তাই হঠাৎ তোমার চেঁচামেচি শুনে...'

সেদিন বোধহয় রজার্স পরিবার কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন তাই মিসেস রজার্স ছুটে এলেন না। বাজারের আওয়াজ শুনে তরুণের চিৎকার থেমে গেল। তারপর দরজা খুলে যাঁকে দেখল, তিনি মিঃ মিশ্র।

'তুমি ইন্দ্রাণীকে এত ভালোবাস?'

তরুণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মিঃ মিশ্রের প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে? চুপ করে রইল।

মিঃ মিশ্র তরুণের কাঁধে দুটি হাত রেখে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এত ভালোবাসা তোমার মধ্যে চাপা আছে? আমি তো বোতল বোতল মদ খেয়েও ওই অমলার মুখখানা ভুলতে পারি না। তুমি তো আমার মতো মাতাল নও কিন্তু কি করে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত এই জ্বালাকে চেপে রাখ তরুণ?'

তরুণ এবার মুখ তুলে জানতে চায়, 'আমি কি খুব বেশি চিৎকার করছিলাম?'

মিশ্রের মুখেও হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'চল, চল, ভিতরে গিয়ে বসা যাক।'

তরুণের পিছনে পিছনে প্যাসেজ দিয়ে ড্রইংরুমের দিকে এগুতে এগুতে মিশ্র বলেন, 'আমি মাঝে মাঝে একলা থাকলে চিৎকার করে অমলাকে কত কথা বলি।'

'তাই বুঝি?'

ড্রইংরুমে বসার পর মিশ্র বললেন, 'অমলা মারা গেলেও হারিয়ে যায়নি আমার জীবন থেকে, মন থেকে। কথা না বলে থাকব কেমন করে বলো?'

হঠাৎ মিশ্র পাল্টে গেলেন। 'যাকগে, ওই হতচ্ছাড়ী বোকা মেয়েটার কথা বলতে গেলেও আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বাদ দাও ওসব। গিভ মী এ গ্লাস অফ স্কচ।'

দু গেলাস স্কচ নিয়ে এলো তরুণ।

মিশ্র স্কচের গেলাসটা তুলে ধরে বললেন, 'ফর অ্যান আর্লি অ্যান্ড হ্যাপি রি-ইউনিয়ন অফ টরুণ উইথ হিজ ইট্যারনল লাভার ইন্দ্রাণী!'

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেন্টার টেবিলে গেলাসটা নামিয়ে রেখে তরুণ এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে ধরে বলল, 'সেনগুপ্টা হিয়ার।...কে? মালকানী? ইয়েস, খবর কি?'

মালকানীর কথা শুনে তরুণ বলল, 'এক্ষুনি মেসেজ এলো? দ্যাটস অল? থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি

মাচ।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই তরুণ মিশ্রকে জানাল, 'মালকানী জানাল এক্ষুনি মেসেজ এসেছে আমাকে বার্লিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

মিশ্রও গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন। 'তাহলে তুমি চললে!'

তরুণ দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবছিল।

'এমার্সনের Conduct of Life পড়েছো তো নিশ্চয়ই। মনে পড়ে সেই লাইনটা?

তরুণ জবাব দেয় না, চুপ করে বসেই রইল।

মিশ্রও উত্তরের অপেক্ষা না করে আপন মনে আবৃত্তি করল,

He who has a thousand friends
has not a friend to spare.

একটু চুপ করে স্কচের গেলাসে এক চুমুক দিল! 'আমারও হয়েছে তাই।'

এবার তরুণ একটু হেসে গেলাসটা তুলে নিল। এক চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিল। 'এমার্সন তো ওমর খৈয়ামকে বেস করেই ওই কথা লিখেছেন। ওমর খৈয়ামের আরো কটা লাইন মনে পড়ছে–

মিশ্র কোনো কথা না বলে আবার এক চুমুক খেয়ে চেয়ে রইল তরুণের দিকে।

তরুণ আবৃত্তি করল :

The moving finger writes; and having writ
Moves on : not all our Piety nor Wit
Shall lure back to cancel half a line.
Nor, all our Tears wash our a Word of it.

'ঠিক বলেছ তরুণ, ডিপ্লোম্যাট হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হই যে সব কিছুই যেন বিধির বিধান।'

নয়

মেয়েদের বিয়ে ঠিক হবার পর আইবুড়ো ভাত খাওয়ান হয় আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে। ইংরেজিতে যাকে বলে ফেয়ারওয়েল ডিনার আর কি! ডিপ্লোম্যাটদের আগমন ও নির্গমন উপলক্ষে অনেকটা আইবুড়ো ভাত অর্থাৎ নেমন্তন্ন খাওয়াবার প্রথা আছে। সহকর্মী ছাড়াও অন্যান্য মিশনের বন্ধুদের বাড়িতে খেতে হয় ও খাওয়াতে হয়। সমস্ত দেশের ফরেন সার্ভিসেই এই প্রথা। ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসও কোনো ব্যতিক্রম নয়। সিনিয়র, জুনিয়র–কোনো লেভেলেই নয়।

আমাদের দেশের আই-এ-এস বা আই-পি-এস অফিসারদের মধ্যে এসব সৌজন্যের বালাই নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টরা বদলি হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওঁদের সহকর্মীরা খুশি হন। সুতরাং ফেয়ারওয়েল ডিনারের প্রশ্ন নেই। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিতাড়িত বা পদত্যাগী মন্ত্রীকে বা কলকাতায় বিদায়ী পুলিশ কমিশনারকে কেউ ভালোবেসে ফেয়ারওয়েল ডিনার খাইয়েছেন বলে আজও শোনা যায়নি। আর যত ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাক, ফরেন সার্ভিসে এই সৌজন্যের দৈন্য নেই। অ্যাম্বাসেডরকে রি-কল বা তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হলেও সৌজন্যমূলক ফেয়ারওয়েল ডিনারের ব্যবস্থা হয়।

শ'ছয়েক টাকায় যাঁরা ফরেন সার্ভিসে নতুন জীবন শুরু করেন, প্রথমে ফরেন পোস্টিং-এর সময় তো ফেয়ারওয়েল ডিনারের ঠেলায় তাঁদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। কৈ বাত নেই! তবুও নিদেনপক্ষে শতখানেক নেমন্তন্ন খেতে হয়, খাওয়াতে হয়, ছমাসের মাইনে অ্যাডভান্স নিয়েও তাল সামলান যায় না। হাই স্ট্যান্ডার্ড ও এইসব সৌজন্য রক্ষা করতে অনেক তরুণ আই-এফ-এস'কেই দেনায় ডুবে থাকতে হয়। পরে অবশ্য ক্যামেরা, বাইনোকুলার, ট্রানজিস্টার, টেপ-রেকর্ডার বিক্রি করে অবস্থা বেশ পাল্টে যায়।

নিউইয়র্ক ত্যাগের আগে তরুণকেও ফেয়ারওয়েল ডিনার খেতে হলো, খাওয়াতে হলো। আসা-যাওয়ার নিত্য খেলাঘর হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের চাকরি। এখানে যেন কিছুই নিত্য নয়, সবই অনিত্য। তবুও মানুষ তো। তরুণের মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। একটু কষ্ট করেই মুখে হাসি ফুটিয়ে সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে প্লেনে চড়ল।

প্লেনটা আকাশে উড়তেই তরুণের মন ভাসতে ভাসতে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল লন্ডনে। মনে পড়ল বন্দনার কথা, বিকাশের কথা।

ইচ্ছা ছিল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দনার বিয়ে দেবে। হয়নি। ইউনাইটেড নেশনস-এ তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ছুটি নেওয়া অসম্ভব ছিল। তবুও তরুণের অমতে কিছুই হয়নি। বন্দনা চিঠি লিখেছিল, 'দাদা, খবরের কাগজ দেখেই বুঝতে পারছি কি নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যে তোমার দিন কাটছে। সারা রাত্রি কিভাবে তোমরা মিটিং কর, কনফারেন্স কর, আমি ভেবে পাই না। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তুমি ভুলতে পার না আমার কথা। তোমার চিঠিতে দুতিন রকমের বল-পেন ও কালি দেখেই বুঝি একসঙ্গে একটা চিঠি লেখারও সময় তোমার নেই।...তোমার কথামতো এবার নিশ্চয়ই আমি বিয়ে করব। তবে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করার জন্য কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে কলকাতা যাওয়া কি সম্ভব? নাকি উচিত?'

পরের চিঠিতে বন্দনা লিখল, 'বিকাশকে তো তুমি ভালোভাবেই চেন, জান। আমাদের হাই-কমিশনেই তো কাজ করে। সুতরাং তোমাকে আর কি বলব! সারাদিন অফিস করে রিজেন্ট স্ট্রিট পলিটেকনিকে অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ে বেশ ভালোভাবে পাস করেছে। মনে হয় এবার একটা ভালো চাকরি পাবে।'

বন্দনা জানত সব কথা খুলে না লিখলে দাদার অনুমতি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই চিঠির শেষে লিখেছিল, 'ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি লুকিয়ে-চুরিয়ে ভালোবাসার খেলা আমরা খেলিনি। যে অধিকার পাবার নয়, সে অধিকার ও চায়নি, আমিও নিইনি। তবে মনে হয় আমার মতো দুঃখী মেয়েকে ও প্রাণ দিয়ে সুখী করতে চেষ্টা করবে।'

ওসব কথা ভাবতে ভাবতে আপন মনেই হেসে উঠল তরুণ। প্লেনের জানলা দিয়ে একবার নিচের দিকে তাকাল, দেখতে পেল না সীমাহারা অ্যাটলান্টিক। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেল বন্দনা আর বিকাশকে। রান্নাবান্না শেষ করে সাজা-গোজা হয়ে গেছে। সিঁথিতে, কপালে টকটকে লাল সিঁদুর পরাও হয়ে গেছে। বিকাশকে বকাবকি করছে, 'তোমার নড়তে-চড়তে বছর কাবার হবার উপক্রম। গিয়ে হয়তো দেখব দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে...।'

বিকাশ মজা করার জন্যে বলছে, 'তোমার দাদা হলে কি হয়! আমার তো শালা। অত খাতির করার কি আছে?'

বন্দনা নিশ্চয়ই চুপ করে সহ্য করছে না।...'ভুলে যেও না-দাদার জন্যই আমাকে পেয়েছ। আর যত মাতব্বরী তো আমার সামনে। দাদাকে দেখলে তো ব্যস!'

মহাকাশের কোলে ভাসতে ভাসতে কত কথাই মনে পড়ে।

নিউইয়র্ক থেকে বার্লিনে যাবার পথে সরকারিভাবে তিন দিন লন্ডনে স্টপ-ওভার করা যাবে। শপিং-এর জন্য। বিচিত্র ভারত সরকারের নিয়মাবলী। ইংরেজ চলে গেছে। লাল কেল্লায় তেরঙ্গা উড়ছে, কিন্তু লন্ডন আজও স্বর্গ! দিল্লি থেকে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, ঘানা যেতে হলেও ভায়া লন্ডন! শপিং-এর জন্য লন্ডনে স্টপ-ওভারের কথা ভাবলে অনেকেই হাসবেন। বন্ড স্ট্রিট—অক্সফোর্ড স্ট্রিটে কিছু রেডিমেড জামা-কাপড় ছাড়া লন্ডনে আর কিছু কেনার নেই। আই-সি-এসদের পলিটিক্যাল বাইবেলে বোধ করি লন্ডন ছাড়া আর কোনো জায়গার উল্লেখ নেই।

লন্ডনে শপিং করার মতলব নেই তরুণের। তিন দিন ছুটি নিয়ে লন্ডনে ছদিন কাটাবে বলে ঠিক করেছে। বন্দনা-বিকাশদের সঙ্গে কদিন কাটাবার পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করবে। বন্ধু-বান্ধবদের জানিয়েছে, লন্ডন হয়ে বার্লিন যাচ্ছে ; জানায়নি করে লন্ডন পৌঁছেছে। বন্দনাকেই শুধু একটা কেবল্ পাঠিয়েছে। 'রিচিং লন্ডন, এ-আই ফ্লাইট, ফাইভ-জিরো-ওয়ান, ফ্রাইডে।'

এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং প্রায় বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে লন্ডনের দিকে তবুও, যেন তরুণের আর ধৈর্য ধরে না। ধৈর্যের সঙ্গে বোয়িং-এর প্রতিযোগিতা চলতে চলতেই হঠাৎ কানে এলো, 'মে আই হ্যাভ ইওর অ্যাটেনশন প্লীজ! উই উইল বী ল্যান্ডিং অ্যাট লন্ডন হিথরো এয়ারপোর্ট ইন এ ফিউ মিনিটস ফ্রম নাউ। কাইন্ডলি ফ্যাসেন ইওর সীট বেল্ট অ্যান্ড...!'

প্লেন থেকে বেরিয়ে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এ ঢুকতে গিয়েই উপরের দিকে ভিজিটার্স গ্যালারি না দেখে পারল না তরুণ। হ্যাঁ, ঠিক যা আশা করেছিল! বন্দনা আর বিকাশ আনন্দে উচ্ছ্বাসে হাত নাড়ছিল। পরম পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল ওদের দুজনের সারা মুখে।

বেশ লাগল তরুণের। মনটা যেন মুহূর্তের জন্য উড়ে গেল। কাছের মানুষের ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব হলো না জীবনে। রিক্ত নিঃস্ব হয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিল। ইন্দ্রাণী-বিহীন জীবনে কোনোদিন মুহূর্তের জন্য শান্তি পাবে, ভাবতে পারেনি। ইন্দ্রাণীর ব্যথা আজও আছে, একই রকম আছে। বুড়ীগঙ্গার পাড়ে যাকে নিয়ে প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে জীবনসূর্যের ইঙ্গিত দেখেছিল, আজও তাকে নিয়েই ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে। জীবনের এত বড় ট্র্যাজেডির মধ্যেও তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে তরুণের জীবনে! আছে বন্দনা এবং আরো কত কে!

প্রথম দুটো দিন হোবর্নের ওদের ফ্ল্যাটের বাইরেই বেরুতে পারল না তরুণ। কতবার বলল, 'চলো বেড়িয়ে আসি। মার্বেল আর্চের পাশে বসে একটু গল্প-গুজব করে পিকাডিলিতে খাওয়া-দাওয়া করি।'

বন্দনা বলল, 'মার্বেল আর্চ আর বন্ড স্ট্রিট দেখে কি হবে বল? তাছাড়া বাইরে যাবে কেন? আমার রান্না কি তোমার ভালো লাগছে না?'

এ-কথার কি জবাব দেবে তরুণ। কিছু বলে না। শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।

বিকাশ দুদিন অফিসে যায়নি। অফিসে এখন ভীষণ কাজের চাপ। তাই আর ছুটি পায়নি। বন্দনা তো দশ দিনের ছুটি নিয়ে বসে আছে।

সেদিন দুপুরের লাঞ্চের পর তরুণ আর বন্দনা গল্প করছিল। আমেরিকার কথা, ইউনাইটেড নেশনস-এর কথা। কখনও আবার ব্যক্তিগত, পারিবারিক। সাধারণ, মামুলি কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ বন্দনা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আচ্ছা দাদা, তুমি মনসুর আলি বলে কাউকে চেন?'

তরুণ একটু চিন্তিত হয়ে জানতে চাইল, 'কোন্ মনসুর আলি?'

'উনি বললেন, তুমি নাকি ঢাকাতে ওদেরই বাড়ির কাছে...।'

এবার তরুণ নিজেই চঞ্চল হয়ে উঠল। জানতে চাইল, 'চোখ দুটো কটা-কটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'খুব হাসতে পারে?'

'ঠিক ধরেছ।'

আর শুয়ে থাকতে পারে না। এবার উঠে বসে। 'কোথায় দেখা হলো হতচ্ছাড়ার সঙ্গে?'

বন্দনা বড় খুশি হলো, একটু যেন আশার আলো দেখল। তরুণ কোনোদিন তাকে ইন্দ্রাণীর কথা বলেনি। বলবার সম্পর্ক নয়। তাছাড়া তরুণ জানে নিজের মান, মর্যাদা সম্ভ্রম রক্ষা করে অন্যের সঙ্গে মিশতে। প্রত্যক্ষভাবে কিছু না শুনলেও বন্দনা অনুমান করতে পেরেছিল। তাছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছিল তরুণ এই দুনিয়ায় ওই একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনসুর আলির সঙ্গে আলাপ করার পর আরো অনেক কিছু জানতে পারল।

তরুণের কথায় বন্দনাও তাই একটু চঞ্চল না হয়ে পারে না। বলল, 'এবার আমাদের নববর্ষের ফাংশানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। কথায় কথায় তোমার কথা উঠল।'

'হতচ্ছাড়া হঠাৎ আমার কথা জিজ্ঞাসা করল?'

'আমাদের পাশেই মিঃ সরকার বলে ঢাকার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। মিঃ আলি ওকে তোমার নাম করে বলেছিলেন যে তোমরা নাকি একই পাড়ায় থাকতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু এক পাড়ায় নয় একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়তাম!'

'তাই নাকি?'

'তবে কি, ওকে তো আমরা কোনোদিন মনসুর আলি বলতাম না।'

'তবে?'

'বলতাম মুসুর। ভারি মজার ছেলে। ওকে মুসুর বললেই ও বলতো, কি বলছ শ্বশুর?'

হঠাৎ হাসিতে তরুণের সারা মুখটা ভরে উঠল। জানলা দিয়ে দৃষ্টিটা লন্ডনের ঘোলাটে আকাশের কোলে নিয়ে গেল কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেল সেই ফেলে আসা অতীতের দিনগুলো।

পেটুক মনসুরকে নিয়ে কি মজাটাই না করত ওরা! তবে হ্যাঁ, যে কাজ আর কোনো ছেলেকে দিয়ে করানো সম্ভব হতো না, মনসুর হাসতে হাসতে সে কাজ করে দিতে পারত! তরুণের মা তাই তো মনসুরকে খুব ভালোবাসতেন। রমনার বিলাস উকিলের মেয়ের বিয়ের সময় মনসুর না থাকলে কি কাণ্ডটাই হতো! শেষ রাত্তিরে লগ্ন। বিলাসবাবুর সঙ্গে কি তর্কাতর্কি হওয়ায় নাপিত চলে গেল। লগ্ন বয়ে যায় অথচ নাপিতের পাত্তা নেই। হঠাৎ মনসুর ওই নাপিতেরই ষোল-সতের বছরের ছেলেকে হাজির করে মহা অপমানের হাত থেকে রক্ষা করল সবাইকে। সেই মনসুর লন্ডনে এসেছিল?

'উনি তো এখন রেডিও পাকিস্তানে আছেন। বি-বি-সি-তে কি একটা ট্রেনিং নিতে এসেছিলেন।

'ও জানল কেমন করে আমি লন্ডনে ছিলাম?'

'তা তো জানি না। হয়তো কোনো পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাটের কাছে তোমার কথা শুনেছে।'

কথাবার্তা চলতে থাকে। একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচ বোধ করে বন্দনা। তবুও আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'আচ্ছা দাদা, তোমাদের ওখানে চিকাটোলা বলে কোনো...?'

'চিকাটোলা নয়, টিকাটুলি।'

'মিঃ আলি ওই টিকাটুলির এক রায়বাড়ির কথাও বলছিলেন।'

টিকাটুলির রায়বাড়ি শুনতেই যেন তরুণের হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘাবড়ে গিয়ে সারা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে শুধু জানতে চাইল, 'রায়বাড়ির কথা কি বলল!'

'বিশেষ কিছু না। তবে খুব দুঃখ করলেন দাঙ্গায় ওদের সর্বনাশ হবার জন্য। আর বললেন, ও বাড়ির মেয়ে ইন্দ্রাণী নাকি...!'

ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, গলার স্বরটা কেঁপে উঠল তরুণের। 'কি? কি হয়েছিল ইন্দ্রাণীর? মারা গিয়েছে তো?'

বন্দনা তরুণের হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'না না দাদা, উনি বেঁচে আছেন।'

'কি বললে বন্দনা?'

'উনি মারা যাননি।'

তরুণ আপন মনে বার বার আবৃত্তি করল, 'ইন্দ্রাণী বেঁচে আছে—?'

মাথাটা নিচু করে কত কি ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন তলিয়ে গেল তরুণ। হয়তো মহা দুর্যোগের রাত্রে মহাসাগরের মাঝে দিগভ্রান্ত নাবিকের মতো কোথায় যেন দূরে একটু আলোর ইঙ্গিত পেল।

কয়েকটা মিনিট কেউই কথা বলতে পারল না। শেষে বন্দনাই বলল, 'হ্যাঁ দাদা, উনি বেঁচে আছেন। তুমি একবার ঢাকায় বদলি হয়ে যাও না!'

মুখটা তুলে মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে তরুণ বলল, 'না না, বন্দনা, ঢাকায় আমি যাব না। ওখানে গিয়ে আমি টিঁকতে পারব না'।'

'তুমি একটু চেষ্টা করলে ওকে খুঁজে বার করতে পারবে।'

তরুণ একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'ওর খোঁজ করা বড় কঠিন।'

'তুমি মনসুর আলি সাহেবকে একটা চিঠি দাও না।'

'না না, তা হয় না।'

'কেন হয় না?'

'ফরেন সার্ভিসের লোক হয়ে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট অফিসারকে চিঠিপত্র দেওয়া ঠিক নয়!'

খবরটা এত অপ্রত্যাশিত যে স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা ছিল না তরুণের। বন্দনাই কি যেন ভেবে বলল, 'এক কাজ কর না দাদা। করাচিতে তোমাদের হাইকমিশনে কাউকে বলো না মনসুর আলি সাহেবের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে।'

বন্দনার প্রস্তাবে তরুণ যেন বাস্তব জ্ঞান ফিরে পায়। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! মনসুর কি করাচিতেই পোস্টেড?'

'তাই তো বলেছিলেন।'

একটু চুপচাপ থাকে দুজনে। বন্দনাই আবার বলে, 'আচ্ছা দাদা, তুমি একবার ঢাকায় তোমাদের ডেপুটি হাই-কমিশনের কাউকে বলো না ওই টিকাটুলিতে খোঁজ-খবর নিতে। হয়তো কেউ না কেউ খবরটা জানতেও পারেন!'

চাপা গলায় তরুণ বলে, 'হ্যাঁ, তাও নিতে পারি।'

বন্দনার কিছু কেনাকাটার ছিল। তাই এবার উঠে পড়ল।

'কোথায় চললে?'

'এই একটু দোকানে যাব।'

'কেন?'

'আজ তিনদিন তো বাড়ির বাইরে যাইনি। কিছু কেনাকাটা...!'

হাসি-খুশিভরা তরুণ বলল, 'আর দোকানে যেতে হবে না। বিকাশ এলে আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ব, বাইরেই খাওয়া-দাওয়া করব!'

অনেকদিন পর হঠাৎ একটু আশার আলো দেখতে পাবার পর তরুণের মনটা খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল। বন্দনা তাই আর বাধ্য দিতে পারল না। 'ঠিক আছে। আজ খুব মজা করা যাবে। তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'কিছু আনতে হবে?'

'হ্যাঁ দাদা, একটু কফি আনতে হবে।'

'না না, আর দোকানে যেতে হবে না। তার চাইতে আমি বিকাশকে ফোন করে দিচ্ছি যে আমরাই আসছি, ও যেন ওয়েট করে।'

'একটু কফি খেয়ে বেরুব না?'

'কি দরকার? বেরিয়ে পড়ি। তারপর তিনজনে একসঙ্গে কোথাও কফি খেয়ে নেব।'

গুরুগম্ভীর ধীর-নম্র তরুণ হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেক দিনের জমাট বাঁধা বরফ যেন প্রভাতী সূর্যের রাঙা আলোয় একটু একটু করে নরম হতে শুরু করল।

রাত্রে শোবার পর বন্দনা বিকাশকে বলল, 'খবরটা শোনার পর থেকে দাদা কেমন পাল্টে গেছেন দেখেছ?'

'হ্যাঁ। দুনিয়ায় তো আর কেউ নেই। সুতরাং খবরটা শোনার পর আনন্দ হওয়া তো স্বাভাবিক।'

'ওরা দুজনে যেদিন মিলতে পারবে, সেদিন কি হবে বলো তো?'

বিকাশ মজা করে বলে, 'আমরা যেদিন প্রথম মিলেছিলাম, সেদিনকার আনন্দের চাইতে বেশি কিছু হবে কি?'

বিকাশকে ছোট্ট একটা চড় মেরে বন্দনা বলল, 'তোমার মতো অসভ্য ছাড়া একথা আর কে বলবে?'

আর মাত্র একটা দিন। তরুণ সারাদিন ঘোরাঘুরি করে পুরনো সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে এলো। টুকটাক কিছু কাজকর্ম ছিল, তাও সেরে ফেলল।

রাত্রে বন্দনা নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াল। তারপর বেশ খানিকটা গল্প-গুজব করে সবাই শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই এয়ারপোর্ট রওনা দিল। যথারীতি বন্দনার চোখ দুটো ছলছল করছিল। তরুণ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এবার আর দুঃখ কি? বছরে একবার তোমরাও যেতে পারবে, আমিও আসতে পারব।'

বি-ই-এ-র প্লেনে তরুণ রওনা হলো বার্লিন।

কলকাতার বৌবাজারে-বৈঠকখানার সঙ্গে রাসবিহারী-সাদার্ন অ্যাভিনিউর আশ্চর্য পার্থক্য থাকলেও তুলনা হতে পারে, কিন্তু লন্ডনের সঙ্গে বার্লিনের তুলনা? অসম্ভব, অবাস্তব, অকল্পনীয়। বরানগর-কাশীপুরের পুরনো জমিদার বাড়ির গেটে সিমেন্টের সিংহমূর্তি দেখে শিশুদের কৌতূহল জাগতে পারে, সহায়-সম্বলহীন অধস্তন কর্মচারীদের ভক্তি বা ভয় হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে আজ সেটা কৌতুকের উপকরণ মাত্র। ওইসব জমিদারবাড়ির ঐতিহ্য থাকলেও ওদের দারিদ্র্য কারুর দৃষ্টি এড়াবে না। লন্ডন্ যেন ওই কাশীপুর-বরানগরের জমিদারবাড়িগুলির বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র। তাই তো লন্ডনের সঙ্গে বার্লিনের কোনো তুলনাই হয় না।

শুধু লন্ডন কেন, নিউইয়র্কের সঙ্গেও বার্লিনের কোনো তুলনা হয় না। পৃথিবীর সব চাইতে ধনীর দেশ আমেরিকা। নিউইয়র্ক তার মাথার মণি—শো উইন্ডো। তবুও সেখানকার ডাউন টাউনের মানুষের দারিদ্র্য, জৌলুসভরা টাইমস স্কোয়ারে ভিখারি দেখলে চমকে উঠতে হয়। কেন বেকারি? আমেরিকার কত অজস্র নাগরিক আজও অন্ন-বস্ত্রের জন্য হাহাকার করছে!

তাই তো বার্লিনের সঙ্গে নিউইয়র্কেরও তুলনা হয় না, হতে পারে না ; বার্লিনে বেকার? ভিখারি? নিশ্চয়ই মানুষটা উন্মাদ। তা না হলে ওখানে কেউ বেকার থাকে না, ভিখারি হয় না।

এসব তরুণ আগেই জানত। পোস্টিং না হলেও আসা-যাওয়া করতে হয়েছে কয়েকবার। সেই বার্লিনে চলেছে তরুণ।

দশ

বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো জার্মানিও দু টুকরো হয়েছে কিন্তু কলকাতা বা লাহোরের মতো বার্লিন আর সেই আগের মতো নেই। একটা নয়, দুটো নয়, চার চারটে টুকরো হয়েছে বার্লিন—ব্রিটিশ সেকটর, ফ্রেঞ্চ সেকটর, আমেরিকান সেকটর ও রাশিয়ান সেকটর। অ্যালায়েড ফোর্সেস-এর তিনটি সেকটর নিয়েই আজকের পশ্চিম বার্লিন ও রাশিয়ান সেকটর হচ্ছে পূর্ব বার্লিন। পশ্চিম বার্লিন বাহ্যত ও কার্যত মুক্ত হলেও আইনত আজও ইংরেজ-ফরাসি আমেরিকা অধীন। শহরটাকে চক্কর দিতে গিয়ে বার বার নজরে পড়বে, 'ইউ আর লিভিং ব্রিটিশ সেকটর, ইউ আর এন্টারিং ফ্রেঞ্চ সেকটর' অথবা 'আমেরিকান সেকটর।'

বিরাট ও বিচিত্র শহর হচ্ছে বার্লিন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বার বার এর উল্লেখ। আয়তনে পূর্ব বার্লিনের চাইতে পশ্চিম বার্লিন কিছুটা বড়। দুটি বার্লিন একত্রে ওয়াশিংটনের সাড়ে তিনগুণ। আজকের পশ্চিম বার্লিনের আমেরিকান সেকটরই প্যারিসের চাইতে বড়।

দুটি জার্মানি, দুটি বার্লিন দিন-রাত্তিরের মতো সত্য হলেও ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে শুধু পশ্চিম জার্মানির। পশ্চিম বার্লিনে আছে কন্সাল জেনারেলের অফিস। সেই কন্সাল জেনারেল অফিসে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান হতে চলেছে তরুণ।

সাধারণত কন্সাল জেনারেলের অফিসের দুটি কাজ। কনসুলার ও কমার্শিয়াল। অর্থাৎ পাসপোর্ট-ভিসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সঙ্গে থাকে প্রচার বিভাগ। বার্লিন যদি সানফ্রান্সিসকোর মতো একটা বিরাট শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র হতো, তাহলে ওই দুটি-তিনটিই কন্সাল জেনারেল অফিসের কাজ হতো। কিন্তু বার্লিন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর দুটি বিবাদমান শক্তি এখানে মুখোমুখি। তাই তো শুধু পাসপোর্ট-ভিসা আর এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের কাজই নয়, কন্সাল জেনারেলের অফিসে কূটনৈতিক বিভাগটি অন্যতম প্রধান অংশ। তরুণ সেই গুরুত্বপূর্ণ পলিটিক্যাল ডিভিশনের প্রধান হতে চলেছে।

পূর্ব জার্মানিতে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন নেই, বার্লিনে নেই আমাদের দূতাবাস বা কন্সাল-জেনারেল। বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ দেশ পূর্ব জার্মানির সঙ্গে ভারতের শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক। তাই তো আছে ট্রেড মিশন।

দ্বিধাবিভক্ত বাংলার কাছে দ্বিখণ্ডিত বার্লিনের কাহিনি হাসির খোরাক যোগাবে। পশ্চিম বার্লিন

পশ্চিম জার্মানির অন্তর্গত নয়। তবে রাজধানী বনের চাইতে পশ্চিম জার্মানির অনেক বেশি সরকারি কর্মচারী পশ্চিম বার্লিনে কাজ করেন। বার্লিন দু টুকরো হলেও মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম একইভাবে চলছিল। মাটির উপরের রেল 'ইউ-বান' চালাত পূর্ব জার্মানি, মাটির তলার রেল 'ইউ-বান' চালাত পশ্চিম জার্মানি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার পূর্ব বার্লিনবাসী প্রতিদিন চাকরি করতে আসত পশ্চিমে, কয়েক হাজার পশ্চিমের বাসিন্দাও নিত্য যায় পূর্বে চাকরি করতে।

বার্লিনের মজার কাহিনি আরো আছে। পশ্চিম বার্লিন থেকে যে বাইশ জন ডেপুটি বনে প্রতিনিধিত্ব করে, তাঁদের একজন তো পূর্ব বার্লিনেই থাকতেন। ভাবতে পারেন খুলনা বা বরিশালে বাস করে, কলকাতা থেকে নির্বাচিত হয়ে দিল্লির পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া? কলকাতার মতো পূর্ব জার্মানির থিয়েটারের মানে বেশ উঁচু। পশ্চিম বার্লিনের বনেদি ও ধনী বা থিয়েটার রসিকের দল তাই রোজ সন্ধ্যায় পূর্ব বার্লিনে গিয়ে থিয়েটার দেখেন। আবার আমেরিকান খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন পড়ার জন্য আমেরিকান প্রচার দপ্তরের পৃথিবীর বৃহত্তম লাইব্রেরি—পশ্চিম বার্লিনের ইউ-এস-আই-এ-তে পূর্ব বার্লিনের হাজার হাজার কর্মী নিত্য আসেন।

এই বার্লিনে—পশ্চিম বার্লিনে এলো তরুণ। পশ্চিম বার্লিনের টেম্‌পেলহফ্ এয়ারপোর্টটি একেবারে শহরের মধ্যে। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মতো না হলেও পার্ক সার্কাস আর কি! এয়ারপোর্টটিও বেশ অভিনব। মাঠের মধ্যে রানওয়ের ধারে বা টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে মাইলখানেক দূরে প্লেনে ওঠা-নামা করতে হয় না। প্লেন একেবারে টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বিরাট হল ঘরের মধ্যে থামে। প্লেনে ওঠা-নামার সময় এয়ার হোস্টেসের কৃত্রিম হাসি দেখার আগে বা পরে রোদ-জল ঝড় সহ্য করতে হয় না যাত্রীদের।*

কন্সাল জেনারেল একটু জরুরি কাজে আটকে থাকায় নিজে এয়ারপোর্ট যেতে পারেননি তরুণকে অভ্যর্থনা জানাতে। সহকর্মী মিঃ সুরী ও মিঃ দিবাকরকে পাঠিয়েছিলেন।

তরুণ বলল, 'আপনারা দুজনে কেন কষ্ট করলেন? আই অ্যাম সরি, আমার জন্য আপনাদের বেশ কষ্ট হলো।'

মিঃ দিবাকর বললেন, 'কি যে বলেন স্যার! আপনাদের দেখাশুনা করা ছাড়া আমাদের আর কি কাজ?'

মিঃ সুরী শুধু বললেন, 'দ্যাটস্ রাইট স্যার।'

হান্সা কোয়ার্টারে তরুণের ফ্ল্যাট ঠিক করা ছিল। দিবাকর আর সুরী ফ্ল্যাটের সব কিছু দেখিয়ে দেবার পর বললেন, 'স্যার আপনি একবার সি-জি-র (কন্সাল জেনারেল) ওয়াইফকে টেলিফোন করুন।'

'কেন? এনিথিং স্পেশ্যাল?'

'সি-জি বার বার করে বলেছেন?'

তরুণ হাসে। দিবাকর আর সুরী মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন।

তরুণ বলল, 'টেলিফোন করার দরকার নেই। আপনারা কাইন্ডলি মিসেস ট্যান্ডনকে বলে যান আমি একটু পরেই আসছি।'

দিবাকর আর সুরী বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, 'একটু পরেই গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার।'

* দুটি বার্লিনের কথা ১৯৬১ সালে 'বার্লিন প্রাচীর' ওঠার আগেকার পট ভূমিকায় লেখা। এই রচনার ঘটনাকালও তখনকার।

'দ্যাটস অল রাইট।'

ওঁরা বিদায় নেবার পর তরুণ একটু ঘুরে ফিরে ফ্ল্যাটটা দেখল। ছোট্ট ফ্ল্যাট। ছোট্ট ফ্ল্যাটই সে চেয়েছিল। একটা বড় লিভিং রুম, একটা মাঝারি সাইজের বেডরুম, ছোট্ট একটা স্টাডি আর কিচেন, টয়লেট ইত্যাদি। এ ছাড়া দুটি বারান্দা—একটি ছোট, একটি বড়। বড়টি লিভিং রুমের সঙ্গে, ছোটটি বেডরুমের সঙ্গে। দুটি বারান্দাতেই অ্যালুমিনিয়াম ডেকচেয়ার রয়েছে। হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে ত্রুটি কিছু নেই। ফার্নিচার, বিছানাপত্তর, লাইট স্ট্যান্ড—সব কিছুই ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে।

পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের সমন্বয় হয়েছে। মুষ্টিমেয় এই কটি দেশে সব কিছুতেই একটা শিল্পীসুলভ মনোবৃত্তি, রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে। রাইফেল সব দেশেই তৈরি হচ্ছে। আমেরিকা-রাশিয়া থেকে শুরু করে আমাদের ইছাপুর, কাশীপুরে পর্যন্ত। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াই একমাত্র দেশ যে দেশের রাইফেলেও চমৎকার শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যাবে। লোহার তৈরি পুল তো সব দেশেই আছে। কলকাতা-লন্ডন-নিউইয়র্কে। কিন্তু প্যারিসের ওই প্রাণহীন লোহার পুলগুলির মধ্যেও সমগ্র ফরাসি জাতির যে শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। জাপান, জার্মানিও অনুরূপ। সব কিছুতেই প্রয়োজনের সঙ্গে রুচির সমন্বয়।

পৃথিবীর বহু শহরে-নগরে আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট দেখা যাবে, কিন্তু বার্লিনের হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে কি যেন একটু অতিরিক্ত পাওয়া যাবে। এই অতিরিক্ত পাওয়াটুকুই এক একটা জাতির বৈশিষ্ট্য। রাশিয়া রকেটের সঙ্গে সঙ্গে বলশয় থিয়েটার আর ব্যালেরিনার জন্য বিখ্যাত। জাপান শুধু ইলেকট্রনিকসে নয়, চমৎকার পুতুল তৈরি করে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে। সুইস মেশিনারী ঘড়ির মতো সুইস চকোলেটও সবার প্রিয়। বার্লিনেও বড় বড় কলকারখানার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বার্লিন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখতে বেশ লাগছিল তরুণের। দূরের রেডিও টাওয়ারের দিকে নজর পড়তেই মনে পড়ল ফিলহারমনিক ও সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার কথা। নিউইয়র্কে গত বছরই শুনেছিল হাবার্ট ভন্ কারজনের পরিচালনায় বার্লিন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা। মনে পড়ল আরো অনেক কথা—।'

রমনার মজুমদার বাড়ির বিনয়বাবু বি-এ ফেল করার পর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। অনেক খোঁজ-খবর করেও ফল হলো না। ফটো দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তবুও বিনয়বাবুর কোনো সন্ধান দিতে পারেনি কেউ। পারবে কোথা থেকে। খবরের কাগজে যখন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে উনি তখন আরব সাগরের মাঝ দরিয়ায় ভেসে চলেছেন।

দেখতে দেখতে বছরের পর বছর কেটে গেল। ঢাকার লোক প্রায় ভুলে গেল বিনয় মজুমদারের কথা। ওয়াড়ীর মাঠে, বুড়ীগঙ্গার পাড়ের জটলাতেও বিনয় মজুমদারকে নিয়ে আলাপ-আলোচনাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। ইন্দ্রাণী ভুলতে পারল না তার বিনেকাকুকে। *ভুলবে কেমন করে? ও যে বিনেকাকুর কোলে চড়ে প্রায়ই বেড়াতে যেত, লজেন্স খেতো!* বিনেকাকু যে ওর সব আব্দার হাসিমুখে বরদাস্ত করতেন। বড় হবার পরও বিনেকাকুর দেওয়া পুতুলগুলো বেশ যত্নে সাজিয়ে রেখেছিল ইন্দ্রাণী।

দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ বিনেকাকু ফিরে এলেন ঢাকায়। রমনা, ওয়াড়ী, বুড়ীগঙ্গার পাড়ে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল। দীর্ঘদিন জার্মানিতে থেকে অদৃষ্ট পাল্টেছেন, অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন জীবনে। যুদ্ধ শুরু হবার পর প্রায় বাধ্য হয়ে সুইডেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ

হবার পর বিনয়বাবু এলেন আবার মাতৃভূমিকে দেখতে।

বিনেকাকুর কাছে যেতে ইন্দ্রাণীর দ্বিধা, সঙ্কোচ হচ্ছিল। তরুণ কিছু না বলে কলেজ যাবার পথে বিনেকাকুর ওখানে গিয়েছিল।

'কাকু, আমার নাম তরুণ। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন।'

'তোমার বাবার নাম কি?'

'কানাই সেনগুপ্ত।'

'ওই উকিলবাড়ির কানাইদার ছেলে তুমি?'

তরুণ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।'

বিনয়বাবু আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তরুণকে। অনেক কথাবার্তার পর তরুণ ইন্দ্রাণীর কথা বলেছিল।

'ওই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটা? যে আমাকে বিনেকাকু বলত?'

'হ্যাঁ।'

বিনয়বাবু একটু যেন উদাস হলেন। হারিয়ে যাওয়া অতীতের ভিড়ের মধ্যে মনটাকে নিয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'ও কি এখনও সেই রকম আদুরে আছে?'

তরুণ কি জবাব দেবে? চুপ করে থাকে। বিনয়বাবু আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'জান তরুণ, প্রথম প্রথম বিদেশে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের টফি খেতে দেখলেই মনে পড়ত ওর কথা। বড় ইচ্ছে হতো ওর একটা ছবি কাছে রাখি কিন্তু তা আর মনে হয়নি।'

তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কাকু?'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'বাড়ি থেকে যে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ঢাকার কাউকেই চিঠি দিতে পারতাম না।'

ইন্দ্রাণীকে আসতে হয়নি, বিনয়বাবুই গিয়েছিলেন। পকেট ভর্তি টফি নিতে ভুলে যাননি।

বার্লিনের হান্সা কোয়ার্টারের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তরুণের সে সব কথা পরিষ্কার মনে পড়ল। আর মনে পড়ল বিনেকাকু শেষে বলেছিলেন, ঢাকায় থেকে ইলিশ আর গঙ্গাজলি খেয়ে কিছু হবে না। একদিন টুপ করে পালিয়ে জার্মান যাও, বার্লিনে এসো।'

ঢাকার সেই বিনেকাকু জার্মান নাগরিক হয়েই বার্লিনে থাকেন বলেই তরুণ জানত। স্থির করল খুঁজে বের করতেই হবে সেই পরম শুভাকাঙ্ক্ষীকে।

বিনেকাকুর কথা মনে হতেই ইন্দ্রাণীর স্মৃতিটা একটু বেশি সচেতন হয়ে পড়ল মনের মধ্যে। এই ওপাশের ব্যালকনির ডেক-চেয়ারে বসে যদি ইন্দ্রাণী গুনগুন করে গান—

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'তরুণ স্পিকিং?'

'হ্যাঁ। আমি তরুণ বলছি।...নমস্কার মিঃ ট্যান্ডন, হাউ আর ইউ?'

'আই অ্যাম সরি, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না।'

'না না, তাতে কি হয়েছে...'

আর দেরি করতে পারল না।

ট্যান্ডন সাহেব সরকারি চাকুরি থেকে প্রায় বিদায় নিতে চলেছেন। বার্লিনেই তাঁর লাস্ট পোস্টিং। ফরেন সার্ভিসের অনেক অফিসারই ট্যান্ডন সাহেবের অধীনে কোনো না কোনো ডেস্কে কাজ করেছেন। তরুণও করেছে! মিসেস ট্যান্ডনকে ভাবীজি বললেও ফরেন সার্ভিসের জুনিয়র অফিসাররা তাঁকে মাতৃতুল্য সম্মান দেন। কেউ একটু সম্মান দিলে, কেউ একটু মর্যাদা দিলে

মিসেস ট্যান্ডন ক্ষমতার অতিরিক্ত না করে শান্তি পান না।

এর অবশ্য একটা কারণ আছে। ট্যান্ডন সাহেব কর্মজীবন শুরু করেন অধ্যাপনা করে। কনিষ্ঠদের আজও তাই ছাত্রজ্ঞান করেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর তরুণ বলল, 'জানেন ভাবীজি, ইউনাইটেড নেশনস্ ছাড়তে মনটা বড় খারাপ লাগছিল। কিন্তু যেই মনে পড়ল আপনার রান্নার কথা, তখন আর এক মুহূর্তও নিউইয়র্কে থাকতে মন চাইল না।'

ভাবীজি বললেন, 'এবার তো তোমাদের ট্যান্ডন সাহেব রিটায়ার করছেন। আর আমি তোমাদের রান্না করে দিতে পারব না। এবার বিয়ে কর, তাকে রান্না-বান্না শিখিয়ে দিয়ে আমিও রিটায়ার করি।'

'তাহলে আর এ জন্মে হলো না ভাবীজি।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়। ফরেন সার্ভিসে থেকে আজও ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করতে পারলে না?'

ফরেন সার্ভিসের কথা বাইরে না ছড়ালেও গোপন থাকে না। ভালো, মন্দ, কোনো খবরই না। সুধীর আগরওয়ালা দিল্লিতে থাকার সময় সবাইকে চমকে দিল। ড্রিংক তো দূরের কথা, পান-সিগারেটও খেত না। মঙ্গলবার শুধু উপবাসই করত না, আরউইন রোডের হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে অফিসে এসে সবাইকে প্রসাদ দিত। সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে কোট-প্যান্ট ছেড়ে ধুতি-চাদর পরে পুজো করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

যাঁরা ফরেন অফিসে কাজ করেও ফরেন যেতেন না, বা যেতে পারতেন না, তাঁরা বাহবা দিতেন। কিন্তু যাঁরা বহু ঘাটে জল খেয়ে এসেছেন, তাঁরা মন্তব্য করতেন, প্রথম ওভারেই ক্লিন বোল্ড হয়ে যাবে। আই-এফ-এস সুধীর আগরওয়ালাকে তাই ঠাট্টা করে অনেকেই বলত আই-জি-বি-এস—ইন্ডিয়ান গুড বয় সার্ভিস।

আগরওয়ালার প্রথম ফরেন পোস্টিং হলো ম্যানিলায়। বিকৃত পশ্চিম, বিস্মৃত পূর্বের মিলনভূমি ফিলিপাইন। ট্রান্সফার অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত জেনেই অনেকেই মুচকি হেসেছিলেন।

দুচারজন অনভিজ্ঞ প্রবীণ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'ইউ ইউ পিপুল ডোন্ট স্পয়েল হিম, আগরওয়াল ঠিক থাকবে।'

বিদেশ যাত্রার আগে সুধীর ছুটি নিয়ে বাবা মাকে দেখার জন্য শুধু কানপুরই গেল না, হরিদ্বার আর বেনারসও গেল। নিয়ে এল নির্মাল্য, গঙ্গাজল আর অসংখ্য দেবদেবীর ফটো। কনট প্লেসে শপিং করবার আগে চাঁদনী চক থেকে ডজন ডজন ভালো ধূপকাঠি কিনল। অন্যান্য সহকর্মীদের মতো সেই সঙ্গে কিনল রেকর্ড। তবে বিলায়েৎ খাঁ-রবিশঙ্করের সেতার বা লতা মঙ্গেশকারের লাইট মডার্ন সঙস্ নয়। কিনল যূথিকা রায়, শুভলক্ষ্মীর ভজন।

শুভদিনে শুভক্ষণে সুধীর আগরওয়াল রওনা হল সিঙ্গাপুর এন রুট টু ম্যানিলা।

বিদায় জানাতে আরো অনেকের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান গুড বয় সার্ভিসে'র মহেশ মিশ্রও গিয়েছিল। মিশ্র বার বার করে আগরওয়ালাকে বলেছিল 'ডোন্ট হেসিটেট, যা কিছু দরকার আমাকে লিখো। আমি পাঠিয়ে দেব।'

ম্যানিলায় পৌঁছেই আগরওয়াল বহু সহকর্মীকে চিঠি দিল। মিশ্রকে লিখল, 'তোমাদের সবাইকে ছেড়ে এসে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি। তবে আমার পরম সৌভাগ্য মিঃ ডুরাইস্বামীর ছোট্ট ফ্ল্যাটটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছি। দু-একজন সহকর্মী

আমাকে বেশ সাহায্য করেছেন। তবে সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছি। সারা শহরটা যেন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তুমি তো জান আমার ওসব ভালো লাগে না। তাই শুধু পড়াশুনা করছি।'

আর কারুর কাছে না হোক, মিশ্রের কাছে প্রতি সপ্তাহে ম্যানিলা থেকে চিঠি আসত। কখনও লিখত, 'ভাই আরো দুচারটে ভালো ভালো ভজন বা ক্লাসিক্যাল গানের রেকর্ড পাঠিয়ে দাও।' আবার লিখত, 'বইপত্তর যা এনেছিলাম তা যে কতবার করে পড়লাম তার ঠিকঠিকানা নেই। এখানে আমার মনের মতো বই পাওয়া অসম্ভব। তাই তুমি যদি একটু কষ্ট করে ভারতীয় বিদ্যাভবনের কয়েকটা বই পাঠাও তবে বড়ো ভালো হয়।'

আরও কত কি লিখত আগরওয়াল। '—এদের ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখলাম। সত্যি দেখবার মতো অনেক কিছু আছে। কয়েক শতাব্দীর অস্ত্রশস্ত্রের যে কালেকশন আছে, শুধু তাকে নিয়েই পৃথিবীর এদিককার মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস লেখা সম্ভব। আর আছে পোশাক-এর কালেকশান। এক কথায় অপূর্ব। মানব সভ্যতার প্রগতির অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তার পোশাক। মানুষের সৃজনী শক্তি কি সুন্দরভাবে, ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে তার মধ্যে যে ছন্দ আছে, আনন্দআত্মতৃপ্তি আছে তা এদের মিউজিয়ামের পোশাকের কালেকশান দেখলে বেশ অনুভব করা যায়। আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধরনের পোশাক ব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব পোশাকের কোনো সংগ্রহশালা নেই।'

নিঃসঙ্গ আগরওয়াল সন্ধ্যাবেলায় হয় পড়াশুনা করত, নয়তো চিঠিপত্র লিখত। লিখত সহকর্মীদের কথা, শহরের কথা।—দিনের বেলা সবই যেন ক্যাজুয়াল। কাজকর্ম, পোশাক-আসাক, সব কিছু। একটা শর্ট শ্লিভের সার্ট পরেও ফরেন মিনিস্টারের কাছে যাওয়া যাবে। কাজকর্ম সবাই করছে, তবে মনটা পড়ে থাকে সন্ধ্যার দিকে। রাত্রির নেশাতেই দিনের বেলা যা কিছু করা সম্ভব আর কি! শুধু হোটেল, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাবে নয়, জনে জনের বাড়িতেও রসের মজলিশ বসে। মানুষগুলো হঠাৎ চলে যায় যুগ যুগ পিছনে। আদিম মানুষের মতো সে হিংস্র হয়ে ওঠে—নারী পুরুষ সবাই।...এই যে আমাদেরই সহকর্মী মিঃ চাড্ডা! কিভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন। রোজ সন্ধ্যায় কোথা থেকে যে এক একটা মেয়েকে শিকার করে নিজের ফ্ল্যাটে আনেন, ভাবলেও অবাক লাগে, ঘেন্না করে।

ফরেন সার্ভিসের সর্বত্র ছড়িয়েছিল আগরওয়ালের অভিজ্ঞতার কাহিনি। পরে যখন ওর চিঠিপত্র আসা কমতে থাকল, সে খবরও মুখে মুখে, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কৃপায় অথবা ডিপ্লোম্যাটদের নিত্য আনাগোনার ফলে ছড়িয়ে পড়ত পৃথিবীর প্রায় সব ইন্ডিয়ান মিশনেই।

কয়েক মাসের মধ্যেই আরো অনেক কাহিনি ছড়িয়েছিল।

ম্যানিলা থেকে যাঁরা অন্যত্র বদলি হতেন, তাঁরা জানতেন আগরওয়ালের বিবর্তনের ইতিহাস। দেবদেবীর ভজন-পূজন শেষ হয়ে গেছে। মদ খেয়ে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা ছুকরীদের নিয়ে বেলেল্লাপনা করবার সময় বহুদিন আগেই ভেঙে চুরমার করেছে। এখন আর আগরওয়াল 'জঙ্গল বার' নাইট ক্লাবে বসে ধেনো মদের মতো ফিলিপাইনের তালের রসে তৈরি 'তুবা' মদ খেতে খেতে গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে গল্প করে খুশি হয় না। শিকার যোগাড় করেই নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আনে।

তরুণের কাহিনিও ছড়িয়েছিল ফরেন সার্ভিসের সর্বস্তরে। মিসেস ট্যান্ডনও জানতেন ইন্দ্রাণী-হারা তরুণের দীর্ঘনিশ্বাসের কথা। তাই তো ইন্দ্রাণীর বিষয়ে প্রশ্ন করতেই তরুণের নীরবতা দেখে ভাবীজি বললেন, 'ঠিক হ্যায়। তোমার মতো ইনকম্পিটেন্ট ডিপ্লোম্যাটকে দিয়ে

কিছু হবে না। এবার আমিই দেখি কি করতে পারি।'

তরুণ কিছু না বলে বিদায় নিল।

এগারো

লন্ডনের মতো ভারতীয়দের ভিড় বা নিউইর্কের মতো ভি-আই-পি-র স্রোত নেই বার্লিনে। ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটদের কাছে এটা শুধু শান্তি নয়, স্বস্তিরও বটে। তবে বার্লিনে আছে ডেলিগেশনের অফুরন্ত ধারা। অতীত দিনের বাংলাদেশের মতো বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে এখানে। পলিটিশিয়ানের সংখ্যা সীমিত হলেও ডিগনিটারীর অভাব নেই। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট থেকে শুরু করে ফিল্ম-স্টার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পর্যন্ত।

ডেলিগেশন বে-সরকারি হলে ডিপ্লোম্যাটদের দায় থাকে, দায়িত্ব থাকে না। কর্তব্য থাকে না কিন্তু দুশ্চিন্তা থাকে। কন্সাল জেনারেল মিঃ ট্যান্ডন নিছক ভদ্রলোক। রিটায়ার করার মুখোমুখি কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চান না। তাছাড়া ফরেন অফিসের একজন প্রবীণ ডিপ্লোম্যাট বলে আলাপ আছে সারা দেশের সরকারি বে-সরকারি মানুষের সঙ্গে। সুতরাং ঝামেলার শেষ নেই।...

সেবার জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স ইন্ডিয়ান ডেলিগেশনের লিডার ছিলেন মাইশোরের লেবার ও ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার মিঃ ভীমাপ্পা। ভীমাপ্পাসাহেবের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। ভীমাপ্পাজনক ছিলেন মাইশোর মহারাজার ডেপুটি পলিটিক্যাল সেক্রেটারি। শৈশব, কৈশোরে দশেরার শোভাযাত্রায় হাতি চড়ে ঘুরেছেন 'গার্ডেন সিটি' মাইশোরের রাজপথ। প্রথম যৌবনের সোনালি দিনগুলিতে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘোরাঘুরি করেছেন রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে।

ভীমাপ্পাসাহেবের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের এই শেষ নয়, শুরু। পড়াশুনা করেছেন ব্যাঙ্গালোরের মিশনারী কলেজে, হৃদ্যতা হয়েছে ডজন ডজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন চমরাজ সাগর-লেকের ধারে। ছুটির দিনে ছোট মেল চড়ে দল বেঁধে গিয়েছেন নন্দী পাহাড়ে। কখনও বা শিবাসমুদ্রমে গিয়ে কাবেরীর জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

আরো কত কি করেছেন এই ভীমাপ্পাসাহেব। দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো সুর করে ইংরেজি ইনি বলেন না। অক্সোনিয়ন ইংলিশ না বললেও ইংরেজি বেশ বলেন।

আরো পরের কথা। এম-এল-এ হবার পর চুড়িদার শেরওয়ানী পরে ঘোরাঘুরি শুরু করলেন দিল্লির রাজনৈতিক মহলে। গোটা দুয়েক ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার প্যাসেঞ্জার হবার পর একদিন শুভক্ষণে মন্ত্রী। লেবার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার। অদৃষ্টের সিংহদ্বার খুলে গেল।

একবার নয়, দুবার নয়, সরকারি-বেসরকারি ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে বহুবার বহু কারণে গিয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশে। মিঃ ট্যান্ডনের সঙ্গে সেই সূত্রেই আলাপ। একবার একটা গুড উইল ডেলিগেশনে ওরা দুজনেই গিয়েছিলেন ইস্ট ইউরোপের কয়েকটি দেশে।

ভীমাপ্পা যে জেনেভায় ইন্ডিয়ান ডেলিগেশনের লিডার হয়ে গিয়েছেন, সে খবর পৌঁছেছিল বার্লিনে। কিছুদিন পরে ওঁর একটা চিঠিও এলো মিঃ ট্যান্ডনের কাছে।...'কি নিদারুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে, তা বোঝাতে পারব না। এত মতভেদ ও মতবিরোধ যে দেখা দেবে আমাদের ডেলিগেশনের মধ্যে, তা আগে ভাবতে পারিনি। যাই হোক কনফারেন্স শেষ হলে কয়েক

সপ্তাহের জন্য একটু ঘুরেফিরে বেড়াব। বার্লিনে নিশ্চয়ই যাব। কয়েকটা দিন একটু আনন্দ করা যাবে।'

সেদিন কনসুলেটে যেতেই মিঃ ট্যান্ডন তলব করলেন তরুণকে। বললেন, 'আই হোপ ইউ নো মিঃ ভীমাপ্পা? ওই যে মাইশোরের লেবার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার।'

তরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও ভীমাপ্পাসাহেবের কথা সে শুনেছে। বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি ওঁর কথা। তাছাড়া উনি তো আই-এল-ও কনফারেন্সে আমাদের ডেলিগেশনের লিডার।'

মিঃ ট্যান্ডন খুশি হয়ে বললেন, 'দ্যাটস্ রাইট। তুমি দেখছি কারুর কথাই ভুলে যাও না।'

হাসতে হাসতে তরুণ বলে, 'ভারতবর্ষের এসব স্মরণীয় ব্যক্তিদের ভুললে কি আর চাকরি করতে পারি?'

ট্যান্ডনও একটু না হেসে পারলেন না। 'তা তুমি ঠিকই বলেছ। স্মরণীয়ই বটে।'

একটু থেমে একটু মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি কিছু জান নাকি ওর সম্পর্কে?'

'বিশেষ কিছু না, তবে শুনেছি জলি গুড ফেলো।'

'ঠিক শুনেছ। যাই হোক, উনি আসছেন কয়েকদিনের জন্য। যদিও প্রাইভেট ভিজিটে আসছেন, তবুও মিনিস্টার তো, কিছু ব্যবস্থা কিছু দেখাশুনা করতেই হবে।'

পশ্চিমের অনেক দেশে ডিপ্লোম্যাটদের অনেক রকম টুকটাক সুবিধে দেওয়া যায়। ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কেনাকাটা করলে অনেক সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। ডিপ্লোম্যাটিক মিশন থেকে 'বুক' করলে বহু হোটেলেও চার্জ কম লাগে। ভীমাপ্পাসাহেবের মতো যাঁরা ঘন ঘন বিদেশে যান ও ইন্ডিয়ান মিশনের সঙ্গে খাতির আছে, তাঁদের হোটেলে বুকিং হয় ইন্ডিয়ান মিশনের মারফৎ। সুতরাং মিঃ ভীমাপ্পার জন্য 'হোটেল আম জু'তেই অ্যাকোমডেশন বুক করা হল। কনসুলেটের একটা গাড়িও রাখা হল মাঝে মাঝে ভীম্পাসাহেবকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করার জন্য। সরকারিভাবে নয়, বেসরকারিভাবে। দিনকাল বদলে যাচ্ছে। কোথা থেকে কিভাবে যে খবর বেরিয়ে যায় তার ঠিক নেই। এসব খবর অপোজিশন এম-পি-দের হাতে পড়লে রক্ষা নেই। সুতরাং আইন-কানুন বাঁচিয়েই গাড়ির ব্যবস্থা করা হল।

মিঃ ট্যান্ডন নিজেই এয়ারপোর্ট গেলেন ভীমাপ্পাসাহেবকে রিসিভ করতে। তবে এয়ারপোর্টে রিসিভ করার পর হোটেলে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিলেন কনসুলেটের একজন সাধারণ কর্মীকে।

এয়ার ফ্রান্সের প্লেন ঠিক সময়েই এল। কথামতো ভীমাপ্পা এলেন। পিছনে এলেন মিঃ শর্মা। হাসিমুখে মিঃ ট্যান্ডনের সঙ্গে করমর্দন করার পর ভীমাম্পাসাহেব বললেন, 'মীট মাই ফ্রেন্ড মিঃ শর্মা...'

স্বভাবসুলভ খুশি মনেই মিঃ ট্যান্ডন হ্যান্ডসেক করে বললেন, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিঃ শর্মা।'

এরপর ভীমাপ্পাসাহেব শর্মাজীর পরিচয় দিলেন।...'জানেন মিঃ ট্যান্ডন, শর্মাজী একজন ফেমাস ট্রেড ইউনিয়ন লিডার। এবার আমাদের ডেলিগেশনের একজন মেম্বারও ছিলেন! র‍্যাদার হি ওয়াজ দি মোস্ট অ্যাকটিভ মেম্বার অফ অল দেম।'

ভীমাপ্পা শর্মাজীর আরো অনেক গুণের কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ বকবক করা ভালো দেখায় না বলে মিঃ ট্যান্ডন বললেন, 'কয়েক দিন থাকছেন তো? পরে ভালোভাবে কথাবার্তা বলা যাবে।'

'মিঃ ভীমাপ্পার সঙ্গেই আবার চলে যাব।'

'আপনি কোথায় থাকছেন?'

ভীমাপ্পাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'একসঙ্গে এসেছি একসঙ্গেই থাকব।'

ট্যান্ডন সাহেব চিন্তিত না হয়ে পারলেন না। 'এক্সকিউজ মী মিঃ ভীমাপ্পা, আপনি কি ওর বিষয়ে কিছু জানিয়েছিলেন?'

'না, তবে যেভাবেই হোক ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।'

কথাটা শুনে মনে মনে ট্যান্ডন বিরক্ত বোধ করলেন। হরিদ্বার-লছমনঝোলা বা কাশী-গয়ার ধর্মশালায় এক ঘরে পাঁচ-দশজনকে থাকতে দিতে পারে কিন্তু বার্লিনে যে তা সম্ভব নয়, ভীমাপ্পা ভালোভাবেই জানেন। একটু খবর দিলেই সবকিছু ব্যবস্থা ঠিক থাকত। কিন্তু অধিকাংশই ভীমাপ্পার দলে। কেউ সোমবার বলে মঙ্গলবার, সকাল বলে বিকেলে আসেন ; আবার কখনও তিনজন বলে একজন অথবা একজন বলে তিনজন।

এই তো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইন্ডিয়ান ডেলিগেশন নিয়ে কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। দুটি ফিচার ফিল্ম, একটি ডকুমেন্টারী ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল এনট্রি ছিল। এইসব ফিল্মর প্রডিউসার, ডিরেক্টার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দলে এগারোজন থাকার কথা। এ ছাড়া ফেস্টিভ্যাল কমিটি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতীয় ফিল্ম দুনিয়ার চারজনকে। এরা সবাই আসবেন বলে কলকাতা, দিল্লি, বোম্বে থেকে চিঠি এল। চিঠি পাবার পর হোটেল বুক করা হল।

আবার চিঠি এল, টেলিগ্রাম এল। কেউ জানালেন সোমবার আসছেন, কেউ জানালেন মঙ্গলবার আসছেন, কেউ সকালে, কেউ বিকেলে।

চিঠি আসা বন্ধ হল, শুরু হল টেলিগ্রাম আসা। 'ফরেন একচেঞ্জ নট ইয়েট স্যাংশানড্। ডিপারচার ডিলেড'—বলে জানালেন কলকাতা থেকে মিঃ গুপ্ত। ফেস্টিভ্যাল কমিটির আমন্ত্রণে যে চারজনের আসার কথা তাঁদের দুজন বোধহয় ধার-দেনা করেও প্লেন ভাড়া জোগাড় করতে পারেননি, তাই শেষ মুহূর্তে দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন! 'সরি, ক্যান্ট অ্যাটেন্ড, সিরিয়াসলি ইল' বলে জানালেন কলকাতার এক বিখ্যাত ফিল্ম জার্নালিস্ট। বোম্বের ভদ্রলোক হিন্দী ফিল্মের মতো টেলিগ্রাম করে জানালেন, 'এয়ারপোর্টে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সুতরাং 'সরি, ভেরী সরি। সামনের বছর নিশ্চয়ই আসব।'

আরো কত টেলিগ্রাম এল। বোম্বের প্রডিউসার ভোঁসলে জানালেন, নায়িকা কুমারী সুন্দরীকে নিয়ে বুধবার আসছি। নায়ক দুর্লভকুমার রিচিং থার্সডে। কিন্তু কখন? বার্লিনে কি একটাই ফ্লাইট? একদিনে তিনটি টেলিগ্রাম এল কলকাতা থেকে। কোনোটাতেই স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই।

কি বিভ্রাটেই না কনসুলেটকে পড়তে হয়েছিল। ফেস্টিভ্যাল কমিটি থেকে বার বার করে ফোন আসে কন্সাল জেনারেলের কাছে। অথচ তিনি কিছুই বলতে পারেন না। বলবেন কী? নিজেদের সরকারের অকর্মণ্যতার কথা বাইরে বলা যায়, বলা যায় না, বিশ্বের সব চাইতে অস্পষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষগুলিই ফরেন একস্চেঞ্জ ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করেন।

শেষ পর্যন্ত তিন দিন ধরে চারটে আলাদা আলাদা ফ্লাইটে এলেন সাতজন। হোটেলে পৌঁছে প্রডিউসার ভোঁসলে অবাক হলেন সিঙ্গল রুম অ্যাকোমোডেশন দেখে। প্রথমে অনুরোধ, পরে দাবি জানালেন ডবল রুমের জন্য। ইউরোপের নানাদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন বার্লিন ফেস্টিভ্যাল দেখতে। তিল ধারণের জায়গা নেই কোনো হোটেলে। হোটেল কর্তৃপক্ষ অক্ষমতা জানালেন। ভোঁসলে সাহেব ক্ষেপে লাল!

মুখে বললেন না, তবে বেশ স্পষ্টভাবেই কন্সাল জেনারেলকে বুঝিয়ে দিলেন, 'আপনাদের মতো সত্যমেব জয়তের তিলক পরে আমাকে গোলামি করতে হয় না। হাজার হাজার টাকা

খরচা করে হিরোইনকে নিয়ে এসেছি শুধু ফিল্ম জার্নালে দুচারটে ছবি ছাপাবার জন্য নয়, নিজের প্রয়োজনে।'

মিঃ ট্যান্ডনের মতো লোকও আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, 'মিঃ ভোঁসলে, আপনাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক ভদ্রতা, সৌজন্যের খাতিরে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। দ্যাটস অল রাইট।'

দেশের সুনাম বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তো নয়, নিছক রক্তমাংসের দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যেই কোনো অনারেবল ডেলিগেটের আগমন হয়। কিন্তু তাহলে কি হয়! ইন্ডিয়ান মিশনের জ্বালাতনের শেষ নেই।

ভীমাপ্পাসাহেব একজন মন্ত্রী ও ইন্ডিয়ার ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করেছেন! দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে তাঁকে অপবাদ দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও তিনি শর্মাজীকে আনার আগে একটা খবর দেওয়া কর্তব্য মনে করেননি।

মিঃ ট্যান্ডন মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, চলে যান হোটেলে। আই হোপ দে উইল ম্যানেজ সামহাউ।'

পরের দুদিন ভীমাপ্পা ও শর্মাজীর টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। তিন দিনের দিন দুপুরের দিকে কনসুলেটে হাজির হয়ে ট্যান্ডনকে অনুরোধ করলেন, 'আমি আর শর্মাজী কিছু কেনাকাটা করব। মিঃ সেনগুপ্ত যদি একটু কাইন্ডলি হেল্‌প করেন...?'

লন্ডনে গিয়ে ভিড়ে ভর্তি 'পাবে' গিয়ে এক জাগ বিয়ার না খেলে বিলেত যাওয়া বৃথা। প্যারিসে গিয়ে নাইট ক্লাবে যেতে হয় আর পারফিউম কিনতে হয়। রোমে গিয়ে ক্যাসিনো। তেমনি বার্লিনে গিয়ে নাইট ক্লাবে রাত কাটাতে হয়, সস্তায় ক্যামেরা কিনতে হয়। এসব নিয়ম পালন না করলে ইন্ডিয়ান ভি-আই-পি-দের ধর্মরক্ষা হয় না।

ভীমাপ্পা নিজেই বললেন, 'ইউ সি মিঃ ট্যান্ডন, লাস্ট দুটো নাইট রেসিতে বেশ কেটেছে।'

'রেসি?'

'হ্যাঁ, বলহাউস রেসি। বার্লিনের পৃথিবীখ্যাত নাইট ক্লাব। ডান্সিং ফ্লোরের চারপাশে ছোট ছোট কেবিন। প্রত্যেক টেবিলে আছে টেলিফোন ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে চিঠি আদান-প্রদানের অপূর্ব ব্যবস্থা। খোলামেলা কেবিনে বসে দেখে নিন কে কোথায় বসেছে। টেবিলের উপর রাখা ম্যাপ দেখে জেনে নিন অন্যের টেবিল নম্বর। তারপর চিঠি লিখুন, দূর থেকে আপনাকে বেশ লাগছে। যদি আপত্তি না করেন তাহলে এই ভারতীয় আপনার সঙ্গে একটু নাচতে চান।

ইলেকট্রনিক্সের কৃপায় মুহূর্তের মধ্যে সে চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক অভীষ্ট স্থানে। উত্তর আসবে, 'এই শ্যাম্পেনটুকু শেষ করার ধৈর্য ধরতে পারলে বার্লিনে ভ্রমণরতা ও হ্যামবুর্গবাসিনী কৃতার্থ হবে।'

'জার্মান মেয়েদের সম্পর্কে আমার অত্যন্ত উঁচু ধারণা ছিল, কিন্তু সামান্য এক গেলাস শ্যাম্পেনের প্রতি আপনার দুর্বলতা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারছি না।'

'মাই ডিয়ার জেন্টলম্যান, কি করব বলুন?' শুধু নাচতেই নেমন্তন্ন করলেন। শ্যাম্পেনের অফার তো পেলাম না।'

ভীমাপ্পাসাহেব নিশ্চয়ই ভাবলেন, বিদেশ বিভুঁইতে তোমার মতো ডাগর-ডোগর জার্মান বান্ধবী পেলে এক গেলাস কেন, বোতল বোতল শ্যাম্পেন দিতে পারি।

যাই হোক উত্তর গেল, 'ইউ আর ওয়েলকাম টু ডান্স-অ্যান্ড ড্রিংক।'

এমনি করে খেলা চলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শ্যাম্পেন খেয়ে নাচতে নাচতে মদির হয়ে অনেকে

দেখতে বসেন রেসি ওয়াটার শো। সে আর এক অপূর্ব দৃশ্য। প্রতি মিনিটে ন'হাজার জেট আট হাজার লিটার জল ছড়াচ্ছে এক লক্ষ আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে।

রেসির গল্প করতে করতে আনন্দে, খুশিতে ভীমাপ্পাসাহেবের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'জানেন মিঃ ট্যান্ডন, রেসিতে গেলে ভুলে যেতে হয় এই মাটির পৃথিবীর কথা।'

ভীমাপ্পাসাহেব এত আগ্রহ করে সব বলেছিলেন যে মিঃ ট্যান্ডন তাঁকে একেবারে দমিয়ে দিতে পারলেন না।–'এরা আনন্দ করতে জানে।'

এবার ভীমাপ্পাসাহেব লিডারের মতো কথা বলতে শুরু করলেন, 'যে জাত আনন্দ করতে জানে না, সে পরিশ্রম করতেও জানে না। কাজ করতে হলে আনন্দ করার, ফুর্তি করার স্কোপ চাই। কিন্তু ইন্ডিয়াতে কোথায় সেই আনন্দ করার স্কোপ?'

'দ্যাটস রাইট মিঃ ভীমাপ্পা।'

মিঃ ট্যান্ডন প্রবীণ হলেও ফরেন সার্ভিসের লোক। খুব বেশি না বুঝলেও একটু বুঝলেন, রেসিতে নাচতে নাচতে মিঃ ভীমাপ্পা কোনো শিকার ধরেছিলেন নিশ্চয়ই।

শর্মাজী এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। রেসির স্মৃতি মনের মধ্যে টগবগ করে ফুটছিল। আর সামলাতে পারলেন না, 'ডু ইউ নো মিঃ ট্যান্ডন, ওই যে মেয়েটি–মিস রিটারের সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে কিছু কিছু জার্মান কথাও শিখেছি।'

মিঃ ট্যান্ডন ইংরেজিতে ধন্যবাদ না জানিয়ে বললেন, 'ডাংকেসন!'

শর্মাজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বিটুসেন।'

ভীমাপ্পা আবার কেনাকাটার কথা শুরু করলেন, 'টুমরো উই আর ফ্রি। তারপর কিছু ইন্ডাস্ট্রি দেখব। দু একটা পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা আছে। ওরা হয়তো কোলাবরেশন করে মাইশোরে কিছু স্টার্ট করতে পারে।'

'অর্থাৎ আগামী কালই শপিং করতে চান?' ট্যান্ডন জানতে চাইলেন।

'দ্যাট উড বি ফাইন।'

ট্যান্ডন সাহেব তরুণ সেনগুপ্তকে ভালোভাবেই জানেন। এক বোতল বিয়ার বা একটা ডিনারের লোভে সে ইন্ডিয়ান ভি-আই-পি-দের ল্যাংবোট করে ঘুরতে আদৌ পছন্দ করে না। তাছাড়া নিজের নামে কিনে ভীমাপ্পাকে দিতে তার আপত্তি থাকবেই। অথচ–।

অথচ আবার কি? ফরেন সার্ভিসে এসব হজম করতেই হয়। কতজনের মেয়ের বিয়ের সময় হাজার হাজার টাকার মালপত্র কিনে ডিপ্লোম্যাট বা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ মারফত পাঠাতে হয়।

'কি কি কিনতে চান তার একটা লিস্ট আর সেগুলোর দাম রেখে যান। আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ।' ট্যান্ডন সাহেব আর কি বলবেন!

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে পকেট থেকে ক্যাটলগ, প্রাইস লিস্ট বের করলেন। দুজনে মিলে কত আলোচনা-সমালোচনার পর একটা লম্বা লিস্ট তৈরি করলেন।

'আই অ্যাম আফ্রেড, এতগুলো কেনা সম্ভব হবে না।'

শর্মাজী বললেন, 'আমরা তো রোজ আসব না। আর তাছাড়া ভীমাপ্পার ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট আছে। বোম্বে বা দিল্লিতে কাস্টমসের ঝামেলা থাকবে না। তাই...।'

'কিন্তু আপনার মতো অনেকেই তো আসছেন।'

ভীমাপ্পা অত্যন্ত বিবেচকের মতো বললেন, 'ঠিক আছে। লিস্ট রেখে গেলাম, যা পারেন

তাই কিনবেন।'

ভি-আই-পি-দ্বয় বিদায় নিলেন। ট্যান্ডন সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন তরুণকে।

তরুণ ঘরে ঢুকতেই ওই লিস্ট আর এক বান্ডিল দ্যবেস্তা মার্ক এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার পুরস্কার দেখেছ?'

তরুণ হাসতে হাসতে বলল, 'উনি যে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার! তাই তো দেশের কিছুই ওঁর পছন্দ হবে না। ইমপোর্টেড জিনিসে ঘর ভর্তি না থাকলে কি ওঁদের প্রেস্টিজ থাকে?'

একটু থেমে তরুণ আবার বলে, 'মাঝে মাঝে মনে হয় ট্রানজিস্টার টেরিলিন ক্যামেরা হুইস্কীর জন্য ইংরেজ যদি কিছু ব্যয় করত, তবে বোধহয় ওরা আবার ভারতবর্ষে রাজত্ব করতে পারত।'

ট্যান্ডন সাহেব বললেন, 'বোধহয় তোমার কথাই সত্যি।'

বারো

এরপর ভীমাপ্পাসাহেব যেদিন কনসুলেটে এলেন, সেদিন আর শর্মাজীকে দেখা গেল না। ট্যান্ডন সাহেব একটু বিস্মিত হলেন। দীর্ঘদিন ফরেন সার্ভিসে কাজ করে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে একটু চালু মন্ত্রীরা ঠিক একলা দেশভ্রমণ পছন্দ করেন না।

কারণ?

কারণ একটা নয়, একাধিক। তবে শুধু উমেদারি, তাঁবেদারি বা খিদমতগারির জন্য নয়, নিজেদের রসনা আর বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য।

নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পক্ষে বেহিসেবী হওয়া যায় না। মোটা খদ্দরের তলায় মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে বাধ্য হয়ে চাপা রাখতে হয়। এত পরিচিত সমাজে খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করা অসম্ভব। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিধানসভা-লোকসভায় 'মে আই নো স্যার' বলে না জানি কে প্রশ্ন করবেন। এরপর লোক্যাল কাগজের রিপোর্টারগুলো তো আছেই।

বিহারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী দিব্যেন্দুবিকাশ চৌধুরি মিঃ ট্যান্ডনকে এবার বলেছিলেন, 'আচ্ছা বলুন তো মিঃ ট্যান্ডন, মন্ত্রী হয়েছি বলে কি আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ নই?'

সহানুভূতি জানিয়ে মিঃ ট্যান্ডন বলেছিলেন, 'তা তো বটেই!'

'কলেজের ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে ঘুরতে পারে, অধ্যাপকরা ছাত্রীদের আদর করতে পারেন চাকুরিয়া সহকর্মী মেয়েদের নিয়ে ডায়মন্ডহারবার বা পুরী যেতে পারেন, মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিসার ইয়ং মেয়ে স্টেনোদের নিয়ে মুসৌরী-নৈনীতাল কনফারেন্স বা সেমিনারে যেতে পারেন...।'

ঝড়ের বেগে দিব্যেন্দুবিকাশের দুঃখের ইতিহাস বেরিয়ে আসে।

বেইরুটের ইন্ডিয়ান এম্বাসীর চান্সেরী বিল্ডিং-এর তিনতলায় ওই কোণার ঘরে বসেই মিঃ ট্যান্ডন ভূমধ্যসাগরের মাতাল হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করেন। জানালা দিয়ে একবার বাইরের আকাশটা দেখেন। তারপর সান্ত্বনা দিয়ে মাঝপথে মন্তব্য করলেন, 'আমি আপনার কথা কোয়াইট রিয়ালাইজ করি।'

একটু আস্তে হলেও উত্তেজনায় টেবিল না চাপড়ে পারলেন না দিব্যেন্দু-বিকাশ। 'রিয়ালাইজ কেন, অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আমার কথা—কারণ দেয়ার ইজ লজিক ইন মাই আর্গুমেন্ট।'

'দ্যাটস রাইট।'

ছোটখাটো মন্ত্রীরা ছোটখাটো শিকার ধরেন। কেউ শপিং করে দেয়, কেউ ট্যাকসির বিল মেটায় আর কেউ বা বেইরুটের পৃথিবী খ্যাত নাইট ক্লাব 'কিটক্যাটে' নিয়ে যায়।

বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা চুনোপুঁটি শিকার করেন না।...

একজন অতি সাধারণ বিদেশযাত্রীর মতো অশোক আগরওয়ালা নামে এক ভদ্রলোক দমদম থেকে কোয়ান্টাস ফ্লাইটে ইউরোপ গেলেন। বাইরের দুনিয়ার কেউ জানল না, খেয়াল করল না। পরিচিতরা জানল, দুর্গাপুরের এক কারখানার কোলাবরেশনের জন্য অশোকবাবু 'বিলাইত' গেলেন।

কোলাবরেশনের মকরধ্বজ খেয়ে ভারতবাসীরা স্বর্গে যাবে বলে যেসব দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের ধারণা, তাঁরা অশোকবাবুর পকেট ভর্তি করে ফরেন এক্সচেঞ্জ দিয়েছেন। এছাড়া—

এছাড়া আবার কি?

এছাড়া এ-বি-সি অ্যান্ড একস-ওয়াই-জেড ইন্টারন্যাশনাল কনসট্রাকশন কোম্পানির ওভারসিজ ম্যানেজারের অ্যাকাউন্টে তো মাসে মাসে পাঁচশো ডলার জমছে।

তার মানে?

অশোক আগরওয়ালা আর তাঁর বন্ধুরা হয়তো ভাবেন কেউ কিছু বোঝে না। ট্যান্ডন সাহেব মনে মনে হাসতেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বলা হল, ওভারসীজ ম্যানেজারকে মাইনে দশ হাজার টাকা প্লাস কার অ্যালাউন্স প্লাস অফিস অ্যালাউন্স প্লাস এন্টারটেনমেন্ট অ্যালাউন্স প্লাস...। ওভারসিজ ম্যানেজারকে বলা আছে, শ্রীমানজী! মাসে মাসে পাঁচশো ডলার ব্যাঙ্কে জমা রাখবে। কর্তাব্যক্তিরা বা তাঁদের বন্ধু-বান্ধব-হিতাকাঙ্ক্ষীরা এলেই ওই ডলার খরচ হবে।

সুতরাং পকেট ভর্তি ভরেন এক্সচেঞ্জ ছাড়াও অশোকবাবুর আরো কিছু সম্ভব ছিল। একমাস ধরে ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে 'বন্ধুদের' সেবার জন্য ফুলপ্রুপ ব্যবস্থা করলেন অশোকবাবু।

এক মাস পরে 'বন্ধুবর' যেদিন ভারতের কোনো এয়ারপোর্ট থেকে বি-ও-এ-সি প্লেনে চাপলেন, সেদিন লোকে-লোকারণ্য। যেদিন ফিরে এলেন সেদিনও শত-সহস্র মানুষের ভিড়। কেউ জানল না কার নিঃস্বার্থ সেবায় তাঁর যাত্রা সফল হল।

ট্যান্ডন সাহেব এসব জানেন, বোঝেন। ছোটখাটো সেবা-যত্ন পাবার লোভেই যে ভীমাপ্পাসাহেব শর্মাজীকে সঙ্গে রেখেছিলেন, তাও তিনি জানেন। আর জানেন যে, শর্মাজীও লিডার। কাঁচা লোক নন। একেবারে ফিনিশড প্রডাক্ট। সুতরাং তিনিও তাঁর ওই টিটাগড়ের কারখানার ইংরেজ জেনারেল ম্যানেজার মারফত বিধি-ব্যবস্থা করেছেন ইউরোপ দর্শনের সুব্যবস্থার জন্যে। শ্রমিক-কল্যাণের জন্য বিদেশি মিল-মালিকের দল যে ইউরোপ ভ্রমণকারী কোনো কোনো লিডারের সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করেন, তা শুধু মিঃ ট্যান্ডন নয়, সব ডিপ্লোম্যাটরাই জানেন।

তবুও মিঃ ট্যান্ডন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড টু মিস্টার শর্মা? ওকে আজ দেখছি না যে?'

'আর বলবেন না! আমাদের কোনো কোনো লিডার এমন করাপটেড আর হোপলেস যে কি বলব? ওঁর গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ব্রাউন অ্যাকসিডেন্টালি বার্লিনে এসেছিলেন। মার্টিনী খেতে খেতে একটু নিভৃতে দু-একটা ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য কয়েক দিন...।'

মিঃ ট্যান্ডন বাধা দিয়ে বললেন, 'না-না, আমি অত কিছু জানতে চাইনি। লেট হিম মাইন্ড হিজ ওন বিজনেস!'

'ইন এনি কেস্' ভীমাপ্পাসাহেব এবার কাজের কথায় আসেন, ওই ক্যামেরা আর বাইনোকুলারটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে দিল্লি পাঠাতে হবে।'

শর্মাজী অসৎ, কিন্তু ভীমাপ্পা সৎ। সৎ হয়েও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে, মাল পাচার করার অনুরোধ করতে দ্বিধা হয় না।

কূটনৈতিক জগতের এক আশ্চর্য আবিষ্কার হচ্ছে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। কূটনৈতিক মিশনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি হচ্ছে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। ওয়াশিংটনের সি-আই-এ দপ্তর থেকে মস্কোর আমেরিকান এম্বাসী মারফত এজেন্টদের কাছে যে গোপন সংকেত ও নির্দেশ যায়, তা থাকে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। আমেরিকান এম্বাসী থেকে যে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ওয়াশিংটনে যায়, তাতে থাকে রাশিয়ার অনেক গুপ্ত খবর। সারা দুনিয়া থেকে ক্রেমলিনে যেসব ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ আসে, তাতেও ভর্তি থাকে অনেক রহস্য।

এই লেনদেনের কাহিনি সবাই জানে, সবাই বোঝে। তবে কেউ বাধা দেয় না। শান্তির সময় ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের যাতায়াতে বাধা দেবার নিয়ম নেই, প্রথা নেই।

সাধারণত নিজের নিজের দেশের এয়ার লাইন্স এই ব্যাগ আনা-নেওয়া করে। ব্রিটিশ ফরেন অফিস বা ব্রিটিশ এম্বাসী প্যান অ্যামেরিকান বা এয়ার ফ্রান্সেও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ পাঠাবে না। এয়ার ক্র্যাফটের কম্যান্ডারের ব্যক্তিগত হেপাজতে এক ব্যাগ থাকে। কোনো দেশের গোয়েন্দা, পুলিশ বা কাস্টমস-এর স্পর্শ করার অধিকার নেই।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যে শুধু গোপন তথ্য যায় তা নয়। মিশনের নিত্য-নৈমিত্তিক চিঠিপত্র ও টুকিটাকি অনেক কিছু যায়। জরুরী প্রয়োজনে ডিপ্লোম্যাটদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও পাঠান হয়।

সে যাই হোক, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের রাজনৈতিক মূল্যের তুলনা নেই। প্রয়োজনের শেষ নেই। তাই তো বহু দেশ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে দুএকজন ডিপ্লোম্যাটকেও পাঠায়।

ভারতবর্ষের অত ফালতু পয়সা নেই। তাছাড়া দুনিয়ার গোপন খবর লুঠপাট করে নেবার প্রয়োজনও তার নেই। তবুও তো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। ফরেন মিনিস্ট্রির অনেক গোপন খবর ও চিঠিপত্র তাতে থাকে।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ এম্বাসি থেকেই যাতায়াত করে, কনসুলেট থেকে নয়। এই ব্যাগে কিছু পাঠাতে হলে কনসুলেট থেকে এম্বাসীতে পাঠাতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে তার স্থান হবে।

বার্লিন থেকে কোনও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ সোজা দিল্লি যায় না। প্রথমে সব কিছুই বন-এ ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে যাবে। তারপর সেখান থেকে নির্দিষ্ট দিনে ফ্রাঙ্কফুর্ট গিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লিগামী প্লেনের কম্যান্ডারের হাতে তুলে দেওয়া হবে সেই অমূল্য ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ।

আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে শুধু যে জরুরি নথিপত্র যায়, তা নয়। প্যারিস-ডিপ্লোম্যাটদের জন্য ধনে-জিরে-শুকনো লঙ্কাও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যেতে পারে। আবার দিল্লিগামী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে জয়েন্ট সেক্রেটারির মেয়ের বিয়ের জন্য সুইস ঘড়ি বা জামাতা বাবাজীর স্কটিশ টুইডের স্যুট যায় কিনা বলা শক্ত। আরো অনেক কিছু যেতে পারে।

তবুও অপরের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য নিজে সেই কাজ করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

'একসকিউজ মী, মিঃ ভীমাপ্পা, আমাদের এখান থেকে তো কোনো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ দিল্লি যায় না।'

'ঠিক আছে, বন-এ এম্বাসীতে পাঠিয়ে দিন। ওরা ওখান থেকে আপনাদের হয়েই সেক্রেটারি মিঃ নানজাপ্পার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাহলেই–।'

'বাট স্যার, আমরা তো কোনো ব্যাগ বন-এ পাঠাই না। আপনি বরং ফেরার পথে বন-এ এম্বাসীতে দিয়ে দেবেন।'

এর আগে কোনো কনসুলেটে তরুণের পোস্টিং হয়নি। দিল্লির ফরেন মিনিস্ট্রি ছাড়া বিভিন্ন এম্বাসিতে কাজ করেছে। বার্লিন আসার আগে ইউনাইটেড নেশনশ-এ ছিল। তাই তো ভেবেছিল কনসুলেটে এসে ঝামেলা অনেক কমবে, কিন্তু ভীমাপ্পার মতো নিত্য নতুন ভূতের উপদ্রবে যে জীবন অতীষ্ঠ হবে ভাবতে পারেনি।

ভীমাপ্পাকে কোনোমতে বিদায় করার পর মিঃ ট্যান্ডনও বললেন, 'জানো তরুণ, ভেবেছিলাম রিটায়ার করার আগে একটু শান্তিতে দিন কাটাব, কিন্তু এদের উপদ্রবে তাও হলো না।'

একটু থেমে ট্যান্ডন সাহেব আবার বললেন, 'সারা জীবন কোনো না কোনো অফিসার বা অ্যাম্বাসেডরের আন্ডারে কাজ করেছি। তাঁদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই তো বার্লিনে ইন্ডিপেনডেন্ট চার্জ নিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আগেই ভালো ছিলাম।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন বার্লিনের ইন্ডিয়ান কন্সাল জেনারেল মিঃ ট্যান্ডন।

এবার তরুণ বলে, 'আপনি তো সামনের সপ্তাহে কনসালটেশনের জন্য বন যাচ্ছেন, তখন আমার কি দুর্গতি হবে বলুন তো?'

মিঃ ট্যান্ডন হাসতে হাসতে বললেন, 'নার্ভাস হবার তো কিছু নেই! নেক্সট উইকে তো ডান্সার প্রীতিকুমারী ছাড়া কোনো পলিটিশিয়ান আসছেন বলে শুনিনি। সো ইউ উইল হ্যাভ এ প্লেজান্ট টাইম, আই হোপ।'

'হোপ' তো অনেকেই অনেক কিছু করেন কিন্তু বাস্তব যে সম্পূর্ণ আলাদা।

আমাদের 'পিসফুল কো-একজিসটেন্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি কো-অপারেশন' বিদেশে যত বেশি অচল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ডান্স আর বাজনা তত বেশি পপুলার হচ্ছে বলে শোনা যায়। ইন্ডিয়ান খবরের কাগজগুলো পড়লে মনে হয় আমাদের বাজনা আর ডান্সের ঠেলায় হলিউডে ফিল্ম তৈরি বন্ধ হয়েছে, প্যারিসের নাইট ক্লাবে খদ্দের হচ্ছে না।

ওস্তাদ সাহেবের দল সাকসেসফুল ফরেন ট্যুরের পর খুশিতে ডগমগ হয়ে বেনারসী পান-জর্দা চিবুতে চিবুতে প্রেস কনফারেন্সে বলেন, 'বাজনা? আহাহা, ওরা কি ভালোই বাসে! হল প্যাকড! অটোগ্রাফ দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়।'

কোনো সাংবাদিক অবশ্য প্রশ্ন করেন না, কত ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন? তাহলেই ঝোলা থেকে বেড়াল ছানা বেরিয়ে পড়ত!

এই প্রেস কনফারেন্সের পর কলকাতার মিউজিক কনফারেন্সগুলোতে ওস্তাদ সাহেবের রেট শেয়ার বাজারের ফাটকাকে হার মানিয়ে চড় চড় করে বাড়ে।

সুন্দরী যুবতী ডান্সারদের পয়সা খরচা করে প্রেস কনফারেন্স করতে হয় না। রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানরাই সুন্দরীদের দোরগোড়ায় ভিড় করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্না দেবার পর মুহূর্তের জন্য সেই অমৃতলোকবাসিনী সুন্দরী দর্শনে তাঁরা ধন্য হন। আর কাগজে ছাপা মিস পদ্মাবতীর নাচ দেখার জন্য প্যারিসে ট্রাফিক জ্যাম হয়, রাশিয়ায় বলশয় থিয়েটারের টিকিট বিক্রি হয় না।

আর রোমে?

পাগল ইতালীয়নরা এয়ারপোর্টে এমন ভিড় করেছিল যে চারটে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিলেড হয়ে যায়।

'ভালো কথা। অনেক দেশের ফিল্ম প্রডিউসার ডাইরেকটাররা আমাকে তাঁদের ফিল্মে নাচতে ইনভাইট করেছেন।'

ব্যস! রেসের মাঠে ট্রিপল টোট! চার লাখ কালো, এক লাখ সাদা দিয়েও প্রডিউসার পদ্মাবতীর কনট্রাকট পান না!

লেক মার্কেটের পটলদা বা দর্জিপাড়ার বিধুবাবু এসব কাহিনি বিশ্বাস করলেও তরুণের মতো ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরা শুনলে হাসি চাপতে পারে না। নেক্সট উইকে প্রীতিকুমারীর আগমনবার্তা শুনে তাই তো তরুণ খুব বেশি সুখী হতে পারল না।

তাছাড়া তরুণ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কিছু কিছু ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট আছেন যাঁরা প্রীতিকুমারীর মতো ডান্সারদের সেবা করে ধন্যবোধ করেন। প্রোগ্রামের শেষে হোটেলের নিভৃত কক্ষে দুচার রাউন্ড ড্রিংক করার পর এদের ভাগ্যে কখনও কখনও উপরি পাওনাও জুটে যায়। তরুণদের সহকর্মী সাবারওয়াল এমনি এক নৃত্যপটীয়সীর সেবা করে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি করে তাড়াহুড়ো করে অফিস যাবার সময় লেডিস জুতো পরে এম্বাসী গিয়েছিলেন, সে কথা ফরেন সার্ভিসের কে না জানে?

তরুণ এসব উপরি পাওনার স্বপ্ন কোনোদিন দেখেনি জীবনে। শুধু একজনেরই স্বপ্ন দেখেছে সে সারাজীবন ধরে। মনের সমস্ত সত্তা দিয়ে, মাধুরী দিয়ে যাকে সে ভালোবেসেছে, সেই ইন্দ্রাণী ছাড়া আর কোনো নারীর স্থান নেই তরুণের জীবনে।

জীবনের ধূসর মরু-প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে বন্দনার কাছে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত পেয়েছিল তরুণ। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল বার্লিনে। মনসুর আলির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য করাচিতে সেকেন্ড সেক্রেটারি বড়ুয়াকে চিঠি দিয়েছিল। বড়ুয়া ছুটিতে থাকায় উত্তর এসেছে মাত্র কদিন আগে। পাকিস্তান সরকারের কোনো অফিসারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে বড়ুয়া জানিয়েছে। বড়ুয়া লিখেছে, আমার ক্ষতির চাইতে মিঃ আলির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। কারণ পাকিস্তান সরকার ভাবতে পারে ওর সঙ্গে আমাদের কোনো গোপন সম্পর্ক আছে। করাচির আবহাওয়া বড়ই খারাপ। সেজন্য মিনিস্ট্রির লেভেলেই যোগাযোগ হওয়া ভালো।

বড়ুয়া চিঠির শেষে লিখেছে, আমাদের মিনিস্ট্রি থেকে পাকিস্তান ফরেন মিনিস্ট্রিতে চিঠি এলে কাজের অনেক সুবিধে হবে। প্রথম কথা হাই-কমিশনও সরকারিভাবে তদ্বির করতে পারবে। তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা, এখন এখানে যিনি ইন্ডিয়া ডেস্কের এসব দেখাশুনা করেন, তিনি পূর্ব বাংলারই একজন মুসলমান। খুব সম্ভব ঢাকারই লোক। প্রায়ই ঢাকা যান। আমার স্থির বিশ্বাস উনি নিশ্চয়ই খুব সাহায্য করবেন।

কটা দিন এমন বিশ্রী ঝামেলার মধ্যে কাটছে যে তরুণ মিনিস্ট্রিতে একটা ফর্ম্যাল কমিউনিকেশন পাঠাতে পারল না। ট্যান্ডন সাহেবের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই সময় পাবে না।

তরুণ বলল, 'ওসব ডান্সারের চিন্তা পরে করা যাবে। আপনি কনসালটেশনের জন্য বন-এ যাবার আগে আমার ওই চিঠির ড্রাফটটা দেখে ফাইনাল করে দেবেন, অ্যান্ড ইউ শুড সী দ্যাট ইট ইজ ইমিডিয়েটলি ডেসপ্যাচড টু ফরেন অফিস।'

মিঃ ট্যান্ডন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন, 'সার্টেনলি।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'বেটার ডু ওয়ান থিং। তুমি আজ রাত্রে আমার ওখানে চলে এসো। ডিনারের পর দুজনে বসে ফাইনাল করে ফেলব।'

তরুণ হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি জানেন না আমি আজ রাত্রিরে আসছি?'

'তার মানে?'

'তার মানে আজ ভাবীজি আমার জন্য কিছু স্পেশ্যাল ডিস...।'

মিঃ ট্যান্ডন হাসতে হাসতে বলেন, 'ডিপ্লোম্যাট হয়ে রিটায়ার করার সময়ও ডিপ্লোম্যাসিতে তোমাদের কাছে হেরে যাচ্ছি!'

তের

শুক্রবার অফিসে গিয়েই তরুণ খবর পেল, ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বার করবার জন্য ফরেন মিনিস্ট্রি যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

খবর পাঠিয়েছেন 'বন' এম্বাসী থেকে ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ কাপুর।

মেসেজটা পেয়ে খুশিতে ভরে গেল সারা মন। বার বার পড়ল কেবল্‌গ্রামটা। 'ফরেন অ্যাসিওরড এভরি পসিবল্ অ্যাকশান, ট্রেস ইন্দ্রাণী।'

বুঝতে অসুবিধা হলো না, মিঃ ট্যান্ডনের জন্যই এত চটপট বন থেকে আর্জেন্ট মেসেজ গেছে দিল্লিতে। অ্যাম্বাসেডরও নিশ্চয়ই বেশ ভালো করে লিখেছিলেন। তা নয়তো এত চটপট উত্তর?

ফরেন মিনিস্ট্রির অনেক অসুবিধে। সারা দুনিয়ায় 'পঞ্চশীল' প্রচার করতে অনেকের দ্বিধা থাকলেও সহকর্মীদের এসব সাহায্য সহযোগিতা করতে কারুর দ্বিধা নেই। বরং আগ্রহই বেশি।

পাকিস্তান এক বিচিত্র দেশ। রাজনৈতিক ব্যাপারে পাকিস্তানের মতিগতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু অরাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণত সাহায্য করার চেষ্টা করে। তার অবশ্য কারণ আছে। যে কোনো পাকিস্তানীর বিপদ-আপদে ভারত সরকার সাহায্য করতে শুধু আগ্রহী নয়, উন্মুখ। দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে হরদম এই ধরনের অনুরোধ আসছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে ভারত সরকার সে সব অনুরোধের মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করে।

দেশটা দুটুকরো হলেও আত্মীয়স্বজন ছড়িয়ে রয়েছে দুদেশেই। বিয়েসাদীতে যাতায়াত করতেই হয় ওদের। লক্ষ্ণৌতে শ্বশুরের মৃত্যু হলে লাহোর থেকে ছুটে আসতে হয় মেয়ে-জামাইকে।

আরো কত কি হয়। এইতো সেবার পাকিস্তান হাই-কমিশনের এক থার্ড সেক্রেটারির স্ত্রী সন্তান প্রসবের পরই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভদ্রমহিলা তাঁর মাকে কাছে পাবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ভারত সরকারের সাহায্যে একদিনের মধ্যে তাঁকে আনা হয় পেশোয়ার থেকে দিল্লি। ভারত সরকারের ঔদার্যে ও তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে কয়েকদিন পর পাকিস্তানের ফরেন সেক্রেটারি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের বহু বড় বড় অফিসারের অসংখ্য আত্মীয়স্বজন উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে আছেন। ভারত সরকারের ঔদার্যে ও সহযোগিতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাকিস্তানীরাই বেশি উপকৃত হন। সেজন্য ভারত সরকার থেকে সাধারণ কোনো অনুরোধ গেলে এঁরাও যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেন।

তরুণ এসব জানে। দিল্লিতে থাকতে ওর কাছেই কত অনুরোধ এসেছে। তাই তো বন থেকে মেসেজটা পেয়ে মনে হলো, বোধহয় অন্ধকার রাত্রির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, নতুন দিনের আলো আত্মপ্রকাশ করার সময় সমাগত।

মিঃ দিবাকর কতকগুলো ফাইল নিয়ে এলেন কিন্তু তরুণের ইচ্ছা করল না ওগুলোয় হাত দিতে।

'এক্সকিউজ মি মিঃ দিবাকর, আজ এগুলো রেখে দিন। সোমবার দেখব। আজ আমি উইকলি রিপোর্টটা রেডি করে দিচ্ছি। আপনি ওটা আজই পাঠিয়ে দিন।'

সব দেশের সব ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে উইকলি পলিটিক্যাল ডেসপ্যাচ পাঠানো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, ডিপ্লোম্যাট মরুক বাঁচুক, উইকলি রিপোর্ট ঠিক সময়ে যাবেই। তাছাড়া বার্লিনের গুরুত্বই আলাদা। বন-এ এম্বাসী এই রিপোর্টের ভিত্তিতে দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠাবে এবং তার ভিত্তিতেই দিল্লি তার নীতি ও কার্যধারা ঠিক করবে। সুতরাং ইন্দ্রাণীর স্বপ্নে মশগুল হয়েও তরুণ পলিটিক্যাল রিপোর্ট পাঠাতে দেরি করল না।

রিপোর্টটা ফাইনাল চেক আপ করে নিজে হাতে সিল করে তরুণ তুলে দিল মিঃ দিবাকরের হাতে। হাসতে হাসতে বলল, 'এই নিন। আই হোপ আই উইল নট সী ইউ বিফোর মনডে!'

দিবাকর বিদায় নেবার পর তরুণ আবার কেবল্‌গ্রামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি মনে হলো। চিঠি লিখতে বসল বন্দনাকে।

'প্রায় তিন সপ্তাহ আগে তোমার চিঠি পেয়েও জবাব দিতে পারিনি। প্রিয়জনের চিঠির উত্তর আমি চটপট দিই না, তা তুমি জান। যাদের ভালোবাসি অথচ কাছে পাই না, তাদের চিঠি পেলে বড় ভালো লাগে। বার বার পড়ি সে সব চিঠি। একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন ধরে পড়ি। তোমার চিঠিটাও পড়েছি বেশ কয়েকদিন ধরে। উত্তর দিলেই তো সব শেষ! যতক্ষণ উত্তর না দিই ততক্ষণে মনে হয় চিঠির মধ্য দিয়ে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, কথা শুনতে পাচ্ছি। আমি উত্তর দিলেই তো তোমাদের আর দেখতে পাব না, কথা শুনতে পাব না! তাই, সেই ভয়ে উত্তর দিতে দেরি করি।'

'তবুও এত দেরি হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু এমন কতকগুলো আজেবাজে লোকের উৎপাতে বিব্রত ছিলাম যে অফিসের কাজকর্মও ঠিক করতে পারিনি। তবে আজ আর চিঠি না লিখে পারলাম না। আজই এম্বাসি থেকে খবর পেলাম ফরেন মিনিস্ট্রি ইন্দ্রাণীর খোঁজ নেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে রাজি হয়েছে। খবরটা পেলে তুমি অনেকটা আশ্বস্ত হবে, খুশি হবে, তাই আর দেরি করলাম না।

চিঠির শেষে তরুণ একথাও লিখল, জানি না ইন্দ্রাণীকে পাওয়া যাবে কিনা ; জানি না তাকে আর কোনোদিন দেখতে পাব কিনা তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু মনে হয় তার সঠিক খবর হয়ত এবার পাওয়া যাবে।...'

এই পৃথিবীটা মহাশূন্যের মাঝে থেকেও ঠিক নিয়মমাফিক নিত্য চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরপাক খাচ্ছে। নিয়ম মতো চন্দ্র-সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে। গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা খেলছে, অমাবস্যা-পূর্ণিমা হচ্ছে। দুনিয়াটা এমনি করেই চলছে। এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো মানুষ ও প্রকৃতিরও একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। পাহাড়ের কোলে জন্ম নেয় যে নদী, সে ছুটে যায় সমুদ্রের কোলে। মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই তার সাধনা, তার ধর্ম। সমুদ্রের আকর্ষণেই নদী ছুটে আসে, ছেড়ে আসে তার শ্বেতশুভ্র পবিত্র হিমালয়-শৃঙ্গের আসন। যে হিমালয় সবাইকে হাতছানি দেয়, সেই পর্বতরাজকে ত্যাগ করতে নদীর দ্বিধা নেই, কুণ্ঠা নেই।

বরং আনন্দ আছে, আছে পরিতৃপ্তি। তাই তো সে ক্ষীণধারা নাচতে নাচতে নেমে আসে, হাসতে হাসতে সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়। সে ক্ষীণধারা হিমালয়তুঙ্গে বা তরাই-এর জঙ্গলে প্রায় পরিচয়হীন থাকে, সমতলভূমিতে অসংখ্য মানুষের স্পর্শে সে অনন্য হয়, সে বিরাট বিশাল হয়। সমুদ্রের মুখোমুখি সে দিগন্তবিস্তৃত হয়।

তরুণও ছুটে চলেছে সেই অনন্তবিস্তৃত অজ্ঞান ভবিষ্যতের দিকে। ইন্দ্রাণীর আকর্ষণে। হয়তো বা মিথ্যা প্রত্যাশা, মরীচিকা। জানে না। অন্ধকার ভবিষ্যৎ তার জানা নাই। তবুও এই একটু ক্ষীণ আলোয় সে যেন বিভোর হয়ে গেছে। তাই তো বন্দনাকে চিঠি লিখতে বসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

'...বন্দনা, তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। তার চাইতেও বড় কথা তুমি আমাকে ভালোবাস, আমার মঙ্গল কামনা কর, আমাকে দাদা বলে প্রণাম কর। তোমাকে না বলার কিছু নেই। আর পাঁচজন মেয়ের মতো ইন্দ্রাণী ঠিক সাধারণ মেয়ে ছিল না। সে বড় বেশি স্বপ্ন দেখত। বড় বেশি প্রত্যাশা করত আমার কাছ থেকে। বুড়িগঙ্গার পাড়ে বাস করে আমি ঠিক অত স্বপ্ন দেখতে পারতাম না, সাহস করতাম না, বাবা কোর্টে গেলে, মা বুড়ো শিববাড়িতে পূজা দিতে গেলে ও আসত আমার কাছে। বার বার করে বলত, বিনেকাকার মতো তুমি চমকে দিতে পারে না সবাইকে?'

সেদিন কল্পনা করতে পারিনি ঢাকা বা কলকাতার বাইরে পা দেব, ভাবতে পারিনি কর্মজীবনের তাগিদে সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পাড়ি দেব বার বার। ভাবতে পারিনি আরো অনেক কিছু। তাই তো আমি বলতাম, 'ভবিষ্যৎ কি আমার হাতে ইন্দ্রাণী?'

ও প্রতিবাদ করত, 'পুরুষমানুষ হয়ে এমন কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?'

ওই কটা কথা বলতেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ত। এলো করে বাঁধা খোঁপাটা আরো ঢিলে হয়ে যেত।

খোঁপার কাঁটাগুলি ঠিক করতে করতে বলত, 'তুমি এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে, আমিও কলেজে ভর্তি হলাম। এখনও কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু সচেতন হবার সময় আসেনি?'

'কত কথা আর লিখব? আমাকে নিয়ে যার বুকভরা আশা ছিল সে যদি বেঁচে থাকে তবে কিভাবে যে দিন কাটাচ্ছে, তা চিন্তা করতেও কষ্ট লাগে।'

বন্দনাকে আর কিছু লিখল না। লিখতে পারল না। লেখা সম্ভবও নয়। সব মেয়েই স্বপ্ন দেখে। কেউ বেশি, কেউ কম। কিন্তু ইন্দ্রাণী যেন অসম্ভবকে প্রত্যাশা করত।

ঢাকা থেকে অনেক দূরে বার্লিনের ইন্ডিয়ান কনসুলেটে বসেও তরুণের মন উড়ে যায় সেই সোনালি দিনগুলিতে।...

বেশ বেলা হয়েছিল। তরুণ তবুও শুয়েছিল। টেস্ট পরীক্ষা যখন শেষ হয়েছে, তখন একটু বেলা করে উঠলেই বা কি? ওপাশের বড় জানলা দিয়ে রোদ্দুর আসছিল বলে পাশ ফিরে শুয়ে আর একবার চাদর মুড়ি দিল। তাছাড়া বাবা যখন ঢাকায় নেই, তখন চিন্তার কি?

কে যেন দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল? এক গোছা কাঁচের চুড়ির আওয়াজ হলো না? শুয়ে শুয়েই মুচকি হাসে তরুণ। এসেছে তাহলে ডাকাত মেয়েটা!–

মুহূর্তের মধ্যেই কানে ভেসে এলো, 'মাসিমা।'

কোণার ঘর থেকে তরুণের মা জবাব দিলেন, 'আমি এই কোণার ঘরে।'

পরের কয়েক মিনিট আর কিছু শোনা গেল না ওদের কথাবার্তা। একবার পাশ ফিরে বারান্দার দিকে তাকাল। নাঃ, এখনও এদিকে আসার সময় হয়নি।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। তবুও ইন্দ্রাণীর কথা শুনতে পায় না। তবে কি চলে গেল? না, তা কেমন করে হয়! একবার দেখা না করে কি যেতে পারে?

এতক্ষণ পর তরুণের হুঁশ হলো, বেশ রোদ্দুর উঠেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে বিশ্রী লাগল।

দুচার মিনিট আরো কেটে গেল। না, আর দেরি করে না। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। গায়ে চাদরটা জড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে একবার এপাশ-ওপাশ দেখল। পটলের মাকে না দেখে বুঝল সে রান্নাঘরে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কোণার ঘরের দোরগোড়ায়। তরুণ বেশ বুঝল, হঠাৎ দুজনের কথাবার্তা থেমে গেল।

'কি ব্যাপার? সকালবেলাতেই তোমরা ফিসফিস করছ?' চোখ রগড়াতে রগড়াতে তরুণ জানতে চায়।

মাথাটা দুলিয়ে বিনুনীটা ঘুরিয়ে ইন্দ্রাণী ঘাড় বেঁকিয়ে তরুণকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'একি মাসিমা খোকনদা এখন উঠল?'

ইন্দ্রাণীর কথা শেষ হতে না হতেই তরুণ ভিতরে ঢুকে চেয়ারটা টেনে নেয়। 'ভাগ্যবান মাত্রেই বেলা করে ওঠে ; তাতে এত অবাক হবার কি আছে?' নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তরুণ।

হাজার হোক একমাত্র সন্তান। শাসন করার ভাষাটাও যেন স্বতন্ত্র। 'ওর কথা আর বলিস না মা!'

একটা যেন চোরা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তরুণের অজ্ঞাতে। ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার মতো একটা মেয়ে পেতাম! তবে ও জব্দ হতো।'

মুহূর্তের জন্য দুজনে দুজনকে দেখে। দুজনের চোখগুলো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইন্দ্রাণী যেন একটু লজ্জাবোধ করে।

তরুণ একটু মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে। 'যদি পেতাম আবার কি? তোমার পাশেই তো বসে আছে।'

একটু থেমে আবার বলে, 'আচ্ছা মা, তুমি কি মনে কর বল তো? এই রকম একটা মেয়ে আমাকে জব্দ করবে?'

হঠাৎ পটলের মা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল। তরুণের মা ছেলের কথার জবাব না দিয়ে হাতের সেলাই নামিয়ে রেখে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলেন।

তরুণ উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রাণীকে বলল, 'দেখো তো, এক কাপ চা খাওয়াতে পার কিনা!'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ইন্দ্রাণী বলল, 'মুখ ধুয়েছ?'

'তোমার হাতের চা খেলেই মুখ ধোওয়া হয়ে যাবে।'

'এ আর মাসিমা পাওনি যে একমাত্র ছেলের সব আব্দার সহ্য করবেন।'

তরুণ একটু মজা করার জন্য বলে, 'মাসিমার একমাত্র ছেলের মতো আমিও তো তোমার একমাত্র ধ্যান-ধারণা।'

ঠোঁট উল্টে একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে ইন্দ্রাণী বলে, 'তা তো বটেই! যে ছেলে মুনসেফ কোর্টে ওকালতি করার স্বপ্ন দেখে, সে ছেলে আমার ধ্যান-ধারণা!'

ডান হাতে বুড়ো আঙুলটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে তরুণ উত্তর দেয়, 'মুনসেফ কোর্টে প্র্যাকটিশ করবো আমি?'

'তোমার দ্বারা তার বেশি কি হবে!'

হাজার হোক বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনোদিনই বিশেষ চিন্তার

গরজ ছিল না। ম্যাট্রিকের পর আই-এ ; আই-এ-র পর বি-এ, বি-এ-র পর এম-এ।

তারপর?

তারপর দেখা যাবে। মা আছেন, বাবা আছেন। তারপর ইন্দ্রাণী আছে। অত শত চিন্তার কি আছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তরুণের ঔদাসীন্যই ইন্দ্রাণীর অসহ্য। কল্পনাতীত। ছেলেবেলায় যার সঙ্গে খেলা করেছে, যৌবনে যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শিখেছে সে তো শুধু ওয়াড়ির মাঠে ফুটবল খেলবে না, সে তো শুধু বুড়িগঙ্গার পাড়ে আড্ডা দেবে না, চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করবে না।

তবে?

তবে আবার কি? সে বড় হবে। অনেক বড় হবে। দশজনের মধ্যে একজন হবে। সে বিনেকাকা হবে। দেশ-বিদেশে পাড়ি দেবে, ঢাকার মানুষকে চমকে দেবে।

সেই ছোট্টকালে টফি-চকোলেট খাওয়াতে খাওয়াতে বিনেকাকা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। শিশু ইন্দ্রাণী বিস্মিতা না হয়ে পারেনি। যত বড় হয়েছে, তত বেশি মনে পড়েছে ওই বিনেকাকাকে। ঢাকার আর সবাই তো ঠিক একই রকম আছে! গঙ্গাজলি আর ইলিশ মাছ খেয়েই ওরা খুশি, সুখী। মনের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করত। কারও কাছে প্রকাশ করত না। তরুণের কাছেও না। বড় হবার পর সেই শূন্যতা পূর্ণ করতে চেয়েছে কাছের মানুষকে দিয়ে।

তাই তো কথায় কথায় খোঁচা দিয়েছে তরুণকে।

ইন্দ্রাণী চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

তরুণ হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢোকার পরই চা নিয়ে ইন্দ্রাণী এলো। চায়ের কাপটা ওর হাতে তুলে দিতে দিতে ইন্দ্রাণী বেশ একটা মিষ্টি হাসি কিছুটা চেপে রেখে বলল, 'জানো, এই সাতসকালে মাসিমা কেন ডেকেছিলেন?'

চেয়ারের উপর পা দুটো তুলে বসতে বসতে তরুণ বলল, 'কেন?'

'মা বুঝি মাসিমাকে বলেছেন যে, ময়মনসিংহের কোনো এক ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে...।'

ভ্রূ দুটো কুঁচকে তরুণ বলে, 'কই, সে কথা তো আমাকে বলোনি।'

'আমিও ঠিক জানতাম না। মাসিমার কাছেই শুনলাম।'

'মা কি বললেন?'

'জানো, আমার বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে মাসিমার ভীষণ রাগ।'

'কেন?'

'তা জানি না। তবে বেশ বুঝলাম যে আমি অন্য কোথাও চলে যাই, তা উনি চান না।'

এবার পরম পরিতৃপ্তিতে চায়ের কাপে চুমুক দেয় তরুণ, 'আঃ! ফার্স্ট ক্লাস!'

প্রায় মুখোমুখি টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী জানতে চায়, 'কি ফার্স্ট ক্লাস?'

মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'তুমি, মা, চা—সবাই ফার্স্ট ক্লাস!'

বন্দনাকে চিঠি লেখার পর আপন মনে বসে থাকতে থাকতে এসব মনে পড়ছিল তরুণের। মনে পড়ছিল মা'র কথা। বড় ভালোবাসতেন ইন্দ্রাণীকে। নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। বড় ইচ্ছা ছিল মেয়েটাকে কাছে রাখার।

দু চারটে আজেবাজে বিয়ের সম্বন্ধ আসার পর আর থাকতে না পেরে শেষে ইন্দ্রাণীর

বাবাকেই বলেছিলেন, 'দেখুন ঠাকুরপো, আমাকে না জানিয়ে মেয়েটাকে যেখানে সেখানে পার করবেন না!'

'আপনাকে না জানিয়ে কোথায় মেয়ের বিয়ে দেব।'

'তা জানি না। তবে ওইসব আজেবাজে ছেলের খবর পেয়েই আপনারা যা মাতামাতি করছেন!'

'তা আপনার ছেলের মতো ছেলে পাব কোথায়?'

'সে পরে দেখা যাবে। মোট কথা আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ কোথাও—!'

সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে গেল। শাঁখা-সিঁদুর, মুখের হাসি, চোখের স্বপ্ন—সব কিছু একসঙ্গে হারিয়ে গেল।

তারপর কত কি হলো! ভেড়ার পালের মতো সর্বহারাদের সঙ্গে এলেন এপারে।

রানাঘাট, শেয়ালদা, পটলডাঙা। পিসতুতো ননদের বাড়ি, মামাতো দেওরের বাড়ি। আরো কত কি!

সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি! নবীন কুণ্ডু লেনের ওই অন্ধকার ঘর একদিন হঠাৎ সূর্যের আলোয় ভরে গেল! তরুণ আই-এফ-এস হলো।

যে সূর্য প্রায় দুপুরবেলাতেই অস্ত গিয়েছিল, সেই তার জন্য মা খুব খানিকটা কেঁদেছিলেন সেদিন। খোকার এই কৃতিত্বে সবচাইতে উনিই তো খুশি হতেন!

তরুণ কোনো সান্ত্বনা জানাতে পারেনি। এত বড় কৃতিত্বের পরও কেমন যেন পরাজিত মনে হচ্ছিল নিজেকে। চৌকির উপর মাথা নিচু করে বসে চুপচাপ ভাবছিল।

হঠাৎ একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন তরুণের মা। আপন মনেই যেন বললেন, 'হতচ্ছাড়ি মেয়েটাও যদি কাছে থাকত।'

এসব কথা, স্মৃতি, ভাবতে ভাবতে তরুণের চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছিল সেদিন। ভুলে গিয়েছিল সে বার্লিনে বসে আছে, ভুলে গিয়েছিল অফিসের কথা।

মিঃ দিবাকর হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন, 'স্যার! প্রায় ছটা বাজে। আমরা কি যাব?'

তরুণ লজ্জিত বোধ করে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সার্টেনলি যাবেন। চলুন চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

চৌদ্দ

উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে মধু খাওয়াই মৌমাছির কাজ। মৌমাছির ধর্ম। শীত, বসন্ত, শরৎ, হেমন্তে কত বিচিত্র ফুলের মেলায় মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু যার মধু নেই, যার মধুর ভাণ্ডার শূন্য হয়েছে, সেখানে মৌমাছি নেই।

অনেক মানুষও উড়ে উড়ে মধু খায়। শীতের মরসুমী ফুলের মেলায় বসেও এদের নজর থাকে বসন্তের প্রতি। স্মৃতির ভাণ্ডারে এদের জমা হয় না কিছু। এদের হৃৎপিণ্ড আছে কিন্তু হৃদয় নেই, মন আছে কিন্তু অন্তর নেই।

ভালোবাসাই তো জীবনের ধর্ম। যৌবনে তার প্রথম পূর্ণ অনুভূতি। জীবন সন্ধিক্ষণের সেই অপূর্ব মুহূর্তে মানুষ ভালোবাসবেই। তাই তো যৌবনে কতজনই প্রেমে পড়ে, কিন্তু ভালোবাসা? সবাই কি ভালোবাসতে পারে? দেহ-মনের প্রতিটি গ্রন্থিতে কি সবাই অনুভব করে অব্যক্ত

বেদনা?

না। তাই তো প্রেমে পড়লেই ভালোবাসা হয় না। প্রেম একটা রোগ। আসল না হলেও জল বসন্তে সবাই একবার ভুগবেই। সারা অঙ্গে কিছু ক্ষত রেখে যায়, কিন্তু তার স্থায়িত্ব নেই। একদিন মুছে যায় সে ক্ষতের চিহ্ন। আর ভালোবাসা? সে হচ্ছে অন্তরের ধর্ম, মনের বিশ্বাস। সে স্থায়ী, চিরস্থায়ী, চিরন্তন। সে অনন্ত।

দুনিয়ার মানুষ বার্লিনে এসে ভুলে যায় তার সুখ-দুঃখ ব্যথাবেদনা। গোল্ডেন সিটি বার, এল প্যানোরামা বা বলহাউস রেসিতে ক্ষণস্থায়ী বসন্তে অনেকে আরো কিছু ভুলে যায়! হাঙ্গা কোয়ার্টারে থেকেও ভোলা যায় অনেক কিছু। কিন্তু তরুণ ভুলতে পারে না ইন্দ্রাণীর কথা।

অফিস থেকে ফিরে লিভিং রুমে চুপচাপ বসে বসে পরপর কতকগুলো সিগারেট খেতে খেতে তরুণ কি যেন ভাবছিল। বিভোর হয়ে ভাবছিল। অন্যদিন গাড়ি থেকে নেমেই প্রতিবেশী ডাঃ রিটারের ছোট ছেলেটিকে খোঁজে। তরুণকে দেখলে ছোট্ট রিটারও টলতে টলতে এগিয়ে আসে একটা মিল্ক চকোলেটের লোভে। প্রতিদিনের মতো সেদিনও পকেটে চকোলেট ছিল কিন্তু গাড়ি থেকে অন্যমনস্কভাবে সোজা চলে এসেছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। অন্যদিনের মতো সোজা প্যানট্রিতে গিয়ে চা তৈরি করতেও যায়নি। যাবে কেন? রোজ রোজ কি ভালো লাগে? শুধু নিজের জন্য এত ঝামেলা পোহাতে কার ইচ্ছে করে?

বিভোর হয়ে তাই তো ভাবছিল, যখন সবাই ছিল ; সব কিছু ছিল, তখন সে কাছে ছিল। সুখে-দুঃখে অহরহ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেবার ঠিক পুজোর আগে আগে যখন তরুণের মার ডবল নিউমোনিয়া হলো তখন তরুণের বাবা গিয়েছিলেন কলকাতা। তরুণের সে কি ভয়। হাজার হোক একমাত্র ছেলে। সংসারের ঝুট-ঝামেলা বলতে যা বোঝায়, তা কোনোদিনই সহ্য করতে হয়নি। তাইতো বাবার অনুপস্থিতিতে মার অসুখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। এপাড়া ওপাড়া থেকে অনেকেই এসেছিলেন। চিকিৎসা বা সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি ওদের সাহায্য সহযোগিতায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাঃ ঘোষালও বলেছিলেন, ভয় নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন।

মার অসুখের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তরুণকে খুব বেশি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছিল না। মুহুরী মদনবাবুই ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। ঔষধ-পত্র দেবার জন্য ও-বাড়ির জ্যাঠাইমা সারাদিনই থাকতেন এ-বাড়িতে। এছাড়াও ঘোষালবাড়ির পিসিমা কতবার যে আসা-যাওয়া করতেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ইন্দ্রাণী তো ছিলই। মাসিমার বিছানার একপাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত সারাদিন। সন্ধ্যার পর সংসারের কাজকর্ম সেরে ইন্দ্রাণীর মা আসতেন। রাত্রি ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ ইন্দ্রাণীর বাবাও আসতেন। তিনজনে মিলে ফিরে যেতেন সাড়ে দশটা-এগারটার পরে।

তবু তরুণ ভয় পেয়েছিল। বাবাকে টেলিগ্রাম করেছিল, 'কাজ হলেই তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।'

বাবার লাইব্রেরি ঘরে টেবিলের উপর মাথা রেখে তরুণ আকাশ-পাতাল ভাবছিল। হঠাৎ কে যেন এসে আস্তে মাথায় হাত দিল। অন্য সময় হলে চমকে উঠত, কিন্তু মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত ছিল। একটুও নড়া-চড়া করল না। তবে বড় ভালো লাগল। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল আরেকজনের সমবেদনা। অনুভব করল ভালোবাসার নির্ভরযোগ্য স্পর্শ।

'কি এত ভাবছ?' মৃদু গলায় ইন্দ্রাণী জানতে চাইল।

তরুণ কিছু উত্তর দিল না। আগের মতোই টেবিলের উপর মাথা রেখে ভাবছিল কত কি।

'বল না কি এত ভাবছ?'

'না, তেমন কিছু না।' এবার তরুণ ছোট্ট উত্তর দেয়।

'তবে এমন করে একলা একলা বসে আছ কেন?'

'এমনি—'

'আমাকেও সত্যি কথা বলবে না?'

তরুণ টেবিলের উপর থেকে মুখ তুলে একবার ইন্দ্রাণীকে দেখে। মুখে একটু হাসির রেখা ফোটাবার চেষ্টা করে বলে, 'এমনি চুপচাপ বসেছিলাম।'

এবার ইন্দ্রাণীও হাসে। 'তুমি কি মনে কর আজও তোমাকে আমি বুঝতে পারলাম না?'

কথায় কথায় কত কথা হয়।

'আচ্ছা, আমার যদি ভীষণ অসুখ করে?' ইন্দ্রাণী মজা করেই প্রশ্ন করে।

'ভালো ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হবে।'

'কিন্তু তুমি কি কিছু করবে? নাকি এমনি করে বসে বসে ভাববে?'

কয়েকদিনের মধ্যেই মা ভালো হলেন। বাবাও কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। মাঝখান থেকে তরুণের একটা নতুন উপলব্ধি হলো।

সেটা হলো ইন্দ্রাণীর ভালোবাসা। দুঃখের দিনে, বিষাদের দিনে একটা নিশ্চিত নির্ভয় আশ্রয়ের স্থির ইঙ্গিত।

অনেক দিন বাদে তরুণের মনে পড়েছিল সেদিনের স্মৃতি। ঘরবাড়ি থেকে অনেক দূরে মার মৃত্যু হলে তরুণ ইন্দ্রাণীর অনুপস্থিতি নিদারুণভাবে অনুভব করেছিল। বহুদিন পরে সেদিন হান্সা কোয়ার্টারে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে একলা বসে থাকতে থাকতে ইন্দ্রাণীর অভাব নতুন করে বড় বেশি মনে পড়ল।

ডিপ্লোম্যাটের নিজের জীবনের কথা ভাবার অবকাশ বড় কম। ডিপ্লোম্যাট অনেক কিছু পায়, পায় না শুধু নিজের কাছে নিজেকে পাবার সুযোগ। কখনও কখনও প্রকাশ্যে, নিভৃতে, তাকে নিরন্তর রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়। দিন অফিস, রাতে পার্টি। সেখানেও ছুটি নেই। মদ খেতে হয় গেলাস গেলাস। কখনও নিজের ইচ্ছায়, কখনও অন্যের আগ্রহে। তবুও মাতাল হতে পারে না ওরা। ভুলতে পারে না নিজের দেশের স্বার্থ।

তাই তো মুহূর্তের জন্যও মুক্তি নেই। কিন্তু যদি কদাচিৎ কখনও কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পায় ডিপ্লোম্যাট, তখন তার বড় বেশি মনে পড়ে নিজের কথা। অধুনা বিশ্ব রাজনীতির প্রতিটি পাতায় বার্লিনের উল্লেখ হলেও লন্ডন-নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন-মস্কোর মতো কূটনৈতিক চাঞ্চল্য নেই এখানে। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসে অবশ্য, তবে সে মাঝে মাঝেই। তাই তো বার্লিনে এসে তরুণ একটু বেশি যেন নিজেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের বেদনা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার এমন 'কোরাস' শোনার অবকাশ যেন এই প্রথম এল তার জীবনে।

ঘরের চারপাশে দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিতেই রাইটিং ডেস্কের পাশে মিঃ মিশ্রের একটা ছবি নজরে পড়ল। তরুণ বড় ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে এই মাতাল লোকটিকে। দেশে দেশে কত মানুষ দেখেছে তরুণ, কিন্তু গ্লানিহীন, কালিমামুক্ত এমন স্বচ্ছ অন্তঃকরণ আর কারুর দেখেনি। ওই একই ডেস্কের আরেক পাশে ছিল ইন্দ্রাণীর একটি ছবি। ছবি দুটো অমন করে পাশাপাশি রাখার একটা কাহিনি ছিল।

ইউনাইটেড নেশনস-এ থাকার সময় তরুণের ফ্ল্যাটে এসে মিশ্র যেদিন প্রথম ইন্দ্রাণীর ফটোটা

দেখলেন, সেদিন উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ইজ দিস দি ইনোসেন্ট গার্ল ইউ লাভ?'

'ও যে ইনোসেন্ট তা আপনি জানলেন কি করে?'

মিশ্র সাহেবের কথা বলার ঢং-ই ছিল আলাদা।...'লুক হিয়ার ইডিয়ট ইয়ংম্যান! চোখ দুটো ভালো করে দেখ।'

একটু হাসতে হাসতেই তরুণ এক ঝলক দেখে নেয় ইন্দ্রাণীর চোখ দুটো। ...'কিন্তু কই, ইনোসেন্স তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবে কোথা থেকে? মনটা বোধহয় পুরোপুরি বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

তরুণ আরো কি যেন বলতে গিয়েছিল কিন্তু পারেনি। মিশ্র চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আর বাজে বকালে পুরো এক বোতল স্কচ খাওয়ালেও আমাকে ঠান্ডা করতে পারবে না!'

দু এক রাউন্ড ড্রিংক আর কিছু গল্প-গুজবের পর মিঃ মিশ্র বলেছিলেন, 'দেখ তরুণ, আই অ্যাম এ ফাদার, বাট আই হ্যাভ মাদার্স মাইন্ড। মাদার্স ফিলিংস!'

ঢক করে প্রায় আধ গেলাস হুইস্কী গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন, 'তাছাড়া ওই হতচ্ছাড়ি মেয়েটা লুকিয়ে পড়বার পর আমি যেন ওদের মতো মেয়েদের সব কিছু জানতে পারি, অনুভব করতে পারি। ওই হোপলেস মেয়েটা আমাকে ঠকালেও আর কোনো মেয়ে তা পারবে না।'

তরুণ গেলাসটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

অনেক দিন পর আজ হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে নিঃসঙ্গ তরুণের বড় বেশি মনে পড়ছে সে রাত্রির কথা।

'...চোখ দুটো দেখেই আমি বুঝতে পারছি এ মেয়ে কাউকে ফাঁকি দেবে না, দিতে পারে না। সী মাস্ট বী ওয়েটিং ফর ইউ।'

নিজের একমাত্র মেয়েকে হারাবার স্মৃতিতে, ব্যথায়-বেদনায় সে রাত্রে বিভোর হয়েছিলেন মিঃ মিশ্র।...'আমার ওই হোপলেস মেয়েটার মতো এই দুনিয়ায় কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা শুধু দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। তোমার এই ইন্দ্রাণী, আমার এই ইন্দ্রাণী মা সে জাতের নয়। ও বহুদিন ধরে বহু অন্ধকার মনে আলো ছড়াবে।'

রাইটিং ডেস্কের দুপাশে ওই দুটো ছবি দেখে তরুণের মনে ছোট ছোট টুকরো টুকরো স্বপ্নের মেঘ জমতে আরম্ভ করে। মেঘে মেঘে মেঘালয়ের প্রাসাদ গড়ে ওঠে মনের মধ্যে। একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ে। তরুণ যেন হঠাৎ ইন্দ্রাণীকে দেখতে পায়। কটি মুহূর্তের জন্য অসহ্য নিঃসঙ্গতার যবনিকাপাত হয়।...

'...কি এত ভাবছ?'

চমকে ওঠে তরুণ। 'কে? ইন্দ্রাণী!'

ইন্দ্রাণী মুখে কিছু বলে না। কোনো কালেই তো ও বেশি কথা বলে না। কৃষ্ণচূড়ার মতো মাথা উঁচু করে নিজের প্রচার সে চায় না, সূর্যমুখীর ঔদ্ধত্যও নেই তার। রজনীগন্ধার বিনম্র মাধুর্য দিয়েই তো সে তরুণকে মুগ্ধ করেছে। আজও সে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আলতো করে তরুণের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। মুখে কোনো জবাব দিল না, তবে যে চোখ দুটো হান্সা কোয়ার্টার ছাড়িয়ে, রেডিও টাওয়ার পেরিয়ে ওই দূরের সীমাহীন আকাশের কোলে ঘোরাঘুরি করছিল, তাতে মিষ্টি তৃপ্তির ইঙ্গিত।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তরুণ কোনো কথা বলতে পারে না। কৃষ্ণপক্ষের দীর্ঘ অমাবস্যার পর এক টুকরো চাঁদের আলোয় ঝলসে ওঠে মনপ্রাণ।

আবার একটা দমকা হাওয়া কোথা থেকে উড়ে আসে। ইন্দ্রাণী লুকিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে

নিজেকে নিয়ে খেলা করার সুযোগও শেষ হয় ডিপ্লোম্যাট তরুণ সেনগুপ্তের।

কতক্ষণ ধরে টেলিফোনটা বাজছিল তা সে জানে না! খেয়াল হতেই উঠে গেল।...'ইয়েস সেনগুপ্টা স্পীকিং।'

অ্যাম্বাসেডর! বন থেকে? তবে কি ইন্দ্রাণীর কোনো হদিশ পাওয়া গেল? না। মাস তিনেকের জন্য বন-এ থাকতে হবে জার্মান ইলেকশন আসছে বলে। চ্যান্সেলার কোনার্ড আদ্যেনুরের জয়লাভ হবে কি? নাকি...। ইলেকশন সম্পর্কে স্পেশ্যাল পলিটিক্যাল রিপোর্ট পাঠাতে হবে দিল্লিতে!

না বলবার কোনো অবকাশ নেই। অ্যাম্বাসেডর নিজে টেলিফোন করেছেন। সি-জি'ও তো রাজি। সুতরাং শুধু জানতে চাইল, 'হোয়েন সুড আই রিপোর্ট স্যার?'

'কাম বাই নেক্সট উইক-এন্ড।'

ধন্যবাদ জানিয়ে তরুণ টেলিফোন নামিয়ে রাখল। কৌচে না বসে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে ভাবল, ইন্দ্রাণীকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। চিন্তায় ভাবনায় ভাবতে হবে ওই বৃদ্ধ আদ্যেনুরের কথা। বাহাত্তর বছর বয়সে যাঁর জীবন-সূর্য পৃথিবীর মহাকাশে উঁকি দিয়েছে, যিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে ঠাণ্ডা জলে পা দুটো ডুবিয়ে রেখে মাথায় তাজা রক্ত পাঠান আর ক্যাবিনেট মিটিং-এ সভাপতিত্ব করার সময় ঘন-ঘন চকোলেট খান, দিবারাত্রি ভাবতে হবে তাঁর কথা!

অতি দুঃখের মধ্যেও তরুণের হাসি পায় আদ্যেনুরের কথা ভেবে। ঘুরতে হবে ওই বিচিত্র বৃদ্ধের সভায় সভায়, যিনি তাঁর রোয়েনডুর্ফের বাড়িতে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে ক্লান্ত হলে এক বোতল রাইন ওয়াইন খেয়ে নিজেকে তাজা করে নেন!

পনের

মাইনে ও পদমর্যাদা দিয়ে গুরুত্ব বিচার করা যায় কল-কারখানায়, সওদাগরী অফিসে ও সাধারণ সরকারি দপ্তরে। হয়তো আরো কিছু কিছু জায়গায়। সর্বত্র নিশ্চয়ই নয়। বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ ও কূটনৈতিক দুনিয়ায় তো নয়ই। একবার পরীক্ষায় পাস করে দু-চারটে প্রমোশন পেয়ে কিছুটা উপরে উঠলেই এই দুটি দপ্তরে গুরুত্ব বাড়ে না। পুলিশের এস-পি বা ডি-এস-পি-র চাইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইন্‌স্পেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টরদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বেশি। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনগুলিতেও ঠিক এমনি হয়।

বিগ পাওয়ারদের কথাই আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যাম্বাসেডরের চাইতে প্রায় অজ্ঞাত এক থার্ড সেক্রেটারির গুরুত্ব অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে এই থার্ড সেক্রেটারির গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই অ্যাম্বাসেডরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ভারতবর্ষ বিগ পাওয়ার হয়নি বলেই হয়তো এখনও কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে অ্যাম্বাসেডরের দস্তখত প্রয়োজন হয়! তবে ভারতীয় মিশনগুলিতেও শুধু মাইনে ও পদমর্যাদা দিয়েই ডিপ্লোম্যাটদের গুরুত্ব বিচার করতে গেলে অন্যায় ও ভুল হবে।

বন-এ ইন্ডিয়ান এম্বাসীর পলিটিক্যাল কাউন্সিলার হয়েও রাজনৈতিক ব্যাপারে মিঃ আহুজার বিশেষ কোনো গুরুত্ব বা প্রাধান্য নেই। যখন প্রায় রাতারাতি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের জন্ম হয়, তখন মিঃ আহুজা ডি-এ-ভি কলেজের দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনার কাজে হঠাৎ ইতি দিয়ে

ডিপ্লোম্যাট হন! প্লুটো, সক্রেটিস বা ভগবান বুদ্ধের সংস্পর্শ ত্যাগ করেও আহুজা সাহেবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। বরং বছর বছর মাইনে বেড়েছে ও কয়েক বছর পর নিয়মিত প্রমোশনও পেয়েছেন। তবুও ওঁর ওপর ঠিক নির্ভর করা যায় না এবং ক্ষেত্র-বিশেষে নির্ভর করাও হয় না।

প্রত্যেক শুক্রবার আহুজা সাহেব তাঁর পলিটিক্যাল রিপোর্ট অ্যাম্বাসেডরকে দেন এবং অ্যাম্বাসেডর একটু চোখ বুলিয়েই তা বন্দী করে রাখেন নিজের ড্রয়ারে। সেকেন্ড সেক্রেটারির রিপোর্টটাই কেটেকুটে পাঠিয়ে দেন দিল্লি।

এবার পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশি। উনপঞ্চাশ থেকে প্রতি নির্বাচনে যা হয়েছে এবার ঠিক তা হবে কিনা কেউ জানে না! অনেকের মনেই অনেক রকম সন্দেহ। বার্লিন নিয়ে দুটি সুপার-পাওয়ারের ঠান্ডা লড়াই নেহাত হঠাৎই জমে উঠেছে বলে এই নির্বাচন আরো বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই তো অ্যাম্বাসেডর তলব করেছেন তরুণকে।

তরুণকে টেলিফোন করার পরদিন সেকালের কনফারেন্সে অ্যাম্বাসেডর নিজেই বললেন, 'আওয়ার ওয়েস্ট ইউরোপীয়ান ডেস্ক ওয়ান্ট ডিফারেন্ট স্টাডিজ অ্যাবাউট ইলেকশন এবং সেইজন্যই আমি বার্লিন থেকে তরুণকেও আসতে বলেছি।'

এই নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দু কোনার্দ আদ্যেনুর। ডিপ্লোম্যাট তরুণ সেনগুপ্তের কাছে আদ্যেনুর অপরিচিত নাম হয়। বরং সে জানে রসিক কূটনীতিবিদরা আদর করে এঁর নাম রেখেছেন জন ফস্টার আদ্যেনুর!

অরণ্যেও দিন-রাত্রি হয় কিন্তু আদ্যেনুরের কাছে নয়। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবার পরও এই মহাপুরুষ রাশিয়াকেও ঠিক স্বীকৃতি দিতে রাজি নন! ইন্দ্রাণীর সব স্মৃতি, সব কথা দূরে সরিয়ে রেখে তরুণ আদ্যেনুরের চিন্তায় ডুবে গেল।

উনিশশো চোদ্দয় যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আদ্যেনুরের বয়স একত্রিশ। কোলোনের লর্ড মেয়র হন আরো দশ বছর পর। নাজীদের সময় এঁকে বনবাসে যেতে হয়। যুদ্ধের পর আমেরিকানরা আবার একে মেয়র করলেও ইংরেজ সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান, 'অকর্মণ্যতার' জন্য একে পদচ্যুত করেন। চাকা ঘুরে গেল। তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেন পশ্চিম জার্মানির সর্বেসর্বা—চ্যান্সেলার! তারপর এক যুগ ধরে চলেছে দাদুর রাজত্ব। একচ্ছত্র আধিপত্য! এবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে?

তরুণ জানে দাদুকে এককালে সবাই ভয়-ভক্তি করলেও আজ নিন্দায় মুখর বহুজনে। প্রকাশ্যে, মুক্তকণ্ঠে।

নির্বাচনের উত্তেজনায় কটা সপ্তাহ কোথা দিয়ে কেটে গেল, তরুণ টের পেল না। পনের দিনে দশটি প্রদেশে ঘুরে ঘুরে কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে! বড় বেশি ক্লান্ত বোধ করছিল। অ্যাম্বাসেডর বড় খুশি হয়েছিলেন তরুণের রিপোর্টে। তাই তো সবকিছু মিটে যাবার পর অ্যাম্বাসেডর তরুণকে বললেন, 'বড্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমাকে। টেক সাম রেস্ট রিটার্নিং টু বার্লিন!'

তরুণ ধন্যবাদ জানাল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ স্যার!'

প্রথম দু' তিন-দিন তো কোলোনেই কেটে গেল। দিনে মিউজিয়ামে ও রাতে নাইট ক্লাব রোমান্টিকাতে। রোজ রোজ যেতে ভালো না লাগলেও চ্যাটার্জীর পাল্লায় পড়ে যেতেই হতো, আর ওই দোতালার কোণার টেবিলে বসে রাইন ওয়াইন খেতে খেতে শুনতে হতো ওর ইন্দোনেশিয়ার কাহিনি।

তরুণের এসব কোনোকালেই ভালো লাগে না। বিশেষ করে যারা নিজের অধঃপতনের কাহিনি বলতে গর্ব অনুভব করে, তাদের তরুণ মনে মনে দারুণ ঘৃণা করে। তবুও চ্যাটার্জিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। হাজার হোক এককালের সহকর্মী ও সমসাময়িক। দিল্লিতে রোজ একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছে, সন্ধ্যায় কনট প্লেস-এ ঘুরেছে, সাপ্রু হাউসে ওডিসি নাচ দেখেছে। আরো কত কি করেছে।

চ্যাটার্জির প্রথম ফরেন পোস্টিং হলো ইন্দোনেশিয়া। নিষ্ঠাবান, আদর্শবান, ধর্মভীরু সন্তোষ চ্যাটার্জি অত্যন্ত খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে গিয়েও অতীত দিনের ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শ অনুভব করবে প্রতি পদক্ষেপে। প্রায় দুহাজার বছর আগে ভারতীয় সওদাগরের দল হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি এনেছিলেন এই দেশে, তার চিহ্ন আজও সযত্নে সসম্মানে দেখতে পাওয়া যাবে। কীর্তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড আর বান্ডিল ধূপকাঠি নিয়ে যে সন্তোষ চ্যাটার্জি একদিন ভোরবেলায় বোম্বে থেকে পি-অ্যান্ড-ও কোম্পানির জাহাজে চড়ে ইন্দোনেশিয়া রওনা হয়েছিল, সে সন্তোষ আর ফিরে আসেনি। হোটেল ইন্দোনেশিয়ার জাভা রুমে আর কেবাজোরান মডেল টাউনের ওই ছোট্ট কটেজের বেডরুমে অসংখ্য ক্ষণিক বান্ধবীদের উষ্ণ সান্নিধ্যে সে চ্যাটার্জির মৃত্যু হয়েছে।

রাইন নদীর শোভা না দেখে রোমান্টিকাতে বসে বসে সেই সর্বনাশা নোংরা কাহিনি শুনতে শুনতে বিরক্তবোধ করে তরুণ। হাতে দিন তিনেক মাত্র সময় ছিল, কিন্তু তবুও সেকেন্ড সেক্রেটারি হাবিবকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ব্ল্যাক ফরেস্টের দিকে।

নির্বাচনের পরিশ্রম আর চ্যাটার্জির সান্নিধ্যে বড্ড ক্লান্তবোধ করছিল তরুণ। ব্ল্যাক ফরেস্টের নির্জন কটেজে বেশ লাগল দুটি দিন। তাছাড়া অনেক দিন পর হাবিবের গান শুনতে আরো ভালো লাগল। নিজে গান শেখেনি, তবে বাড়িতে গানের চর্চা ছিল। হাজার হোক রামপুরের খানদানি বংশের ছেলে তো! হাবিদের দরবারী কানাড়া শুনতে রাত জাগতে হতো না। সন্ধ্যার পর সাপার শেষ করে কটেজের বারান্দায় বসেই শোনা যেত। ঘড়ির কাঁটায় মাত্র আটটা বাজলেও মধ্যরাত্রির গাম্ভীর্যভরা ব্ল্যাক ফরেস্টের মধ্যে তরুণ যেন ফেলে আসা বাংলাদেশের স্মৃতি খুঁজে পেতো।

সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভয়ানক ভাবে হাহাকার করে উঠত। দরবারী কানাড়ার মিষ্টি সুর কানে ভেসে এলেও বুকটা বড় বেশি জ্বালা করত।

হাবিবের গান থামত কিন্তু তরুণ যেন তখনও বিভোর হয়ে থাকত। আত্মমগ্ন থাকত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হাবিব একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করত, 'কিয়া দাদা, কোনো কষ্ট হচ্ছে?'

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়েই আসত। মুখে বলত, 'না না, কষ্ট হবে কেন?'

ব্ল্যাক ফরেস্টের নির্জনতা আবার দুজনকে ঘিরে ধরে। বেশ কিছুক্ষণ কেউই কোনো কথা বলে না।

হাবিব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে এগিয়ে দেয়, 'দাদা, হ্যাভ এ সিগারেট।'

'সিগারেট?'

নিজেই যেন নিজেকে প্রশ্ন করে। মাথাটা হেঁট করে একবার নিজেকেই নিজে দেখে নেয়। আবার একটা চোরা দীর্ঘনিশ্বাস! 'হাবিব! বেটার গিভ মি সাম ড্রিংকস্!'

তরুণ সেনগুপ্ত ড্রিংকস্ চাইছে? হাবিব স্তম্ভিত হয়ে যায়। পার্টিতে, রিসেপশনে বা ককটেলে দু' এক পেগ খেলেও ড্রিংকের প্রতি কোনো আগ্রহ বা দুর্বলতা নেই ওর। একথা ফরেন সার্ভিসের

সবাই জানেন। হাবিবও জানে।

'ইউ ওয়ান্ট ড্রিংক?'

'কেন, ফুরিয়ে গেছে নাকি?'

'না না, ফুরোবে কেন, বাট...।'

'তবে আবার দ্বিধা করছ কেন?'

হাবিব একটু হাসতে হাসতেই বলে, 'আপনাকে তো কোনোদিন ড্রিংক চাইতে দেখিনি, তাই...।'

ওই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই তরুণ একবার হাসে। 'আগে কোনোদিন যা করিনি, ভবিষ্যতে কি তা করা যায় না?'

ইন্দ্রাণী সম্পর্কে অ্যাম্বাসেডর যে মেসেজটা দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন তা হাবিবের হাত দিয়েই গিয়েছিল। তাছাড়া কন্সাল জেনারেল বন-এ এলেও সব শুনেছিল। তাই তো অযথা তর্ক করতে চায় না সে।

ঘর থেকে ওয়াইনের বোতলটা এনে দুটো গেলাসে ঢালে।

'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

আবার কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকার পর তরুণ জানতে চায়, 'আচ্ছা হাবিব, তোমার বাড়িতে সবাই আছেন তাই না।'

'হ্যাঁ, বাবা-মা ভাই-বোন...!'

'তুমি বিয়ে করবে না?'

'হ্যাঁ, করাচি যাবার আগেই বিয়ে করে যাব।' অনায়াসে জবাব দেয় হাবিব।

পাকিস্তানের নাম শুনেই তরুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'তুমি করাচি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ দাদা।'

'কবে?'

'এইতো তিন সপ্তাহের মধ্যেই আই উইল সেল্ ফর বম্বে। তারপর সিকস্ উইকস্ দেশে থেকেই করাচি যাব।'

ওয়াইন গেলাসটা মুখে তুলতে গিয়েও নামিয়ে রাখল তরুণ। স্বগতোক্তির মতো চাপা গলায় বলল, 'তুমি করাচি যাচ্ছ?'

হাবিবও গেলাসটা নামিয়ে রাখে। একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দেয়। দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, 'দাদা, করাচিমে কোই কাম হ্যায়?'

এবার একটু জোর করেই হাসে তরুণ, 'কাম? একটু জরুরি কাজ আছে ভাই।'

'টেল মি হোয়াট আই উইল হ্যাভ টু ডু।' মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তা করে বলে, 'যদি আমার দ্বারা না হয় তাহলে আই উইল আস্ক মাই আংকেল টু হেল্প মি।'

'হু ইজ ইওর আংকেল?'

'উনি পাকিস্তান ফরেন মিনিস্ট্রির অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারি।'

উল্লসিত হয় তরুণ, 'রিয়েলি?'

আর থাকতে পারে না তরুণ। হাবিবের হাত দুটো চেপে ধরে বলে, 'ইউ মাস্ট হেল্প মি, হাবিব।'

'নো কোশ্চেন অফ হেল্প দাদা, আপনার কাজ করা আমার কর্তব্য!'

ওই রাত্রে দূর থেকে ব্ল্যাক ফরেস্টে সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত পেলো ভগ্নমনা তরুণ সেনগুপ্ত।

জলপ্রপাতের জলধারা যেমন দুরন্ত বেগে গড়িয়ে পড়ে, তরুণও প্রায় সেই রকম এক নিশ্বাসে সব কথা বলে ফেললে হাবিবকে।

'অত করে বলার কিছু নেই। কিছু কিছু আমিও জানি, বিকজ আই সেন্ট দ্য অ্যাম্বাসের্ডস মেসেজ টু ফরেন অফিস।'

এই পৃথিবীতে মানুষের কত কি সহ্য করতে হয়। জরা, দারিদ্র্য, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রিয়হীন নিঃসঙ্গ মানুষের মতো অসহায় আর কেউ নয়। কাজের মধ্যে যখন ডুবে থাকে, যখন বৃদ্ধ আদ্যেনুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যালান্সশীট মেলাতে হয়, তখন বেশ কেটে যায়। কিন্তু যখন কাজের চাপ নেই, যখন ব্ল্যাক ফরেস্টের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে নিজেকে বড় বেশি অনুভব করা যায়, যখন নিজের হৃদপিণ্ডের মৃদু স্পন্দনও দৃষ্টি এড়ায় না, তখন হাবিবের মতো কনিষ্ঠ সহকর্মীর কাছেও আত্মসমর্পণ করতে লজ্জা করে না।

হাবিবের দুটো হাত চেপে ধরে তরুণ বলে, 'ইউ মাস্ট ডু সামথিং হাবিব। আমি বড্ড লোন্‌লি।'

বন-এ ফিরেই অ্যাম্বাসেডারের কাছে আর একটা সুখবর পাওয়া গেল।

'দেয়ার ইজ এ গুড পিস্ অফ নিউজ ফর ইউ।'

তরুণ মুখে কিছু বলে না, শুধু অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে অ্যাম্বাসেডরের দিকে।

'পাকিস্তান ফরেন অফিস হ্যাজ ইনফর্মড আওয়ার ফরেন অফিস যে, রায়ট ভিক্‌টিমসদের সমস্ত নাম চেক আপ করেও ইন্দ্রাণীর নাম পাওয়া যায়নি।'

'রিয়েলি স্যার?' তরুণের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অ্যাম্বাসেডর ডান হাত দিয়ে তরুণের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'তুমি ফাইল দেখতে চাও?'

অ্যাম্বাসেডর মনে আঘাত পেলেন নাকি? 'না না, স্যার। ফাইল দেখে কি করব? আপনার মুখের কথাই আমার যথেষ্ট।'

অ্যাম্বাসেডর আরো বললেন, 'তবে পাকিস্তান ফরেন অফিস জানিয়েছে, ইট উইল টেক টাইম টু ট্রেস আউট ইন্দ্রাণী।'

টাইম? তা তো লাগবেই। পুলিশের ফাইল ঘেঁটে বর্ডার চেকপোস্টগুলোর রেকর্ড দেখতে হবে, ইন্দ্রাণী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে চলে গেছে কিনা। বর্ডার চেকপোস্টের রেকর্ড হদিস না পেলে আবার নতুন করে খোঁজ করতে হবে। সময় তো লাগবেই।

'...তাছাড়া হাবির ইজ গোয়িং টু করাচি অ্যান্ড হিজ আংকেল ইজ দ্য রাইট পার্সন টু হেল্‌প আস।'

'হ্যাঁ স্যার, তাই তো শুনলাম।'

'সুতরাং তোমার আর চিন্তা কি? বাই দ্য টাইম ইউ লিভ বার্লিন, ইন্দ্রাণী উইল রিজয়েন ইউ।'

তরুণ মনে মনে বলে, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক স্যার।

দুঃখে নয়, আক্ষেপে নয়, গোপন খবর সংগ্রহের জন্যেও নয়, নিছক আনন্দে, খুশিতে সে রাত্রে হাবিবের সঙ্গে বোতল বোতল রাইন ওয়াইন ড্রিংক করল তরুণ।

ষোল

অ্যাম্বাসেডরের টেলিফোন পেয়ে কাউকে খবর না দিয়েই বার্লিন ত্যাগ করেছিল তরুণ। বন-এ থাকবার সময়ও অবসর পায়নি কাউকে চিঠিপত্র দেবার। বন্দনাকেও নয়। ফিরে এসে দেখল অনেক চিঠিপত্র এসেছে। একটা খামে পাকিস্তানী স্ট্যাম্প দেখে চমকে উঠল। ঢাকা থেকে মণিলাল দেশাই?

সবার আগে ঐ চিঠিটাই খুলল। চিঠিটি দীর্ঘ নয়। চটপট পড়ে ফেলল। তারপর আবার পড়ল।...পাকিস্তান গভর্নমেন্ট বেশ সিরিয়াসলি কেসটা টেক-আপ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। শুনছি পার্টিশানের সময় যেসব সরকারি কর্মচারী ঢাকায় ছিলেন তাদের কাছে একটা সার্কুলার পাঠিয়ে ইন্দ্রাণীর খবর জানবার চেষ্টা করা হবে। মাইনরিটি কমিশন এইভাবে বহু লোকের খবর জেনেছেন এবং মনে হয় এক্ষেত্রেও কিছু খবর পাওয়া যাবে। তবে এসব ব্যাপারে সময় লাগবেই।

দেশাই যে ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনে আছে, একথা তরুণ জানত না। মণিলাল গুজরাটী হলেও জন্মেছে কলকাতায়, ভবানীপুরে। লেখাপড়াও শিখেছে কলকাতায়। মণিলালের বাবা সৌরাষ্ট্রে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে যৌবনে চলে আসেন কলকাতায়। নগণ্য পুঁজি, সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু পরিশ্রম ও সততার জন্য কয়েক বছরেই নিজের অদৃষ্ট ঘুরিয়ে ফেলেন।

মণিলালের বাবা ছেলেকে ব্যবসায় ঢুকতে দেননি। 'তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। আমার মতো দোকানদারি করো না।'

মণিলাল ব্যর্থ করেনি তাঁর বাবার আশা। কলকাতার রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রামে অবাঙালিদের প্রতি বাঙালিদের বিতৃষ্ণার প্রকাশ দেখেছে বহুদিন কিন্তু বিরক্ত বোধ করেনি। সে তো বোম্বে, আমেদাবাদ, সুরাট ও বরোদার গুজরাটী নয়। সুরাটের আত্মীয়-বন্ধুরা তো ওদের বাঙালি বলে। মণিলাল তার জন্যে গর্ব অনুভব করে। দেশে গেলে ওদের সঙ্গে তর্ক করে, ঝগড়া করে বাঙালির হয়ে।

মণিলালের সঙ্গে তরুণ বছর খানেক মাত্র কাজ করেছিল দিল্লিতে। তারপর আর দেখা হয়নি কোনোদিন। সেই মণিলাল দেশাই চিঠি লিখেছে।

মুগ্ধ বিস্মিত তরুণ রাইটিং ডেস্কের ওপর রাখা ইন্দ্রাণীর ফটোটা একবার দেখে নেয়। তারপর আপন মনে প্রশ্ন করে, এত লোকের প্রচেষ্টাও কি তুমি ব্যর্থ করে দেবে?

দেশাই-এর চিঠিটায় আরেকবার চোখ বুলিয়ে উঠে যায় রাইটিং ডেস্কের কাছে। হাতে তুলে নেয় ইন্দ্রাণীর ফটোটা।

'...অনেক দিন পর আমাকে দেখলে? তাই না?'

নিজের প্রশ্নের কৈফিয়ত নিজেই দেয়, 'কি করব বল? তুমি তো জান ডিপ্লোম্যাটের জীবন!

একটু থামে। একটু হাসে। 'আমার মতো ঘরকুনো কুঁড়ে ছেলে কি এমনি এমনি বেরুতে চায়? একলা একলা থাকতে কি ভালো লাগে? এই এত বড় অ্যাপার্টমেন্টে একলা একলা থাকতে বুকটা বড় জ্বালা করে, বড় বেশি করে তোমাকে মনে পড়ে...'

চোখের দৃষ্টিটা যেন একটু ঝাপসা হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি ফটোটা নামিয়ে রেখে ফিরে আসে কৌচে। চিঠিপত্রের বান্ডিল হাতে তুলে নেয়। বন্দনা দুটো চিঠি লিখেছে?...'কি আশ্চর্য লোক বলো তো তুমি! কদিন তোমার খবর পাই না। দুটো-তিনটে চিঠি লিখেও কোনো জবাব পেলাম না। তোমার জন্যে যে আমার কত ভাবনা-চিন্তা হয়, তা হয়তো বিশ্বাস কর না বা জান না।

জানলে কখনও তুমি আমাকে এমন কষ্ট দিতে না...'

এতক্ষণ পর্যন্ত তবু সহ্য করেছিল তরুণ কিন্তু তারপর কি লিখেছে?

'...আমি না হয় মা'র পেটের বোন নই, কিন্তু তাই বলে আমাকে এমন দুঃখ দেবে কেন? আমার ভালোবাসার এমন অমর্যাদা করবে কেন?...'

পাগলি মেয়েটা দ্বিতীয় চিঠিটায় শুধু দুটো লাইন লিখেছে, 'দয়া করে শুধু জানাও তুমি সুস্থ আছ, ভালো আছ। সম্ভব হলে বার্লিন গিয়ে তোমার খোঁজ করে আসতাম। কিন্তু তুমি জান, সে সামর্থ্য আমার নেই।'

বড় অপরাধী মনে হলো নিজেকে। বন-এ যাবার পর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটেছে, ঘুরতে হয়েছে কয়েক হাজার মাইল। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লিখতে হয়েছে লম্বা লম্বা রিপোর্ট। কিন্তু তবুও বন্দনাকে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল। বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

আরো একটা অন্যায় হয়ে গেছে। বন্দনা সামান্য চাকরি করে। তাছাড়া প্রতি মাসেই দেশে বেশ কিছু পাঠাতে হয়। বিকাশেরও একই অবস্থা। সুতরাং কদিনের জন্য বার্লিন বেড়াতে আসা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তরুণেরই উচিত ছিল একবার ওদের নিয়ে আসা। ওরা ছাড়া তরুণের আর কে আছে?

বেশ ক্লান্তবোধ করছিল। কোনোমতে জামা কাপড় চেঞ্জ করে কয়েকটা স্যান্টউইচ আর এক কাপ কফি খেয়ে নিল। তারপর একটা দীর্ঘ চিঠি লিখল বন্দনাকে।

শেষে লিখল, 'কিছুদিনের জন্য তোমরা দুজনে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে। বিকাশকে বোলো ডেপুটি হাই কমিশনারকে আমার কথা বলতে। তাহলে ওর ছুটির কোনো অসুবিধা হবে না। আর তোমার ছুটি নেবার তো কোনো ঝামেলাই নেই! অ্যাপ্লিকেশন লেখ না বলেই তো ছুটি পাও না। প্যান আমেরিকান অফিসে খোঁজ করে তোমাদের 'ওপন' টিকিট দুটো নিয়ে নিও।'

চিঠি শেষ করার আগে আরো দুটো লাইন জুড়ে দিল, 'যদি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করতে না পার তবে এ চিঠির জবাব দিও না। আর আমাকে দাদা বলেও কোনোদিন ডাকবে না।

পরের দিন সকালে অফিসে গিয়েই প্যান অ্যামেরিকান অফিসে ওদের দুজনের ভাড়া পাঠিয়ে দিল।

চিঠির জবাব এলো না। চারদিন পর এলো টেলিগ্রাম, 'রিচিং ফ্রাইডে প্যান অ্যাম ফ্লাইট ফাইভ-সেভেন-সিক্স বন্দনা-বিকাশ।'

তরুণ জানত এমনি একটা কিছু হবে। বন্দনা যতই রাগ করুক চিঠি পাবার পর আর রাগ করে থাকতে সাহস করবে না। কেবল্‌টা পাবার পর তরুণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

কেবল্‌টা হাতে নিয়ে চলে গেল কন্সাল জেনারেল ট্যান্ডনের ঘরে। কোনো ভূমিকা না করেই বলল, 'হ্যাভ আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট বন্দনা?'

ট্যান্ডন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'কতবার বলেছ তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে?'

'বন্দনা আর বিকাশ আমার এখানে আসছে।'

'দ্যাট ইজ হোয়াই ইউ লুক লাইক এ ম্যাড চ্যাপ।'

তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে।

'ওরা কবে আসছে?'

'এই শুক্রবার।'

'তাহলে তো সময় নেই। বাড়ি ঘরদোর তো একটু ঠিকঠাক করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিছু তো করতেই হবে।'

'তাহলে তুমি বরং বাড়ি যাও। আমি অফিসে আছি।'

'না না, তা কি হয়?' কৃতজ্ঞ তরুণ বলে।

'আই সে গো হোম! এরপর তর্ক করলে বকুনি খাবে।'

আর একটি কথাও না বলে তরুণ চলে এলো নিজের ঘরে। টুকটাক কাগজপত্র সামলে নিয়ে অফিস থেকে বিদায় নিল।

অ্যাপার্টমেন্টে একবার ঘরদোর ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে ভাবছিল ওদের জন্যে স্পেশ্যাল কি করা যায়। আর এক চক্কর ঘুরতে গিয়ে রাইটিং ডেস্কের উপর রাখা ইন্দ্রাণীর ফটোটা বড় বেশি চোখে লাগল। আলতো করে ফটোটা তুলে নিল নিজের হাতে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'শুনছ, বন্দনারা আসছে। তুমি আসবে না?'

মনে হল ইন্দ্রাণী জবাব দিল, 'আসব বৈকি। তোমাকে ছেড়ে আর কতকাল থাকব বল।...'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী কোথায় লুকিয়ে পড়ল। ফটোটা নামিয়ে রেখে তরুণ টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, 'টরুণ হিয়ার...কি ভাবিজী? কি ব্যাপার?'

হঠাৎ এমন সময় মিসেস ট্যান্ডনের টেলিফোন।

'বন্দনা আসছে?'

'এর মধ্যে সে খবর আপনার কাছে পৌঁছে গেছে?'

'উনি এক্ষুনি অফিস থেকে টেলিফোন করে জানালেন।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'শুক্রবার মানে পরশু আসছে?'

'হ্যাঁ ভাবিজী।'

এবার ভূমিকা ত্যাগ করে কাজের কথায় এলেন ভাবিজী, 'তোমার অ্যাপার্টমেন্ট ছোট হলেও ওদের তো আমার কাছে থাকতে দেবে না। তা যাই হোক সারাদিন তো তোমরা ঘোরাঘুরি করবেই এবং রোজ সন্ধ্যার পর ঠিক হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢুকবে...।'

'না না, ভাবিজী, বন্দনা আবার ওসব পছন্দ করে না।'

'তা না করুক। মোট কথা রোজ সন্ধ্যার পর তোমরা তিনজনে আমার এখানে আসবে। গল্পগুজব—খাওয়া-দাওয়া করে ফিরে যাবে, বুঝলে?'

বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে তরুণ বলল, 'রোজ কি সম্ভব হবে?'

'তবে কি একদিন ডিনার খাইয়ে ভদ্রতা করতে বলছ?'

আর কি বলবে তরুণ? 'আচ্ছা ভাবিজী, আপনার সঙ্গে তর্ক করার সাহস তো আমার হবে না।'

বিকেলবেলার দিকে মিঃ দিবাকর এলেন।

'কি ব্যাপার? কোনো জরুরি খবর আছে নাকি?' তরুণ জানতে চায়।

'সি-জি পাঠিয়ে দিলেন। আপনার বোন-ভগ্নীপতি আসছেন, তাই যদি কোনো দরকার থাকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'সি-জি জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনার কি ড্রাইভার লাগবে? যদি লাগে তাহলে...'

'না না, আমি তো নিজেই ড্রাইভ করি। ড্রাইভার লাগবে কেন?'

বন্দনারা আসছে শুনে মিঃ ও মিসেস ট্যান্ডন অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আপনজন বলতে

তরুণের কেউ নেই। মা-বাবা ভাই-বোন কেউ না। যারা সহজ পথে প্রথম প্রেম ভুলতে পারে তরুণ তাদের মধ্যেও পড়ল না। জীবনে আর কোনো মেয়েকে সে আপন ভাবতে পারল না। বন্দনারা এলে অন্তত কদিনের জন্য ওর নিঃসঙ্গতা ঘুচবে ভেবেই মিঃ ও মিসেস ট্যান্ডন অত্যন্ত খুশি।

দুটো দিন কোথা দিয়ে যে কেটে গেল তা টের পেল না তরুণ। শুক্রবার সকালে অফিস করে লাঞ্চ টাইমেই বেরিয়ে পড়ল। আনন্দে উত্তেজনায় লাঞ্চই খেল না। প্লেন ল্যান্ড করবে সওয়া তিনটেয়। প্লেনেই বন্দনাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়ে যাবে। তবুও তরুণ ভাবল, ওরা এলেই খাব।

প্লেন ল্যান্ড করার বেশ খানিকটা আগে পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টে। দেখেশুনে বেশ একটা ভালো জায়গায় গাড়িটা পার্ক করল, যাতে বেরুতে না দেরি হয়। একটি মুহূর্তও যেন অপব্যয় না হয়।

এয়ারপোর্টে লাউঞ্জে পায়চারি করতে করতে আর একবার মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে নিল ওরা এলে কি করবে। ইতিমধ্যে কখন যে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে প্যান আমেরিকান প্লেন এসে গেছে, সে হুঁশ নেই। অতগুলো সাহেবসুবোর ভিড়ের মধ্যে টিপ করে বন্দনা প্রণাম করতেই হুঁশ ফিরে এল তরুণের।

বন্দনার হাত দুটো ধরে তুলে নিতে নিতে বলল, 'আরে থাক থাক, এখানে নয়।

কে কার বাধা মানে? কথা শেষ করতে না করতেই বিকাশও একটা প্রণাম করল।

মালপত্র নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে বেরুতে তরুণ বিকাশকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

বন্দনা বলল, 'ওর আবার কি কষ্ট হবে? বিনা পয়সায় বার্লিন ঘুরিয়ে দিচ্ছি, তাতে আবার কষ্ট কিসের?'

'আঃ বন্দনা! কি যা তা...'

এত সহজে কি বিকাশ হার মানে? 'তোমার টি বোর্ডের পয়সায় বার্লিন দেখছি?'

তরুণ থামিয়ে দেয়, 'বাড়িতে গিয়ে সারারাত ঝগড়া করা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি চলো তো।'

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। সামনে লিভিং রুমে মালপত্র নামিয়ে রেখেই তরুণ বলল, 'নাও নাও, চটপট হাত-মুখ ধুয়ে নাও ; ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

বিকাশ অবাক হয়ে বলল, 'সেকি দাদা, আমরা তো আজ দুবার লাঞ্চ খেয়েছি।'

কন্টিনেন্টাল ফ্লাইট যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকেই—একথা তরুণ জানে। তবুও ওদের নিয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ খাবার লোভে বেশ কিছু ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই বন্দনা বলল, 'তুমি কি বলো তো দাদা! সারাদিন না খেয়ে বসে আছ?'

'আঃ! কি বকবক করছ। হাতমুখ ধুয়ে নাও, সবাই মিলে একটু কিছু মুখে দেওয়া যাক।'

বন্দনা আর তর্ক করে না। 'কোথায় কি আছে, একটু দেখিয়ে দাও তো দাদা।' বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটু তাড়াতাড়ি নাও। দেখছ না, দাদা না খেয়ে আছেন।'

সংসারধর্ম বুঝে নিতে মেয়েদের সময় লাগে না, বন্দনারও লাগল না। লিভিং রুমে কৌচে বসে সেন্টার টেবিল টেনে নিয়ে মহানন্দে খাওয়া-দাওয়া মিটল। বন্দনাকে পেয়ে তরুণ হঠাৎ মহাকুঁড়ে হয়ে গেল, হাত ধুতেও উঠে গেল না।

'বন্দনা, একটু হাত ধোবার জল...।'

এমন সুরে কথাটা বলল যে বন্দনার বড় মায়া লাগল। 'তোমাকে কে উঠতে বলেছে?'

ওই কৌচে বসেই শুরু হলো আড্ডা।

'সব চাইতে আগে বল, তোমাদের ছুটি কদিন?'

তরুণের এই প্রশ্ন শুনেই বন্দনা আর বিকাশ একবার দৃষ্টিবিনিময় করল। ওরা ভেবেছিল, এয়ারপোর্টেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। লন্ডন থেকে রওনা হবার আগেই তাই শলা-পরামর্শ করে উত্তরদাতাও উত্তর ঠিক করে রেখেছিল।

বিকাশ চিবুতে চিবুতে বলল, 'নেকসট উইক থেকে আমাদের অডিট!'

চিমটি কেটে তরুণ জানতে চাইল, 'তিন চারদিন আছো তো?'

'না-না, দাদা, তিন-চারদিনের জন্য কি এত খরচা করে এতদূর আসে?'

বন্দনা চুপটি করে বসে মিটমিট করে হাসছিল। এবার তরুণ ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্দনা, তোমার অডিট কি এই উইকেই শুরু হচ্ছে?'

'আচ্ছা দাদা, অমন করে কথা বলছ কেন? আমি কি বলেছি–?'

আর এগুতে হলো না।–'তোমার হয়ে আমিই না হয় বলে দিলাম।'

হাসি-খুশিতে ডগমগ হয়ে বন্দনা বলল, 'ও চলে যাবে যাক। আমি এত সহজে যাচ্ছি না।'

ফরেন সার্ভিসের কর্মচারীরা ফরেন সেক্রেটারির চাইতে অডিট পার্টির নিম্নতম কর্মচারীকে যে বেশি ভয় করে, তা তরুণ জানে। তাছাড়া বিকাশের সেকশনের উপরেই যে অডিট করাবার ভার, সে খবরও তরুণ রাখে। 'তাহলে ছুটি পেলে কেমন করে?'

'ডেপুটি হাই-কমিশনারকে আপনার কথা বলাতেই এক উইকের ছুটি পেয়েছি। আদারওয়াইজ...!'

তরুণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। কি করা যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা বলল, 'আমি কিন্তু দাদা, মাসখানেক থাকব।'

'বিকাশের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

একি একটা প্রশ্ন? অত্যন্ত সহজ হয়ে বন্দনা উত্তর দেয়, 'কেন? দিনে ইন্ডিয়া হাউসের বিখ্যাত ক্যান্টিন, আর রাত্রে স্বহস্তে সাত্ত্বিক আহার, অথবা ইতালিয়ান কাফে!'

'এতদিন ওই হোটেল-রেস্তোরাঁয় খেয়ে কাটাবে?'

বিকাশ বলে, 'না না, তাতে কি হয়েছে!'

মফঃস্বলের ফৌজদারি কোর্টের উকিলের মতো বন্দনার কাছে অফুরন্ত আর্গুমেন্টের রসদ। 'এতকাল কিভাবে কাটিয়েছে?'

তরুণ একটু শাসন করে, 'আঃ! বন্দনা! বিয়ের পর যেন একটু মুখরা হয়েছ!'

ছুটি-ছাটা নিয়ে বেশ তর্কটা জমে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই ছেদ পড়ল।

'দ্যাখ তো বন্দনা, কে? হয়তো ভাবিজী।'

'কে ভাবিজী?'

'আমার কন্সাল জেনারেলের স্ত্রী।'

ঠিক যা সন্দেহ করেছিল তাই। সবাই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে রওনা দিল মিঃ ট্যান্ডনের বাড়ির দিকে।

সতের

এককথায় যাকে বলে ভুরিভোজ তাই হলো। সবাই দল বেঁধে ড্রইংরুমে এলেন পোস্ট-ডিনার আড্ডার জন্য।

'আচ্ছা ভাবিজী, আমার জন্য তো এমন ভুরিভোজের আয়োজন কোনোদিন হয়নি।'

ভাবিজী তরুণের কথার জবাব না দিয়ে বন্দনাকে বললেন, 'দেখেছ তোমার দাদার কি হীন মনোবৃত্তি? কোথায় বোন-ভগ্নীপতিকে খাইয়েছি বলে খুশি হবে, তার বদলে কিনা হিংসা করছে।'

বন্দনা হাসে, বিকাশ হাসে, মিঃ ট্যান্ডনও হাসেন। কেউ কোনো কথা বলেন না।

মিসেস ট্যান্ডন আবার শুরু করলেন, 'বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের ইজ্জতই আলাদা। বিয়ের পর তুমিও এমনি ইজ্জত, আদর-আপ্যায়ন পাবে।'

বন্দনা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। শুধু একবার চুরি করে বিকাশের দিকে তাকাল, একটু হাসল।

'বিয়ে না করলে ভালো-মন্দ খেতেও পাব না?' অবাক হয়ে তরুণ প্রশ্ন করে।

ভাবিজীর স্পষ্ট জবাব, 'না।'

'সুড আই ম্যারি টু-মরো?'

এবার ভাবিজী হঠাৎ সীরিয়াস হলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আই উইশ ইউ কুড, তরুণ!'

ভাবিজীর ভাবান্তরে, ওই ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাসে সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটাই পাল্টে গেল। অটামের বার্লিনের আকাশ হঠাৎ মেঘে ছেয়ে গেল।

'জানো বন্দনা, আমার আর ভালো লাগে না। সত্যি ভালো লাগে না। নিজের ছেলে-মেয়ে আত্মীয়স্বজন কতদূরে পড়ে রয়েছে। এদের নিয়েই তো আমার সংসার।'

মিঃ ট্যান্ডন, তরুণ, বিকাশ চুপটি করে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। বন্দনা বলল, 'তা তো বটেই।'

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস। 'আর এদেরই মুখে যদি হাসি না দেখি, তাহলে কেমন লাগে বলো তো?'

আর এগুতে পারলেন না ভাবিজী। গলার স্বর আটকে এল। ঠিক তাকিয়ে না দেখলেও সবাই বুঝল, মিসেস ট্যান্ডনের চোখের কোণায় জল এসে গেছে।

সিচুয়েশনটা সেভ করার চেষ্টা করলেন স্বয়ং ট্যান্ডন। 'আঃ, এখন আর দুঃখ করছ কেন? ইন্দ্রাণী উইল বি উইথ আস ভেরি সুন।'

মিসেস ট্যান্ডন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। 'বাজে বকো না তো! ভেরি সুন ভেরি সুন করতে করতে তো তুমি রিটায়ার করতে চলেছ!'

প্রথম দিনের পরিচয়, ব্যবহারেই ভাবিজীকে দেখে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় বন্দনা, বিকাশ। দাদাকে ওঁরা এত ভালোবাসেন?

হ্যাঁ।

ফেয়ারলি প্লেসে বা রাইটার্স বিল্ডিং-এ সারা জীবন কাটাতে হয় অনেককেই। পাশাপাশি বসে সারাজীবন কাজ করতে করতে তিক্ততা আসে বৈকি! কিন্তু যাদের জীবনে সে স্থায়িত্ব কোনোদিনই আসবে না, আসতে পারে না, তাদের সবার মন ঠিক বিষাক্ত হতে পারে না। হবার অবকাশ নেই। বিষ একটু এগুতে না এগুতেই ট্রান্সফার! কানাডা থেকে আলজিরিয়া, লন্ডন থেকে কলম্বো, পিকিং থেকে প্যারিস। আট-দশ-বারো বছর পর যখন আবার দেখা হয়,

তখন সে বিষের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতীত দিনের এই তিক্ততা যদি কেউ মনে করে রাখত তবে কি ওবেরয় আজও ফরেন-সার্ভিসে থাকতে পারত?

রাত্রে ফিরে এসে এইসব গল্পই হচ্ছিল তিনজনে মিলে। বড় কৌচটায় দাদার পাশে বসে ওবেরয়ের কথা শুনছিল বন্দনা। বিকাশ সামনের কৌচে বসেছিল।

ওবেরয় তখন আফ্রিকার সীমান্ত রাজ্য মরোক্কোতে পোস্টেড। চুয়াল্লিশ বছর ফরাসি শাসনে থাকার পর মরোক্কো স্বাধীন হয়েছে। সারা দেশের মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। মারাক্কেশ স্কোয়ারে সারা দিনরাত্রি হৈ-হুল্লোড় চলত। ওবেরয় ঘুরে ঘুরে সেসব দেখত।

রাবাতে ইন্ডিয়ান মিশন খোলা হলেও ফুল টাইম অ্যাম্বাসেডর তখনো আসেনি। ওবেরয় ও আর দু তিনজন মিলেই সব কাজ করত। ভারত মরোক্কো থেকে কিছু ফসফেট কিনলেও আর বিশেষ কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেন ছিল না দু দেশের মধ্যে। কমার্শিয়াল কাউন্সিলারের, পদও মঞ্জুর করা হয়নি। ওবেরয়কেই এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের টুকটাক খোঁজখবর ঘুরে ফিরে জোগাড় করতে হতো। ঘুরত ক্যাসাব্লাঙ্কা, মারাক্কেশ, ফেজ, তাঞ্জিয়ার।

তরুণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ওই ঘোরাঘুরিই হলো ওর কাল।'

বড় বড় হোটেলে যাতায়াত শুরু হলো ঘন ঘন। 'প্রানাদা'য় 'হোটেল ট্যুর হাসানে,' কখনও 'কন্‌সুলাত'-এ। শুরু হলো নাচ-গান খানা-পিনা।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তরুণ বলল, 'মরোক্কোর নাইট ক্লাবগুলো সস্তা হয়ে আরো সর্বনাশ হল।'

বিকাশ ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে, 'সস্তা মানে?'

জবাব দেয় বন্দনা, 'কেন তুমি যাবে নাকি?'

তরুণ শাসন করে, 'আঃ বন্দনা! তারপর আবার বলে, 'রিয়েলি দে আর ভেরি চিপ্। দু ডলার দিলেই বড় বড় নাইট ক্লাবে যাওয়া যায়।

...দু বছর পরে সেই ওবেরয় যখন বেইরুটে ট্রান্সফার হলো, তখন সর্বনাশের পথে নামতে আর দেরি হল না। মেডিটারিয়ানে মাতাল হাওয়া ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করে ওর নাম দিল, ইভস্ অ্যাম্বাসেডর।

লেবাননের রাজনৈতিক গুরুত্বের চাইতে ওখানকার নাইট ক্লাবের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু তবুও বেইরুটে আমাদের একটা বিরাট চান্সেরী আছে। ফরেন সার্ভিসের ক্লাস ওয়ান অ্যাম্বাসেডর পাঠান হয় এই মধ্য-প্রাচ্যের প্যারিসে! ডজন ডজন ডিপ্লোম্যাট আর শতাধিক কর্মচারী আছেন এই চান্সেরীতে। এছাড়া পূব-পশ্চিম যাতায়াতের পথে বেইরুটে রাত কাটান না, এমন ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট নেইই।

এদের সবাইকে ঠকিয়েছে ওবেরয়। কাউকে দশ-বিশ পাউন্ড কাউকে আবার সত্তর-আশি-একশো পাউন্ড!

'কয়েক বছর পরের কথা। ওবেরয় তখন জেনেভায়। বোম্বে থেকে খবর এলো মা'র ক্যান্সার। অতীত দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অর্ধেক মাইনেটাও পেত না বেচারী। কারুর কাছে হাত পাতারও সাহস ছিল না। প্রয়োজন ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বোম্বে যাবার কথা ভাবতে পারল না।'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে তরুণ বললে, 'উই হ্যাভ লিটল ডিপ্লোম্যাসি উইথ আওয়ার ডিপ্লোম্যাট কলিগ। ওবেরয় কিছু টের পেল না, কিন্তু খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।'

বন্দনার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'আচ্ছা!'

'খবরটা শুধু ছড়িয়েই পড়ল না টপ সিক্রেট কনসালটেশন হল ইউরোপের পাঁচ-সাতটা ইন্ডিয়ান মিশনের পনের-বিশ জন ডিপ্লোম্যাটের মধ্যে। ঠিক হলো ওবেরয়কে না পাঠিয়ে ওর মাকে জেনেভায় আনান হোক চিকিৎসার জন্য। ডিসিসনের সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকশান। এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডন অফিসে পনের-বিশটা চেক পৌঁছে গেল। দিল্লি থেকে বোম্বেতে খবর পৌঁছে গেল ওবেরয়ের একমাত্র বোন ও ভগ্নিপতির কাছে, 'কনটাক্ট এয়ার ইন্ডিয়া ইমিডিয়েটলি ফর ইওর মাদার্স জার্নি টু জেনেভা ফর ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট!'

তরুণ সে সব কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলল। 'ওবেরয় এয়ার ইন্ডিয়ার কাছ থেকে মার আসার খবর পেয়ে চমকে গিয়েছিল।'

বিকাশ জানতে চাইল, 'ভদ্রমহিলা সেরে গেলেন কি?'

'না!'

অতীত দিনের তিক্ততার কথা ফরেন সার্ভিসের কেউ মনে রাখেন না। রাখতে পারেন না। ওটা ওঁদের ধর্ম নয়, কর্ম নয়। অতীত দিনের কথা মনে রাখলে কি ডিপ্লোম্যাসি করা যায়? অসম্ভব।

ওবেরয়কে যারা এমন করে ভালোবাসতে পারেন, তাঁরা তরুণের জন্য ভাবলেন না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তরুণ বলে, 'এদের মতো কিছু মানুষ না থাকলে হয়তো আমি পাগল হয়ে যেতাম। এই পৃথিবীতে একলা থাকার মতো অভিশাপ আর নেই।'

ঘরের পরিবেশটা থমথমে হয়ে গেল। বিকাশ একবার বন্দনার দিকে তাকাল, বন্দনা বিকাশকে দেখে নিল।

'তুমি একলা কোথায়? আমরা কি তোমার কেউ নই দাদা?' বন্দনা যে একটু আহত মন নিয়ে কথাটা বলল।

ডান হাত দিয়ে বন্দনার মাথাটা টেনে কাঁধের উপর রেখে আদর করতে করতে তরুণ বলল, 'আমি কি তাই, বলেছি? তোমাদের চাইতে আপন আমার আর কে আছে?'

বিকাশ তরুণকে ভয় না করলেও বেশ সমীহ করে চলে। আজ যেন একটু সাহস পেল। 'ওকে এত বেশি আদর করবেন না দাদা।'

বন্দনা মাথাটা তুলে ভ্রূ কুঁচকে বিকাশের দিকে তাকাল।

তরুণ জানতে চাইল, 'কেন?'

একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বিকাশ জবাব দেয়, 'আপনি ওকে ভালোবাসেন বলে ওর বড় বেশি অহংকার আর আমাকে ভীষণ কথা শোনায়।'

'সে কি বন্দনা? আমার জন্যে ওকে কথা শোনাও?'

'না দাদা, ও সব মিথ্যে কথা বলেছে।'

'ইভন্ ইফ দে আর মিথ্যে, আই ডোন্ট লাইক টু হিয়ার সাচ্ সিরিয়াস অ্যান্ড ডামেজিং অ্যালিগেশনস্।'

স্বামীকে আর বেশি অপদস্থ করতে চায় না বন্দনা। 'দাদা, কফি খাবে?'

কফি খেতে ভীষণ ভালোবাসে তরুণ। ওর বহুকালের স্বপ্ন ডিনারের পর এক কাপ ঘন ব্ল্যাক কফি নিয়ে গল্প করবে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, বন্দনা-বিকাশের সঙ্গে।

'কফি? হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া!'

বন্দনা বিকাশকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে?'

হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বিকাশ বলল, 'না না, একটা বেজে গেছে, আমি আর খাব না।'

তরুণ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'সত্যিই তো অনেক রাত হয়ে গেছে। থাক থাক বন্দনা, আর কফি করতে হবে না। তোমরা বরং শুতে যাও।'

বন্দনা বলে, 'আমি এখন শুচ্ছি না।'

'যাও বিকাশ তুমি শুয়ে পড়।'

বিকাশ একটু আপত্তি করছিল, কিন্তু বন্দনার কথায় আর দেরি করল না। 'বিয়ের পর এই তো প্রথম ভাইয়ের কাছে এলাম। তুমি যাও তো, আমাদের একটু প্রাইভেট কথাবার্তা বলতে দাও।'

তরুণ আবার শাসন করে, 'আঃ বন্দনা!'

বন্দনা প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে-ঠুলেই বিকাশকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিল।

দু কাপ ব্ল্যাক কফি শেষ হবার পরও কত কথা হলো দু ভাইবোনের।

'আচ্ছা দাদা, তুমি রেগুলার চিঠিপত্র দাও না কেন বল তো?'

'চিঠি লিখতে ভালো লাগে না। তাছাড়া চিঠিপত্র লিখে কি মন ভরে?' তরুণ নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'আমাদের কাছে পেতেই ভালো লাগে।'

ডান হাতের উপর মুখটা রেখে বন্দনা মুগ্ধ হয়ে দাদার কথা শোনে।

'আচ্ছা বন্দনা, আমি যদি লন্ডনে ট্রান্সফার হই, তাহলে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে—তাই না?'

লন্ডন যাবার কথা শুনেই বন্দনা চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'তুমি লন্ডনে আসছ?'

'না। তবে গেলে মজা হতো।'

'এসো না দাদা। আমরা একটা বড় ফ্ল্যাট নেব।'

ঘড়ি দেখে তরুণ চমকে উঠল, 'মাই গড! সওয়া তিনটে বাজে।'

'তাই নাকি?' বন্দনার কাছে যেন তেমন রাত হয়নি।

'যাও, যাও, শিগগির শুতে যাও।'

বন্দনা তরুণের বিছানার বেডকভার তুলে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ঠিক করে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল।

ছোট্ট নাইট ল্যাম্পটা জ্বেলে বিকাশের স্যুটটা ঠিক করে ওয়ার্ডরবে তুলে রাখল। নিজে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাইটি পরে সুইচ অফ করে লেপের তলায় ঢুকে পড়ল।

একটু এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে শুতে গিয়েই বিকাশ জেগে গেল!

'তুমি ঘুমোওনি?' বন্দনা জানতে চাইল।

'ঘুমোব না কেন? তুমিই তো ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।'

'উঃ কি মিথ্যে কথা তুমি বলতে পার।'

'মিথ্যে কথা? তুমি রোজ আমার ঘুম ভাঙাও না?'

'কখ্খনো না। তুমিই জেগে জেগে গুণ্ডামি করো।'

'গুণ্ডামি নয়, বলো কর্তব্য। মাই সেকরেড্ ডিউটি টু মাই বিলাভেড্ অ্যান্ড একসাইটিং ওয়াইফ!'

অন্ধকারের মধ্যেও যেন দুজনে দুজনকে দেখতে পেল, দেখতে পেল হাসি হাসি মুখ।

বন্দনা যেন গাম্ভীর্যের সঙ্গেই হুঁশিয়ার করে, 'যতই ফ্লার্টারি করো, আজ সুবিধে হচ্ছে না।'

'আই অ্যাম নট কনসার্নড্ উইথ মাই সুবিধে, বাট ইওর অসুবিধে।'

'আজ দেখছি তোমার মাথায় ভূত চেপেছে, বাট ফর গডস্ সেক্ ডোন্ট ডিসটার্ব মী।'

বন্দনা একটু পরেই আবার বলে, 'জান কটা বাজে?'

'কটা?'

'চারটে বেজে গেছে।'

'সো হোয়াট?'

'কাল সকালে দেরি করে উঠলে দাদার কাছে মুখ দেখানো যাবে না। ভাববে...!'

'কিচ্ছু ভাববেন না, বরং জানবেন বেশ সুখেই আছে।...'

সত্যি সত্যি পরদিন সকালে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তরুণ অফিস যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেছে। প্যান্ট্রিতে চা-ব্রেকফাস্টের উদ্যোগ আয়োজন করে লিভিংরুমে বসে বসে কয়েকটা পিরিওডিক্যাল উল্টে দেখছে।

ওদিকে ওরা দুজনে উঠে কেউই আগে বেরুতে চাইছিল না। অনেক ঠেলাঠেলির পর দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে এলো।

'কি, ঘুম হলো?' তরুণ জানতে চাইল।

মুহূর্তের জন্য বন্দনা-বিকাশের সলজ্জ দৃষ্টি-বিনিময় হলো। তারপর বন্দনা বলল, 'এখনও জানতে চাইছ ঘুম হলো কিনা?'

'কাল তোমরা বেশ টায়ার্ড ছিলে। অত রাত করে শুতে যাওয়া ঠিক হয়নি।'

বিকাশ কোনোমতে বলল, 'অফিস যাবার চাপ না থাকলে ঘুম যেন ভাঙতে চায় না।'

'নিশ্চয়ই ঘুমোবে। খাবে-দাবে ঘুমোবে বৈকি! কদিন রিল্যাক্স করে নাও।'

'দাদা, তুমি চা খেয়েছ?'

'রোজই তো একলা খাই। তোমরা আসার পরও একলা একলা খাব?'

বন্দনা চটপট চা-টা নিয়ে এলো। চা-টা খেয়ে উঠবার সময় তরুণ বলল, 'বুঝলে বিকাশ, বন্দনা যতদিন আছে ততদিন আমি আর কিছু কাজকর্ম করব না।'

বিকাশ বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই করবেন না।'

'মাছ-মাংস সব কেনা আছে। দেখেছ তো?'

বন্দনা বলে, 'কালকেই দেখেছি।'

'খুব ভালো করে খাবার-দাবার বানাও। আমি কিন্তু রোজ লাঞ্চ খেতে আসব।' হাসতে হাসতে তরুণ বলে।

বন্দনা হাসতে হাসতে বলে, 'না আসবার কি কথা আছে দাদা?'

তরুণ একবার হাতের ঘড়িটা দেখে বলল, 'ও। বড্ড দেরি হয়ে গেল।'

বেরুবার আগে তরুণ একবার অফিসে কন্সাল জেনারেলকে টেলিফোন করল, 'স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি।'

ট্যান্ডন সাহেব জবাব দিলেন, 'কে তোমাকে আসতে বলেছে? বি হ্যাপি উইথ ইওর সিস্টার অ্যান্ড বিকাশ।'

'থ্যাংক ইউ ভেরি ম্যাচ্ স্যার! আই অ্যাম কামিং উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার।'

ট্যান্ডন সাহেব আর তরুণের সঙ্গে কথা বলতে চান না। 'একবার বন্দনাকে দাও তো।'

'গুডমর্নিং।'

'গুডমর্নিং। কেমন আছ বন্দনা?'

'খুব ভালো।'

'কাল রাত্তিরে খুব জমেছিল তো?'

'হ্যাঁ, তা বেশ জমেছিল।'

'তোমার দাদাকে অফিসে আসতে দিচ্ছ কেন?'

'অফিসে না গেলেও চলবে?'

'একশো বার।'

বন্দনা টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেখল দাদা হাসছে।

'তোমাকে অফিস যেতে হবে না।'

'তাই কি হয়? ট্যান্ডন সাহেব অমনি বলেন।'

কিছুক্ষণ ধরে ভাইবোনে অনুরোধ-উপরোধের পালা চলল। শেষে সমস্যার সমাধান করল বিকাশ।

'ঠিক আছে, চল আমরাও দাদার সঙ্গে অফিস যাই। কিছুক্ষণ থেকে সবাই আবার একসঙ্গে চলে আসব।'

বন্দনা দুটো হাতে তালি বাজিয়ে বলল, 'দি আইডিয়া!'

আঠারো

দুঃখের দিনগুলো কাটতে চায় না কিন্তু সুখের দিনগুলো কেমন যেন ঝড়ের বেগে উড়ে যায়। বন্দনা-বিকাশকে নিয়ে তরুণের দিনগুলিও অমনি উড়ে গেল। দেখতে দেখতে বিকাশের ছুটি ফুরিয়ে এলো।

কটি দিন কত কি করল! কত কি দেখল! রবিবার সকালেই বিকাশ চলে যাবে। শনিবার সন্ধ্যায় তরুণ ওদের নিয়ে মার্কেটিং-এ বেরুল।

'তোমরা তো লন্ডনে হাস্ পাপির জুতো পরে হৈ হৈ কর। এদের হাতে তৈরি জুতো জোড়া নিয়ে পরে দেখে কি চমৎকার।'

বিকাশ বলল, 'আমার তিন-চার জোড়া ভালো জুতো আছে। আবার জুতোর কি দরকার।'

তরুণ সেকথা কানেও তুললো না। এবার ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট একটা গলির মধ্যে এক এজেন্সি হাউসে হাজির হল।

'হাউ আর ইউ মিঃ নোয়েল?'

'ফাইন, থ্যাংক ইউ স্যার।'

'এই হচ্ছে আমার বোন আর ব্রাদার-ইন-ল। ওদের জিনিসটা রেডি আছে তো?'

বিকাশ-বন্দনা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

নোয়েল সাহেব বললেন, 'আপনার জিনিস রেডি রাখব না?'

এক মিনিটের মধ্যে ভিতর থেকে ঘুরে এসেই টেবিলের ওপর ব্রাউনের টুরিস্ট মডেল একটা টি-ভি সেট খুলে দেখালেন।

বন্দনা বলল, 'একি দাদা! টি-ভি সেট কিনছ কেন?'

'চুপ করে থাক।'

এবার বিকাশ বলে, 'একি করছেন দাদা?'

আর একি করছেন! মাস কয়েক আগে সেটটা দেখেই ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। তারপর ওদের আসার খবর পাবার পরই নোয়েলকে দাম-টাম মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

তরুণের সঙ্গে তর্ক করার সাহস ওদের কারুরই নেই। তবুও বার বার আপত্তি করেছি।

শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে তরুণ বলেছিল, 'জীবনে কাউকেই তো কিছু দেবার সৌভাগ্য হলো না। লোকেরা বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্রকে কত কি দেয়! তোমরা না হয় আমাকে সেই সৌভাগ্যটুকু উপভোগের প্রথম সুযোগ দাও।'

বন্দনা-বিকাশের মুখ দিয়ে আর একটি কথা বেরোয়নি।

কিছুক্ষণ পরে তরুণ আবার বলল, 'দাদার কাছে ছোট ভাইবোনেরা কত কি আবদার করে। কই, তোমরা তো আমার কাছে কিছুই আবদার করলে না?'

এই দুনিয়ায় স্নেহ, ভালোবাসা পাবার সৌভাগ্য চাই। কিন্তু সেই স্নেহ-ভালোবাসা অপরকে না দিতে পারার মতো দুর্ভাগ্য নেই। মানুষকে ভালোবেসেই মানুষের স্বার্থকতা, পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি। তরুণের জীবনে সেই পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি হলো না। একথা বন্দনা-বিকাশ জানত কিন্তু সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকল। খানিকক্ষণ পরে বন্দনা বলল, 'এই একমাস আমি এমন জ্বালাতন করব যে তোমার আর দুঃখ থাকবে না দাদা।'

বিষণ্ণ তরুণের মুখে শুকনো হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'শুধু এই একমাস তো জ্বালাতন করবে, তারপর তো নয়।'

পরের দিন বিকাশকে 'সি-অফ করতে গিয়ে তরুণের মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। 'বন্দনা, তুমিও চলে গেলে পারতে। ও বেচারির একলা থাকতে ভীষণ কষ্ট হবে।'

'তোমাকে একলা ফেলে গেলে তোমার বুঝি কষ্ট হবে না?'

বিকাশও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না দাদা, আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না। তাছাড়া বন্দনাও তো কতদিন ধরে একঘেয়ে জীবন কাটাচ্ছিল।'

বিকাশ চলে গেল। বন্দনাকে নিয়ে তরুণ ফিরে গেল হাল্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে।

একটা অ্যালুমিনিয়াম ডেক-চেয়ার নিয়ে তরুণ দক্ষিণের বারান্দায় বসল। বন্দনা চলে গেল ভিতরে।

কিছুক্ষণ পরে দু হাতে দু কাপ কফি নিয়ে বন্দনা এলো বারান্দায়।

হাসতে হাসতে তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি, কফি?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর একটা বসবার কিছু আনি।'

'তুমি ধর। আমি আনছি।'

'না না, আমিই আনছি।'

তরুণ চট করে ভিতর থেকে একটা ইজিপসিয়ান মোড়া আনল।

কফির কাপে চুমুক দিয়েই বন্দনা বলল, 'একটা মাস বেশ মজায় কাটানো যাবে, তাই না দাদা?'

'হ্যাঁ, তা বেশ কাটবে।' খুশিভরা হাসি হাসি মুখে তরুণ জবাব দেয়।

'জান দাদা, আমার ভাগ্যটা যে এমন করে পাল্টে যাবে তা কোনোদিন ভাবিনি।'

আত্মস্মৃতির সবগুলি অধ্যায় মনে মনে পর্যালোচনা করে বন্দনা যেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

'এর মধ্যে আবার ভাগ্য পাল্টাল কোথায়?'

ভ্রূ দুটো তুলে চোখ ঘুরিয়ে বন্দনা বলে, 'ভাগ্য না হলে তোমার মতো দাদা পাই? হাল্পা কোয়ার্টারে থাকতে...'

তরুণ আর হাসি চাপতে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, 'একটা আস্ত পাগলী না হলে কেউ একথা বলে?'

হঠাৎ ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

তরুণ উঠতে গেলেই বন্দনা বলল, 'তুমি বসো, আমি দেখছি।'

বন্দনা দরজা খুলেই আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আপ আ গিয়া! আইয়ে আইয়ে!'

তাড়াতাড়ি তরুণ উঠে গিয়ে দেখল ট্যান্ডন সাহেব এসেছেন।

ট্যান্ডন সাহেব মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, 'আই ওয়ানটেড টু চেক আপ দুই ভাই-বোনে কেমন মজা করছ?'

বন্দনা মজা করে বলে, 'এই তো সবে এক কাপ কফি নিয়ে শুরু করেছি। কদিন অপেক্ষা করুন—তারপর দেখবেন।'

ট্যান্ডন সাহেব বন্দনার কাঁধে হাত দিয়ে একটু কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'এই বুড়ো দাদাকেও একটু শেয়ার-টেয়ার দিও।'

তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। এবার বলে, 'আগে তো বসুন তারপর ভাগাভাগি করা যাবে।'

তরুণ আর ট্যান্ডন সাহেব লিভিং রুমের কোণার কৌচে বসলেন। পাকা গিন্নীর মতো বন্দনা জানতে চাইল, 'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ টি অর কফি?'

'শুধু টি অর কফি? আর কিছু খাওয়াবে না?'

'আপনার মতো সিনিয়র ডিপ্লোম্যাটের তো অধৈর্য হওয়া চলে না। ইউ সুড ওয়েট অ্যান্ড সী।'

বন্দনার শাসন করার কায়দা দেখে দু জনেই হাসলেন।

ট্যান্ডন সাহেব কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'খোদা হাফিজ! এ তো দারুণ মেয়ে।' এবার তরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সি সুড হ্যাভ বিন ইন ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস।'

'ইউ গো অন পন্ডারিং, আমি যাচ্ছি।'

কার্ডিগানের হাত গোটাতে গোটাতে বন্দনা পা বাড়াল প্যান্ট্রির দিকে। ট্যান্ডন সাহেব প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'তরুণ, আউটস্ট্যান্ডিং ডিপ্লোম্যাটদের মতো সি ক্যান ইগনোর টু!'

তরুণ কিছুই জবাব দেয় না কিন্তু মনে মনে যেন বন্দনার জন্য গর্ব অনুভব করে।

ট্যান্ডন সাহেব এবার বলেন, 'ভারি চমৎকার মেয়ে! দেখলেই যেন আদর করতে ইচ্ছা করে।'

'সত্যি, বন্দনা খুব ভালো মেয়ে।'

'তুমি খুব লাকী।'

'অ্যাজ ফার অ্যাজ বন্দনা'জ কনসার্নড্, আমি নিশ্চয়ই লাকি।'

ট্যান্ডন সাহেব হঠাৎ একটু হাসলেন, 'অ্যান্ড সী ইজ ভেরি প্রাউড অফ ইউ।'

'তাই নাকি?' হাসতে হাসতে তরুণ পাল্টা প্রশ্ন করে।

কিছুক্ষণ পরে বন্দনা ট্রলি-ট্রে নিয়ে হাজির হলো। প্লেট ভর্তি পাকোড়া আর কফি ছাড়াও আরো কি কি যেন।

ট্যান্ডন সাহেব ঠাট্টা করে বললেন, 'এত বেলায় পাকোড়া-কফি? ভেবেছিলাম লাঞ্চ খাওয়াবে।'

'আজকে আমাদের একটু স্পেশাল খাওয়া-দাওয়া আছে। সো ইউ মাস্ট এক্সকিউজ।'

বন্দনার কথা শুনে দুজনেই হাসল।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। এর আগে মহাশূন্যতার মধ্যে তরুণ ভেসে বেড়াত। আজকাল? সব শূন্যতা যেন পূর্ণ করেছে বন্দনা। একটি মুহূর্তের জন্যও তরুণ নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করতে পারে না।

তরুণের মুখটা তুলে ধরে বন্দনা বলল, তুমি চুপটি করে কি ভাবছ দাদা? আমি রান্না করছি, চলো না, তুমি ওখানে গিয়ে বসবে।'

তরুণ আর চুপটি করে একলা বসতে পারে না। বন্দনা রান্না করে আর ও পাশে ইজিপসিয়ান মোড়াটা নিয়ে বসে বসে গল্প করে।

'আচ্ছা দাদা, তুমি রান্নাঘরে গিয়ে মাসিমার সঙ্গে গল্প করতে?'

'খুব ছেলেবেলায় মার পাশে পাশেই কাটাতাম কিন্তু বড় হবার পর আর সে সুযোগ পেতাম না।'

'কেন?'

ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তরুণ হাসল। পুরনো দিনের কথা মনে হতেই কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

উদাস ফ্যাকাশে দৃষ্টিটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে তরুণ বলল, 'পরের দিকে ইন্দ্রাণী না হলে মার এক মুহূর্তও চলত না। ইন্দ্রাণীকে কাছে পেলেই মার ফিসফিস শুরু হয়ে যেতো।'

'মাসিমা ওকে ভীষণ ভালোবাসতেন।' আপন মনেই বন্দনা বলল।

কথা বলতে বলতেই মাছ ভাজা হয়ে গেল। একটা মাছ ভাঙা প্লেটে তুলে তরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও দাদা।'

'সে কি? এখন মাছ খাব কেন?'

'আমি দিচ্ছি, খেয়ে নাও না।'

আরো এগিয়ে চলে। তরুণ ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রার দুটো টিকিট কিনে এনেছে। বন্দনাকে বলেছে একটু ভালো কাপড়-চোপড় পরে যেতে। ভিতরের ঘরে সাজগোজ করছে সে। তরুণ সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করছে।

'দাদা, একটু এদিকে আসবে?'

'কি হলো?'

'একটু এসো।'

ও-ঘরে গিয়ে বন্দনাকে দেখেই তরুণ বলল, 'বাপরে বাপ! বার্লিনার্সরা ভাববে ইন্ডিয়ান কুইন এসেছে।'

'আমি কুইন না হতে পারি বাট সিস্টার অফ অ্যান ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট!'

ঠোঁটটা উল্টে তরুণ বলে, 'এই গহনা-টহনা কাপড়-চোপড় দেখে, কি বিশ্বাস করবে?'

বন্দনাকে দেখতে ভালোই। চোখ-মুখ বেশ শার্প। নাকটা যেন একটু চাপা। তবে তা নজরে পড়ে না। চেহারার গড়নটাও বেশ ভালো। লন্ডনের একদল ইন্ডিয়ান ছোকরা যে বন্দনার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য টি বোর্ডের দোকানে আড্ড জমাত, সেজন্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। আজ আবার একটা কালো বেনারসী পরেছে। আই-ল্যাশ দিয়ে চোখ দুটোকে আরো সুন্দর

করেছে। পেন্ট করেনি বটে তবে একটু বিউটি ট্রিটমেন্ট করায় সুন্দর মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

'দাদা, এই দুলটা পরিয়ে দাও তো।' দুল দুটো এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এমন বিশ্রী ডিজাইন যে পরাই একটা ঝামেলা।'

'এই মাটি করেছে। আমি কি পারব?'

পারব না বললে কি বন্দনা ছাড়ে!

বন্দনাকে কাছে পেয়ে নতুন করে বাঁচার আশা পায় তরুণ। আনন্দ পায়, উৎসাহ পায়। জীবনযাত্রার ধরনটাও পাল্টে গেল। কফি আর স্যান্ডউইচ খেয়েই দিন কাটে না। প্রতিদিন কত কি রান্না করে বন্দনা।

'এত কি খাওয়া যায়?'

'তুমি বড্ড বেশি তর্ক কর, দাদা। অন্তত খাওয়া-দাওয়ার ভারটা আমাকে ছেড়ে দাও।'

তরুণ আর তর্ক করে না। হার স্বীকার করেও যেন জিতে যায়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে গল্প করত কত রাত পর্যন্ত। ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে কত কথা হতো।

'চল, এবার তুমি শুতে চল।'

তরুণ বুঝত এ অনুরোধ নয়, অর্ডার। 'এই তো যাচ্ছি।'

'আর এই তো যাচ্ছি নয়, এবার ওঠ।'

তরুণ উঠে পড়ে। বন্দনা আগেই বিছানাপত্র ঠিক করে রেখেছে। তরুণ শুতে না শুতেই বন্দনা ব্ল্যাঙ্কেট ঠিক করে দেয়!

'আমি কি বাচ্চা? কম্বল-টম্বলও গায়ে দিতে পারি না?'

'এত আদরে মানুষ হয়েছ যে এসব শেখার সুযোগ পেলে কোথায়?'

বন্দনা ভোরবেলায় উঠে পড়ে। একবার উঁকি দিয়ে তরুণকে দেখে নেয়। হয়তো কম্বলটা একটু টেনে দেয়। মুহূর্তের জন্য একটু যা ভালো করে দেখে নেয়।

দুঃখে-কষ্টে মানুষ হয়েছে বন্দনা। ঝড়-বৃষ্টি বড় বেশি সহ্য করতে হয়েছে। তরুণের স্নেহচ্ছায়ায় এসেই প্রথম একটু পরিষ্কার আকাশ দেখার সুযোগ পেয়েছে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই এই মুখখানা দেখে যেন সে অনুপ্রেরণা পায়, আনন্দ পায়। দাদার ওপর আধিপত্য করে আত্মতৃপ্তিও পায় মনে মনে।

সুখের দিনগুলো আবার ঝড়ের বেগে উড়ে যায়। বন্দনার বার্লিন বাসের পালা প্রায় শেষ হয়ে আসে।

'সব অভ্যেসগুলো তো নষ্ট হয়ে গেছে। এবার যে কিভাবে একলা থাকব আর স্যান্ডউইচ খাব, তাই ভাবছি।'

সেইদিন দুপুরেই বন্দনা বিকাশকে লিখল, 'দাদাকে ছেড়ে যেতে মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে। তুমি যদি রাগ না কর তাহলে আরো সপ্তাহ দুই থাকতাম।'

বিকাশের উত্তর আসতে দেরি হল না। 'তুমি নিশ্চয়ই আরো কিছুদিন থাকবে। দাদাকে দেখলে কি আমি রাগ করতে পারি? ভুলে যেও না ওঁর চাইতে আমাদের আপন আর কেউ নেই।'

পরের দিন সকালে অফিস বেরুবার সময় তরুণ বলল, 'আজ তোমার টিকিট কাটতে দেব।'

'না না, দাদা। আমার টিকিট কাটতে হবে না। তোমাকে আর একটু জ্বালাতন করি।'

'সে কি? বিকাশ আর কতদিন হাত পুড়িয়ে খাবে?'

'ওই আমাকে থাকতে বলেছে।'

একটু শুকনো হাসি হাসল তরুণ। 'আমার সঙ্গে তোমরা এত জড়িয়ে পড়ো না। তাহলে আমার পাপে তোমাদেরও দুঃখ পেতে হবে।'

'সে সব তোমার ভাবতে হবে না।'

উনিশ

বন্দনা চলে গেল। নিয়ে গেল কিছু অনুভূতি, রেখে গেল কিছু স্মৃতি।

বিন্দুতে যেমন সিন্ধু হয়, তেমন প্রতিটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে জন্ম নিয়েছিল কিছু অনুভূতি। সে অনুভূতি এর আগে কোনোদিন বোঝেনি। আর রেখে গেল যে টুকরো টুকরো স্মৃতি তা তরুণের জীবনের অনন্য সম্পদ। এত বড় দুনিয়াটায় এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এমন আপন করে আর কাউকে কাছে পায়নি। ভালোবাসা পেয়েছে, সমবেদনা পেয়েছে বহুজনের কাছে। বন্দনা ইন্দ্রাণীর অভাব মেটাতে পারেনি, পারবে না, পারতে পারে না। তবুও সে যা দিয়ে গেল, তা তরুণ আর কোথাও আশা করতে পারে না।

বন্দনা ছাড়া আর কে এত আপন-জ্ঞানে বলতে পারে, 'দাদা, তুমি আমার শাড়ির নিচের কুঁচিগুলো চেপে ধরো তো ; আমি কাপড়টা ঠিক করে পরে নিই।'

কোনো কোনোদিন পার্টিতে যাবার সময় বিচিত্র হেয়ার-ডু করে দুহাত দিয়ে খোঁপাটা চেপে ধরে ডাকত, 'দাদা একটু এ ঘরে এসো।'

'কেন, কি হলো?'

তরুণ ঘরে এলে বলত, 'ওই সামনের কাঁটাগুলো দিয়ে দাও তো।'

কাঁটাগুলো খোঁপায় গুঁজে দিতে দিতে তরুণ বলত, 'কি দরকার এত সব কায়দা-টায়দা করার?'

'জীবনে কোনোদিন ঠিক আনন্দ করার অবকাশ পেলাম না তো, তাই তোমার এখানে এসেও লাইফটাকে এন্‌জয় করব না?'

কে এমন স্পষ্টভাবে দাবি জানাতে পারে?

বন্দনা সত্যি অনন্যা!

বন্দনাকে বিদায় জানিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে বড় বিশ্রী লাগছিল। চুপচাপ কৌচটায় বসে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের কয়েকটা দিন আরো খারাপ লাগল। নিঃসঙ্গতার জ্বালাটা বড় বেশি অনুভব করল। অফিসে যাতায়াত করে, কিন্তু কাজকর্মে মন দিতে পারে না। ট্যান্ডন সাহেব সবই বোঝেন কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। জীবনটা যেন আরো বিবর্ণ হয়ে গেল। দিল্লি, লন্ডন, নিউইয়র্কে তবু সময় কেটে যায়, কিন্তু বার্লিনে যেন সময় কাটতে চায় না। একদিন কথায় কথায় ট্যান্ডন সাহেবকে বলেই ফেলল, 'আর এখানে ভালো লাগছে না। ভাবছি এবার ট্রান্সফারের জন্য চেষ্টা করি।'

'যেখানে ট্রান্সফার হবে, সেখানে গিয়ে ভালো লাগবে?'

তরুণ আর জবাব দিতে পারেনি।

মিঃ ট্যান্ডনই আবার বললেন, 'তুমি ট্রান্সফার চাইলে নিশ্চয়ই মিনিস্ট্রি আপত্তি করবে না,

তবে তাতে তোমার কি লাভ? বরং ওয়েট ফর সাম টাইম।'

কাজকর্মের চাপ না থাকায় তরুণের আরো খারাপ লাগছিল। নিউইয়র্ক, লন্ডন, মস্কো, পিকিং-এ ডিপ্লোম্যাটদের মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা থাকে, বার্লিনে তাও নেই। কি নিয়ে থাকবে তরুণ?

মাস খানেক পরে দু তিনজন জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ড কাম স্টেনো টাইপিস্টের ইন্টারভিউ নিচ্ছিল তরুণ। পাঁচ-ছটি মেয়ে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল।

মিস হেরম্যানের ইন্টারভিউ নেবার সময় তরুণ জানতে চাইল, 'এর আগে কোথাও কাজ করেছেন?'

'কয়েক মাস আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছি। ঠিক চাকরি করিনি কোথাও।'

'তবে কি করেছেন?'

'এল-বি'র পাড়ে নর্থল্যান্ড স্যানাটোরিয়ামে একজন পাকিস্তানী অফিসারের কাছে মাঝে মাঝে কাজ করেছি।'

তরুণ ন্যাকামি করে প্রশ্ন করল, 'ইজ হি এ বিজনেসম্যান?'

'না, না, বিজনেসম্যান না। পারহ্যাপস হি ইজ অ্যান আর্মি অফিসার।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'উনি যে কেবল রাওলপিন্ডি আর পেশোয়ারে আর্মি অফিসারদেরই চিঠি লেখেন।'

তরুণ আর এগোয়নি। বুঝেছিল, অফিসারটি অসুস্থ নয়; কারণ চিকিৎসার জন্য স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হলে নিশ্চয়ই এত চিঠিপত্র লেখালেখি বা কাজকর্ম করতেন না। ওটা নিশ্চয়ই একটা কভার। গোপনে কাজ করার কায়দা মাত্র।

মিস হেরম্যানের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার টাইপ হবার আগেই বন-এর ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে মেসেজ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন থেকে দিল্লি; দিল্লি থেকে করাচি।

দিন দুয়েকের মধ্যেই বার্লিনে খবর এসে গেল। ...কয়েকদিন আগে করাচিতে পাকিস্তান-কানাডার চুক্তি হলো যে দু বছর অন্তর দু দেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির ডেলিগেশন এক্সচেঞ্জ হবে। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির যে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এই ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তিনি এবার এ স্বাক্ষর করেননি। শোনা যাচ্ছে উনি অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্য জেনেভা গেছেন।

পাকিস্তান অবজার্ভার, ডন, পাকিস্তান টাইমস ও আরো বহু পত্রিকায় নানা চুক্তি সই করার পর ওই অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির ছবি ছাপা হতো। খবরের সঙ্গে এইসব ছবির কয়েকটা কপিও দিল্লি থেকে বার্লিনে পাঠানো হলো।

একটু কায়দা করে মিস হেরম্যানকে ছবিগুলি দেখাতেই সে বলে উঠল, 'এই ভদ্রলোকের কাছেই সে কাজ করেছে।'

ইতিমধ্যে রোমের একটি পত্রিকায় খবর বেরুল, ইতালি পুরনো ন্যাটো আর্মস বিক্রির জন্য মিডল ইস্ট ও ফার ইস্টের কয়েকটি দেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই কানাডা, পশ্চিম জার্মানি ও পর্তুগালের কয়েকটি পত্রিকায় অনুরূপ খবর বেরুল।

ঠিক এই পটভূমিকায় পাকিস্তান ডিফেন্স মিনিস্ট্রির অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির বার্লিন উপস্থিতির তাৎপর্য বুঝতে ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের কষ্ট হলো না। দিল্লি আরো তৎপর হলো।

মেসেজ চলে গেল চারদিকে। ওয়াশিংটন, লন্ডন, বন, রোম, প্যারিস ও আরো কয়েকটি

'ন্যাটো' কান্ট্রিতে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতরা সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ওই সব দেশের ফরেন মিনিস্ট্রির সঙ্গে। কোনো কোনো দেশ ন্যাকামি করে বলল, 'উই হ্যাড নো ইউফরমেশন অ্যাবাউট সেল অফ ন্যাটো আর্মস।'

ওয়াশিংটন থেকে বলা হলো, 'ন্যাটো আর্মস নিয়মিত আধুনিকীকরণ করা হয়। ইট ইজ এ রেগুলার প্রসেস। বাট ওই আর্মস অন্য দেশে বিক্রি করতে হলে আমাদের পারমিশন চাই। সুতরাং ডোন্ট ওরি!'

ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডরকে তাঁরা একথাও বললেন, 'উই উইল থিংক টোয়াইস বিফোর উই অথোরাইজ এনি সাচ সেল টু পাকিস্তান।'

সব শেষে করাচি। ইন্ডিয়ান হাইকমিশনার পাকিস্তান ফরেন সেক্রেটারিকে বললেন, 'আপনারা আর্মস নিলে আমাদের দুই দেশের রিলেসানস অ্যাফেক্ট করতে বাধ্য।'

পাকিস্তান ফরেন সেক্রেটারি বললেন, 'আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ পজিশন খুব খারাপ। কোরিয়ার যুদ্ধ থেমে যাবার পর আমাদের পাটের বাজারও খুব খারাপ। ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাবে আমরা প্রয়োজনীয় ফুড গ্রেনস্ ও ইন্ডাস্ট্রির জরুরি ইম্‌পোর্টস পর্যন্ত করতে পারছি না! সুতরাং ন্যাটো আর্মস কিনব আমরা? ইট উড বি এ বিবলিক্যাল ড্রিম ফর আস!'

ফরেন সেক্রেটারি ইন্ডিয়ান হাই-কমিশনারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হাসি-ঠাট্টা করে বললেন, 'অনেক কষ্টে দু দেশে রিলেসান্স একটু ইমপ্রুভ করেছে। এখন আর কিছু না হোক আমি আমার লক্ষ্ণৌর পুরনো বাড়িতে যেতে পারি, বুড়ী নানীর সঙ্গে দেখা করতে পারি, শালীর একটু ওয়ার্ম কোম্পানি পেতে পারি। ডু ইউ থিংক আমরা এমন কাজ করব যাতে এই সম্পর্কটাও নষ্ট হয়ে যায়।'

'আমরাও তো তা আশা করি না!'

ফরেন সেক্রেটারি শেষে বললেন, 'ভুলে যাবেন না উই আর সেয়ারিং সেম হিউম্যান মিজারিজ! ওই যে ইন্দ্রাণীর কেসটা আপনারা রেফার করেছেন...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...'

'ভাবুন তো কি ট্রাজেডি!...আই অ্যাম প্যার্সোন্যালী লুকিং ইনটু দ্য ম্যাটার এবং আশা করি দু এক মাসের মধ্যেই মেয়েটিকে খুঁজে বার করা যাবে।'

'উই উইল বী গ্রেটফুল...'

'গ্রেটফুল হবার দরকার নেই। তবে দেখবেন যেন ওদের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে পারি।'

হাসতে হাসতে হাই-কমিশনার বললেন, 'আমি নিজে এসে আপনাকে নেমন্তন্ন করে যাব।'

মাসখানেক তীব্র উত্তেজনার মধ্যে কাটাবার পর দিল্লি থেকে পাকিস্তানী ফরেন সেক্রেটারির মন্তব্যের রিপোর্ট পেয়ে দীর্ঘদিনের ক্লান্তি এক মুহূর্তে বিদায় নিল। অনেক দিন পর আবার ইন্দ্রাণীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করল তরুণ।

দিন তিন-চার পরেই মিঃ ট্যান্ডন তরুণকে ডেকে পাঠালেন।

'বসো তরুণ।'

'কি ব্যাপার।'

'দেয়ার ইজ এ গুড পিস অফ নিউজ ফর ইউ।'

চমকে উঠল তরুণ। তবে কি ইন্দ্রাণীর কোনো খবর পাওয়া গেছে? তরুণ মুখে কিছু বলল না, উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল ট্যান্ডন সাহেবের মুখের দিকে।

'প্রথম কথা, তুমি প্রমোশন পাচ্ছ...'

তরুণ শুধু একটু হাসল।

'দ্বিতীয় কথা, তোমার ট্রান্সফার হচ্ছে।'

'কোথায়?'

'বোধহয় লন্ডনে।'

তরুণ হেসে ফেলল। 'লন্ডনে?'

'মনে হয় তাই।'

তারপর ধীরে ধীরে মিঃ ট্যান্ডন জানালেন, 'ন্যাটো আর্মস সেল নিয়ে যা হয়ে গেল, তার জন্য মিনিস্ট্রি মনে করে তোমাকে আর বার্লিনে রাখা ঠিক নয়।

'সেটা আমিও ফিল করছিলাম।'

'অ্যাম্বাসেডর যা বললেন তাতে মনে হয় তোমাকে ফার্স্ট সেক্রেটারি, পলিটিক্যাল করে লন্ডনেই পাঠান হবে। তবে...'

'তবে কি?'

'হয়তো ইন-বিটুইন দু এক মাসের জন্য দিল্লিতে যেতে হতে পারে।'

শালগ্রাম শিলার আর শোওয়া-বসা? স্ত্রীর অমত, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সমস্যা যখন নেই, তখন লন্ডন আর দিল্লি। সবই সমান।

প্রমোশন? কৃতিত্বে, উন্নতিতে আর পাঁচজন খুশি হয় বলেই আনন্দ। কিন্তু তরুণ কাকে খুশি করবে? হ্যাঁ, বন্দনা-বিকাশ নিশ্চয়ই খুশি হবে, কিন্তু...

ওই কিন্তুটা তরুণের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওর থেকে মুক্তি নেই।

দু একদিন পরেই ঢাকা থেকে দেশাই-এর একটা চিঠি পেল, ঠিক বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করার জন্য হঠাৎ অত্যন্ত বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে। মনে হয় করাচি থেকে চাপ এসেছে।

ওই চিঠিটা ওইখানেই শেষ। তবে সঙ্গে আরেকটা স্লিপ। তাতে লিখেছে, 'আজ অফিসে এসেই খবর পেলাম যে রায়টে ইন্দ্রাণীর বাবা-মা মারা যান। আগে বাড়িতে যখন আগুন লেগেছিল তখন চাপা পড়ে ছোটভাই মারা যায়। এর পর ইন্দ্রাণীকে স্থানীয় এক মুসলমান পরিবার আশ্রয় দেন।'

দেশাই শেষে লিখেছে, 'ইস্ট পাকিস্তানের ডি-আই-জি (সি-আই-ডি) নিজে কেসটা ডিল করছেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই আরো খবর জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

চিঠিটা বার বার পড়ল। দশবার-বিশবার পড়ল। একটা চাপা উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ল তরুণ। চিঠিটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে গেল মিঃ ট্যান্ডনের ঘরে।

ট্যান্ডন সাহেবও চিঠিটা বার কয়েক পড়লেন। হেসে বললেন, 'সত্যি সুখবর।'

একটু পরে বললেন, 'পাকিস্তান ওদের অনেস্ট ইন্‌টেনশন প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

নিজের ঘরে ফিরে এসেই তরুণ দেশাইকে কেবল্‌ পাঠাল, 'থ্যাঙ্কস্‌ ইওর কাইন্ড লেটার স্টপ অ্যাংসাস্‌লি এক্‌সপেক্‌টিং ফারদার ডেভলপমেন্ট স্টপ লাভ টরুণ।'

আশা-নিরাশার দোলায় তরুণ প্রায় পাগল হয়ে উঠল। দেশটা দু টুকরো হবার পর পূর্ব বাংলার বহু হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমানদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে নানা কারণে। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়। তাদের কেউ সুখী, কেউ অসুখী।

এমন অনেক মেয়ের কথা তরুণ জানে। শাঁখা-সিঁদুর পরেও অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান স্বামীর ঘর করছে, তাও সে জানে।

দিল্লিতে থাকতে এমন অনেক কেস সে নিজে ডিল করেছে। নাটক-নভেলকে হার মানাবে সে-সব কাহিনি। গুণ্ডা-দস্যুদের হাত থেকে হিন্দু মেয়েদের বাঁচাবার জন্য সারা পূর্ব বাংলার বহু মুসলমান পরিবার তাদের ঠাঁই দিয়েছেন নিজেদের পরিবারে। অনেক প্রগতিশীল যুবক হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরকরণ না করিয়েই বিয়ে করেছে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দপ্তরে গিয়ে।

বাঙালির জীবনের সেই ঘন দুর্যোগের রাত্রিতে আরো কত কি হয়েছে! কেউ কেউটে সাপের মতো ছোবল দিয়েছে, আবার কেউ পশুরাজ সিংহের মতো ঔদার্য দেখিয়ে হাতের কাছের শিকার ছেড়ে দিয়েছে।

ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টে এমনি কোনো বিপর্যয় ঘটেনি তো?

ভাবতে পারে না তরুণ।

কুড়ি

প্রতি মানুষের জীবনের কিছু কিছু চরম মুহূর্ত আসে, যখন প্রতিটি মুহূর্তের অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, গুরুত্ব আছে। সর্বস্তরের সব মানুষের জীবনেই এমন মুহূর্ত আসে।

তরুণের জীবনে আজ আবার তেমনি চরম মুহূর্ত হাজির।

এমন মুহূর্ত এর আগেও এসেছে। পরীক্ষার হলে কোশ্চেন পেপার পাবার আগে, রেজাল্ট বেরুবার দিন, ফরেন সার্ভিসের ইন্টারভিউ দেবার সময় হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন শুনতে পেয়েছে। কেন? ঢাকার সেই শেষ দিনগুলোতে? কিন্তু আজ যেন সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চের রায় বেরুবার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর যেন আর কোনো গতি নেই।

দেশাই-এর চিঠি পাবার পর দিনই দিল্লি থেকে একটা মেসেজ পেল তরুণ। দেশাই যে খবর দিয়েছিল, সেই খবরই পাক পররাষ্ট্র দপ্তর দিল্লিতে পাঠিয়েছে এবং তরুণ তারই কপি পেল।

সময় যেন কাটে না, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন আরো জোরে শুনতে পায়। সে এক বিচিত্র অনুভূতি! চব্বিশ ঘণ্টা কত কি ভাবে। কত আজেবাজে চিন্তা আসে মনে। বহু মেয়েকে প্রথমে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়ে পরে পাচার করা হয়েছে লাহোরের আনারকলি বাজারের পিছনের সরু গলিতে। সেখানে তাদের নাচ শেখান হয়েছে, গান শেখান হয়েছে, শেখান হয়েছে বেলুচিস্থানের প্রাণহীন মরুভূমির হৃদয়হীন মানুষগুলোকে প্রলুব্ধ করতে। ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টে যদি...।

মাথাটা ঘুরে ওঠে তরুণের। সারা শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনগুলো হঠাৎ খুব জোর হয়েই থেমে গেল!

প্রিয়জন সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা দেখা দিলেই যত খারাপ চিন্তা মনে আসে।

মনে আসবে না? সেই সর্বনাশা দিনগুলোতে কি হয়নি? সুস্থ স্বাভাবিক মানুষগুলোও যে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। স্নায়ুগুলো যেন সেতারের তাদের মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল বহুজনের মধ্যে। সুপ্ত পশু প্রবৃত্তিগুলোরই তখন রাজত্ব। মানুষগুলো ফিরে গিয়েছিল তার আদিমতম অন্ধকার দিনগুলিতে।

ইন্দ্রাণী কি এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? লাহোর, পেঁশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডির কোনো

হারেমে তার স্থান হয়নি তো?

হয়তো হয়েছে, হয়তো হয়নি। বাঙালির জীবনের সেই চরম অন্ধকার রাত্রেও কিছু কিছু মহাপ্রাণ 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে এসেছিলেন অসহায়া শিশুকে আশ্রয় দিতে, বিপদগ্রস্তা যুবতীর সম্মান রক্ষা করতে, নিঃসম্বল নারীকে আশ্রয় দিতে। এগিয়ে এসেছিলেন বহু ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক। পূর্ব বাংলার এই সব মহান, মহাপ্রাণ মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে বহু হিন্দু মেয়ে সন্তানের মতো স্নেহ পেয়েছে, আপন বোনের মতো ভালোবাসা পেয়েছে, মায়ের সম্মান পেয়েছে।

ইন্দ্রাণী কি এমনি কোনো পরিবারের একটু আশ্রয় পায়নি?

ঢাকায় কত মুসলমান পরিবারের সঙ্গেই তো ওদের ভাব, ভালোবাসা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ঈদের দিন কত বাড়িতে ঘুরে ঘুরে মিষ্টি খেয়েছে। অসহায়া ইন্দ্রাণীকে দেখে কি তাঁদের কারুর মন কেঁদে ওঠেনি? কেউ কি ওকে কোলে তুলে নেয়নি? চোখের জল মুছিয়ে দেয়নি?

নিশ্চয়ই দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে তরুণ যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। ঢাকা থেকে একটা চিঠি, করাচি থেকে হাবিবের একটা মেসেজ পাবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

সেদিন বিকেলে হঠাৎ মনে পড়ল বন্দনার দু দুটো চিঠি এসে গেছে অথচ উত্তর দেওয়া হয়নি। ইন্দ্রাণীর চিন্তায় আর কাউকে ভাবার অবকাশ পায়নি। বন্দনাকেও না?

অ্যাপার্টমেন্টে একলা একলা বসেছিল কিন্তু মনে হল সবাই জেনে গেল বন্দনাকেও সে ভুলতে বসেছে।

ছি, ছি।

নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিল। আর কিছু না হোক, ওর প্রমোশনের খবর, লন্ডনে বদলী হবার সংবাদটা অতি অবশ্যই বন্দনাকে জানান উচিত ছিল। দেশাই-এর চিঠিটার কথাই বা কেন লিখবে না?

আর দেরি করল না। বন্দনাকে সব লিখল, সব কিছু জানাল। সব শেষে লিখল, 'জানি না কি লিখলাম, কি জানালাম। মনের যা অবস্থা। দাদা হয়ে ছোট বোনকে এসব লেখা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারছি না। সে বিচার করার মানসিক অবস্থা আমার নেই। তবে বোন, তোমাকে ছাড়া আর কাকে লিখব? তুমি তো শুধু আমার বোন নয়, তুমি আমার মা, তুমি আমার বন্ধুও বটে।'

আর লিখল, 'মনে হচ্ছে তোমাদের ওখানে যাবার পরই বিধাতা আমাকে চরম খবরটা জানাবেন। হয়তো আমার জন্য তোমাদের অদৃষ্টেও কিছু দুর্ভোগ জমা আছে। যদি সত্যিই কোনো সর্বনাশা খবর পাই, তাহলে দাদাকে আর খুঁজে পাবে না। তোমাদের দু ফোঁটা চোখের জল পড়লেই আমার আত্মার শান্তি হবে। এর চাইতে বেশি কিছু করলে আমি যে ঋণের বোঝা বইতে পারব না।'

বন্দনার চিঠি আসতে দেরি হলো না। দীর্ঘ চিঠির শেষে লিখল, 'দাদা, তোমার কোনো অকল্যাণ হতে পারে না। আর কেউ না জানুক, আমি অন্তত জানি তুমি কি ধাতু দিয়ে তৈরি, ঔদার্যে ভরা। আমার মতো নিঃসম্বল অসহায়া মেয়েকে যে চরম সর্বনাশের মুখ থেকে রক্ষা করেছে, তার অকল্যাণ করার সাহস ভগবানেরও নেই।'

চিঠিটা শেষ করে আবার নিচে লিখেছিল, 'তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে? তুমি যেভাবেই হোক দিল্লি যাওয়া বন্ধ কর। আমার মনে হয় তোমার এখন আমার কাছেই থাকা

উচিত। যত তাড়াতাড়ি পার এখানে চলে এসো।

ট্যান্ডন সাহেবও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। তরুণের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে ওর দিল্লি যাওয়াটা ঠিক পছন্দ করছিলেন না। ইতিমধ্যে একদিন অ্যাম্বাসেডরের সঙ্গে টেলিফোনে অন্যান্য কথাবার্তা বলতে বলতে এই প্রসঙ্গটাও তুলেছিলেন, 'স্যার, ও এখন এমন টেনসনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে যে দিল্লিতে না গেলেই ভালো হয়।'

'আই ডু রিয়ালাইজ দ্যাট।'

'আপনি একটু দেখবেন...'

'নিশ্চয়।'

গুরুত্বপূর্ণ ডিপ্লোম্যাটদের বদলি করে দিল্লি এনে তাদের ব্রিফিং করা হয় নানা বিষয়ে। এর প্রয়োজন আছে, গুরুত্বও আছে। কিন্তু দু চারদিনের ব্রিফিং-এর জন্য সরকারি অর্থে দু-এক মাস ভারত ভ্রমণ ও আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করাই চলতি রেওয়াজ। কেউই আপত্তি করেন না—কারণ যিনি আপত্তি করবেন, তিনিও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চান না।

অ্যাম্বাসেডর নিশ্চয়ই দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কারণ ট্রান্সফার অর্ডারে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল, 'অ্যাজ সুন অ্যাজ হি কমপ্লিটস্ হিজ রাউন্ড অফ ব্রিফিং হিয়ার, হি সুড প্রসিড টু লন্ডন টু জয়েন হিজ নিউ পোস্ট।' অর্থাৎ ব্রিফিং শেষ হলেই লন্ডন যেতে পারে।

এরপর পরই অ্যাম্বাসেডর নিজেই একদিন তরুণকে টেলিফোন করলেন, 'দিল্লিতে তোমার কদিন লাগবে?'

'তিন-চারদিন। খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ।'

'তুমি কি তারপর একটু ঘোরাঘুরি করবে?'

'না স্যার, তেমন কোনো প্ল্যান নেই।'

'তাহলে তুমি আমার একটা উপকার করবে?'

'নিশ্চয়ই স্যার। একথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন?'

'আমার ছোট মেয়ে যমুনাকে চেন তো?'

'খুব চিনি, স্যার।'

যমুনা অ্যাম্বাসেডরের ছোট ভাইয়ের কাছে থেকে বোম্বে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিল। ওকে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে ভর্তি করার চেষ্টা চলছিল, তাও তরুণ জানে।

অ্যাম্বাসেডর আবার বললেন, 'আমার ছোট ভাই গত মাসে হঠাৎ বদলি হয়ে মাদ্রাজ চলে গেছে। ওর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা বোম্বেতেই আছে। যমুনার অ্যাডমিশন ফাইন্যাল হয়ে গেছে কিন্তু ও চলে আসার আগে আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি একটু ওকে দেখতে চান।'

'স্যার, ওঁরা তো দিল্লিতেই থাকেন?'

'হ্যাঁ। তাই বলছিলাম তুমি যদি যাবার সময় বোম্বে হয়ে যেতে...'

'নিশ্চয়ই।'

'আর ফেরার সময় যমুনাকে নিয়েই এখানে চলে এলে...'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, স্যার।'

সব কথাবার্তা হবার পর অ্যাম্বাসেডর যমুনাকে চিঠি লিখে জানালেন, 'আংকেল তরুণ মিত্রের সঙ্গে দিল্লি যাবে এবং ওরই সঙ্গে এখানে চলে আসবে।'

তরুণ বন্দনাকে জানাল, দিল্লিতে যাব, তবে মাত্র সপ্তাহ খানেকের জন্য। তারপর এখানে

কদিন থেকেই লন্ডনে চলে যাব। কেনসিংটন গার্ডেনে আমাকে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া হবে। বিকাশ যেন রঙ্গস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাপার্টমেন্টটা ঠিক করে রাখে।

অসহ্য অস্বস্তিভরা দিনগুলি যেন কাটছিল না তরুণের। এই ট্রান্সফার হওয়া নিয়ে তবু কয়েকটা দিন কেটে গেল।

আবার সেই দুশ্চিন্তা মাথায় এলো। অফিসে, পার্টিতে সময়টা তবু কাটে কিন্তু এই হাল্সা কোয়ার্টারের নির্জন অ্যাপার্টমেন্টে এলেই যত আজব চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করে। ঢাকার কথা মনে পড়ে।

মাথাটা আবার ঘুরে ওঠে, শরীরটা ঝিমঝিম করে।

এরই মধ্যে হাবিবের চিঠি এলো, ফরেন সেক্রেটারি স্বয়ং কেসটা ডিল করছেন এবং আমার কাকা বলছিলেন যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব খবর পাওয়া যাবে।

ভালো কথা। কিন্তু তাতে কি মন ভরে? দুশ্চিন্তা যায়?

ঠিক পরের দিনই আবার দেশাই-এর চিঠি এলো।...'ডি-আই-জি'র রিপোর্টের কপি আজই আমরা পেলাম। দীর্ঘ রিপোর্ট। আজই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে দিল্লি পাঠানো হলো বলে কপি করা সম্ভব হলো না। তবে ওই রিপোর্টের মেন সামারিতে বলা হয়েছে যে, লেট রবীন্দ্রনাথ গুহের কন্যা কুমারী ইন্দ্রাণী গুহ মর্ডান হিস্ট্রিতে এম-এ পড়ার জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেয়, কিন্তু সিক্সথ ইয়ারে ওঠার পরই পড়া ছেড়ে দেয়।...'

'...এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার জন্য ইন্দ্রাণীর আবেদনপত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন রেজিস্টারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।...'

দেশাই-এর চিঠি পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তরুণ। কি? কি খবর জানা গেল :

...প্রথম কথা জানা গেল তাঁর বাবা জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় কথা সে অবিবাহিতা ছিল।...

অবিবাহিতা? তরুণ যেন একটু আশার আলো দেখতে পায়।

...তৃতীয় কথা তাঁর অভিভাবকের নাম লেখা আছে আজিজুল ইসলাম, প্লিডার।...

আজিজুল ইসলাম? পুরনো দিনের ঢাকার স্মৃতি তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে তরুণ। চিঠি পড়া বন্ধ করে আপন মনে বার বার বলে—আজিজুল ইসলাম!

...রিলেশন সিপ উইথ দি গার্ডিয়ানের ঘরে লেখা আছে, আংকেল।...

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা বেশ জোর করে কামড়ে ধরে তরুণ বলে, আংকেল? তবে কি ইন্দ্রাণী কোনো আশ্রয় পেয়েছিল?

...বার লাইব্রেরিতে খোঁজ-খবর করে জানা গেছে যে মিঃ আজিজুল ইসলাম হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তবে সঠিক সময়টা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। মিস গুহ এক বছর এম-এ পড়ার পরই কেন আর পড়লেন না, তা জানা যায়নি। প্রথমে সন্দেহ হয় যে হয়তো বিয়ে...

তরুণ প্রায় আঁতকে ওঠে, বিয়ে? তাহলে শেষ পর্যন্ত—।

চিঠিটা হাতে করে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজের অস্তিত্বটা যেন নিজেই বুঝতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

...বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে ঠিক ওই সময়েই মিস গুহের নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। ঠিক কি কারণে ও কোন দেশে উনি যান, তা খোঁজ করা হচ্ছে। আজিজুল ইসলাম সাহেব মারা যাবার পর ওর একমাত্র ছেলে ঢাকার বাড়ি বিক্রি করে দেন ও কিছুকালের মধ্যেই পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। মিস গুহ ওরই সঙ্গে বিদেশ যান কিনা, তার কোনো রেকর্ড ঢাকা এয়ারপোর্ট বা ইমিগ্রেশান

বা পুলিশের কাছে নেই। করাচিতে অনুসন্ধান করলে নিশ্চয়ই সেসব খবর পাওয়া যাবে।

চিঠির শেষে দেশাই লিখেছে, 'মনে হয় ঢাকাতে আর বিশেষ কিছু করণীয় নেই। তবে যদি করণীয় থাকে, জানাতে দ্বিধা করবেন না। তাছাড়া ডি-আই-জি'র পুরো রিপোর্টটা পড়ে দেখবেন! ঢাকার বহুলোকের মন্তব্য ও রেফারেন্স আছে এবং আপনি হয়তো অনেককে চিনতে পারেন।'

ডি-আই-জি'র রিপোর্টের মূল বক্তব্য পড়ে নতুন সন্দেহের মেঘ জমল তরুণের মনে। তবুও যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলো। কৃতজ্ঞতা বোধ করল দেশাই-এর প্রতি। কেবল্ করে ধন্যবাদ জানাল, 'কাইন্ডলি অ্যাকসেপ্ট সিনসিয়ারেস্ট থ্যাংকস্।'

কিন্তু কে এই আজিজুল ইসলাম? প্লিডার? তরুণের বাবাও তো ওকালতি করতেন। কিছু কিছু উকিলের সঙ্গে তো ওরও পরিচয় ছিল, কিন্তু আজিজুল ইসলাম?

না।

উয়াড়ির ওদিকে হবিবুর ইসলাম বলে একজন উকিল ছিলেন। আর কোনো ইসলাম নামে উকিল ছিলেন কি?

অনেকক্ষণ ভাবল। হঠাৎ মনে পড়ল, ওবেদুর ইসলাম সাহেব তো ওর বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন।

কিন্তু আজিজুল ইসলাম নামে কোনো উকিলকে কিছুতেই মনে পড়ল না। আশেপাশে ঢাকার কোনো লোকও নেই যে খোঁজ-খবর করা যাবে। বার্লিনে বাঙালি নেই বললেই চলে। লন্ডন, নিউইয়র্ক হলে ঢাকার কতজনকে পাওয়া যেত। এমন বিশ্রী জায়গা এই বার্লিন।

অন্য জায়গাতে পাকিস্তান মিশনে কত ঢাকার লোক পাওয়া যায়! এখানে তাও নেই।

আজিজুল ইসলামের চিন্তা করতে করতেই দিল্লি রওনা হবার সময় এসে গেল।

প্লেনে দিল্লি যাবার সময়ও ওই কথাই ভাবছিল, আজিজুল ইসলাম! তেহেরান এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বসেও ভাবছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, আবাল্য বন্ধু মৈনুল ইসলামের কথা। ওর বাবার নাম ছিল তো আজিজুল ইসলাম!

কিন্তু?

কিন্তু তিনি তো মুনসেফ ছিলেন, উকিল ছিলেন না। ডি-আই-জি ভুল করে মুনসেফকে উকিল বলে লেখেননি তো?

মৈনুলদের পরিবারেই কি ইন্দ্রাণী স্থান পেয়েছিল? মৈনুলের মাকে তরুণও আম্মাজান বলে ডাকত। ভদ্রমহিলার বেশ চুল পেকে যায়। ভারি ভালো লাগত দেখতে। আম্মাজানকে কি জ্বালাতনই না করেছে ওরা!

একুশ

অনেক দিন পর সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে বেশ ভালো লাগল। হাজার হোক ভারতবর্ষ! নিজের দেশ! বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে নিজের দেশে ফিরে এলে সবারই ভালো লাগে।

কেবিনের অন্যান্য প্যাসেঞ্জারেরা চলে যাবার পর আস্তে আস্তে তরুণ উঠল। উপরের র‍্যাক থেকে ওভারকোটটা হাতে নিল। ব্রিফকেসটাও তুলে নিল আরেক হাতে।

গ্যাংওয়ের মুখে এয়ার হোস্টেস সারা রাত্রির ক্লান্তি সত্ত্বেও একটু হাসল। 'গুডবাই স্যার।'

তরুণ অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিল, 'বাই।'

যমুনা এসেছিল এয়ারপোর্টে।

কাস্টমস এনক্লোজারের বাইরে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তরুণ চিনতে পারেনি। চিনবে কেমন করে? সেই ছোট্ট যমুনা যে এত বড় হয়ে গেছে, ভাবতে পারেনি।

যমুনাই দৌড়ে গিয়ে ডাকল, 'আংকেল, আই অ্যাম হিয়ার।'

'তুমি যমুনা?'

যমুনা হাসতে হাসতে বললো, 'কেন, সন্দেহ হচ্ছে?'

'না। তবে তুমি কত বড় হয়ে গেছ!'

যাদের ছোট্ট দেখা যায়, দেখা যায় হামাগুড়ি দিতে, টফি চকোলেট-আইসক্রীম নিয়ে মারামারি করতে, অনেক দিনের অদর্শনের পর তাদের বড় দেখলে ভালো লাগে। সেই বহু দূরের একটা ছোট্ট স্বপ্ন যেন বাস্তবে দেখা দেয়।

যমুনাকে দেখতে দেখতে তরুণের সারা মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

'নো আংকেল, আই ওয়াজ নট এ কিডি হোয়েন ইউ স মি লাস্ট। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়তাম।'

শুধু দুপুরটা বোম্বেতে কাটিয়েই আফটারনুন ফ্লাইটে যমুনাকে নিয়ে দিল্লি এলো তরুণ। পালাম থেকে সোজা গেল পুসা রোডে, যমুনার দাদুর বাড়িতে! বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নাতনীকে পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন। তরুণকে ধন্যবাদ জানালেন। ওদের ওখানেই থাকবার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন।

'কাইন্ডলি অত অনুরোধ করবেন না। আই অ্যাম কমিটেট টু স্টে উইথ এ ফ্রেন্ড অফ মাইন।'

বিদায় নেবার আগে যমুনাকে বললে, 'দাদু-দিদিমাকে বেশি জ্বালাতন করো না। দরকার হলে আমাকে টেলিফোন করো!'

তরুণ আর দেরি করল না। সোজা চলে গেল বড়ুয়ার ওখানে।

বড়ুয়া বড় পুরনো বন্ধু। বার্লিনে বসেই ওর অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়েছিল। শুধু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিল, আর কিছু করতে পারেনি।

বড়ুয়া একটা গার্ডেন চেয়ারে বসে লনে অপেক্ষা করছিল তরুণের জন্য। ট্যাক্সি এসে থামতেই চিৎকার করল, 'রানি, এসে গেছে।'

রানি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে বলল, 'মাই গড! এত দেরি করলেন?'

'এত দেরি কোথায়? যমুনাকে নামিয়ে দিয়েই তো চলে এলাম।'

তরুণ তাড়াতাড়ি গিয়ে বড়ুয়াকে জড়িয়ে ধরল। 'এখন কেমন আছ?'

'একটু একটু হাঁটা-চলা করছি।'

রানি বলল, 'ও তো এয়ারপোর্টে যাবে বলে ভীষণ জিদ ধরেছিল...'

তরুণ বলল, 'যেতে দাওনি তো?'

'আমার কথা কি শোনে? ডক্টর স্টপড্ হিম গোয়িং।'

'পম্পি কোথায়?'

বড়ুয়া বলল, 'এক্সকারসানে গেছে। তিন-চারদিন পর ফিরবে।'

রাত্রে ডিনারের পর অনেক গল্প হলো। কলহান, মিশ্র, ট্যান্ডন, হাবিব, দেশাই ও কতজনের কথা।

অনেক কথার শেষে বড়ুয়া বলল, 'এখন তো তুমিই সব চাইতে ওয়াইডলি ডিসকাসড্ ডিপ্লোম্যাট।'

'তার মানে?'

রানি মাঝখান থেকে মন্তব্য করল, 'সত্যি দাদা, সারা মিনিস্ট্রি আপনাকে নিয়েই মেতে উঠেছে।'

বড়ুয়া বলল, 'হ্যাটস্ অফ টু ইন্দ্রাণী। একটা বাঙালি মেয়ে দুটো গভর্নমেন্টকে নাচিয়ে দিল।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'আর হোয়াট ডু ইউ মিন-এর টাইম নেই। গেট রেডি ফর এ গ্রেট সেলিব্রেশন।'

তরুণ অত আশাবাদী হতে পারে না, 'ডোন্ট বি ওভার-অপটিমিস্টিক্।'

ডান পা-টা আস্তে আস্তে একটা ছোট্ট মোড়ার উপর তুলে বড়ুয়া বলল, 'তরুণ, আই নো পাকিস্তান বেটার দ্যান ইউ।'

'তা তো বটেই।'

'ইন্দ্রাণীর খবর যদি খারাপ হতো, তাহলে পাকিস্তান এত ঝামেলার মধ্যে যেত না...'

উদগ্রীব হয়ে বড়ুয়ার কথা শোনে তরুণ। 'তার মানে?'

'ইফ ইট ওয়াজ এ হোপলেস কেস, তাহলে ওরা সোজা বলে দিত ইন্ডিয়াতে চলে গেছে। দেন দি বল উড হ্যাভ বিন ইন আওয়ার কোর্ট।'

'নানা কারণে ইন্দ্রাণীর কেসটায় ওরা ইন্টারেস্ট নিচ্ছে কিন্তু...'

'ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ সুইফ্‌টলি দে ক্যান অ্যাক্ট ইন সাম কেসেস।'

'তাতে কি হলো?'

'আমার মনে হয় ওরা ইন্দ্রাণীর সব খবর পেয়ে গেছে এবং এখন আস্তে আস্তে আমাদের সব খবর জানবে।'

'তাতে কি লাভ?'

'ওরা বোঝাবে যে আমাদের একজন ডিপ্লোম্যাটের জন্য কত কি করল।'

'ডু ইউ থিংক সো?'

'একশোবার।'

পরের দিন সকালে সাউথ ব্লকে মিনিস্ট্রিতে গেলে পাকিস্তান ডেস্কের অনেকেই একথা বললেন।

ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান ডেস্কে তরুণ নিজের কাজকর্ম নিয়ে বেশ একটু ব্যস্ত হলেও পাকিস্তান ডেস্কে যাতায়াত করতে হতো নানা কারণে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জয়েন্ট ডিস্কাসনও হতো।

একদিন এমনি ডিস্কাসনের সময় জয়েন্ট সেক্রেটারি বললেন, 'ইন্দ্রাণীকে পাবার পরই নিজেদের বোনাফাইডি প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তান নিশ্চয়ই একটা দারুণ প্রোপাগাণ্ডা শুরু করবে।'

উপস্থিত অফিসাররা অস্বীকার করতে পারলেন না এমন সম্ভাবনা।

তরুণ ওদের আলাপ-আলোচনায় বেশ একটু অবাক হয়। সারা মিনিস্ট্রির প্রায় সবাই ধরে নিয়েছে, ইন্দ্রাণীকে পাওয়া যাবেই।

কিন্তু?

তরুণের অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয়। ইন্দ্রাণীকে পাওয়া গেলেও কি তাতে গ্রহণ করা সম্ভব হবে? তরুণ গ্রহণ করতে চাইলেও তার পক্ষে অসম্ভব হবে না তো?

জয়েন্ট সেক্রেটারি তো দূরের কথা, অন্যান্য কাউকেই এসব কথা বলতে পারে না, জানাতে পারে না, বোঝাতে পারে না। চুপ করে ওদের কথা শোনে, মুখে কিছু বলে না।

মনের মধ্যে অনেক সংশয়, অনেক দ্বিধা সত্ত্বেও দিল্লিতে আসার পর তরুণের মনটা একটু যেন জড়তামুক্ত হলো। একটু যেন আশাবাদী হলো।

হবে না? হাজার হোক এতগুলো মানুষ যে ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বার করার কাজে মেতে উঠেছে তা দেখে তরুণ একটু স্বস্তি পায়। বহুদিন বহুজনের সেবাযত্ন পাবার পরও যদি কোনো রোগী রোগমুক্ত না হয়, যদি সে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেয়, তবুও একটা সান্ত্বনা থাকে। তেমনি এতগুলো মানুষের এত দিনের প্রচেষ্টার পরও যদি ইন্দ্রাণীকে...

না না, তা হয় না। যুক্তি-তর্ক করে অন্যকে বোঝান যায়, সান্ত্বনা জানান যায়। নিজের বেলায়? নৈব নৈব চ।

ইতিমধ্যে করাচি থেকে আর একটা মেসেজ এলো দিল্লিতে।...'উই হ্যাভ চেকড্ আপ আওয়ার রেকর্ডস...। পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে তদন্ত করে জানা গেল আজ পর্যন্ত সাতজন মৈনুল ইসলামকে পাশপোর্ট ইস্যু করা হয়েছে ও তাদের মধ্যে পাঁচজন বিদেশ গিয়েছেন। দু জন মৈনুল ইসলাম পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে আছেন এবং এদের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের, বাট কারেন্টলি ওয়ার্কিং ইন ফরেন সার্ভিস। উই আর কনটাকটিং অল অফ দেম।...'

ওই মেসেজেই আর একটা খবর ছিল।...'মিস গুহের পাশপোর্টের রেকর্ড থেকে জানা গেছে ওঁর পায়ের পাতায় নাকি স্টিচ্ করার চিহ্ন আছে। কাইন্ডলি চেক আপ উইথ মিঃ সেনগুপ্ত এবং একটু তাড়াতাড়ি খবরটার সত্যতা আমাদের জানালে ভালো হয়।

মেসেজটা ডি-সাইফার হয়ে পাকিস্তান ডেস্কে এসেছিল সন্ধ্যার দিকে। ডেপুটি সেক্রেটারি সঙ্গে সঙ্গে মিনিস্ট্রিতে তরুণের খোঁজ করেছিলেন কিন্তু পাননি। একটু পরেই বড়ুয়া ওখানে ফোন করলেন।

'তরুণ, হিয়ার ইজ অ্যান আর্জেন্ট মেসেজ ফ্রম করাচি এবং আজ রাত্রেই উত্তর দিতে হবে।'

করাচি থেকে আর্জেন্ট মেসেজের কথা শুনতেই তরুণ যেন একটু অস্থির হয়ে উঠল। সারা শরীরের রক্ত যেন হুড়মুড় করে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল! কিছু বুঝতে দিল না। ডেপুটি সেক্রেটারিকে বলল, 'হ্যাঁ, ওর ডান পায়ে স্টিচ্ করার চিহ্ন ছিল।'

'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

'নট অ্যাট অল। বরং কষ্ট করে আমাকে ফোন করার জন্য আমিই আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।'

মেসেজটা শোনার পর আবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল।

তখন ও ক্লাস টেন-এ পড়ে। নতুন শাড়ি পরা শুরু করেছে। ব্লেড দিয়ে পায়ের নখ কাটতে কাটতে হঠাৎ হাওয়ায় শাড়ির আঁচলটা বুঝি উড়ে পড়ে সামনের দিকে। এক ঝাঁকুনি দিয়ে শাড়িটা সরাতে গিয়ে ব্রেডটা বসে যায় পায়ের পাতায়। উঃ! কি রক্ত পড়েছিল। পাঁচটা কি ছটা স্টিচ্ করতে হয়েছিল।

ইন্দ্রাণী তখনও বিছানায় শুয়ে। ওঠা-নামা একেবারেই বন্ধ। একদিন তরুণ বলেছিল, 'তোমার শাড়ি পরার কি দরকার?'

'সে কথা তোমাকে বোঝাতে হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করেছিল ইন্দ্রাণী।

'আমাকে ছাড়া আর কাকে বোঝাবে?'

'তোমাকে কোনোদিনই বুঝতে হবে না।'

অনেক দিন পর আজ আবার সেসব কথা মনে পড়ল। একটু বিবর্ণ হয়ে গেল তরুণের মন।

রানি একটু ইসারা করল বড়ুয়াকে।

'কে ফোন করল?' জানতে চাইল বড়ুয়া।

'ডি-এস (পাকিস্তান)।'

'আইডেনটিফিকেশন মার্ক ভেরিফাই করল বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

বড়ুয়া একটু হাসল। আপন মনেই বলল, 'পাকিস্তানিদের ঢং দেখে হাসি পায়!'

'তার মানে?'

'সব খবর-টবর হাতের মুঠোয় থাকার পরও এইসব ন্যাকামির কোনো মানে হয়?'

একটু হেসে বড়ুয়া আবার বলে, 'ব্রাদার, গেট রেডি। শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ডের কয়েক হাজার টাকা অ্যাড্‌ভান্স নিলেই চলবে না। বেশ কিছু খসাতে হবে। নইলে কেউ তোমাকে ছাড়বে না।'

শুধু বড়ুয়া বা রানি নয়, মিনিস্ট্রির অনেকেই সে কথা বললেন, 'তরুণ, আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না কিন্তু।'

'না না, ফাঁকি দেব কেন?'

'ডোন্ট প্রমিস্ লাইক এ প্রমিসিং ডিপ্লোম্যাট।'

শুধু অফিসাররাই নয়, মিনিস্ট্রির নানা ডিপার্টমেন্টের অনেক পরিচিত কর্মচারীও বললেন, 'দাদা, শুধু আপনি বলেই আমরা এত খাটছি।'

'থ্যাংক ইউ।'

'নো নো দাদা, শুধু থ্যাংক ইউ বললেই চলবে না।'

সবার মুখেই ওই এক কথা। শুনতেও যেন ভালো লাগে।

দিনগুলো বেশ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। যমুনাকে দেখতে যেতেও পারেনি। আর মাত্র দুটি দিন হাতে। সেদিন মিনিস্ট্রি থেকে যমুনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিল, বিকেলের দিকে ঠিক হয়ে থাকবে। আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।

লাঞ্চের সময় রানিকে বলল, 'আজ বিকেলে যমুনাকে নিয়ে আসব। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডিনার খাইয়ে দিয়ে আসব।'

রানি বলল, 'ঠিক আছে।'

'আমি তোমাদের গাড়িটা রেখে যাচ্ছি। তুমি পম্পিকে আনার পর চলে এসো অফিসে। তারপর দুজনে মিলে যমুনাকে আনতে যাব।'

রানি কিছুতেই গাড়ি রাখতে রাজি হলো না। বড়ুয়াও বারণ করল, 'না না, তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। যমুনাকে আনতে যাবার আগে রানিকে তুলে নিও অথবা ও ট্যাক্সি নিয়েই সাউথ ব্লকে পৌঁছে যাবে।'

সেদিন যমুনাকে নিয়ে আর পরের দিন মিনিস্ট্রির সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতেই কেটে গেল। একবার ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গেও দেখা করল। রাত্রে তরুণের অনারে বড়ুয়া আর রানি ডিনার দিল।

দিল্লি ত্যাগ করার সময় মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল তরুণের। এত বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ বুঝতে পেরেছে, ওরা সবাই ওকে কত ভালোবাসে, শুভ কামনা করে।

বড়ুয়া পর্যন্ত এসেছিল পালামে বিদায় জানাতে। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও বাধা মানেনি।।

বলেছিল, 'রানিই তো ড্রাইভ করবে, সুতরাং আমার যেতে আপত্তি কি?'

বড়ুয়ার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে তরুণ বিদায় নিল। পম্পিকে একটু বুকের মধ্যে টেনে নিল। রানির মাথায় একটু হাত বুলিয়ে শুধু বলেছিল, 'চললাম। চিঠি লেখো।'

সবার চোখই ছলছল করছিল! কথাবার্তা বিশেষ কেউই বলতে পারল না।

যমুনা পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

প্লেনটা পালামের মাটি ছেড়ে অনেক দূরে উড়ে যাবার পরও তরুণ উদাস দৃষ্টিতে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। কেবিন হোস্টেস কফি দেবার পর দৃষ্টিটা গুটিয়ে আনল ভিতরে।

যমুনা বলেছিল, 'আপনি ওদের সবাইকে খুব ভালোবাসেন তাই না?'

মাথাটা একটু নাড়িয়ে তরুণ বলল, 'ওরাই আমাকে ভালোবাসে।'

কফি শেষ করে যমুনা আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আংকেল, আপনি তো লন্ডনে ট্রান্সফার হচ্ছেন।'

'হ্যাঁ!'

'আমি কিন্তু উইক-এন্ডে আপনার কাছে চলে আসব।'

'তুমি এলে তো আমি খুশিই হবো।'

'আপনি একটু বাবাকে বলে রাখবেন।'

তরুণ হাসে। 'বলব।'

পম্পি, যমুনার মতো বন্ধু-বান্ধব-সহকর্মীদের ছেলেমেয়েদের কাছে পেলেই তরুণের মনে আসে অনেক কথা, অনেক স্বপ্ন। ইন্দ্রাণীকে পেলে ওরও ছেলেমেয়ে এতদিনে বড় হতো, লেখাপড়া করত। ভাবে, ইন্দ্রাণীর মেয়ে হলে এই পম্পি-যমুনার মতোই দেখতে সুন্দর হতো, বুদ্ধিমতী হতো।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে মন উড়ে যায় সীমাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। প্লেন ছুটেছে তেহেরানের দিকে। ফ্রাঙ্কফুর্টের আগে এই একটাই স্টপেজ। সেই তেহেরানও পার হয়ে গেল। পার হলো আরো কত দেশ-দেশান্তর।

অ্যাম্বাসেডর সস্ত্রীক ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে এসেছিলেন যমুনাকে রিসিভ করতে। দুজনেই বার বার ধন্যবাদ জানালেন তরুণকে।

'একথা বলে লজ্জা দেবেন না, স্যার। দিল্লিতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে যমুনাকে নিয়ে একটুও ঘুরতে পারিনি।'

হঠাৎ মাঝখান থেকে যমুনা বলে উঠল, 'বাট আংকেল, দ্যাট ডে উই অল এনজয়েড্ ভেরি মাচ।'

অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতে বললেন, 'তরুণ, ডিপ্লোম্যাট হয়েও হেরে গেলে। ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ।'

একটু পরেই প্যান অ্যামেরিকানের বার্লিন ফ্লাইট। তরুণ সেই প্লেনেই যাবে। অ্যাম্বাসেডরের পার্সোন্যাল অ্যাসিসট্যান্ট তরুণের লগেজ ট্রান্সফার চেক করতে ও বোর্ডিং কার্ড আনতে চলে গেল। সেই অবসরে অ্যাম্বাসেডর আর তরুণ একটু দূরে গিয়ে কিছু গোপন কথাবার্তা বললেন।

তরুণের প্লেন ছাড়ার আগে অ্যাম্বাসেডর বললেন, 'যমুনাকে পৌঁছে দিতে হয়তো আমিই লন্ডন আসব! আই মাইট স্টে উইথ ইউ।'

'আই উইল বি গ্রেটফুল ইফ ইউ প্লিজ।'

বার্লিন বাসের মেয়াদ মাত্র দুটি দিন। ফেয়ারওয়েল লাঞ্চ-ডিনারের জন্যই ওই দুটো দিন

হাতে রেখেছিল তরুণ। আর কোনো কাজ নেই। লগেজের ঝামেলা ওর কোনো কালেই নেই। কিছু জামা-কাপড়, বই-পত্তর আর একটা মুভি ছাড়া আর কিছু নেই ওর। মিঃ দিবাকর সেসব কদিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন লন্ডনে।

প্রথম দিন দুপুরে কলিগদের লাঞ্চ, রাত্রে ট্যান্ডন সাহেবের ডিনার হলো। পরের দিন তরুণ ঘুরে ঘুরে সমস্ত কলিগদের বাড়ি গেল, বিদায় নিল, শুভেচ্ছা বিনিময় করল। রাত্রে কনসুলেটেই ও ডিনার দিল ট্যান্ডনদম্পতি ও অন্যান্য সব কলিগদের জন্য।

সমস্ত কর্মজীবন ধরে বার বার যে দৃশ্যটির মুখোমুখি হতে হয়, সেই দৃশ্যটি আবার হাজির হলো। সবার মনই ভারি, চোখগুলো সবারই যেন একটু চক্‌চক্ করছে। মুখে কারুরই বিশেষ কথাবার্তা নেই। একেবারে শেষ মুহূর্তে তরুণের কাঁধে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে মিঃ ট্যান্ডন বললেন, 'বেস্ট অফ লাক।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।' কলিগদের দিকে ফিরে বলল, 'থ্যাংক ইউ অল।'

ব্রিটিশ ইউরোপীয়ন এয়ারওয়েজের প্লেনটা লন্ডন এয়ারপোর্টের উপর ঘুরবার সময় বন্দনা-বিকাশের কথা মনে হতেই একটু ভালো লাগল। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়েই যেমন সূর্যরশ্মি বেরিয়ে আসে, তেমনি অনেক খুশির মধ্যেও দিল্লি বার্লিনে এয়ারপোর্টের দৃশ্য বার বার মনে পড়ল।

টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এ ঢুকতে গিয়েই তরুণ উপরে ভিজিটার্স গ্যালারীর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, বন্দনা আর বিকাশ আনন্দে উল্লাসে হাসতে হাসতে দু হাতই নাড়ছে। হাই-কমিশনের কয়েকজন বন্ধু ও কর্মচারীও এসেছিলেন।

হাই-কমিশনের একজন স্টাফ কাস্টমস এনক্লোজারে গিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারি-ডেজিগনেট এসেছেন জানাতেই সঙ্গে সঙ্গে তরুণের মালপত্র ছেড়ে দিলেন ওঁরা।

বাইরে আসতেই বন্দনা টিপ করে একটা প্রণাম করল। 'দেখলে দাদা, শেষ পর্যন্ত আমার কথাই ঠিক হলো।'

পুরনো বন্ধু মিঃ মানি বললেন, 'ফিরে এসে বাঁচালে!'

'কেন?'

'ছেলেমেয়েকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একটু ফূর্তি করা যাবে।'

তরুণ হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'সারা জীবনই কি তোমাদের আয়াগিরি করব?'

হাই-কমিশনের একজন স্টাফ জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার, লগেজ গাড়িতে রেখে দিয়েছি। আপনি এখন আপনার অ্যাপার্টমেন্টে যাবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

বন্দনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'সে কি দাদা? আগে আমার ওখানে চলো।'

'তার চাইতে তোমরা আমার সঙ্গে চলো। একটু দেখে শুনে নিয়ে তারপর তোমার ওখানে যাব।'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, তাই ভালো।'

তরুণ বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল। বন্দনা বিকাশও উঠল।

লন্ডনের জীবনটা বেশ ভালোই শুরু হলো। অফিসে কাজকর্মের চাপ বেশি হলেও ভালো লাগে। তাছাড়া বেশ ইন্টারেস্টিং। প্রথম তিন চারদিন তো নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পেল না। লাঞ্চেও বেরুত না, উপরের রেস্তোরাঁ থেকে কিছু আনিয়ে খেত! অফিস থেকে বেরুতে

বেরুতেও অনেক দেরি হতো। সাড়ে সাতটা-আটটা বেজে যেত।

টুকটাক কিছু মার্কেটিং করার ছিল। সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরুবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু অফিস থেকে বেরোবার আগেই হঠাৎ একটা টেলিফোন এলো, 'তরুণ, আমি ওবেদুর।'

ওবেদুর যে এখনও লন্ডনে আছে, তা ও ভাবতে পারেনি। অপ্রত্যাশিত এই টেলিফোন পেয়ে ভীষণ খুশি হলো, 'আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এখনই লন্ডনেই আছ।'

'হালারা ট্রান্সফার করার চেষ্টা করছিল।'

'এতদিন পরেও পূর্ববঙ্গের পোলাদের ওরা চেনেনি?'

'হালারা চেনে বলেই তো আমাদের একটু দূরে দূরে রাখে।'

ওবেদুর একটু থেমে বলে, 'আজ আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে গান-বাজনা আছে। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। আইদার ইউ কাম টু মাই অফিস অর আই উইল কাম ডাউন টু পিক ইউ আপ।'

'ভাই আজকে মাপ করো। আজকে আমার একটু জরুরি কাজ আছে, কদিন একেবারেই সময় পাইনি।'

'এক্ষুনি একজনের কাছে শুনলাম তুমি এসেছ এবং সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন করেছি। আর তুমি আমার ফার্স্ট রিকোয়েস্টই...'

তরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ! এসব কথা বলছ কেন? তোমার সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক?'

এবার ওবেদুর সোজা হুকুম করে, 'দেন প্লিজ ডোন্ট আর্গু এনি মোর। তুমি সাতটা নাগাদ আমার এখানে আসছ তো?'

ওবেদুর রহমান ময়মনসিং-এর ছেলে। তবে তরুণের সমসাময়িক। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশানাল এয়ার লাইনসের লন্ডন অফিসের ম্যানেজার বহুদিন ধরে। বাঙালি ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাগলামি করতে ওর জুড়ি নেই লন্ডনে। তরুণের সঙ্গে বেশ গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল গতবার। এমন বন্ধুবৎসল উদার মানুষ টেমস্-এর পাড়ে দুর্লভ। কিছুতেই না করতে পারল না। তাছাড়া এতকাল বার্লিনে থেকে বাঙালির আড্ডাখানা ভুলতে বসেছে।

একে আড্ডার লোভ, তারপর ওবেদুরের অনুরোধ। তরুণ রাজি হয়ে গেল।

'ঠিক আছে।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে বন্দনাকে টেলিফোন করে বলল, 'আমি ওবেদুরের সঙ্গে এক ঘরোয়া জলসায় যাচ্ছি। নিশ্চয়ই রাত হবে। তুমি আমার জন্য কিছু খাবার-দাবার রেখো।'

'কোথায় যাচ্ছ, দাদা?'

'ঠিক জানি না। ওবেদুরেরই এক বন্ধুর বাড়ি।'

অফিস থেকে বেরুবার মুখে হঠাৎ একটা কাজ এসে গেল।

বেরুতে বেরুতেই সাতটা বেজে গেল। ওবেদুরের ওখানে পৌঁছতেই ও চিৎকার শুরু করে দিল, 'আড্ডা দিতেও কেউ লেট করে?'

একটা মুহূর্ত দেরি করল না ওবেদুর। 'চলো চলো, গাড়িতে ওঠ। আরেক দিন এসে কফি খেও।'

উঠতে না উঠতেই ওবেদুরের অস্টিন-কেম্ব্রিজ টপ্ গিয়ারে ছুটতে শুরু করল। আশেপাশের আর সব গাড়িকে ওভারটেক করে এমন স্পিডে গাড়ি ছুটছিল যে তরুণ ওবেদুরের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলারই কোনো সুযোগ পেল না। টটেনহাম কোর্ট ছাড়াবার পর তরুণ শুধু জানতে চাইল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

ওবেদুর শুধু বলল, 'এইত সামনেই হোবর্নে।'

হোবর্ন টিউব স্টেশন পার হবার পরই ডানদিকে গাড়ি ঘুরল। আবছা আলোয় তরুণ বুঝতে পারল না কোন রাস্তায় ঢুকল। শত খানেক গজ যাবার পরই অনেকগুলো গাড়ি নজরে পড়ল। ওই গাড়িগুলোরই একটু ফাঁকে ওবেদুর গাড়ি ঢুকিয়ে ব্রেক করল।

দুজনেই নেমে পড়ল। গাড়ির চাবিটা পকেটে পুরেই সিগারেট বের করল ওবেদুর। দুজনেই সিগারেট ধরিয়ে দু-চার পা এগিয়েই একটা কর্নারের বাড়িতে এলো। সামনের ঘরেই একদল বাঙালির জটলা। দরজার গোড়াতেই ভিতরের দিকে মুখ করে আরেকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এক ভদ্রলোক।

ওবেদুর ডাক দিল, 'মৈনুল, তোমাগো ঢাকার এক পুলাকে লইয়া...'

ঢাকার মৈনুল শুনতেই তরুণের সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

মৈনুল এদিকে মুখ ফেরাতেই তরুণ ওর মুখের আঁচিলটা দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'মৈনুল!'

এক পলকের জন্য মৈনুল হকচকিয়ে থতমত হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই সারা লন্ডন শহরটাকে চমকে দিয়ে চিৎকার করল, 'আম্মাজান, ইন্দ্রাণী! তরুণ আইছে।'

দুজনে দুজনকে জাপটাজাপটি করে জড়িয়ে ধরল।

মৈনুলের চিৎকার শুনে ওবেদুর থেকে শুরু করে সারা ঘরভর্তি মানুষগুলো মুহূর্তের জন্য প্রাণহীন পাথরের স্ট্যাচুর মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন বুড়ী আম্মাজান আর ইন্দ্রাণী।

'ইন্দ্রাণী!'

'আম্মাজান!'

তরুণ যেন বিশ্বাস করতে পারে না নিজের চোখ দুটোকে।

আম্মাজান হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তরুণকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ভাবি নাই তোমার দেখা পামু। মাইয়াটাকে লইয়া সারা দুনিয়া ঘুরছি তোমার দেখা পাওনের জন্য।

তরুণ স্তব্ধ হয়ে আম্মাজানকে জড়িয়ে ধরে।

হঠাৎ আম্মাজান নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইন্দ্রাণীর হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে তরুণের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললেন, 'বাবা, মাইয়াটাকে তুইলা লও। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না।'

তরুণ মাটিতে বসে পড়ে। ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

সব কিছু কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

মৈনুল আবার হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ওরে তোরা চুপ কইরা থাকিস ক্যান? গান শুরু কর। মিষ্টি লইয়া আয়। আজ আমার ইন্দ্রাণীর বিয়া হইব।'

সোনালী



খোকন ওকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কী আশ্চর্য! তুই শাড়ি পরেছিস!

সোনালী ওকে প্রণাম করে সুটকেশটা হাতে নিয়ে বলল, তুমি কি ভেবেছ আমি চিরকালই ছোট থাকব?

খোকন ড্রইংরুম পার হয়ে ভিতরের দিকে যেতে যেতে বলল, না, না, তুই মস্ত বড় হয়েছিস।

সোনালী সঙ্গে সঙ্গে খোকনের মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি বড় হইনি বড়মা?

খোকনের মা হাসতে হাসতে বললেন, হয়েছিস বৈকি!

শুনলে তো খোকনদা?

এখন আমি এসে গেছি। এখন আর বড়মা বা জ্যাঠামণিকে তেল দিয়ে লাভ নেই। এখন আমাকেই তেল দে।

সোনালী ঘরের একপাশে সুটকেশটা রেখে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে নির্বিকার হয়ে বলল, আমি কাউকে তেল দিই না।

বাজে ফড় ফড় না করে চা দে।

সোনালী রান্নাঘরে চলে যেতেই খোকন বলল, দেখো মা, যত দিন যাচ্ছে সোনালীকে দেখতে তত সুন্দর হচ্ছে।

ওকে দেখে তো কেউ ভাবতেই পারে না ও আমাদের মেয়ে না।

খোকন হেসে বলল, তুমি ওকে যা সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখো...

বাজে বকিস না। ওকে দেখতেই ভালো। একটা সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজ পরলেও ওকে দেখতে ভালো লাগে।

খোকন মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি যাই বলো মা, তুমি ওকে আদর দিয়ে দিয়েই...

তুই বাড়িতে এসেই আমার পিছনে লাগবি না।

সোনালী চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, তোমার স্বভাব আর কোনোদিন বদলাবে না খোকনদা।

ঠাকুমা-দিদিমার মতন কথা বলবি তো এক থাপ্পড় খাবি।

আমাকে থাপ্পড় মারলে তুমিও বড়মার কাছে থাপ্পড় খাবে।

খোকন চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি, বাবা-মা তোকে আদর দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছেন যে এরপর তোকে সামলানোই দায় হবে।

খোকনের মা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, তোর কলেজ খুলবে কবে?

কলেজ পনেরোই জুলাই খুলবে। তবে আমাকে দিন পনেরো পরেই ফিরে যেতে হবে। খোকন হাসতে হাসতে বলল, ছুটির মধ্যেই আমাদের টিউটোরিয়াল হবে।

খোকনের মা আর কিছু না বললেও সোনালী বলল, মাত্র পনেরো দিনের জন্য এত খরচা করে এলে কেন?

তোকে শায়েস্তা করতে।

যতদিন বড়মা জ্যাঠামণি আছেন, ততদিন আমার জন্য তোমাকে কিছুই করতে হবে না।

দ্যাখ সোনালী, আমি এ বাড়ির একমাত্র ছেলে।

আমি এ বাড়ির একমাত্র মেয়ে।

খোকনের মা হাসতে হাসতে বললেন, তুই ওর সঙ্গে পেরে উঠবি না। সোনালী এখন মাঝে মাঝে আমাকে আর তোর বাবাকেও শাসন করে।

সোনালী ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিট পরে এসেই বলল, নাও খোকনদা, এবার চান করতে যাও।

আগে আরেক কাপ চা দে।

আর চা খেতে হবে না।

কবিরাজি না করে যা বলছি শোনো।

বড়মার সামনে এই ধরনের কথা বলে?

খোকন হেসে বলে, আচ্ছা আর বলব না। তুই এক কাপ চা খাওয়া।

সোনালী রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েই পিছন ফিরে বলল, বড়মা, তুমি জ্যাঠামণিকে টেলিফোন করবে না? জ্যাঠামণি হয়ত ভাবছেন, খোকনদা এখনও আসেনি।

হ্যাঁ করছি।

খোকন বাথরুম থেকে বেরুতেই ওর মা ডাকলেন, খোকন খেতে আয়।

খোকন টেবিলে এসে বসতেই সোনালী খেতে দিল।

তুমি খাবে না মা?

তুই খেয়ে নে। আমি আর সোনালী পরে বসব।

পরে বসবে কেন? এখনই বসো।

সোনালী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, তোমার মাছ বেছে দিতে দিতে বড়মার খেতে অসুবিধে হয়। তুমি নামেও খোকন কাজেও খোকন।

দ্যাখ সোনালী, আমি এ বাড়ির একমাত্র ছোট ছেলে।

তুমি কখনও এ বাড়ির একমাত্র বড় ছেলে, আবার কখনও একমাত্র ছোট ছেলে।

খোকনের মা হেসে উঠলেও খোকন ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে আলু-পটলের তরকারি মাখা ভাত মুখে দিয়েই বলল, তরকারিটা লাভলি হয়েছে।

খোকনের মা বললেন, সব রান্নাই সোনালীর।

ইস! কি নুন হয়েছে!

খোকনের মা হেসে উঠলেও সোনালী গম্ভীর হয়ে বলল না জেনে প্রশংসা করলে অন্যায় হয় না।

গ্রামের বুড়িদের মতন বেশ তো প্যাঁচ মেরে কথা বলতে শিখেছিস?

সোনালী হেসে বলে, যাই বলো বড়মা, খোকনদা না থাকলে বাড়িতে লোকজন আছে বলেই মনে হয় না।

খোকন জিজ্ঞেস করল, তুই একলা একলা ঝগড়া করতে পারিস না?

তুমি পারো বুঝি?

আমি কি ঝগড়া করতে জানি নাকি?

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ ছেলের সঙ্গে গল্প করে খোকনের মা শুতে গেলেন। খোকন নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ডাকল, সোনালী একগ্লাস জল দিয়ে যা।

সোনালী এক গেলাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই খোকন ইশারায় ওকে কাছে ডেকে বলল, দেশলাইটা আন তো।

সোনালী এক গাল হাসি হেসে দুটো আঙুল ঠোঁটের উপর চেপে ধরে একটা টান দিয়ে বলল, ধরেছ?

বাজে বকিস না। তাড়াতাড়ি আন।

অত ধমকালে আনব না।

আচ্ছা প্লীজ আন।

সোনালী দেশলাই আনতেই খোকন সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল।

বেশ পাকা ওস্তাদ হয়ে গেছ দেখছি।

আস্তে। মা শুনতে পাবে।

অ্যাসট্রে লাগবে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লীজ নিয়ে আয়।

সোনালী আঁচল দিয়ে ঢেকে অ্যাসট্রে এনে জিজ্ঞেস করল, রোজ কটা খাও?

এক প্যাকেটের বেশি না।

সোনালী চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, এক প্যাকেট!

খোকন মৌজ করে টান দিতে দিতে বলল, আমি তো তবু কম খাই।

এক প্যাকেট কম হলো?

হোস্টেলের সব ছেলেরাই দুই-তিন প্যাকেট খায়।

অত সিগারেট খেলে তো টি বি হয়ে যাবে।

ওসব বাজে কথা ছেড়ে দে।

বেশি সিগারেট খাওয়া খারাপ না?

সে রকম ধরতে গেলে তো সব নেশাই খারাপ।

তবে?

তবে আবার কি?

তাহলে জেনে-শুনে নেশা করছ কেন?

আজকালকার যুগে সবাই কিছু না কিছু নেশা করে।

সবাই মোটেও করে না।

সবাই মানে অধিকাংশ লোকই...

জানো খোকনদা, সিগারেটের গন্ধটা আমার দারুণ লাগে!

ভালো লাগে?

খুউব।

খোকন হাসে।

সোনালী একটু থেমে বলে, তবে যে যাই বলুক, কলেজের ছেলেরা একটু-আধটু সিগারেট না খেলে বড্ড ক্যাবলা ক্যাবলা লাগে।

খোকন ওর কথা শুনে একটু জোরেই হাসে।

হাসছ কেন।

তোর কথা শুনে।

আমি কি এমন হাসির কথা বললাম?

খোকন ওর কথার জবাব না দিয়ে পর পর দু-তিনটে টান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দেয়।

আচ্ছা খোকনদা, আমি কি সত্যিই বেশ বড় হয়ে গেছি? নিজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সোনালী প্রশ্ন করে।

খোকন ওর দিকে একবার ভালো করে দেখে বলল, তা একটু হয়েছিস। তুমি বড়দিনের ছুটিতে যা দেখেছিলে আমি তার থেকে বড় হয়েছি?

নিশ্চয়ই হয়েছিস।

দেখে বুঝা যায়?

শাড়ি পরে তোকে একটু বড় লাগছে।

তুমিও যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছ।

তাই নাকি?

সত্যি বলছি।

খোকন হাসে।

সোনালী হেসে বলে, সামনের বার হয়তো দেখব তুমি দাড়ি কামাতে শুরু করেছ।

খোকন একবার নিজের মুখে হাত বুলিয়ে বললে, সামনের বার না হলেও বছর খানেকের মধ্যে শুরু করতেই হবে।

ভালো কথা খোকনদা, মীরাদির বিয়ে হয়ে গেল।

প্রদীপ আমাকেও একটা কার্ড পাঠিয়েছিল। তোরা গিয়েছিলি?

জ্যাঠামণির অফিসে মিটিং ছিল বলে যেতে পারেননি। আমি আর বড়মা গিয়েছিলাম।

জামাইবাবু কেমন হলো রে?

খুব সুন্দর।

আজকালের মধ্যেই একবার প্রদীপদের বাড়ি যেতে হবে।

প্রদীপদা বোধহয় আজ বিকেলে আসবে।

ও এসেছিল নাকি?

দু-তিন দিন আগে এসেছিলেন।

ও জানে আমি আজ আসছি?

প্রদীপদা বসে থাকতে থাকতেই তোমার চিঠিটা এলো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আর কেউ আমার খোঁজ নিতে এসেছিল?

একদিন মানসদা এসেছিলেন।

মানস? খোকন একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করল।

মানসদা এসেছিল শুনে তুমি চমকে উঠলে কেন?

ও হতভাগা লিখেছিল বিলেত যাচ্ছে।

এবার সোনালী চমকে ওঠে, তাই নাকি?

স্টেশনে নেমেই মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কোনো বন্ধু-বান্ধব এসেছিল কিনা, মা

বলল না কেউ তো আসেনি।

বড়মা অত খেয়াল করেননি।

তোর মতন একটা প্রাইভেট সেক্রেটারি না থাকলে আমি যে কী মুশকিলেই পড়তাম!

সোনালী হেসে বলল, জ্যাঠামণিও ঠিক একই কথা বলেন।

মা রেগে যায় না?

না। বড়মা বলেন, আমি তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হবো কোন্ দুঃখে?

সত্যি, মা যদি এম-এস সি পাস করে রিসার্চ বা প্রফেসারী করতেন, তাহলে অনেক উন্নতি করতেন।

বড়মা আমাকে পড়াতে পড়াতে কি বলেন জানো?

কি?

বলেন তোর জ্যাঠামণিকে বলে আয় আমার মতন মাস্টার রাখতে হলে মাসে মাসে আড়াই শ' টাকা লাগবে।

বাবা কি বলেন?

জ্যাঠামণি গম্ভীর হয়ে বলেন, বিয়ের সময় লাখ টাকা নগদ না দিলে স্বামীর ঘরে এসে এসব খেসারত দিতে হয়।

খোকন আবার একটা সিগারেট ধরাতেই সোনালী বলল, তুমি আবার সিগারেট খাচ্ছ?

দেখতে পাচ্ছিস না?

এই তো, একটু আগে খেলে।

একটু আগে মানে ঘণ্টা খানেকের উপর হয়ে গেছে।

হলেই বা!

গল্প-গুজব করতে গেলেই একটু বেশি সিগারেট খাওয়া হয়। কলেজ ছুটির দিনে তো হোস্টেলের ঘরে ঘরে দার্জিলিং-এর মতন মেঘ জমে যায়।

হোস্টেলে খুব মজা হয়, তাই না খোকনদা?

অতগুলো রাজার বাঁদর এক জায়গায় থাকলে মজা তো হবেই।

হোস্টেলে তোমাদের দেখাশুনার জন্য কোন প্রফেসর থাকেন না?

থাকেন।

খোকন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, মাঝে মাঝে তাকে আমরা এমন টাইট দিই যে তিনি আর এক সপ্তাহ আমাদের ধারে কাছে আসেন না!

প্রফেসরকে তোমরা কী টাইট দেবে?

কত রকম টাইট দিই, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে।

যেমন?

খোকন মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে সিগারেট খায় কিন্তু কোন কথা বলে না।

সোনালী অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে, বলো না খোকনদা, প্লীজ। হোস্টেলের গল্প শুনতে আমার খুব ইচ্ছে করে।

না তোকে বলব না।

কেন?

তুই কখন যে মাকে বলে দিবি, তার কি ঠিক আছে!

না, না, বলব না।

ঠিক বলছিস?

সত্যি বলছি, কাউকে বলব না।

তুই জ্যাঠামণি আর বড়মার যা ভক্ত, তোকে হোস্টেলের কথা বলতে সত্যি ভয় হয়।

মা কালীর নামে বলছি কাউকে কিছু বলব না।

খোকন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, রোজ সকাল-সন্ধেয় হোস্টেল সুপারিণ্টেন্ডেন্ট একবার আমাদের দেখতে আসেন।

কি দেখতে আসেন?

সব ছেলেরা ঘরে আছে কিনা বা পড়তে বসেছে কিনা। তাছাড়া বাইরের কোন ছেলে আছে কিনা তাও চেক করেন।

হোস্টেলে বাইরের ছেলে থাকতে পারে?

বাইরের মানে কলেজেরই বন্ধু-বান্ধব। অনেক সময় নাইট শোতে সিনেমা দেখে বাড়িতে না ফিরে হোস্টেলেই কারুর কাছে থেকে যায়।

বুঝেছি।

হতভাগা রোজ ভোর ছ'টায় এসে আমাদের উৎপাত করে। একদিন সবাই মিলে ঠিক হল আমরা সবাই দরজা খুলে ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকব।

শুনেই সোনালী দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। লজ্জা আর বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এ রাম!

অত রাম রাম করলে শুনতে হবে না।

আচ্ছা, আচ্ছা, বলো।

মৌজ করে সিগারেটে টান দিয়ে খোকন বলল, পরের দিন ভোরবেলায় হোস্টেলের দেড়শ' ছেলেকে তৈলঙ্গস্বামী হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে...

তোমাদের লজ্জা করল না?

হোস্টেলে থাকলে লজ্জা ঘেন্না ভয় বলে কিছু থাকে না।

একটু চুপ করে থাকার পর সোনালী জিজ্ঞাসা করল, পরে উনি কিছু বললেন না?

আমরা কি কচি বাচ্চা?

তবুও এই রকম একটা কাণ্ডর পর কিছুই বললেন না?

শুনেছিলাম সবাইকে ফাইন করা হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয়ে আর কিছু করেননি।

তাহলে হোস্টেলে বেশ ভালোই আছ।

এমনি বেশ মজায় থাকি তবে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট।

কেন?

কি বিচ্ছিরি রান্না, তুই ভাবতে পারবি না।

তাই নাকি?

হ্যাঁরে। গলা দিয়ে নামতে চায় না।

এক গাদা টাকা নিচ্ছে অথচ...

শালারা চুরি করে।

তাহলে তোমরা কি করে খাও?

কি আর করব বল? বাধ্য হয়ে খিদের জ্বালায় সবাই খেয়ে নেয়।

বড়মা তাহলে ঠিকই বলেন।

মা কি বলে?

কালও বাজার করতে গিয়ে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্টের কথা বলছিলেন।

আজ আমি যা খেলাম, হোস্টেলে এর সিকি ভাগও খাই না।

আজকের রান্নাগুলো তোমার ভালো লেগেছে?

আমি ভাবতেই পারিনি তুই এত ভালো রান্না শিখেছিস।

আজকাল বড়মাকে আমি বিশেষ রান্নাঘরে ঢুকতে দিই না।

সব তুই করিস?

বড়মা বেশিক্ষণ রান্নাঘরে থাকলেই শরীর খারাপ হয়। হঠাৎ এক একদিন এমন মাথা ধরে যে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না।

মা যে কিছুতেই ঠিক মতন ওষুধ খাবে না।

তুমিও ঠিক জ্যাঠামণির মতন কথা বলছ।

খোকন আর শুয়ে থাকে না উঠে পড়ে। বলে, যাই, এবার একটু মার কাছে শুই।

সোনালী হেসে বলল, তুমি কলেজে পড়লেও এখনো সত্যিকার খোকনই থেকে গেছ।

খোকন ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি যে মার কাছে শুতে পারি না?

আমি কি তাই বলেছি? কিন্তু...

সোনালীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই খোকন একটু চাপা গলায় বলল, মার পাশে শোবার দিন তো ফুরিয়ে আসছে।

কেন?

কেন আবার? এর পর বউয়ের পাশে...

এ রাম! কি অসভ্য!

খোকন সোনালীর একটা হাত চেপে ধরে বলে, এতে অসভ্যতার কি আছে? আমি যেমন বউয়ের পাশে শোবো তুইও তেমন স্বামীর...

সোনালী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ খোকনদা, কী অসভ্যতা হচ্ছে।

খোকন সোনালীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, বিয়ে করা কি অন্যায়?

অন্যায় হবে কেন?

তবে বিয়ে করার কথা বলতেই তুই আমাকে অসভ্য বললি কেন?

যখন বিয়ে করবে তখন এসব কথা বোলো। সোনালী একটু হেসে বলল, এখন বিয়ে করতে চাইলেও তোমাকে বিয়ে দেওয়া হবে না।

তুই কি আমার বিয়ে দেবার মালিক?

মালিক না হলেও আমার মতামতেরও অনেক দাম আছে।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

খোকন আর দাঁড়ায় না। সোনালীও উঠলো। বলল, আমি কিন্তু একটু পরেই চা করব।

খোকন মাকে জড়িয়ে শুতেই উনি বললেন, তুই এলি আর আমার দুপুরবেলার বিশ্রামের বারোটা বাজল।

তুমি ঘুমোও না।

এমন করে জড়িয়ে থাকলে কেউ ঘুমোতে পারে?

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। আর ঘুমোতে হবে না।

কেন, ক'টা বাজে?

চারটে।

এর মধ্যেই চারটে বেজে গেল?

সময় কি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে?

এই তোর বক-বকানি শুরু হলো।

সত্যি মা, তোমার কাছে এলেই বক-বক করতে ইচ্ছে করে।

মাকে জ্বালাতন না করে কি তোর শান্তি আছে?

মার কথা শুনে খোকন হাসে।

এতক্ষণ তুই কি করছিলি?

সোনালীকে হোস্টেলের গল্প বলছিলাম।

ছুটির মধ্যে তোদের কি সত্যি টিউটোরিয়াল হবে?

আরে দূর! কে ছুটির মধ্যে টিউটোরিয়াল করবে?

তবে যে বলছিলি দিন পনেরো পরেই যেতেই হবে?

ও সোনালীকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলছিলাম।

তুই আসবি বলে ও আজ ক'টায় উঠেছে জানিস?

ক'টায়?

পাঁচটারও আগে।

খোকন শুনে হাসে।

ওর মা বললেন, সকাল আটটা থেকে ও আমাকে স্টেশনে যাবার জন্য তাড়া দিতে শুরু করল।

আচ্ছা মা, সোনালীদের বাড়ির কি খবর?

বিহারীর দোকানটা মোটামুটি ভালোই চলছে আর সন্তোষকে তো তোর বাবা ওঁদেরই অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তুই জানিস না?

না।

সোনালী ওদের বাড়ি যায়?

প্রত্যেক মাসেই যায় তবে রাত্তিরে থাকে না।

কেন?

ও আর আজকাল আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে না।

খোকন আবার হাসে।

ওর মা বলেন, তাছাড়া ও না থাকলে আমাদেরও খুব খারাপ লাগে।

তা তো লাগবেই।

বিশেষ করে তোর বাবার তো এক মিনিট ওকে না হলে চলবে না।

তাই নাকি?

ওর মা হেসে বললেন, সোনালী যেদিন ওর বাবা-মার কাছে যায় সেদিন তোর বাবাকে

দেখতে হয়।

কেন? কি করেন?

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মিনিটে মিনিটে আমাকে শোনাবেন, হতভাগী মেয়েটা না থাকলে বাড়িটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগে যে।

খোকন হেসে বলে, আচ্ছা!

তারপর আটটা বাজতে না বাজতেই নিজে গাড়ি নিয়ে ছুটবেন।...

খোকন একটু জোরেই হাসে।

এখনই হাসছিল? আসলে উনি সোনালীকেই আনতে যান কিন্তু ওখানে গিয়ে বলবেন, কাল ভোরবেলায় চলে আসিস।

সোনালী থাকে?

ও হতভাগীও জানে, জ্যাঠামণি ওকে আনতেই গেছে। ও জ্যাঠামণির গাড়ি চেপে চলে আসে।

সোনালী ট্রেতে করে তিন কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, জানো খোকনদা, বাড়িতে এসে দেখি বড়মা আমার জন্য রান্না করছেন।

খোকনের মা নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য কোনমতে গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি যখন জানি তুই আসবিই তখন তোর জন্য রান্না করব না?

খোকন চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মাকে বলে, যেমন বাবা তেমন তুমি! দুজনেই মেয়েটার মাথা খাচ্ছ।

ওর মা একটু রাগের ভান করে বলেন, তুই চুপ কর।

সোনালী খুশির হাসি হেসে বলল, ঠিক হয়েছে।

খোকন কটমট করে সোনালীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোর জ্যাঠামণি বা বড়মা না। ঠিক একটা থাপ্পড় খাবি।

খোকনের মা এবার সত্যি রেগে বললেন, কথায় কথায় থাপ্পড় মারা কি ধরনের কথা?

বেশ তো শাড়ি-টাড়ি পরছে। এবার কোন একটা হাবা-কানা ধরে বিয়ে দিয়ে দাও না।

সোনালী বলল, তোমার কি এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি যে তুমি আমাকে তাড়াতে চাও?

খোকনের মা সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, দু-এক বছর পরে সত্যি তোর বিয়ের কথা ভাবতে হবে।

খোকন মুহূর্তের জন্য সোনালীকে একবার ভালো করে দেখেই বলল, দু-এক বছর দেরি করারই বা দরকার কী?

সোনালী গম্ভীর হয়ে বলল, আমার ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

খোকনের মা বললেন, খোকন যাই বলুক না কেন, এবার সত্যিই তোর বিয়ের কথা ভাবতে হবে।

সোনালী কোনো কথা না বলে লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুই

পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

মিস্টার সরকার অফিস থেকে বাড়িতে ফিরেই স্ত্রীকে বললেন, শিবানী একটা খবর আছে।

স্বামীর গলার টাই খুলে দিতে দিতে শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, আবার বদলী নাকি?

না।

তবে আবার কি খবর?

মিস্টার সরকার দু'হাত দিয়ে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললেন, যদি বলতে পারো তাহলে তোমাকে এক সপ্তাহের জন্য দার্জিলিং ঘুরিয়ে আনব।

এই বর্ষায় আমি দার্জিলিং যাচ্ছি না।

কেন?

আমি কি পাগল যে এই বর্ষায় দার্জিলিং যাব?

বর্ষাতেই তো দার্জিলিং যেতে হয়। শহরে কোন জানাশুনা লোক দেখা যাবে না। সারাদিন বেশ ঘরের মধ্যে...

অসভ্যতা না করে খবরটা বলো।

অফিস থেকে গাড়ি কিনতে বলেছে।

গাড়ি কিনতে বলেছে মানে?

মানে গাড়ি কেনার টাকা দেবে, মাসে মাসে আড়াইশো টাকা কেটে নেবে।

আর অ্যালাউন্স তো দেবে?

তা তো দেবেই।

তবে তোমাকে আমি গাড়ি চালাতে দিচ্ছি না।

তোমাকে চালাতে পারছি আর গাড়ি চালাতে পারব না?

স্বামীর জামার বোতাম খুলতে খুলতে শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, কবে গাড়ি কিনতে হবে?

এই মাসের মধ্যেই কিনতে হবে!

কি গাড়ি কিনবে?

তুমি বলো।

অস্টিন। ছোটর মধ্যে ভারি সুন্দর গাড়ি।

তোমার দাদার অস্টিন আছে বলে কি আমাকেও অস্টিনই কিনতে হবে?

এই পৃথিবীতে যেন আমার দাদাই একমাত্র অস্টিন চড়েন!

আমিও অস্টিন কিনব ভেবেছি!

আজে-বাজে রঙের গাড়ি নিও না।

তুমি কি রঙের চাও?

স্টিল গ্রে।

নমস্কার স্যার। আমাকে চৌধুরী সাহেব...

তোমার নামই কি বিহারীলাল দাস?

হ্যাঁ স্যার।

চৌধুরী তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কৃতার্থের হাসি হেসে বিহারী বলল, ওঁদের বাড়ির সবাই আমাকে খুব স্নেহ করেন।

তাই বলছিল বটে।

আমার বাবা চৌধুরী সাহেবের বাবার গাড়ি চালাতেন। আর চৌধুরী সাহেব তো আমার কাছেই গাড়ি চালানো শিখেছেন।

শিবানী বললেন, এই সাহেবকে স্টিয়ারিং ধরতে দেবে না।

বিহারী হাসে।

না না হাসির কথা নয়।

কিন্তু সাহেব যদি বলেন?

সাহেব কান্নাকাটি করলেও দেবে না।

শিবানীর কথায় শুধু বিহারী না মিস্টার সরকারও হাসেন।

হাসি থামলে মিস্টার সরকার বিহারীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইনে-টাইনে কাজকর্মের ব্যাপারে চৌধুরী যা বলেছে তাতে আপত্তি নেই তো?

না স্যার।

সোমবার আমার গাড়ির ডেলিভারী পাব।

আমি কখন আসব স্যার?

সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে এসো।

বিহারী দুজনকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

সরকার দম্পতির জীবনে বিহারীলাল দাসের সেই প্রথম আবির্ভাব।

বছর ঘুরে পূজা এলো। শিবানী মিস্টার সরকারকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগো বিহারীকে একটা ধুতি-পাঞ্জাবি দেবে না?

ও তো অফিস থেকে মাইনে পাবে।

তা পাক। হাজার হোক তোমাকে দাদা বলে ডাকে, আমাকে বউদি বলে। আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে।

মিস্টার সরকার ও-কথার কোনো জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পূজায় তুমি আমাকে কি দিচ্ছ?

শিবানী স্বামীর কানে কানে বলল, অনেক অনেক ভালোবাসা।

বিহারী সত্যিই বড় ভালো মানুষ। সব সময় মুখে হাসি লেগে আছে। কোন সময় কাজে না বলে না। সর্বোপরি অত্যন্ত সৎ লোক।

বউদি!

কি বিহারী?

একটা ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।

মিসেস সরকার হেসে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার না আমার?

আপনি কেন অন্যায় করবেন? আমারই অন্যায় হয়েছে।

কি হয়েছে?

শনিবার আপনাদের সিনেমার টিকিট কেটে বাকি পয়সা ফেরৎ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

বিহারী একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা এগিয়ে দিতে গেলেও মিসেস সরকার নিলেন না। বললেন, এত বড় অন্যায় যখন করেছ তখন তোমাকে কিছু খেসারত দিতে হবে।

বলুন বউদি।

আমাকে একটু ঢাকুরিয়া নিয়ে যেতে হবে।

বিহারী এক গাল হাসি হেসে বলল, এ খেসারত দিতে তো আমি সব সময় প্রস্তুত।

মিসেস সরকার ঘুরে দাঁড়াতেই বিহারী বলল, বউদি পয়সাটা নিলেন না?

না।

ঢাকুরিয়া যাবার পথে বিহারী গাড়ি চালাতে চালাতেই মিসেস সরকারকে বলে, বউদি প্রায় তিন বছর গাড়ি কেনা হয়েছে কিন্তু একবারও আপনারা গাড়ি নিয়ে বাইরে কোথাও গেলেন না।

তোমার দাদার বলে সময় হয় না।

সামনের সপ্তাহেই তো দাদার তিন দিন ছুটি।

কেন?

অ্যানুয়াল কনফারেন্সের জন্য বেশি খাটতে হয়েছে বলে সামনের সপ্তাহে দাদার ডিপার্টমেন্টের সব অফিসারদের তিন দিন ছুটি।

ছুটির কথা তোমাকে কে বলল?

অফিসেই শুনেছি!

আজ?

আজ না। কনফারেন্স শেষ হবার দিনই সব অফিসারদের বলে দেওয়া হয়েছে।

অথচ তোমার দাদা আমাকে কিছুই জানাননি।

হয়তো ভুলে গিয়েছেন।

তোমার দাদার সব কথা মনে থাকে। শুধু ছুটির কথা বলতেই ভুলে যান।

বিহারী হাসে।

একটু চুপ করে থাকার পর মিসেস সরকার জিজ্ঞাসা করেন, সামনের সপ্তাহে কোন তিন দিন ছুটি জানো?

বৃহস্পতি-শুক্র-শনি।

তার মানে তো চার দিন ছুটি!

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পরে বিহারী বলে, এই বছরে কোম্পানির অনেক মাল বিক্রি হয়েছে বলে এই ছুটির সময় বাইরে বেড়াবার জন্য বোধহয় কোম্পানি থেকেই খবর দেবে।

এসব কিছু আমাকে বলে না।

দাদা যেন জানতে না পারেন আমি আপনাকে বলেছি।

জানলেই বা কি হবে?

না না বউদি, দাদাকে আমার কথা বলবেন না।

আচ্ছা বলব না।

মিস্টার সরকার গাড়িতে বসতেই বিহারী জিজ্ঞাসা করল, সোজা বাড়ি যাব?

হ্যাঁ।

পার্ক স্ট্রিট ছাড়িয়ে লাউডন স্ট্রিটে ঢুকতেই বিহারী বলল, দাদা একটা কথা বলব?

কি?

কাল বউদির জন্মদিন। কিছু কিনবেন না?

দেখেছ! একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেব?

চল গড়িয়াহাট ঘুরে যাই।

গড়িয়াহাটেই যখন যাচ্ছেন তখন ঢাকুরিয়ার দাদা-বউদিকে কাল আসার কথা বলে আসবেন কি?

মিস্টার সরকার একটু হেসে বললেন, বিহারী তুমি স্টিয়ারিং না ধরলে যে আমার সংসার করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কি যে বলেন দাদা?

দ্যাখো বিহারী, স্ত্রী-পুত্রকে শুধু অন্নবস্ত্র দিলেই সংসারে শান্তি আসে না। এইরকম ছোটখাটো দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলেই সংসারে শান্তি পাওয়া যায়।

একটু পরে মিস্টার সরকার বললেন, ভালো কথা বিহারী, সামনের আঠারই আমাদের চৌধুরীর বাবা-মার বিয়ের ডায়মণ্ড জুবিলী। তার আগে তোমার বউদিকে নিয়ে একটা ভালো ধুতি আর শাড়ি কিনে আনার কথা মনে করিয়ে দিও তো।

দেবো।

ওদের দুজনের খেয়াল না থাকলেও বিহারীর ঠিক মনে আছে।

মিস্টার সরকারকে নিয়ে অফিসে বেরুবার সময় বলল, বউদি আমি দাদাকে পৌঁছে ফিরে আসছি।

কেন?

চৌধুরী সাহেবের বাবা-মার ধুতি-শাড়ি...

মিসেস সরকার হাসতে হাসতে বললেন, আমার একদম মনে ছিল না।

আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন।

ঠিক আছে।

মিস্টার সরকার অফিস যাবার জন্য প্রায় তৈরি। শিবানী ওর পার্স, ডায়েরী, কলম, রুমাল এগিয়ে দিচ্ছেন।

বিহারী একটু দূর থেকেই বলল, বৌদি, দাদা কি তৈরি?

হ্যাঁ।

দাদা কি চেকটা নিয়েছেন?

শিবানী নয়, মিস্টার সরকার জিজ্ঞাসা করলেন, পেট্রোল পাম্পের চেক তো দিয়ে দিয়েছ। আজ আবার কিসের চেক?

বিহারী বলল, আজই তো ইন্সিওরেন্সের...

ওকে কথাটা শেষ করতে হল না। শিবানী বললেন, আজই তো প্রিমিয়াম দেবার লাস্ট দিন, তাই না?

মিস্টার সরকার বললেন, আমি তো একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেন, আজ যদি বিহারী মনে না করিয়ে দিত তাহলে...

মিস্টার সরকার বিহারীকে শুনিয়েই একটু জোরে বললেন, বিহারী ভুলে গেলে ওকে শূলে চড়াতাম না!

এ সংসারে বিহারীর একটা বিশেষ ভূমিকা, বিশেষ মর্যাদা অনস্বীকার্য। ঘরে-বাইরের ছোট-বড়

খুঁটিনাটি হাজার দিকেই ওর নজর। ওর নজর না দিয়ে উপায় নেই। সরকার দম্পতি জানেন, বিহারী যখন আছে তখন চিন্তার কিছু নেই।

তারপর একদিন এ-সংসারে খোকনের আবির্ভাব হতেই হঠাৎ সবকিছু মোড় ঘুরে গেল। বিহারী এখন আর পার্শ্ব চরিত্র নয়, এ সংসারের অন্যতম মুখ্য চরিত্র।

খোকনের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে চা-জলখাবার খেয়ে সবাই মিলে গল্পগুজব হচ্ছিল। হঠাৎ মিস্টার সরকারের মা বললেন, যে যাই বলো, বিহারী না থাকলে কাল একটা কেলেঙ্কারি হতো।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেন, আপনার আদুরে ছেলে শুধু চাকরি করতে জানে। কোনোমতে একদিন টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করেছিল ঠিকই কিন্তু ওকে নিয়ে সংসার করা যে কি দায়, তা আমি আর বিহারী ছাড়া কেউ জানে না।

শিবানীর মা বললেন, এই বয়সের ছেলেরা কোন কালেই সংসারী হয় না। আরও দুটো-একটা ছেলেমেয়ে হোক, তারপর নিশ্চয়ই সংসারী হবে।

শিবানী একটু জোরেই হাসলেন। তারপর বললেন, এই খোকন হবার সময় আমার যা শিক্ষা হয়েছে তাতে আমার আর ছেলেমেয়ে হয়ে কাজ নেই।

মিস্টার সরকারের দিদি মীনা বললেন, যাইহোক শিবানী, আমি এবার বিহারীকে নিয়ে যাচ্ছি। চা বাগানে থাকতে হলে বিহারীর মতন একজন অল রাউন্ডার দরকার।

দিদি, তুমি কি আমার এই উপকারটুকু করার জন্যই দার্জিলিং থেকে এসেছ?

তুই বল শিবানী, ওই মহাদেব নেশাখোর স্বামীকে নিয়ে চা বাগানে থাকা যায়?

মীনার কথায় সবাই হাসেন।

মীনা বললেন, তোমরা হাসছ কিন্তু যে লোকটা অফিসে আর তাসের আড্ডা ছাড়া আর কিছু জানে না, তাকে নিয়ে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মিস্টার সরকারের ছোট বোন বীণা বললেন, দিদি বিহারীকে বউদি ছাড়বে না। তুই বরং আমার বরটাকে নিয়ে যা।

মীনা একবার অজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, অজয় তো একটা ক্লাউন! ওকে নিয়ে কে সংসার করবে?

অজয় সঙ্গে সঙ্গে শিবানীকে বলল ডার্লিং, এই অপমানের পর এক্ষুনি চারটে রসগোল্লা আর পর পর দু কাপ চা না খেলে আমি আর বাঁচব না।

ইন্ডিয়া কিং সিগারেট চাই না?

আমি কি সুহাসদার মতন নেশাখোর?

তাও তো বটে!

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে বিহারী এসে শিবানীকে বলল, বউদি, ছ'শো টাকা দিন!

শিবানী রেগেই বললেন, আমি টাকা পাব কোথায়? তোমার দাদার কাছ থেকে নাও।

বিহারী হেসে বলল, কালো হ্যান্ড ব্যাগ থেকে এখন দিন। পরে আমি...

দ্যাখো বিহারী, তুমিও তোমার দাদার মতন বেশ ওস্তাদ হয়ে গেছ।

এখন দিন। পরে আমি ঠিক দিয়ে দেবো।

শিবানী উঠে ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, তোমার দাদা বুঝি ভয়ে এলেন না?

দাদা একটু কাজে বেরিয়েছেন।

বাজে বোকো না। এক মিনিট আগে ওর গলা শুনলাম আর...

অজয় বললেন, ডার্লিং আমার টাকাটাও এনো।

শিবানী ঘুরে দাঁড়িয়ে অজয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এক লাখ টাকাই আনব?

না, না, হাজার খানেক।

শিবানী মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, জানো দিদি, তোমাদের এই জামাই গতবার কলকাতায় এসে কি রকম ফোর-টোয়েন্টি করে আমার...

ডার্লিং তুমি সে টাকা এখনও পাওনি? আমি তো ফিরে গিয়েই তোমাকে চেক পাঠিয়েছিলাম!

ব্যাঙ্ক অফ বে অফ বেঙ্গলের চেক আমার দরকার নেই।

শিবানীর কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

আস্তে আস্তে সবাই চলে গেলেন। সবার পৌঁছনোর সংবাদও এলো। সবাই চিঠিতে বিহারীর কথা লিখেছেন।

কদিন পরে শিবানী ওকে বললেন, বিহারী, চিঠিতে সবাই তোমার কথা লিখেছেন। মীনাদি আর অজয় লিখেছে তোমাকে নিয়ে ওদের ওখানে ঘুরে আসতে।

সত্যি বউদি, একবার ঘুরে এলে হয়।

ওরা এত করে বলেছে যে না গেলে অত্যন্ত অন্যায় হবে।

যাইহোক, খোকনের অন্নপ্রাশনের জন্য আপনাদের সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল।

তোমাকে তো সবারই খুব ভালো লেগেছে।

ভালো কথা বউদি, আপনাদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে আমার কত আয় হয়েছে জানেন?

আয় হয়েছে নাকি? কত?

তিনশো দশ টাকা পেয়েছি।

দেড়শো টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিও।

না বউদি, এ টাকা থেকে কিছুই ব্যাঙ্কে রাখতে পারব না!

কেন?

সন্তোষের বইপত্তর কিনতে হবে, তাছাড়া এবার শীতে লেপতোষক না করালে...

পুরো টাকাই লাগবে?

হ্যাঁ বউদি।

ঠিক আছে, আমি তোমাকে একশো টাকা দেব। এই একশো টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেবে।

আপনাদের দয়ায় খেয়ে-পরে বেঁচে আছি। আপনি আবার টাকা দেবেন কেন?

খোকনের অন্নপ্রাশনে এত খাটা-খাটনি করলে...

দাদা তো আমাকে ধুতি-সার্ট কিনে দিয়েছেন। আবার...

এত বড় একটা কাজ তুমি উদ্ধার করে দিলে আর তোমাকে কিছুই দেবো না? তাই কী হয়?

দুদিন পরে বিহারী বলল, বউদি, ব্যাঙ্কে আমার কত জমেছে জানেন?

কত?

চোদ্দশো পঞ্চাশ।

এর একটি পয়সাতেও তুমি হাত দেবে না।

বিহারী হাসে।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী খোকনের অন্নপ্রাশনের কথাই আলোচনা করছিলেন।

জানো শিবানী, আমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম।

কেন?

এত লোকজন নেমন্তন্ন করে যদি কোন কেলেঙ্কারি হয়, সেই ভেবেই আমি মনে মনে খুব নার্ভাস ছিলাম।

আর আমরা নেমন্তন্ন করতে তো কাউকে বাদ দিইনি।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অফিসের লোকজন—এদের তো বাদ দেওয়া যায় না।

যাইহোক, বেশ ভালয় ভালয় সব হয়ে গেল।

তবে হ্যাটস অফ টু চৌধুরী আর বিহারী।

চৌধুরীদা বড় বাড়ির ছেলে। অনেক কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু বিহারী যে এসব কাজেও এত এক্সপার্ট তা আমি ভাবতে পারিনি।

আমিও কল্পনা করতে পারিনি।

আমি ওকে একশো টাকা দিয়েছি।

খুব ভালো করেছ। ও ডেকরেটর আর মিষ্টির দোকানের বিল থেকে কত টাকা বাঁচিয়েছে জানো?

কত?

দু'শো পঁচাত্তর টাকা।

তুমি হলে একটা পয়সাও বাঁচাতে পারতে না।

অসম্ভব।

তাছাড়া বিহারী খোকনকে কি দারুণ ভালোবাসে, তোমাকে কী বলব।

হ্যাঁ, খোকনও ওর খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। আই মাস্ট ডু সামথিং ফর্ বিহারী।

কি করবে?

আমাদের অফিসের সব ড্রাইভারের অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স আছে। অফিসই প্রিমিয়াম দেয়। অফিসারদের ড্রাইভারদের অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স করলে অফিস থেকে অর্ধেক প্রিমিয়াম দেবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভাবছি, বাকি অর্ধেক প্রিমিয়াম আমি দিয়ে ওরও একটা...

খুব ভালো হবে। হাজার হোক কলকাতা শহরে ড্রাইভারী করা! কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

তা তো বটেই।

দেখতে দেখতে খোকন তিন বছরের হল। বিহারী কদিন আসছে না। খোকনকে রোজ বিকেলে গাড়িতে বসাতেই হবে। ও স্টিয়ারিং নেড়ে-চেড়ে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দেয়।

সেদিন বিকেলে মিস্টার সরকার অফিস থেকে ফিরতেই শিবানী বললেন, জানো একটু আগে বিহারী এসে খবর দিয়ে গেল ওর একটা মেয়ে হয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বিহারী খুব খুশি।

ছেলেটা এত বড় হবার পর মেয়ে হল, খুশি হবারই তো কথা। খোকন আরো একটু বড় হবার পর তোমার একটা মেয়ে হলে আমিও কি কম খুশি হবো?

এত সখ খায় না।

খায় না মানে? আমাদের একটা মেয়ে হবে না?

একটা হবার ঠেলাতেই আমার জান বেরিয়ে গেছে। ন্যাড়া বেলতলায় বার বার যায় না।

তাই বলে...

ন্যাকামি কোরো না। ওই কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারব না।

খুব কষ্ট হয়?

কষ্ট হবে কেন? এত আরাম লাগে যে...

শিবানী চলে গেলেন।

পরে চা খাবার সময় মিস্টার সরকার বললেন, শিবানী বিহারীর মেয়েকে একদিন দেখে এসো।

তুমি যাবে না?

না, না, আমি গেলে ওর স্ত্রী লজ্জা পাবে।

তা ঠিক।

দাদা কাল আপনি ট্যাক্সিতে অফিস যাবেন!

মিস্টার সরকার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? গাড়ির ফুয়েল পাম্প কি আবার গণ্ডগোল করছে?

বিহারী নির্মম ঔদাসীন্যের সঙ্গে বলল, গাড়ি ঠিকই আছে।...

তবে?

কাল খোকনকে পোলিও ভ্যাকসিন দেবার জন্য...

মিস্টার সরকার জানেন বিহারীর এসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন ফল নেই। তাই বললেন, ঠিক আছে।

খোকনের সঙ্গে বিহারীর খুব ভাব। মাত্র ক'মাসের শিশু হলেও বিহারীকে দেখলেই ও হাসবে, কোলে চড়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে।

খোকনকে কোলে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিহারী শিবানীকে বলে, জানেন বউদি, আমি গত জন্মে খোকনের কাছে গাড়ি চালানো শিখেছিলাম।

শিবানী হাসতে হাসতে বলেন, তাই নাকি?

তাইতো এবার আমি ওকে গাড়ি চালানো শেখাব।

শিবানী ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেন, এখনই শেখাবে?

না না বউদি, ঠাট্টার কথা নয়। আপনি দেখবেন খোকনের মতন ড্রাইভিং...

তোমার খোকন তো সবই করবে।

করবেই তো!

শিবানী হাসতে হাসতে স্বামীকে বললেন, বিহারী আজ কি বলছিল জানো?

কি?

ট্রাফিক পুলিশটা নম্বর নিয়েছে বলে ও বলছিল, খোকনকে পুলিশ কমিশনার হতেই হবে।

ও একটা বদ্ধ পাগল!

কিন্তু ও খোকনকে এত ভালোবাসে যে তা বলার নয়।

তা ঠিক।

বিহারীর বাড়ি থেকে ঘুরে এসেই শিবানী মিস্টার সরকারকে বললেন মেয়েটার রং কালো হলেও দেখতে ভারি সুন্দর হবে।

তাই নাকি?

দিন কয়েক পরে তুমিও একবার দেখে এসো। মেয়েটাকে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

মিস্টার সরকার শিবানীর কানে কানে বললেন, যতদিন তুমি আমাকে একটা মেয়ে দিচ্ছ না, ততদিন অন্যের মেয়েদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

একটা ছেলে দিয়েছি। আমি আর কিছু দিতে পারব না।

ছি, ছি, ওকথা বলে না।

অত যদি মেয়ের সখ হয় তাহলে আরেকটা বিয়ে করো।

ঠিক আছে। ডিভোর্স করে তোমাকেই আবার বিয়ে করছি।

শিবানী হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কদিন পরে বিহারী শিবানীকে বলল, বউদি, এবার দাদাকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিই?

কেন?

আমি দু-চার দিন না থাকলে দাদার খুব অসুবিধে হয়।

কেন? অফিসের গাড়িতেই তো যাতায়াত করেন।

অফিস যাতায়াত চলে যায় ঠিকই কিন্তু আর তো কোথাও যেতে পারেন না।

এই বয়সে গাড়ি চালাতে গিয়ে...

দাদার কি এমন বয়স হয়েছে? অফিসের সাতজন ডেপুটি ডিভিশন্যাল ম্যানেজারের মধ্যে দাদার বয়স সব চাইতে কম।

শেখাবে শেখাও কিন্তু তোমার দায়িত্ব।

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না বউদি। আমি তিন মাসের মধ্যেই দাদাকে এমন গাড়ি চালানো শিখিয়ে দেবো যে তখন আমি বড় জামাইবাবুদের টি গার্ডেনে চাকরি নিয়ে...

শিবানী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি খোকনকে ছেড়ে যেতে পারবে?

বিহারী কোন জবাব দিতে পারে না। শুধু হাসে।

মাস চারেক পরের কথা।

স্টিয়ারিং-এ মিস্টার সরকার, পাশে বিহারী, পিছনে শিবানী আর খোকন।

দক্ষিণেশ্বর হয়ে গান্ধীঘাট। সেখান থেকে ঢাকুরিয়া হয়ে বাড়ি।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেন, বিহারী, তোমার ছাত্র তাহলে অনার্স নিয়েই পাস করলেন।

তিন

দিনগুলো বেশ কাটছে। মিস্টার সরকার ডিভিশন্যাল ম্যানেজার হয়েছেন। বোম্বে বদলী হবার কথা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই থেকে গেছেন। মাঝে অবশ্য এক বছরের জন্য পাটনা যেতে হয়েছিল, তবে শিবানী বা খোকনকে নিয়ে যাননি। ওরা পাটনা গেলে খোকনের পড়াশোনার গণ্ডগোল হতো। মিস্টার সরকার প্রত্যেক মাসে একবার আসতেন। বিহারী ছিল

বলে শিবানীর কোন অসুবিধে হয়নি।। তাছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ি মাস ছয়েক ছিলেন।

বিহাইকাকা, ও বিহাইকাকা, শুনে যাও। পড়ার ঘর থেকেই খোকন বিহারীকে ডাকে।

কিরে খোকনা?

কাছে এসো। কানে কানে বলব। খুব প্রাইভেট কথা।

মিস্টার সরকার হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন, শিবানী তোমার ছেলের মাথায় বোধহয় কোন মতলব এসেছে।

শিবানীও হাসেন। বলেন, বিহারী আদর দিয়ে দিয়েই ছেলেটার বারোটা বাজাবে।

বিহারী কোন মতে হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বলল, আমি কী করলাম বউদি?

না, না, তুমি কি করবে? তুমি কিছু করোনি।

বিহারী কিছু বলার আগেই আবার খোকন ডাকল, কি হলো বিহাইকাকা? এলে না?

মিস্টার সরকার খোকনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখানে এসে বলে যাও না!

আমি যে পড়ছি।

খোকনের জবাব শুনে তিনজনেই হাসেন।

বিহারী আর দেরি না করে খোকনের কাছে যায়। খোকন কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলে। বিহারীও ওর কানে কানে জবাব দেয়।

বিহারী ড্রইংরুমে ফিরে আসতেই ওরা দুজনে ওর দিকে তাকালেন। বিহারী একটু হেসে খুব চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলল, আজ গেমস পিরিয়ডে খোকনের কেডস জুতোটা কে ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে।

শিবানী বললেন, তাই নাকি?

মিস্টার সরকার বললেন, এর আগের মাসেই তো...

যাক্‌গে। ওকে কিছু বলবেন না। বউদি, আমাকে দশটা টাকা দিন। ওর একজোড়া মোজাও কিনতে হবে।

শিবানী বললেন, ওর কি মাসে মাসেই এক জোড়া জুতো-মোজা লাগবে?

ছেলেরা যদি দুষ্টুমি করে, ও কি করবে? বিহারী এক নিশ্বাসেই বলে, তাছাড়া যে গরু দুধ দেয়, তার চাটিও ভালো লাগে।

মিস্টার সরকার হাতের খবরের কাগজ না নামিয়েই বললেন, খোকনের সব ব্যাপারেই বিহারীর ওই এক যুক্তি।

শিবানী বললেন, ছেলে আমার কি এমন একেবারে বিদ্যাসাগর হয়েছে যে...

ওকথা বলবেন না বউদি ; খোকনের মতন ছেলে ওদের ক্লাশে আর একটাও নেই ;

আবার ওঘর থেকে খোকনের গলা শোনা গেল, বিহাইকাকা, আমার পড়া হয়ে গেল।

এবার শিবানী হাসেন। সোফা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, নতুন জুতো-মোজা কেনার জন্য আর পড়ায় মন বসছে না।

খোকন আরো বড় হয়।

সকাল বেলায় স্কুল যাবার সময় বিহারীকে বলে, বিহাইকাকা, তুমি ঠিক তিনটের মধ্যে বাড়ি চলে এসো। সাড়ে তিনটের মধ্যে মাঠে না পৌঁছলে ভালো জায়গা পাব না।

তুমি স্কুল থেকে বাড়িতে এসেই একবার ফোন কোরো।

না, না, আমি বাবাকে ফোন করব না। অফিসে ফোন করলেই বাবা ভীষণ রেগে যায়।

তাহলে বউদিকে বোলো।

মার তখন ঘুমুবার সময়। মাকে ফোন করতে বললে মাও রেগে যাবে। তুমি চলে এসো।

বিহারীকে আসতেই হয়। না এসে পারে না।

সন্ধের পর মাঠ থেকে ফিরে এসেই বিহারী বলে, বউদি, এক বাটি সরষের তেল দিন।

সরষের তেল কি হবে?

খোকনা আমার কাঁধ-পিঠ মালিশ করবে।

শিবানী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, কেন? কি হয়েছে?

বিহারী একবার খোকনের দিকে তাকিয়ে বলে, এত বড় বুড়োধাড়ী ছেলেকে কাঁধে করে খেলা দেখাতে হলে...

খোকন আর চুপ করে থাকে না। বলে, বিহাইকাকা, অযথা আমাকে দোষ দেবে না।

তবে কাকে দোষ দেবো খোকনা?

খোকন এবার মাকে বলে, জানো মা, বিহাইকাকাই আমাকে বলল, খোকনা, আমার কাঁধে চড়। তা নয়ত কিছু দেখতে পাবি না।

বিহারী হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁরে খোকনা, তুই কি চিরকালই আমাকে বিহাইকাকা বলবি?

ওর প্রশ্ন শুনে খোকনও হাসে। জিজ্ঞাসা করে, কেন, আমার বিহাইকাকা ডাক তোমার ভালো লাগে না?

তুই যা বলে ডাকবি তাই আমার ভালো লাগবে।

তাহলে তুমি ওকথা বলছ কেন?

এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা খোকন, এখন তো তুই একটু বড় হয়েছিস, তবে কেন তুই এখনও দাদা বউদিকে সব কথা বলতে পারিস না?

খোকন দুহাত দিয়ে বিহারীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আমি তোমাকে বিরক্ত করি বলে তুমি রাগ করো?

দূর পাগল! তোর উপর আমি কখনও রাগ করতে পারি?

কিন্তু আমি তো তোমাকে খুবই বিরক্ত করি।

তুই বিরক্ত না করলে আমার পেটের ভাত হজমই হবে না।

দুজনে এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

দুজনে আরো কত কথা হয়।

বিহারী বলে, আচ্ছা খোকন. আমি যদি কোনো কারণে তোদের বাড়িতে কাজ না করি...

খোকন একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করে, তার মানে? তোমাকে কি মা বা বাবা কিছু বলেছেন?

না, না, কেউ কিছু বলেননি।

তাহলে তুমি হঠাৎ একথা বললে কেন?

কোনো কারণ নেই রে খোকনা! এমনি বললাম। হাজার হোক মানুষের কথা কেউ কি কিছু বলতে পারে?

খোকন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলে, না না বিহাইকাকা, তুমি চেপে যাচ্ছ।

বিহারী খোকনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যি বলছি কিছু হয়নি। তবে মনে মনে

নানা কথা ভাবতে ভাবতে এসব কথা প্রায়ই মনে হয়।

না না বিহাইকাকা তুমি আর এসব ভাববে না। ঠিক তো?

বিহারী হাসে। বলে, ঠিক আছে খোকনা, আমি আর এসব কথা ভাবব না।

বেশ চলছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল।

অ্যাকসিডেন্ট।

মিস্টার সরকারের টেলিফোন পেয়েই শিবানী প্রায় পাগলের মতন চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাকসিডেন্ট! তোমার?

না, না, আমি গাড়িতে ছিলাম না। বিহারী...

বিহারী নেই?

আছে আছে। হাসপাতালে...

কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হলো?

আমার এক কলিগকে নিয়ে টিটাগড়ের কারখানায় যাবার পথে...

তোমার কোন কলিগ?

মিত্তির। তার কিছু হয়নি।

কিভাবে অ্যাকসিডেন্ট হলো?

একটা লরি অ্যাকসিডেন্ট করে পালাবার সময় আমার গাড়িতে এমন ধাক্কা লাগিয়েছে যে...

বিহারীর কোথায় লেগেছে?

বোধহয় বুকের দু-তিনটে হাড় ভেঙেছে আর ডান হাতটা...

ডান হাত নেই?

আছে, তবে বোধহয় কিছু কাটাকাটি করতে হবে।

কি সর্বনাশ!

যাই হোক আমি আবার এক্ষুনি হাসপাতালে যাচ্ছি...

তুমি একলা?

না, না, অফিসের অনেকেই হাসপাতালে আছে।...

কোন্ হাসপাতালে?

আর. জি. কর-এ। যাই হোক খোকনকে কিছু বোলো না। ও শুনলে...

আমি হাসপাতালে আসব?

এখন গিয়ে কোনো লাভ নেই। বিহারীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে।

দিন পনেরো পরে খোকনকে দেখেই বিহারী কাঁদতে কাঁদতে বলল, খোকনা ছুটির ঘণ্টা পড়লেও যেতে পারলাম না। তোর জন্য থেকে যেতে হল।

খোকন কাঁদতে কাঁদতে বলল, বিহাইকাকা, আমার আর গাড়ি চালানো শেখা হল না।

দাদা তোমাকে শেখাবেন।

না বিহাইকাকা, আমি অন্য কারুর কাছে শিখতে পারব না।

নারে খোকনা, ওই অস্টিনে চড়িয়ে তোকে আমি নার্সিং হোম থেকে এনেছিলাম। তোকে ওই গাড়ি চালাতেই হবে।

না বিহাইকাকা, আমি ও গাড়ির স্টিয়ারিং টাচ করব না, কোনদিনও না। তুমি দেখে নিও।

তিনমাস কেটে গেল।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার আগের দিন বিহারী মিস্টার সরকার আর শিবানীর দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি বাড়ি গিয়ে কি করব দাদা? বউদি, কিভাবে আমার সংসার চলবে?

মিস্টার সরকার বললেন, অত চিন্তা কোরো না সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু যার ডান হাতের চারটে আঙুল নেই, সে কি কাজ করবে?

শিবানী বললেন, তোমার দাদা আর চৌধুরিদা যখন আছেন তখন তুমি অত ভাবছ কেন?

এই তিনমাস হাসপাতালে আসা যাওয়া করার জন্য বিহারীর স্ত্রী মিস্টার সরকারের সামনে একটু আধটু কথাবার্তা বলেন। বলতেই হয়। না বললে চলে না। উনি বিহারীকে বললেন, চৌধুরি সাহেব আর দাদা-বউদি যখন আছেন তখন আমিই সংসার চালিয়ে নেব তোমাকে কিছু করতে হবে না।

আমাকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনতে ওঁরা যা করলেন, তার কোনোই তুলনা হয় না। ওঁরা আর কত করবেন?

চৌধুরিদের পুরনো গ্যারেজ আর ড্রাইভারের থাকার ঘর মেরামত হল। সামনের দিকে ছোট মুদিখানা দোকান বিহারীলাল স্টোর্স তার পিছনেই ওদের থাকার ব্যবস্থা। বিহারীর ছেলে সন্তোষ ক্লাস টেন-এ উঠেছে। ও আগের মতনই পড়তে লাগল। বিহারী দোকান চালায়। ওর স্ত্রী সংসার চালায় আর স্বামীকে দেখে। বিহারীর মেয়ে কালীকে শিবানী নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

মিস্টার সরকার বললেন, যাই বলো বিহারী, তোমার মেয়ে এমন কিছু কালো নয় যে ওকে কালী বলে ডাকতে হবে।

দাদা, ও কালো না?

না, ও শ্যামবর্ণ।

বিহারী হেসে বলে, কালী যদি শ্যামবর্ণ হয়, তাহলে আমি ফরসা।

কালী একটা সোনার টুকরো মেয়ে। তাই আমি ওর নাম দিয়েছি সোনালী।

সোনালী!

হ্যাঁ সোনালী।

স্নেহ বড় বিচিত্র সম্পদ। স্নেহ দিয়ে বনের পশুকেও বশ করা যায়। সোনালীকে তো যাবেই।

সোনালী!

কি জ্যাঠামণি?

বড়মাকে বলে এসো আমি পরশুদিন চিড়িয়াখানা যাব। বাড়িতে ফিরতে দেরি হবে।

তুমি একলা যাবে জ্যাঠামণি?

আর কে যাবে?

আমি আর খোকনদা যাব না?

ওখানে বাঘ-সিংহ আছে। তোমাদের ভয় করবে।

তোমার ভয় করবে না?

করবে, তবে অল্প অল্প।

তোমার অল্প ভয় করবে কেন?

আমি যে বড় হয়েছি।

সোনালী একবার নিজেকে আপাদমস্তক দেখে বলল, আমিও বড় হয়ে গেছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ জ্যাঠামণি আমি বড় হয়ে গেছি।

কি করে বুঝলে?

আমাকে মা-বড়মা কেউ কোলে নিতে পারে না।

সোনালী মাথা নেড়ে ছোট্ট দুটো বিনুনি দুলিয়ে বলতে লাগল, না! পারে না।

তাহলে আমার সোনালী সত্যি বড় হয়েছে।

তাছাড়া আমি তো লুডো খেলাও শিখে গেছি।

সত্যি?

আমি মিথ্যে কথা বলি না। বড়মা বলেছে মিথ্যে কথা বললে জিভে ঘা হয়।

রবিবার সবাই মিলে চিড়িয়াখানা গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে বিহারীর ওখানে।

গাড়ি থামতেই সোনালী চিৎকার করল, বাবা, আমি হাতির পিঠে চড়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বাবা।

খোকনা, তুই চড়েছিস?

তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেলে বিহাইকাকা? তুমি আমাকে কতবার চড়িয়েছ মনে নেই?

আজ চড়েছিস?

চড়েছি।

সোনালী দৌড়ে ভিতরে গিয়ে মাকে খবরটা দিয়েই আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। পিছন পিছন ওর মা।

মিস্টার সরকার হেসে বললেন, সোনালী বড় হয়ে গেছে। আর আমাদের চিন্তা নেই। ও বাঘ-সিংহ দেখেও ভয় পায় না, তাছাড়া লুডো খেলাও শিখে গেছে।

চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহ দেখে কেউ আবার ভয় পায় নাকি?

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, সন্তোষ কোথায়?

বউদি, ও আজকাল এই পাড়ারই একটা ছেলের কাছে পড়তে যায়। সেখানেই গেছে।

দোকান কেমন চলছে?

এক পয়সা ভাড়া তো দিতে হচ্ছে না, আর দাদা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা যেভাবে করে দোকান সাজিয়ে দিয়েছেন তাতে তিনজনের মোটামুটি চলে যাচ্ছে।

বিহারীর স্ত্রী বললেন, আগের মতন এখন আর অত ঘাবড়ে যান না। দোকান তো উনি একলাই চালিয়ে নিচ্ছেন।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর শিবানী বললেন, সোনালী, তুই আজ এখানে থাক। কাল বিকেলে তোর জ্যাঠামণি এসে তোকে নিয়ে যাবে।

ঠিক নিয়ে যাবে তো?

মিস্টার সরকার হাসতে হাসতে বললেন, তুই না থাকলে এই বুড়োকে কে দেখবে?

তুমি মোটেও বুড়ো হওনি।

রওনা হবার আগে বিহারী একবার গাড়িটা দেখে, স্টিয়ারিংটা নাড়াচাড়া করে। তারপর বলে, বউদি, দাদাকে যদি গাড়ি চালানো না শেখাতাম তাহলে আজ কত অসুবিধে হতো বলুন তো!

দিন আরো এগিয়ে চলে। সোনালী আরো কাছে আসে, আরো আপন হয়। তারপর একদিন স্কুলে ভর্তি হয়। ভোরবেলায় যায়। দশটায় ছুটি। দুপুরে বড়মার কাছে বসে পরের দিনের পড়াশুনা

করে নেয়। কখনও খোকনের সঙ্গে গল্প করে, লুডো খেলে। নয়তো ক্যারাম। খেয়াল হলে ডাইনিং টেবিলে টেবিল টেনিস।

আজ সোনালীর জন্মদিন। আজ স্কুলে যায়নি। ভোরবেলায় উঠে স্নান করে নতুন জামা পরে জ্যাঠামণি, বড়মা, খোকনদাকে প্রণাম করে। আশীর্বাদ নেয়। তারপর অফিস যাবার সময় মিস্টার সরকার ওকে বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেন। পরের দিন সকালে সন্তোষ পৌঁছে দিয়ে যায়।

দিনগুলো বেশ কেটে যায়। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর পার হয়।

জানালায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে মিস্টার সরকারের গাড়ি দেখেই সোনালী দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে কেটলি গ্যাসে চড়িয়ে দেয়। তারপর উনি গলিটা পার হয়ে বাড়ির সামনে গাড়ি থামাতে-না-থামাতেই সোনালী গ্যাস বন্ধ করে কেটলির মধ্যে চা ফেলে দেয়! উনি ঘরে বসতে-না-বসতেই সোনালী ট্রেতে দু কাপ চা আর চারটে বিস্কুট নিয়ে ঢোকে। শিবানী চা-বিস্কুট নামিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখতে রাখতে বলেন, আমার মেয়ে তোমাকে কি রকম ভালোবাসে?

মিস্টার সরকার সোনালীকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুই আমাকে সত্যি ভালোবাসিস?

সোনালী একটু হেসে মাথা নাড়ে।

আমি তোকে একটুও ভালোবাসি না।

সোনালী বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, জ্যাঠামণি, তুমি মিথ্যে কথা বললে জিভে ঘা হবে আর বড়মা খুব রাগ করবে।

আমি মিথ্যে কথা বলছি না। আমি সত্যি তোকে একটুও ভালোবাসি না।

ভালো না বাসলে আমার ছবি অত বড়ো করে শোবার ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছ কেন?

সোনালীর কথায় ওরা দুজনেই হাসেন।

সোনালী ভিতরে চলে যাবার পর শিবানী বললেন, সোনালী সত্যি তোমাকে খুব ভালোবাসে। তোমার আসার সময় হলে ও যেভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তা দেখে আমিই অবাক হয়ে যাই।

মিস্টার সরকার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, তা ঠিক। আমার সবকিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারেও ওর নজর আছে।

শিবানী হেসে বললেন, আজ স্কুল থেকে ফিরে আমাকে কি বলেছে জানো?

কি?

বলেছে, বড়মা, একটা লোকের পায়ে খুব সুন্দর একটা জুতো দেখলাম। জ্যাঠামণিকে ওই রকম জুতো কিনে দেবে? ওইরকম জুতো পরলে জ্যাঠামণিকে খুব সুন্দর দেখাবে।

মিস্টার সরকার হাসেন।

শিবানী চা খেতে খেতে বলেন, সেদিন ঢাকুরিয়ায় দাদাকে লখনৌ চিকনের পাঞ্জাবি পরতে দেখেই মেয়ে ধরল, বড়মা, জ্যাঠামণিকে ওই রকম পাঞ্জাবি তৈরি করে দাও।

তাই বুঝি তুমি লখনৌ চিকনের পাঞ্জাবি কিনে আনলে?

কি করব? সোনালী এমন করে ধরল যে পাঞ্জাবি না কিনে পারলাম না।

আজকাল আর খোকনের সঙ্গে ঝগড়া করে না?

না, আজকাল আর ঝগড়া হয় না। একটু বেশি তর্ক হলেই আমার কাছে ছুটে আসে।

বাড়িতে একমাত্র ছেলে বা মেয়ে সব সময় একটু বেশি আদুরে, একটু খামখেয়ালী হয়। সোনালী এসে সেদিক থেকে খোকনের উপকারই হয়েছে।

প্রথম প্রথম খোকনের মধ্যে একটু দ্বিধা ছিল।

দ্বিধা মানে?

মানে, ও ভারত ড্রাইভার বিহারীর মেয়ে, কিন্তু সে-ভাবটা আস্তে আস্তে চলে গেছে। এখন ওকে ঠিক নিজের বোনের মতনই ভালোবাসে।

দরজার ওপাশ থেকে সোনালী বলল, জ্যাঠামণি অফিসের জামা-কাপড় ছাড়বে না?

ওর কথায় ওরা দুজনেই হাসেন।

মিস্টার সরকার ওকে ডাকেন, সোনালী শুনে যা।

সোনালী ঘরে ঢুকে বলে, কী বলছ জ্যাঠামণি?

সোনালীকে কোলে বসিয়ে মিস্টার সরকার বললেন, এত খিদে লেগেছে যে উঠতে পারছি না।

আজ লাঞ্চের সময় কিছু খাওনি?

নারে।

কেন?

এত কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে কিছুতেই উঠতে পারলাম না।

তার পরেও কিছু খেতে পারলে না?

মিস্টার সরকার ঠোঁট উল্টে বললেন, লাঞ্চের পর কি আর সময় হয়?

তাই বলে কি না খেয়ে কেউ কাজ করে নাকি? সোনালী উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টানতে টানতে বলে, আর বক-বক না করে এবার উঠে পড়ো।

মিস্টার সরকার সোনালীকে কোলে-তুলে নিয়ে বলেন,

আমাদের সোনালী
বেড়াতে যাবে মানালী
করে না হেঁয়ালি
আছে একটু খামখেয়ালি।

এক গাল হাসি হেসে সোনালী বলল, দেখলে বড়মা, জ্যাঠামণি কি সুন্দর কবিতা বানালো।

শিবানী হেসে বলল, তোর জ্যাঠামণি রবিঠাকুর হয়ে গেছে।

না না বড়মা, ঠাট্টার কথা নয়। সত্যি কবিতাটি খুব সুন্দর হয়েছে।

মিস্টার সরকার হাসতে হাসতে বললেন, তোকে একটুও ভালোবাসি না বলেই তো কবিতাটা ভালো হল।

তুমি আমাকে ভালোবাস না? সোনালী মিট মিট করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

মিস্টার সরকার মাথা নেড়ে বললেন, না।

সোনালী হাসতে হাসতে বলল, তাই বুঝি রোজ রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমার জন্য...

মিস্টার সরকার হঠাৎ খুব জোরে চিৎকার করে বললেন, বাজে কথা বলবি না। আমি কোনোদিন কাউকে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু দিই না।

সোনালী হাসি চাপতে পারে না। বলে, তুমি লুকিয়ে দিলেও আমি সবাইকে বলে দিই।

আজেবাজে কথা বললে একটা থাপ্পড় খাবি।

সোনালী আর শিবানী হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চার

মিস্টার সরকার বাড়ি ফিরতেই খোকন প্রণাম করল। ছেলেকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, এই কমাসে তুই বেশ লম্বা হয়েছিস তো।

শিবানী বললেন, ছেলের পায়ের দিকে তাকালেই বুঝবে কেন এত লম্বা হয়েছে।

মিস্টার সরকার ছেলের পায়ের দিকে তাকাতেই সোনালী বলল, হোস্টেলে গিয়ে খোকনদার অনেক কায়দা বেড়েছে।

খোকন সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় একটা চাটি মেরে বলল, আবার ফড় ফড় করছিস?

তোমার কায়দা বেড়েছে, বলব না?

কিচ্ছু কায়দা বাড়েনি।

তোমার মাথার চুল আর পায়ের জুতো দেখে তো আমি প্রথমে...

আবার?

ড্রইংরুমে চা খেতে খেতে গল্প গুজব হয়। হঠাৎ মিস্টার সরকার বললেন, শিবানী চলো আমরা সবাই মিলে সপ্তাহ খানেকের জন্য পুরী ঘুরে আসি।

তুমি ছুটি পাবে?

তা পেয়ে যাব।

খোকন বলল, আগে জানলে আমি পুরী পর্যন্ত কনসেশন নিতে পারতাম।

মিস্টার সরকার বললেন, সে আর কি হবে।

শিবানী বললেন, রেল কোম্পানিকে অযথা কতকগুলো টাকা দিতে হতো না।

সোনালী বলল, পুরী তো এক রাত্তিরের জার্নি। আমি আর খোকনদা থ্রী টায়ারে চলে যাব। তোমরা?

খোকন সঙ্গে সঙ্গে সোনালীকে বলল, আবার খোকনদাকে টানছিস কেন?

কেন? তোমার থ্রী টায়ারে যেতে লজ্জা করবে? ছাত্রজীবনে বেশি বাবুগিরি করা ভালো না।

দ্যাখ সোনালী বুড়ীদের মতো ফালতু উপদেশ দিবি না।

মিস্টার সরকার বললেন, খোকন, সোনালী কিছু অন্যায় বলেনি। আমি তোমাদের ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে যেতে পারি ঠিকই কিন্তু দশ-বারো ঘণ্টার জার্নির জন্য অযথা এক গাদা টাকা ব্যয় করার কোনো দরকার আছে কি?

খোকন হেসে বলে, আমি একবারও বলিনি থ্রী টায়ারে যাব না। তবে এবার এসে দেখছি সোনালী বড্ড পাকা পাকা কথা বলছে।

এতক্ষণ পরে শিবানী বললেন, তুই ভুলে যাস না খোকন, সোনালী ক্রমশ বড় হচ্ছে।

খোকন সোনালীর দিকে তাকিয়ে বলল, শাড়ি পরেই তোর মাথাটা গেছে।

পরের দিন দুপুরে মিস্টার সরকার টেলিফোনে টিকিট হয়ে যাবার খবর দিতেই বাড়িতে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল।

শিবানী বললেন, সোনালী কাল সুটকেশ-টুটকেশ গুছিয়ে ফেলতে হবে।

আচ্ছা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, শিবানী একটু বিশ্রাম নিতে-গেলেন।

খোকন নিজের ঘরে যেতেই সোনালী এসে জিজ্ঞাসা করল, দেশলাই আনতে হবে?

দেশলাই আছে। অ্যাসট্রেটা নিয়ে আয়।

সোনালী ড্রইংরুম থেকে অ্যাসট্রে আনতেই খোকন সিগারেট ধরাল। সিগারেটে একটা টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, সোনালী, পুরী তোর কেমন লাগে রে?

সমুদ্র বা পাহাড়ে কারুর খারাপ লাগে নাকি?

পুরী আমার তত ভালো লাগে না।

কেন?

ওখানে ভোরবেলায় আর সন্ধ্যেবেলায় ছাড়া তো বেড়াবার উপায় নেই।

তা ঠিক। রোদ্দুর উঠলে আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া যায় না।

তাছাড়া পুরীতে তো আর কোথাও বেড়াবার জায়গা নেই।

জগন্নাথের মন্দির?

মন্দিরে কি লোকে সারাদিন পড়ে থাকবে?

তাহলে অন্য কোথাও যাবার কথা তুমি জ্যাঠামণিকে বললে না কেন?

ধারে কাছে আর যাবার জায়গা কোথায়? তাছাড়া বাবা-মার পুরী খুব ভালো লাগে।

পুরী তোমার একেবারেই ভালো লাগে না?

পুরীর সমুদ্রে চান করতে খুব ভালো লাগে।

দু-এক মিনিট পরে খোকন জিজ্ঞাসা করল, সমুদ্রে চান করতে তোর কেমন লাগে?

ভালো, তবে এবার আর করব না।

কেন?

এখন ওই অত লোকের সামনে চান করা যায়? লজ্জা করবে না?

খোকন সিগারেট টানতে গিয়েও পারে না। হাসে।

হাসছ কেন?

তোর কথা শুনে।

এমন কি হাসির কথা বললাম?

তুই এমনই বড় হয়ে গেছিস যে পুরীর সমুদ্রে আর চান করতেই পারবি না?

গায়ে অত কাপড়-গামছা জড়িয়ে চান করতে বিরক্ত লাগে।

তুই তাহলে সত্যি বড় হয়েছিস?

ভুলে যেও না আমি সামনের বার হায়ার সেকেন্ডারি দেবো।

খোকন সিগারেট টানতে গিয়েও মাথা নেড়ে জানায়, সে ভুলে যায়নি।

তাছাড়া জানো, আমাদের ক্লাসের দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

চোখ দুটো বড় বড় করে খোকন বলে, সত্যি?

বড়মাকে জিজ্ঞাসা করো।

তোদের ক্লাসের মেয়েরা বিয়ের কি বোঝে?

আমাদের ক্লাসেও অনেক পাকা পাকা মেয়ে আছে। শিউলিটা তো ভীষণ বদ হয়ে গেছে।

বদ হয়েছে মানে?

সুকুমার বলে একটা লোফার ছেলের সঙ্গে ওর খুব ভাব। যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

তুই কী করে জানলি?

অনেক বন্ধুরা দেখেছে। তাছাড়া দুজন দিদিমণি দেখে ওকে খুব বকাবকি করেছেন।

তাহলে তোর বন্ধুরাও ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

একটু চুপ করে থাকার পর সোনালী চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, আমার এক বন্ধুর তোমাকে খুব ভালো লাগে।

সত্যি?

তুমি বড়মাকে বলো না।

বলব না, কিন্তু মেয়েটা কে?

মায়া।

সে আমাকে দেখল কোথায়?

ও তো দু-তিন দিন পর পরই আমার কাছে আসে। আজ সকালেও তো এসেছিল।

ওই মায়া?

হ্যাঁ।

বিয়ে করবে?

জানি না।

তবে আর কী ভালো লাগল?

সোনালী আবার হেসে বলে, শুধু তোমাকে দেখার জন্যই ও আজ সকালে এসেছিল।

তাই নাকি?

সত্যি বলছি।

আবার কবে আসবে?

তা কি আমাকে বলে গেছে?

দুদিন পর পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন ছাড়ার পরই খোকন একটা সিগারেট ধরিয়ে সোনালীকে বলল, বাবা-মার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে না গিয়ে ভালোই হয়েছে।

কেন, সিগারেট খেতে পারতে না বলে?

হ্যাঁ। খোকন সিগারেটে টান দিয়ে বলল, ট্রেনে উঠেই সিগারেট ধরাতে না পারলে আজকাল একদম ভালো লাগে না।

তবে তখন যে খুব রেগে গিয়েছিলে?

মোটেও রাগিনি।

মিথ্যে কথা বোলো না খোকনদা। নিতান্ত জ্যাঠামণি আর বড়মা আমাকে সাপোর্ট করলেন, নয়ত...

দ্যাখ সোনালী বাবা-মার চাইতে আমি তোকে কম ভালোবাসি না।...

তা জানি।

তোর উপর ঠিক রাগ করতে পারি না।

তবে যখন-তখন আমাকে যা তা বলো কেন?

সিগারেটে খুব জোরে একটা টান মেরে খোকন বলল, ও তোকে একটু রাগাবার জন্য।

তুমি বড্ড আমার পিছনে লাগো।

তবে কি বাবা-মার পিছনে লাগব?

সোনালী হাসে।

ট্রেন ছুটে চলেছে। অনেক প্যাসেঞ্জার এর মধ্যেই শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। অন্যেরা কেউ

বা খাওয়া-দাওয়া করছেন অথবা গল্প-গুজব করছেন।

খোকন আবার সিগারেট ধরায়। বলে, দ্যাখ সোনালী, আজকাল বাবা-মা আমার চাইতে তোকে বেশি ভালোবাসেন।

আমি অত বেশি-কম বুঝি না।

তুই কাছে না থাকলে তো বাবার মুখের চেহারাই বদলে যায়।

কি জানি? আমি দেখিনি।

মা একটু চাপা। ঠিক প্রকাশ করতে চান না কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ধরা পড়ে যান।

তুমি জ্যাঠামণি-বড়মার একমাত্র ছেলে। তোমাকে কি ওঁরা কম ভালোবাসতে পারেন?

কিছুক্ষণ পরে খড়্গপুর আসে। খোকন দুটো কফি কিনে একটা সোনালীকে এগিয়ে দিতেই ও বলল, এখন কফি খেলে রাত্তিরে ঘুমোব কখন?

একটু অনিয়ম, একটু অত্যাচার না করলে বাইরে বেড়াবার আনন্দ কি?

তুমি এই দু বছর হোস্টেলে থেকে বেশ বদলে গেছ।

হোস্টেলে না গেলেও এই পরিবর্তন হতো।

পরিবর্তন হলেও এতটা হতো না।

এই বয়সটাই পরিবর্তনের বয়স।

তা ঠিক।

এই বয়সে সব ছেলেমেয়েরাই হঠাৎ অদ্ভুতভাবে সব ব্যাপারেই সচেতন হয়ে ওঠে। সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়, এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে চায়।

সোনালী মুগ্ধ হয়ে খোকনের কথা শোনার পর বলে, তুমি আজকাল কত সুন্দর করে কথা বলো।

খোকন হেসে বলল, তাই নাকি?

সত্যি খোকনদা তোমার কথাবার্তার ধরনটা একেবারে বদলে গেছে।

খোকন একটু হাসে। কিছু বলে না।

সোনালী বলল, খোকনদা, পুরীতে গিয়ে আমরা সারা রাত গল্প করব।

আমার সারা রাত আড্ডা দেওয়া অভ্যাস আছে কিন্তু তুই পারবি না।

খুব পারব।

বারোটা-একটার পর তুই ঠিক ঘুমিয়ে পড়বি।

তুমি গল্প করলে আমি কিছুতেই ঘুমোব না।

আর যদিও বা একটা রাত কোনোমতে জেগে থাকিস তাহলে আর তার পরের দিন সকালে তো...

কিচ্ছু হবে না।

আচ্ছা দেখা যাবে।

একটু চুপ করে থাকার পর সোনালী জিজ্ঞাসা করল, কি খোকনদা, তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

খোকন হেসে বলল, এখুনি?

এখন কটা বাজে?

মোটে এগারোটা কুড়ি।

এখনও সাড়ে এগারোটাও বাজেনি?

না।

সোনালী একবার চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, সবাই কী ঘুম ঘুমোচ্ছে!

আমাদের দেশের কটা মানুষ জীবন উপভোগ করতে জানে? কোনমতে খেয়েদেয়ে বউকে জড়িয়ে শুতে পারলেই...

শুনতেও সোনালী লজ্জা পায়। খোকনের মুখের উপর হাত দিয়ে বলল, চুপ করো!

চুপ করবো?

হ্যাঁ।

কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?

তা বলছি না তবে...

সোনালী কথাটা শেষ না করে খোকনের দিকে তাকায়।

কথাটা শেষ না করে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস?

দেখছি আর ভাবছি। একটু থেমে সোনালী আবার বলল, দেখছি তোমাকে আর ভাবছি তোমার কথা।

খোকন কিছু বলল না, শুধু একটু হাসল।

সোনালী ওর সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, সত্যি খোকনদা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ। মনে হয় এইতো সেদিনও তুমি বাবার কাঁধে চড়ে...

তুই যে দিদিমা-ঠাকুমার মতন কথা বলছিস!

সোনালী একটু হেসে বলে, তুমি যখন এখানে থাকো না তখন সময় পেলেই আমি পুরনো অ্যালবামগুলো দেখি।...

কেন?

তোমার-আমার ছোটবেলার ছবিগুলো দেখতে মজা লাগে।

ছেলেবেলার ছবি দেখতে সবারই মজা লাগে।

আমি কি শুধু ছবি দেখি?

তবে?

যখন একলা একলা ভালো লাগে না, তখন তোমার ছবিগুলো দেখতে দেখতে তোমার সঙ্গে কত কথা বলি।

খোকন হাসতে হাসতে বলে, তুই কি পাগল নাকি?

এতে পাগলের কি আছে?

ছবির সঙ্গে কি কেউ কথা বলে?

একলা একলা ভালো না লাগলে কি করব?

তাই বলে অ্যালবামের ছবিগুলোর সঙ্গে কথা বলবি?

বলব না কেন? কিছুক্ষণ অ্যালবামের ছবিগুলো দেখার পর মনটা বেশ ভালো হয়ে যায়।

অতি উত্তম কথা।

সোনালী খোকনের একটা হাত ধরে একটু টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তারপর কি করি জানো?

কি?

তোমাকে চিঠি লিখতে বসি।

হা ভগবান!

সোনালী একটু রাগ করেই বলে, তুমি এ রকম হা ভগবান, হা ভগবান করবে না।

করব না?

না।

তুই এত সেন্টিমেন্টাল হলে বিয়ের পর স্বামীর ঘর করবি কি করে?

তোমার মতন আমি চট করে বিয়ে করব না।

আমি বুঝি চট করে বিয়ে করতে চাই?

তোমার কথাবার্তা শুনে তাইতো মনে হয়।

খুব ভালো কথা। কিন্তু তুই বিয়ে করবি না কেন?

বিয়ে করব না, তা তো বলিনি। তাই বলে তোমার মতন আমি চটপট বিয়ে করে পালাতে চাই না।

কেন?

কেন আবার? তোমাদের ছেড়ে চলে যাবার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

আচ্ছা সোনালী, একটা কথা বলবি?

বলব না কেন?

বাবা-মা আর আমার মধ্যে সব চাইতে কাকে বেশি ভালোবাসিস?

ওঁদের দুজনের সঙ্গে কি তোমার তুলনা হয়?

কেন হয় না?

ওঁদের একরকম ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি আর তোমাকে অন্য রকম ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।

অন্যরকম মানে?

আমি অতশত বোঝাতে পারব না।

হঠাৎ গাড়ির গতি কমে আসতেই খোকন হাতের ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে একটা বাজে। তোর ঘুম পাচ্ছে না?

না।

আস্তে আস্তে চলতে চলতে গাড়ি থামল।

সোনালী জিজ্ঞাসা করল, এটা কোন্ স্টেশন?

বালাশোর।

তার মানে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে এসেছি?

হ্যাঁ।

জানলার পাশ দিয়ে চাওয়ালা যেতেই খোকন ওকে জিজ্ঞাসা করল, চা খাবি?

এত রাত্তিরে চা খাব?

চা না খেলে রাত জাগবি কিভাবে?

চায়ে চুমুক দিতেই সোনালী বলল, আমি বোধহয় জীবনে এত রাত্রে আর চা খাইনি।

জীবনে এতকাল যা করিসনি, এখন তো তাই করার বয়স আসছে।

তুমি হোস্টেলে থেকে বড্ড ওস্তাদ হয়েছ।

এখনও ওস্তাদ হবো না?

চা খাওয়া শেষ। গাড়িও ছেড়ে দিয়েছে।

খোকন জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে তুই কি সত্যিই ঘুমুবি না?

চা খাবার পরই কারুর ঘুম পায়?

শুয়ে পড়। আস্তে আস্তে ঘুম এসে যাবে।

না না, আমি শোব না।

কেন রে?

এমন করে সারারাত তো কোনোদিন জাগিনি, তাই বেশ লাগছে।

সত্যি বলছিস?

সত্যি বলছি। সোনালী একটু থেমে বলল, তাছাড়া তোমাকেও তো অনেক কাল এভাবে পাই না।

তাহলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করিস কেন?

ভালো লাগে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সামনের বার্থের এক ভদ্রমহিলা ঘুম থেকে উঠে বাথরুম গেলেন।

খোকন বলল, দেখলি, উনি কিভাবে আমাদের দেখলেন?

ওসব তুমি দ্যাখো।

কি অদ্ভুত সন্দেহের দৃষ্টিতে উনি আমাদের দেখলেন, তা তুই ভাবতে পারবি না।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখার কি আছে?

এ দেশে ছেলেমেয়েদের গল্প করতে দেখলেই তো বুড়োদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

সোনালী হেসে বলল, তা ঠিক।

গাড়ি এগিয়ে চলে। রাত আরো গভীর হয়। খোকন ঘন ঘন সিগারেট ধরায়।

আর কত সিগারেট খাবে?

খোকন সিগারেটে টান দিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল, খুব বেশি সিগারেট খাচ্ছি নাকি?

এইতো পাঁচ মিনিট আগেই...

মাত্র তিন প্যাকেট সিগারেট নিয়ে তো গাড়িতে উঠেছি।

ছি, ছি, এত কম সিগারেট কেউ খায়?

খোকন কিছু না বলে সিগারেটে আবার একটা টান দিল।

সোনালী জিজ্ঞাসা করল, ফেরার সময় জ্যাঠামণি যদি তোমাকে আলাদা আসতে না দেন? যদি ওঁদের সঙ্গেই ফার্স্ট ক্লাশে আসতে হয়?

ছাত্র জীবনে বিলাসিতা করা আমি একটুও পছন্দ করি না।

সোনালী হাসতে হাসতে খোকনের গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ভদ্রক পার হতেই ওরা শুয়ে পড়ল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর মিস্টার সরকার পরপর দুবার হাই তুলতেই শিবানী বললেন, চলো শুতে যাই। খোকন আর সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যা তোরাও শুতে যা।

খোকন বলল, এখুনি?

এগারোটা বেজে গেছে। আর রাত করিস না।

কিরে সোনালী, তোর ঘুম পেয়েছে নাকি?

সোনালী জবাব দেবার আগেই ওর মা বললেন, ঘুম না পাবার কি হয়েছে? সারাদিন ধরে এত ঘোরাঘুরির পর ঘুম পাবে না?

সবাই উঠে দাঁড়াতেই শিবানী সোনালীকে বললেন, হয়, টেবিল লাইট না হয় বাথরুমের

আলোটা জ্বালিয়ে রাখিস।

আচ্ছা।

ঘরে ঢুকেই খোকন জিজ্ঞাসা করল, কিরে সোনালী, ঘুমোবি নাকি?

ঘুমোব না তবে শুয়ে শুয়ে গল্প করব।

কেন?

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে পা-দুটো বড্ড ব্যথা করছে।

তার মানে তোর ঘুমোনোর মতলব।

মোটেও না।

আমি সারারাত জাগব বলে দশ প্যাকেট সিগারেট কিনে এনেছি।

দশ প্যাকেট!

এক রাত্রেই দশ প্যাকেট লাগবে না তবে চার-পাঁচ প্যাকেট লাগবে।

খোকনদা, তুমি এত সিগারেট খেও না।

আবার বুড়ীদের মতন হিতোপদেশ দিচ্ছিস? হোস্টেলে কত ছেলে মদ খায় জানিস?

মদ!

হ্যাঁ মদ। হুইস্কী, রাম।

মদের নাম রাম? সোনালী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

হাসছিস কিরে!

মদের নাম রাম শুনেও হাসব না?

সোনালীর বিছানায় পাশাপাশি বসেই ওরা চাপা গলায় কথা বলে। খোকন বলল, আমাদের হোস্টেলে মদ খাবার কথা কিভাবে বলা হয় জানিস?

কিভাবে?

বলা হয়, আজ অত নম্বর ঘরে রাম নাম।

সোনালী শুনে হাসে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোনোদিন খেয়েছ নাকি?

খাইনি তবে অনেকেই জোর-জুলুম করে।

না না, তুমি কক্ষনো খাবে না। জ্যাঠামণি-বড়মা জানতে পারলে ভীষণ কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

খাব না ঠিকই কিন্তু খেলেও কি ওরা জানতে পারবে?

একদিন না একদিন ঠিক জানতে পারবে।

খোকন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বলল, দ্যাখ সোনালী, ছেলেমেয়েরা বড় হবার পর কত যে ফাজিল, কত বদ হয় তা বাবা-মারা ঠিক আন্দাজ করতে পারে না।

না, পারে আবার না?

সত্যিই পারে না। ছেলেমেয়ে সম্পর্কে বাপ-মার এমনই অন্ধ স্নেহ থাকে যে তাদের বেশি খারাপ ভাবতে পারে না।

সোনালী ভাবে।

খোকন সিগারেটে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছিস?

তোমার কথা।

বেশি দূর যাবার কি দরকার? এই যে আমি আর তুই এখনও গল্প করছি বা আমি একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছি তা কি বাবা-মা পাশের ঘরে থেকেও জানতে পারছেন?

তা ঠিক।

তাহলে ভেবে দ্যাখ, বাড়ির বাইরে বা হোস্টেলে থেকে ছেলে-মেয়েরা কি করে তা বাবা-মা জানবে কি করে?

ঠিক বলেছ। সোনালী আবার কি যেন ভাবে। তারপর খোকনের একটা হাত ধরে বলে, তুমি আমার একটা কথা রাখবে খোকনদা?

কী কথা?

আগে বলো রাখবে কিনা।

না জেনে কী করে বলব?

অসম্ভব কিছু বলব না।

তাহলে নিশ্চয়ই রাখব।

ঠিক?

আগে থেকে প্রতিজ্ঞা না করিয়ে কী কথা রাখতে হবে, সেটা তো বল।

তুমি অন্য ছেলেদের মতন খারাপ হবে না।

খোকন হেসে বলে, খারাপ হবো না মানে?

মানে এমন কিছু করবে না যাতে তোমাকে কেউ খারাপ বলে।

এ কথার কোনো মানেই হল না।

কেন?

সব কাজই একজনের কাছে ভালো, অন্যের কাছে খারাপ।

তবুও মাঝামাঝি একটা কিছু তো আছে।

সেটাও এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম।

সোনালী খোকনকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, তুমি বড্ড তর্ক করো।

খোকন হেসে বলে, আচ্ছা তর্ক করব না কিন্তু তুই কী করতে বারণ করেছিস, তা তো বলবি!

বলছি যে তুমি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কোনোদিন মদ-টদ খাবে না।

হুজুগে পড়ে যদি কোনোদিন খাই?

হুজুগে পড়েও খাবে না।

কেন খেলে কি হয়েছে? একদিন মদ খেলেই কি আমি খারাপ হয়ে যাব?

আমি বলছি তুমি খাবে না।

তুই আমার কে যে তোর কথা আমাকে শুনতে হবে?

সোনালী চমকে উঠল, কী বললে? আমি তোমার কে?

তোর কথা শুনতেই হবে?

না। তুমি শুতে যাও, আমি এবার ঘুমোব।

সারারাত গল্প করবি না?

না, তুমি শুতে যাও।

সোনালী রাগ করে মুখখানা ঘুরিয়ে রাখে। খোকনও একটু ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের সামনে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুই সত্যি রাগ করেছিস?

সোনালী কোনো জবাব দেয় না।

খোকন আবার জিজ্ঞাসা করে, কিরে, কথা বলবি না?

তুমি শুতে যাও।

তুই জবাব না দিলে আমি শুতে যাব না।

না রাগ করিনি, খুশি হয়েছি।

খোকন হাসে।

সোনালী রেগে যায়। বলে, আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না।

হাসব না?

নিজের বিছানায় গিয়ে যা ইচ্ছে কর। এবার আমি শোব।

সত্যি শুবি?

হ্যাঁ।

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকার পর খোকন নিজের বিছানায় চলে গেল।

হঠাৎ খোকনের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে বুঝল, কেউ কাঁদছে। এত রাত্রে কোথায় কে কাঁদছে, তা ভেবে পেল না। আরো ভালো করে কান পেতে শুনল। খোকন চমকে উঠল, সোনালী কাঁদছে?

তাড়াতাড়ি উঠে ওর কাছে যেতেই কান্নার শব্দ আরও স্পষ্ট হল।

খোকন ডাকল, সোনালী!

কোনো জবাব নেই।

আবার ডাকল, সোনালী কাঁদছিস কেন, কী হয়েছে?

সোনালী কোনো জবাব দেয় না, দিতে পারে না। উপুড় হয়ে শুয়ে আগের মতনই কাঁদে।

সোনালী, তোর শরীর খারাপ লাগছে, মাকে ডাকব?

কাঁদতে কাঁদতেই ও জবাব দিল, না, তুমি শুতে যাও।

এবার খোকন ওর পাশে বসে মাথার উপর হাত রেখে বলল, তুই কাঁদছিস আর আমি শুয়ে থাকব?

আমি তোমার কে যে আমার কান্নার জন্য তোমাকে জেগে থাকতে হবে?

এতক্ষণে ওর কান্নার কারণ বুঝতে পেরে খোকন হাসতে হাসতে বলল, হা ভগবান! তুই আমার ওই কথার জন্য কাঁদছিস?

ছি, ছি, খোকনদা, তুমি ও-কথা বললে কেমন করে? এতকাল পরে তুমি জানতে চাইলে আমি তোমার কে?

খোকন ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, আমার ওই সামান্য একটা কথার জন্য...

ওটা তোমার সামান্য কথা হল?

আচ্ছা আর ও-কথা বলব না। তুই ঠিক হয়ে শো, আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আমার জন্য তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি শুতে যাও।

তুই না ঘুমুলে আমি এখান থেকে উঠছি না।

আমি তোমার কে?

খোকন ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের ওপর মুখ রেখে কানে কানে বলল, তুই আমার সোনা, সোনালী!

সোনালী মুখ তুলেই বলল, এখন আর গরু মেরে জুতো দান করতে হবে না।

গরু মেরে জুতো দান করছি নাকি?

এর আগে যা তা বলে এখন আর আমাকে সোনা সোনালী বলে ভোলাতে হবে না।

সত্যি বলছি তোকে ভোলাবার জন্য বলিনি। তোকে আমি কত ভালোবাসি, তা জানিস না?

হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, ঘন্টা ভালোবাসো।

নারে সোনালী, তোকে আমি সত্যি ভালোবাসি।

মা কালীর নামে দিব্যি করে বল।

আমি মা কালীর নাম করে বলছি তোকে আমি ভালোবাসি।

সোনালী আর পারে না। এক মুহূর্তে কান্না থেমে যায়, অভিমান চলে যায়। হঠাৎ দু-হাত দিয়ে খোকনের কোমর জড়িয়ে ধরে ওর পায়ের উপর মাথা রেখে বলে, যেমন তুমি আমাকে দুঃখ দিয়েছ, তেমন তুমি সারা রাত এইভাবে বসে থাকবে। আমি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোব।

খোকন একটু অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু কিছু বলতে পারে না। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, এই ভাবে সারারাত বসে থাকা যায় পাগলী?

আমি কিছু জানি না।

তুই ঠিক হয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়। আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

সোনালী আরো জোরে ওকে আঁকড়ে ধরে বলে, তোমাকে আমি ছাড়ছি না। ঠিক এইভাবে বসে থাকতে হবে।

এইভাবে কি বেশিক্ষণ বসে থাকা যায়?

আমি জানি না।

তুই জানিস না?

না।

খোকন কিছু বলে না। চুপ করে বসে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। বোধহয় আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

সোনালী মুখ তুলে খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে বলল, কেমন জব্দ!

সোনালী পা-টা ব্যথা হয়ে গেছে।

হোক।

ওর কথায় খোকন না হেসে পারে না। বলে, সত্যিরে বড্ড ব্যথা করছে।

তোমার কথায় আমার আরো অনেক বেশি ব্যথা লেগেছিল।

সোনালী, তুই বালিশে মাথা রাখ। আমি একটু হেলান দিয়ে বসি।

তারপর তুমি পালিয়ে যাবে?

সত্যি পালাব না।

ঠিক?

আমি বলছি তো পালাব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোনালী বলল, অনেক দিন পর তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছি, তাই না খোকনদা?

হ্যাঁ, অনেক দিন পর।

আগে আমরা একসঙ্গে শুয়ে কত রাত পর্যন্ত গল্প করতাম। আর বড়মা ঘরে ঢুকলে আমরা ঘুমের ভান করতাম, তাই না?

সত্যি সেসব দিনগুলোর কথা ভাবলে ভারি মজা লাগে।

আচ্ছা খোকনদা, হোস্টেলে থাকার সময় আমার কথা তোমার মনে পড়ে?

কেন মনে পড়বে না?

কি মনে পড়ে?

অনেক কিছু।

অনেক কিছু মানে?

অনেক কিছু মানে সবকিছু। আমাদের হাসি-ঠাট্টা ঝগড়া-মারামারি...

আমি তো মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার জন্য কাঁদি।

কেন?

কেন আবার? একলা একলা ভালো লাগে না বলে।

তাহলে আমি এলে ঝগড়া করিস কেন?

আমি মোটেও ঝগড়া করি না।

আবার একটু চুপচাপ।

আচ্ছা খোকনদা, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি বলে তোমার ভালো লাগছে না?

তোকে সব সময়ই আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে হোস্টেলে চলে যাবার পর তোকে বোধহয় বেশি ভালোবাসতে শুরু করেছি।

সত্যি?

এখন বাবা-মার চাইতে তোর জন্য বেশি মন খারাপ লাগে।

পুরী এসে ভালোই হয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ।

তুমি সমুদ্রে চান করবে?

করতেও পারি, ঠিক নেই। তুই তো সমুদ্রে চান করবি না বলেছিস।

না আমি সমুদ্রে চান করব না।

সত্যি সোনালী, তুই যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছিস।

এখন আমাকে দেখলে বেশ বড় মনে হয়, তাই না?

তা একটু হয় বৈকি।

তোমাকেও আজকাল বেশ বড় দেখায়। সোনালী একবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আজকাল তোমাকে যে দেখে সেই ভালো বলে।

তুই ঠিক উল্টো কথা বললি। মেয়েরা বড় হলে ভালো দেখায়। ছেলেরা না।

আমি ঠিকই বলেছি। আমি বড় হয়েছি কিন্তু আমি যেরকম ছিলাম, সেই রকমই আছি। একটুও বদলাইনি।

অনেক বদলে গেছিস।

কি বদলেছি?

খোকন হেসে বলল, সে কথা আমি বলতে পারব না।

কেন?

কেন আবার? বলতে নেই।

সোনালী আর প্রশ্ন করে না। চুপ করে থাকে। ভাবে।

খোকনদা, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমো।

সোনালী খোকনের হাত দুটো চেপে ধরেছিল। আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো আলগা হয়ে গেল। সোনালী ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ সোনালীর ঘুম ভেঙে গেল। খোকন তখনও ওইভাবে পাশে বসে আছে!

কটা বাজে খোকনদা?

আবছা আলোয় খোকন হাতের ঘড়িটা ভালো করে দেখে বলল, সোয়া চারটে।

এ রাম! তোমাকে সারারাত জাগিয়ে রাখলাম। তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আমি আমার বিছানায় যাই।

এখানেও শোও। চিরকাল তো এক বিছানায় শুয়ে মারামারি করেছি। এখন এত লজ্জা কেন?

খোকন শুয়ে পড়ল কিন্তু এতকাল পরে সোনালীর পাশে শুয়েই ওর সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল।

পাঁচ

পরের দিন দুপুরে খোকন সোফায় বসে সিগারেট টানছিল। সোনালী বিছানার উপর বসে ভাজা মশলা চিবুতে চিবুতে বলল, কাল রাত্রে তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি, তাই না খোকনদা?

কষ্ট দিয়েছিস নাকি?

এক সেকেন্ডের মধ্যে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে দেখে আমার এত কষ্ট লাগছিল যে কী বলব।

তুইও তো সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লি।

মোটেও না। আমি আর ঘুমোইনি।

বাজে বকিস না।

সত্যি বলছি আর ঘুম এলো না।

কেন?

সোনালী একটু হেসে বলল, তুমি এমন ক্লান্ত, অসহায় হয়ে আমাকে জড়িয়ে শুয়েছিলে যে আমি তোমাকে ছেড়ে উঠতেও পারলাম না ঘুমোতেও পারলাম না।

বানিয়ে বানিয়ে আজেবাজে কথা বলবি না।

সত্যি খোকনদা, তুমি ঠিক ছোটবেলার মতন...

এই বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার মতন...

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খোকন মনে মনে একটু লজ্জা পায়। একটু পরে খোকন জিজ্ঞাসা করল, আমি ওইভাবে শুয়েছিলাম বলে তোর রাগ হয়নি?

রাগ হবে কেন? তবে অনেক কাল পরে তুমি আমার পাশে শুয়েছিলে বলে একটু অস্বস্তি লাগছিল।

অস্বস্তি মানে?

তোমার হাত-টাত কত ভারী, কত মোটা হয়ে গেছে।...

খোকন হাসে।

তবে তোমার গায়ে একটা ভারি সুন্দর গন্ধ আছে।

খোকন হেসে জিজ্ঞাসা করে, তাই নাকি?

সত্যি। তোমার গায়ের গন্ধ আমার খুব ভালো লাগে।

সবার গায়েই একটা গন্ধ থাকে। তোরও আছে।

আমার গায়ে গন্ধ?

হ্যাঁ, তোর গায়েও গন্ধ আছে বৈকি!

সোনালী বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, ঘণ্টা আছে।

সোনালী আর কথা বলে না। শুয়ে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর ঘুম আসে। সামনের সোফায় বসে সিগারেট টানতে টানতে খোকন ওর দিকে তাকায় অনেকক্ষণ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পাশ ফিরতে গিয়ে হঠাৎ সোনালী চোখ মেলে তাকায়। খোকনকে দেখে। জিজ্ঞাসা করে, তুমি একটু ঘুমোবে না খোকনদা?

না।

রাত্রে তো ঘুম হয়নি। এখন একটু ঘুমোও।

সোনালী আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বিকেলবেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে মিস্টার সরকার সোনালীকে বললেন, এখানে সুন্দর সুন্দর সিল্কের শাড়ি পাওয়া যায়। দামও সস্তা।

তাহলে বড়মাকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দাও।

তুই কিনবি না?

আমি সিল্কের শাড়ি দিয়ে কি করব?

আমি তো ভাবছিলাম শুধু তোর জন্যই একটা শাড়ি কিনব।

কেন?

তোর বড়মার অনেক শাড়ি আছে।

তা হোক। তুমি বড়মাকেই কিনে দাও।

খোকন হাসতে হাসতে বলল, সোনালী তুই বেশ ভালোভাবেই জানিস বাবার মাথায় যখন এসেছে তখন তোর শাড়ি কিনবেনই, কিন্তু বেশ ন্যাকামি করে...

সোনালী আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ওর পিঠে দুম করে একটা ঘুঁষি মেরে বলল, আর আজেবাজে কথা বলবে?

ও ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়।

ওরা তিনজনেই হাসেন।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেন, তোদের ছেলেমানুষী আর যাবে না।

পরের দিন সকালে গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়াম থেকে দুটো শাড়িই কেনা হল। এম্পোরিয়াম থেকে হোটেলে ফেরার পর শিবানী বললেন, সোনালী আজ বিকেলে এই শাড়িটা পরিস।

কলকাতায় গিয়ে পরব।

না না আজ বিকেলেই পরিস।

বিকেলে ওই শাড়িটা পরে সোনালী সামনের বারান্দায় আসতেই মিস্টার সরকার আর ওঁর স্ত্রী একসঙ্গে বললেন বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

সোনালী ওদের দুজনকে প্রণাম করল। খোকন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ভুবনেশ্বর গেছে।

খেয়ে-দেয়ে রাত দশটা-সাড়ে দশটায় ফিরবে। তাই ওকে প্রণাম করতে পারল না।

মিস্টার সরকার সোনালীকে একটু আদর করে বললেন, তুই সত্যিই সোনালী।

শিবানী ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, যত দিন যাচ্ছে তুই তত সুন্দরী হচ্ছিস।

লজ্জায় আর খুশিতে সোনালী মুখ তুলতে পারে না।

সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে সবাই একবার সোনালীর দিকে দেখেন। ও লজ্জায় মুখ তুলে হাঁটতে পারে না। মিস্টার সরকার গর্বের সঙ্গে বললেন, দেখেছ শিবানী আজকে কেউ সমুদ্র দেখছে না, সবাই তোমার মেয়েকে দেখছে।

বড়মা, জ্যাঠামণি এইসব কথা বললে আমি এক্ষুনি হোটেলে ফিরে যাব।

শিবানী বললেন, কালও কত লোক তোকে দেখেছিলেন। এতে লজ্জা পাবার কি আছে?

রাত্রে বি এন আর হোটেলের ডাইনিংরুমে এক মজার কাণ্ড ঘটল। মধ্য বয়সী এক দম্পতি মিস্টার সরকার শিবানীকে বললেন, আপনার এই মেয়েটিকে যে আমি পুত্রবধূ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

সোনালী ওই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ঘরে চলে গেল।

সোনালীর কাণ্ড দেখে ওরা চারজন একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

দু-এক মিনিটের মধ্যে খোকন ফিরে এসে ওকে এত সেজেগুজে একলা থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, তুই একলা একলা কী করছিস?

এমনি বসে আছি।

বাবা মা কোথায়?

ডাইনিংরুমে।

তোর খাওয়া হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ওঁদের খাওয়া হয়নি?

হয়েছে।

তবে ওঁরা কি করছেন?

এক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।

তা তুই চলে এলি?

সোনালী এতক্ষণ মুখ নীচু করে একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। এবার ও খোকনের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, জানো খোকনদা ওই ভদ্রমহিলা কি অসভ্য!

খোকন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন কি হয়েছে?

হঠাৎ বড়মা আর জ্যাঠামণিকে এসে বলছে আপনার মেয়েকে পুত্রবধূ করতে ইচ্ছে করছে!

খোকন হো হো করে হেসে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সোনালী ওর হাতে একটা চড় মেরে বলল, তুমিও ভীষণ অসভ্য।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সোনালী খোকনকে প্রণাম করতেই ও জিজ্ঞাসা করল, চড় মেরেই প্রণাম?

নতুন শাড়ি পরেছি না।

খোকন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে সোনালীকে দেখে বললে, সত্যি আজ তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

সকালবেলার প্রথম ঝলক সোনালী রোদের মতন ও হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, সত্যি খোকনদা?

খোকন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, দারুণ!

খোকন আর কোন কথা না বলে বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে গেল। দশ-পনেরো মিনিট পরে এঘরে ফিরে আসতেই সোনালী জিজ্ঞাসা করল, জ্যাঠামণি বা বড়মা আমার সম্পর্কে কিছু বললেন?

খোকন মুখ টিপে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, তুই কি জানতে চাস? বিয়ের কথা?

খুব গম্ভীর হয়ে সোনালী বলল, বাজে অসভ্যতা কোরো না।

তোর ভয় নেই। কেউ তোকে দুম দাম বিয়ে দিয়ে পার করবে না।

সোনালী চুপ করে বসে থাকে। কোনো প্রশ্ন, কোনো মন্তব্য করে না।

খোকন চুপ করে থাকে না। আস্তে আস্তে সোনালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, তোর বিয়ে দিতে হবে ঠিকই কিন্তু বাবা-মা তোকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারেন না।

সোনালী এবারও কিছু বলে না।

খোকন বলে, আমি ভাবতেই পারি না তুই অন্য কোথাও চলে যাবি। তুই না থাকলে আমি তো বোবা হয়ে যাব।

সোনালী এসব কথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু বলল, আর কথা না বলে জামা-কাপড় বদলে শুয়ে পড়ো।

তোর ঘুম পাচ্ছে নাকি?

আজ বোধহয় সারারাতই জেগে থাকব।

কেন?

কেন আবার? দুপুরে ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়েছি।

তাহলে তো আজ জোর আড্ডা হবে।

না, না, তুমি এত ঘোরাঘুরি করে এসেছ, তুমি নিশ্চয়ই ঘুমোবে।

গল্প করলে আমার ঘুম আসে না।

তুমি শোও। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। সোনালী একটু থেমে, একটু হেসে বলল, কাল রাত্রে তুমি আমাকে যা দিয়েছ, তার কিছু প্রতিদান আজ দিই।

সে রাত্রে খোকন সত্যি ঘুমিয়ে পড়ে।

এরপর যখন খোকন ছুটিতে এসেছে তখনই কথায় কথায় বলেছে মা, সোনালী যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে চা না দেয় তাহলে পুরীর ওই ভদ্রলোকের ছেলে ক্যাবলার সঙ্গেই আমি...

সোনালী দুম দুম করে খোকনের পিঠে দুটো-তিনটে ঘুষি মেরে বলে, ক্যাবলার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।

বিহাইকাকা বলেছিল ক্যাবলা ছেলেটি বেশ ভালো। মল্লিক বাজারে মোটরের চোরাই পার্টস বিক্রি করে বেশ টু পাইস...

আর কেবলি বুঝি তোমার সঙ্গে আই-আই টিতে পড়ে?

তবে ক্যাবলা জামাই হলে বাবা নিশ্চয়ই ওকে অফিসের জমাদার করে নেবে।

সোনালী বাচ্চাদের মতন চিৎকার করে, খোকনদা!

শিবানী আর শুয়ে থাকতে পারে না। উঠে এসে বললেন, তোদের জ্বালায় কোনোদিন দুপুরে

আমার বিশ্রাম করার উপায় নেই।

দ্যাখো না বড়মা...

ওকে এক কাপ চা করে দিলেই তো...

কিন্তু আমাকে যা তা বলছে কেন?

খোকন...তুই বড্ড ওর পিছনে লাগিস।

খোকন ফিরে যাবার দু-এক দিন আগে সব ঝগড়া হঠাৎ থেমে যায়।

জানিস সোনালী, হোস্টেলে এমনি বেশ ভালোই থাকি কিন্তু ছুটির পর ফিরে গিয়ে কিছুদিন বড্ড খারাপ লাগে।

সত্যি বলছ, নাকি আমাকে খুশি করার জন্য বলছ?

সত্যি বলছি। হোস্টেলে পড়াশুনা ইয়ার্কি-বাঁদরামি করে দিনগুলো ভালোই কাটে, তবে এখন ফিরে গিয়ে মাসখানেক শুধু এখানকার কথা মনে পড়বে।

আমার কথা মনে পড়ে?

খোকন সিগারেট টানতে টানতে শুধু মাথা নাড়ে।

কি মনে হয়?

খোকন দু-এক মিনিট কি যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা বাইরের দিকে ঘুরিয়ে যেন আপন মনেই বলে, তোর কথা খুব বেশি মনে হয়।

কেন?

খোকন যেন ওর কথা শুনতে পায় না। বলে, তোকে নিয়ে অনেক কথা ভাবি।

আমাকে নিয়ে এত কী ভাবে খোকনদা?

ও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, সে এখন বলতে পারব না।

কেন?

খোকন ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, মানুষ মনে যা কিছু ভাবে তা কি সব সময় বলতে পারে?

আমার কথা আমাকেও বলা যায় না?

খোকন আবার মাথা নাড়ল। বলল, না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সোনালী বলল, তুমি চলে গেলে আমারও খুব খারাপ লাগে। মনে হয় কেন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতাম, কেন তোমার গা টিপে দিইনি...

আর কি মনে হয়?

বাড়িটা ভীষণ ফাঁকা লাগে!

তাই নাকি?

হ্যাঁ খোকনদা। লেখাপড়া, কাজকর্ম কিছুতেই মন বসাতে পারি না।

কেন?

কেন আবার? শুধু তোমার কথা মনে হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ খোকন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুই সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি?

কোথায় চলে যাব?

কোথায় আবার? বিয়ে করে চলে যাবি?

ওসব কথা আমি ভাবি না।

একেবারেই ভাবিস না?

না।

কিন্তু একদিন তো তোকে চলে যেতে হবে, তা তো জানিস?

সোনালী কোন জবাব দেয় না।

আচ্ছা সোনালী আমি যদি তোকে যেতে না দিই?

সোনালী হেসে বলে, এখানে থাকতে পারলে তো আমারই মজা।

সত্যি বল তুই থাকবি?

থাকব না কেন?

তোর আপত্তি নেই?

এখানে থাকতে আমার আবার কি আপত্তি?

মিস্টার সরকার অফিস থেকে এসে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই বললেন, শিবানী আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম আজই মিস্টার ব্যানার্জির মেয়ের বিয়ে।

আজই? শিবানী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার একদম মনে ছিল না। তারপর ঘোষের কাছে শুনেই...

আজ তো আঠারোই। আমারও একদম খেয়াল ছিল না।

চটপট তৈরি হয়ে নাও। একটা শাড়ি কিনতে হবে তারপর মিত্তিরকে তুলে নিয়ে হাওড়া হয়ে কোন্নগর যাওয়া।

মিত্তিরের গাড়ি কি হলো?

ওর গাড়ি টিউনিং করতে গ্যারেজে দিয়েছে।

তার মানে পার্ক সার্কাস ঘুরে হাওড়া হয়ে কোন্নগর?

কি আর করা যাবে? তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

কাল খোকন যাবে, আর আজ...

কিন্তু ব্যানার্জির মেয়ের বিয়েতে না গিয়ে তো উপায় নেই।

তা ঠিক। শিবানী একটু ভেবে বললেন, ফিরতে ফিরতে নিশ্চয় বারোটা একটা হয়ে যাবে?

মিস্টার সরকার একটু হেসে বললেন, এখন ছ'টা বাজে। সাতটায় বেরিয়ে শাড়ি কিনে মিত্তিরের বাড়ি পৌঁছতেই আটটা। সোনালীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন, বিয়ে বাড়ি পৌঁছতেই দশটা বেজে যাবে।

তার মানে ফিরতে ফিরতে দুটো আড়াইটে!

তবে কাল রবিবার। এই যা ভরসা।

তৈরি হয়ে সোনালীকে সব বুঝিয়ে ওদের বেরুতে বেরুতে সোয়া সাতটা হয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই খোকন সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, সোনালী, চা কর।

ও হাসতে হাসতে বলল, জ্যাঠামণি, বড়মা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি তোমার বাঁদরামি শুরু হলো?

ভালো করে সেবা-যত্ন কর ; তা নইলে আমি চলে যাবার পর মনে মনে আরও কষ্ট পাবি।

অযথা এসব কথা বলে আমার মন খারাপ করে দিও না।

খোকন হঠাৎ দু' হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকিয়ে বলল, আমি চলে গেলে সত্যি তোর মন খারাপ হয়?

না হবার কি আছে?

তুই আমাকে ভালোবাসিস?

তুমি জানো না?

না।

বুঝতে পারো না?

খোকন অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়ল।

তাহলে তোমার জেনে কাজ নেই।

তুই বল না আমাকে ভালোবাসিস কিনা।

ভালোবাসব না কেন?

কি রকম ভালোবাসিস?

সোনালী মাথা দুলিয়ে বলল, আমি অত জানি না।

জানিস না?

না। সোনালী ওর হাত দুটো টেনে বলল, হাত খোলো। চা করব।

চা করতে হবে না।

এক মিনিট আগেই বললে চা কর। আবার...

আগে আমাকে একটু আদর কর।

অসভ্যতা কোরো না। তুমি হাত খোলো।

আগে আমাকে একটু আদর কর। তা না হলে আমি হাত খুলছি না।

অসভ্যতা কোরো না খোকনদা। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমার অনেক কাজ আছে।

একটু আদর না করলে আমি ছাড়ছি না।

আমি আদর করতে জানি না।

জানিস না?

না।

আমাকে আদর করতে ইচ্ছে করে না?

বাজে বকবে না। তুমি এই পাঁচ বছর হোস্টেলে থেকে অত্যন্ত অসভ্য হয়ে গেছ।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি কি ভেবেছ আমি কিছুই বুঝি না? আমিও দুদিন পর বি-এ পরীক্ষা দেবো।

আমি কী অসভ্যতা করলাম?

সব বলা যায় না।

এমন অসভ্যতা করেছি যে বলাই যায় না?

তোমাদের মতন হোস্টেলের ছেলেদের কাছে এসব অসভ্যতা না হলেও...

কি সব অসভ্যতা?

বলেছি তো আমি সবকিছু খুলে বলতে পারব না। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

খোকন একটু হেসে ওকে ছেড়ে দিল। বলল, তুই ঠাট্টা-ইয়ার্কি বুঝিস না সব ব্যাপারেই তুই বড্ড সিরিয়াস।

সোনালী ড্রইংরুম থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, এ ধরনের ঠাট্টা-ইয়ার্কি তুমি আমার সঙ্গে করবে না।

আচ্ছা তুই চা কর।

পারব না।

চা খাওয়াবি না?

না।

কাল চলে যাবার পর যখন...

আমার কিছু মন খারাপ হবে না। তুমি আজই চলে যাও।

কিন্তু আমার যে ভীষণ চা খেতে ইচ্ছে করছে।

শুধু চা কেন, আরও অনেক কিছু খেতেই তোমার ইচ্ছে করছে কিন্তু আমার দ্বারা কিছু হবে না।

চা খাওয়াবি না?

তুমি আমার সঙ্গে বক-বক কোরো না। সোনালী এবার আপন মনেই বলে, হাজার কাপ চা খাইয়েও তোমার মন ভরবে না। একটু আগেই তোমার যে মূর্তি দেখেছি তাতে আমার আর কিছু বুঝতে বাকি নেই।

খোকন ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে গেল। প্যান্ট-বুশসার্ট পরে বেরুবার সময় বলল, আমার ফিরতে রাত হবে।

আমি একলা একলা থাকব?

খোকন চলে গেল।

সোনালী দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ভাবছিল নানাকথা। খোকনদার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ও কেন এমন পাগলামি করে? তাছাড়া আমার সঙ্গে কি ওর এই পাগলামি করার সম্পর্ক?

সোনালী খোকনের কথা ভাবতে ভাবতেই রান্নাঘরের কাজ শেষ করল। তারপর নিজের ঘরে এলো। বসল। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে খোকনের সঙ্গে গার্ডেনে তোলা ওদের দুজনের ছবিটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজতেই সোনালী চমকে উঠল। মনে মনে একটু ভয় পেল। তাছাড়া হঠাৎ খোকনের জন্য মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। না খোকন আসছে না। এক এক মিনিট এক এক ঘণ্টা মনে হয়। সোনালী ছটফট করে। ঘড়িতে সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজতেই ওর কান্না পায়।

সোয়া এগারটার সময় খোকন আসতেই সোনালী আর কান্না চেপে রাখতে পারে না। অঝোরে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, এভাবে আমাকে একলা রেখে যাবার কোন মানে হয়? আমি ভয় ভাবনায় মরে যাচ্ছিলাম।

খোকন শুধু বলল, কাঁদিস না। আমার ঘরে আয়। কথা আছে।

আমাকে একলা রেখে তুমি এতরাত পর্যন্ত কেন বাইরে ছিলে, আগে সেকথা বলো।

সত্যি অন্যায় হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

খোকনের কথা শুনে সোনালী চমকে ওঠে। বলে, তুমি এভাবে কথা বলছ কেন খোকনদা?

খোকন নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাইব না?

সোনালী ওর পিছন পিছন ওর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে বলো তো?

কি আবার হবে? কিচ্ছু হয়নি।

সোনালী খোকনের কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলল, আমাকেও বলবে না? আমি না তোমার সোনা, সোনালী?

খোকন আর চুপ করে থাকতে পারে না। দু'হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, সোনালী, তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

আমি কি মরে যাচ্ছি যে তুমি একথা বলছ?

না, না সোনালী, তোকে আমি হারাতে পারব না। কোনোদিন না।

সোনালী আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি যে তুমি এমন করে কাঁদছ?

খোকন মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই আমাকে ভালোবাসিস না?

নিশ্চয়ই ভালোবাসি।

খুব ভালোবাসিস?

মনে তো হয়।

তুই আমাকে বিয়ে করতে...

সোনালী সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে বলে, খোকনদা!

সোনালীর হাত সরিয়ে খোকন বলল, আমি কি খুব অন্যায় কথা বললাম?

সোনালী কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জানি না খোকনদা। তুমি আমাকে এসব প্রশ্ন কোরো না।

খোকন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, আমার পাশে একটু বসবি?

সোনালী কোন জবাব না দিয়ে পাশে বসল।

তুই আমার জন্য খুব ভাবছিলি?

ভাবব না?

কি ভাবছিলি?

অনেক রকম আজেবাজে চিন্তা হচ্ছিল।

আজেবাজে মানে?

ভাবছিলাম কোনো বিপদে পড়লে কিনা।

খোকন একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, আমি তো কাল চলে যাচ্ছি। চিঠি লিখবি তো?

তুমি চিঠি লিখলেই জবাব দেবো।

না, এবার তুই আগে লিখবি।

কেন?

আমি যে প্রশ্ন করলাম, তার জবাব দিবি।

না, না খোকনদা, ওসব কথা আমি লিখতে পারব না!

কিন্তু আমি যে তোর জবাব না পেলে শান্তিতে পরীক্ষা দিতে পারব না।

মনে রেখো এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা।

তাই তো বলছিলাম...

ওসব পাগলামি ছাড়ো। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলে আমি আর তোমাকে ভালোবাসব না।

খোকন সোনালীর মুখের সামনে মুখ নিয়ে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল, পরীক্ষার রেজাল্ট যদি ভালো হয়, তাহলে আপত্তি করবি না তো?

লজ্জায় সোনালী প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষা দিয়ে ফিরতেই হাওড়া স্টেশনে সোনালীকে একলা দেখে খোকন অবাক। জিজ্ঞাসা করল, কিরে মা আসেনি?

না।

তুই একলা এসেছিস?

হ্যাঁ।

মা এলেন না কেন?

আমি বারণ করলাম।

কেন?

তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে।

ঝগড়া!

তুমি যেন গাছ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে।

কিন্তু...

এই দুমাসের মধ্যে আমাকে একটাও চিঠি দাওনি কেন?

খোকন সোনালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, তোকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে!

আঃ! কি বাজে বকছ!

স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেই খোকন বলল, চল সোনালী রিকশা করে বাড়ি যাই।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

রিকশায় গেলে বেশ প্রাণভরে আড্ডা দেওয়া যাবে।

তুমি রিকশায় এসো। আমি ট্রামে-বাসে ফিরে গিয়ে বড়মাকে খবরটা দিই।

ট্যাক্সিতে উঠেই সোনালী বলল, তোমার চেহারাটা দারুণ খারাপ হয়ে গেছে।

হবে না? একে পড়াশুনোর চাপ, তার উপর তোর চিন্তা।

বড়মা জিজ্ঞাসা করলেও এই জবাব দেবে তো?

খোকন হাসে।

ছুটির দিনগুলো আনন্দে, হৈ-হুল্লোড় করে প্রায় ঝড়ের বেগে ফুরিয়ে গেল।

রেজাল্ট বেরুবার দিন বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

বিহারী ছুটতে ছুটতে এসে খোকনকে জড়িয়ে ধরে বলল, খোকনা এখন আমি মরলেও আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে?

তোর অনুমতি নিয়ে আমাকে মরতে হবে?

একশো বার!

রেজাল্ট বেরুবার এক মাসের মধ্যেই খোকন বাঙ্গালোরে বারোশো টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে গেল। সবাই খুশি, সবাই আনন্দিত কিন্তু খোকনকে দেখে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, বেশ চিন্তিত মনে হয়!

শিবানী খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, তুই এত কি ভাবছিস?

কিছু না।

কিছু না বললেই আমি শুনব! আজ কদিন ধরে সব সময় চুপচাপ বসে আছিস। কি হয়েছে তোর?

সত্যি বলছি কিছু হয়নি।

রাত্রে সবাই শুয়ে পড়ার পর সোনালী আস্তে আস্তে খোকনের ঘরে এসে ওর পাশে বসল। একটু চুপ করে থাকার পর বলল, তোমাকে এমন চিন্তিত থাকতে দেখে জ্যাঠামণি ভীষণ চিন্তিত।

খোকন কোন কথা বলে না।

তুমি আমাকেও কিছু বলবে না?

কি বলব বল।

তুমি এত কি ভাবছ?

কি আর ভাবব? ভাবছি তোর কথা।

সোনালী আর কোনো প্রশ্ন করতে পারল না।

খোকনের বাঙ্গালোর রওনা হবার আগের রবিবারের কথা। সোনালী বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় গেছে। খোকন ওর বাবা মার ঘরে ঢুকেই মুখ নীচু করে বলল, একটা কথা বলতাম।

ওর মা একটু হাসতে হাসতে বললেন, তা এমন করে বলছিস কেন?

খোকন মুখ নীচু করেই বলল, আমি সোনালীকে বিয়ে করব।

মিস্টার সরকার পাগলের মতন চিৎকার করে উঠলেন, নন্‌সেন্স! ভাই-বোনে কখনো বিয়ে হয়?

শিবানী তাড়াতাড়ি খোকনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

খোকন জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মতামত বলবে না?

মিস্টার সরকার আবার গর্জে উঠলেন, রাস্‌কেল, গেট আউট। এক্ষুনি বেরিয়ে যা হতভাগা!

শিবানী দুহাত দিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হাজার হোক সোনালী একটা ড্রাইভারের মেয়ে...

খোকন পাগলের মতো হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, মা! ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল! আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সোনালী বিহারী ড্রাইভারের মেয়ে!

খোকনের পৌঁছনোর সংবাদ আসার পর কলকাতা থেকে ওরা তিনজনেই চিঠি দিলেন কিন্তু তার কোনো উত্তর এল না। মিস্টার সরকার টেলিগ্রাম করে ওর খবর জানতে চাইলেন।

ঠিক দুদিন পরের কথা।

এগারোটা বাজতে না বাজতেই মিস্টার সরকার অফিস থেকে ফিরে এসেই বাচ্চা ছেলের মতন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, শিবানী, খোকন পাগল হয়ে গেছে!

পাগল!

হ্যাঁ।

ছোট্ট শিশুর মতন হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মিস্টার সরকার টেলিগ্রামটা শিবানীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

পাশের ঘর থেকে সোনালী উন্মাদিনীর মতন চিৎকার করে উঠল, খোকনদা!

প্রিয়বরেষু



...অনেক ভাবনা চিন্তা করেও কি নিয়ে উপন্যাস লিখব, তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না। একটা পুরনো ডায়েরি খুঁজতে গিয়ে টেবিলের নীচের ড্রয়ারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার এক দিদির অনেকগুলো চিঠি পেলাম। চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মনে হল, এই চিঠিগুলো ছাপিয়ে দিলেই একটা উপন্যাস হতে পারে।

আমার এই দিদির নাম কবিতা চৌধুরী। থাকেন নিউইয়র্কে। চাকরি করেন ইউনাইটেড নেশানস্-এ। ইউনাইটেড নেশানস্-এর স্পেশ্যাল কমিটির কাজে দিদিকে ঘুরতে হয় নানা দেশে। ইউনাইটেড নেশানস্-এর ক্যাফেটেরিয়ায় দিদির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর আস্তে আস্তে দুজনে দুজনের কাছে এসেছি। খুব কাছে। আজ বোধহয় দিদি আমার চাইতে কাউকে বেশি ভালোবাসেন না। বিশ্বাসও করেন না। আমি দিদিকে শুধু শুধু ভালোবাসি না, শ্রদ্ধা করি। দিদি আমার সত্যিই অনন্যা।

দিদি যখন যেখানেই থাকুন না কেন, আমাকে চিঠি লিখবেনই। কখনও ছোট। নিদেনপক্ষে পিকচার পোস্টকার্ডের পিছনে লিখবেন, ঘণ্টাখানেক সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে কাটিয়ে কলম্বো হয়ে কায়রো যাচ্ছি। ওখানে পৌঁছে চিঠি দেব। দিদি বলেন, তোমাকে চিঠি লিখতে বসলেই মনে হয়, তুমি আমার সামনে বসে বসে অথবা আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার কথা শুনছ। তাই তোমাকে চিঠি না লিখে পারি না। আমি অবশ্য খুব কমই চিঠি লিখি। মাঝে মাঝে আমরা দু'ভাইবোনে ভারি মজা করি। দিদি ব্যস্ততার জন্য চিঠি লিখতে না পারলে কয়েকদিনের ডায়েরির কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে দিদিকে পাঠিয়ে দিই।

যাই হোক দিদির জীবনটা বড়ই বিচিত্র। এ সংসারে সাধারণ মানুষ যা কিছু কামনা করে, সেসব কিছুই দিদির আছে। দিদির বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-যৌবন যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করবেই। অর্থ প্রতিপত্তির অভাব নেই। অভাব নেই আত্মীয়-বন্ধুর। এত কিছু পেয়েও দিদির অনেক জ্বালা, অনেক দুঃখ। এই পৃথিবীর বহু মানুষের বিরুদ্ধে দিদির অনেক অভিমান, অনেক অভিযোগ। দিদিকে হঠাৎ দেখলে, আলাপ করলে কিছু বুঝা যায় না ; জানা যায় না দিদি আমার একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।

আর বেশি লিখতে চাই না। দিদির চিঠি আর ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলো পড়লেই সবকিছু জানা যাবে। দিদির নাম ঠিকানা আর অন্যান্য পাত্র-মিত্রের নাম-ঠিকানা বদলে দিয়েছি। তা নয়তো আমাদের দেশের অনেক গুণী-জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিরা বড়ই বিপদে পড়বেন।...

নিমাই ভট্টাচার্য

প্রিয়বরেষু ভাই রিপোর্টার,

ভেবেছিলাম এ সব কথা কোনোদিন কাউকে বলব না। কিছুতেই না। অসম্ভব। এ সব কথা বলার নয়। বলা যায় না। বোধহয় উচিতও নয়। হাজার হোক এই পৃথিবীটা এখনও পুরুষদের রাজত্ব। আমরা মেয়েরা অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু করছি কিন্তু রাজার আসনে এখনও তোমরা পুরুষরা বসে আছো ভারতবর্ষে, চীন-জাপান, ইউরোপ, আমেরিকায়। সর্বত্র।

তাছাড়া কোনোদিন ভাবিনি আমি কোনো পুরুষকে ভালোবাসব বা বিশ্বাস করব। কিন্তু তুমি আমার জীবনে এসে সবকিছু গণ্ডগোল করে দিলে। অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে আমার আলাপ। ঘনিষ্ঠতাও আছে কয়েকজনের সঙ্গে। অধিকাংশ পুরুষ আমার কাছে এলেই কেমন যেন হিংস্র পশুর মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি শিশু নই। তাদের লোলুপ দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝতে পারি। তাছাড়া ওরা সবাই যেন দ্বিধায়, সঙ্কোচে প্রায় শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসেন। আর তুমি? এমন নাটকীয় ভাবে ও অপ্রত্যাশিত ঝড়ের বেগে আমার সামনে এসে হাজির হলে যে আমি কিছুতেই তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলাম না। সেদিনের কথা ভেবে আজও আমার হাসি পায়।

দিদি, আমি এই মহাদেশে একজন নবাগত বাঙালি সাংবাদিক।

আমি অবাক হয়ে তোমার দিকে তাকাতেই তুমি প্রশ্ন করলে, আপনিই তো কবিতা চৌধুরী?

হ্যাঁ।

তুমি নির্বিবাদে এক পেয়ালা কফি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, ব্যস! তাহলে ভুল করিনি। কফি নিন।

কিন্তু...

দিদি বলে যখন ডেকেছি তখন আবার কিন্তু কেন? তাছাড়া আপনি অত্যন্ত সুন্দরী হলেও আমার বদ মতলব নেই। আফটার অল আমি আপনার ছোট ভাই।

সো কাইন্ড অফ ইউ, বাট।

আবার কিন্তু? নাও নাও, কফি খাও।

আপনি...

ছোট ভাইকে কেউ আপনি বলে? খুব বেশি সম্মান দিতে চাও তো তুমি বল। তুই বললেও আপত্তি নেই।

তোমার কথা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। হাসতে হাসতেই কফির পেয়ালাটা হাতে নিলাম।

না, না, দিদি, হাসির কথা নয়। নিউইয়র্কের মতো শহরে তোমার মতো একজন দিদি অত্যন্ত দরকার।

কেন?

এখুনি বলব?

আপত্তি না থাকলে...

দিদি বলে যখন ডেকেছি তখন কোনো কিছু বলতেই আপত্তি নেই।

তাহলে বলুন।

আবার বলুন?

আমি একটু হাসি। বলি, হাজার হোক আমার বেশি বয়স নয়। তারপর পকেটে কয়েক শ' ডলারের ট্রাভেলার্স চেক আছে। আর মাথায় কখন কোনো বদ বুদ্ধি আসে, তার কি ঠিক আছে?

কফি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আমার কি ভূমিকা তা তো বুঝলাম না।

হা ভগবান! ছোট ভাই অধঃপাতে গেলে দিদির কি ভূমিকা তাও বলে দিতে হবে?

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে তুমি বলেছিলে, আরো একটা বিশেষ কারণে তোমাকে আমার দরকার।

কি সেই বিশেষ কারণ?

তুমি পকেট থেকে পার্স বের করে একটা সুন্দরী মেয়ের ফটো দেখিয়ে বললে, এই কালো কুচ্ছিত মেয়েটাকে আমি বিশেষ ভালোবাসি না, কিন্তু মেয়েটা আমাকে সত্যি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ওর ধারণা আমেরিকার সব সন্দুরী মেয়েই আমার প্রেমে পড়বে।

তুমি এমন সিরিয়াস হয়ে কথাগুলো বললে যে আমি অনেক চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারলাম না।

না, না, দিদি হাসির কথা নয়। আমাকে নিয়ে সত্যি ওর বড় ভয়।

কিসের ভয়?

যদি আমি ওকে ভুলে যাই। ও যদি আমাকে হারায়!

তোমার কথাবার্তা শুনে আমার ভারি মজা লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, ওর নাম কি?

দিদি, এখনই সবকিছু বলব?

আচ্ছা, পরে শুনব।

আমি তোমার চেয়ে বয়সে খুব বেশি বড় না। বোধহয় আমরা দুজনেই সমবয়সী। তা হোক। তুমি সত্যি আমাকে দিদির মতো ভালোবাস, শ্রদ্ধা কর। আমিও তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসি। ভালোবাসতে বাধ্য হয়েছি। প্রথমে নিশ্চয়ই একটু দ্বিধা ছিল। ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে মনের মেঘ কেটে যেতে বিশেষ সময় লাগেনি। সেদিন বলতে পারিনি কিন্তু আজ স্বীকার করছি, প্রথম দিনই তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল। তোমার চোখের দৃষ্টিতে কোনো নোংরামি দেখিনি, তোমার কথাবার্তা বা ব্যবহারে কোনো নীচতার ইঙ্গিতও পাইনি।

আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি, তোমাকে আমি ভালোবাসি, স্নেহ করি এবং তোমার ভালোবাসায় আমি ধন্য হয়েছি। নিউইয়র্ক ছেড়ে যাবার দিন এয়ারপোর্টে তুমি আমাকে প্রণাম করলে, ছোট্ট শিশুর মতো অজোরে কাঁদলে। আমিও তোমার চিবুকে চুমু খেয়ে তোমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চোখের জল না ফেলে পারিনি। আমার মনের মধ্যে যেটুকু দ্বিধা, গ্লানি ছিল, তোমার চোখের জলে সেটুকুও ধুয়ে গেল। আজ আমি সারা পৃথিবীর সামনে গর্ব করে বলতে পারি, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার দিদি। তোমার নিশ্চয়ই আরো অনেক দিদি আছেন কিন্তু আজ তুমিই আমার একমাত্র ভাই, বন্ধু ও আপনজন। একদিন আমিও অনেকের দিদি ছিলাম। এই সংসারের অন্যান্যদের মতো আমারও আত্মীয়স্বজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন নানা

জায়গায়, কিন্তু আস্তে আস্তে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে।

ইউনাইটেড নেশনস্‌-এর ক্যাফেটেরিয়ায় তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর যখন তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম এসেছিলে, তখন আমাদের কি কথাবার্তা হয়েছিল, তা তোমার মনে আছে? এতদিন পর হয়তো তোমার সেদিনের কথা মনে নেই কিন্তু আমার মনে আছে। কিচ্ছু ভুলিনি।

তুমি আমার ঘরদোর-সংসার দেখার পর বলেছিলে, দিদি, তুমি বেশ আছ।

বেশ আছি মানে?

মানে ভগবান দশ হাত উজাড় করে তোমাকে সবকিছু দিয়েছেন।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি এমন দেখলে যে এ কথা বলছ?

ভগবান কি তোমাকে দেননি? বিদ্যা-বুদ্ধি, রূপ-যৌবন, অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি,.।

আমি হাসতে হাসতেই আবার প্রশ্ন করি, আর কিছু?

না, না, দিদি, হাসির কথা নয়। এ সংসারে মানুষ যা যা কামনা করে, তার সবকিছুই তুমি পেয়েছ।

আমি যেন আপন মনেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ভগবান আমাকে সবকিছু দিয়েছেন, তাই না?

একশোবার দিয়েছেন।

আমি তোমার চিবুক ধরে আদর করে বলেছিলাম, কই, ভগবান তো এই ভাইকে আগে দেননি?

ভগবান তো তোমাদের আমেরিকার মতো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলে বসেননি যে একেবারে ঝুড়ি ভরে সবকিছু কিনে আনবেন।

আমি তর্ক না করে শুধু বলেছিলাম, ভাই, ভগবানের দোকানেও কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। আমাকে বোধহয় একটু বেশিই দিতে হয়েছে।

সেদিন তুমি আর প্রশ্ন করনি। আমিও আর কিছু বলিনি। বোধহয় তুমি আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারনি। অবশ্য বুঝতে পারলেও সেদিন তোমাকে কিছুতেই বলতে পারতাম না। সেদিন তোমাকে ভালো লাগলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম না। এখন তোমাকে সবকিছু বলতে পারি। বলব। আমি জানি তুমি আমার কোনো ক্ষতি করবে না। মনে মনে বিশ্বাস করি, তুমি তোমার দিদির দুঃখ উপলব্ধি করবে।

আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি অত্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অনেক অলিগলি, রাজপথ-জনপথ, অনেক মানুষ, অনেক দেশ-মহাদেশ, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আজ আমি নিউ ইয়র্কে। কিন্তু ভাই, বিশ্বাস কর, জীবনের এই পথটুকু পার হতেই আমাকে প্রত্যেকটা খেয়াঘাটে কিছু না কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। সে-সব কাহিনি আস্তে আস্তে তোমাকে বলব। না বলে থাকতে পারব না। জীবনের চরমতম গোপন কাহিনিও চিরদিনের জন্য নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায় না। অসম্ভব। আমিও আর পারছি না। দীর্ঘদিন ধরে এ বোঝা একা একা বহন করা যায় না। তাই তোমাকে সবকিছু বলে আমি একটু হালকা হতে চাই।

বাইরে থেকে সবাই আমার রূপ দেখে, যৌবন দেখে। কিন্তু এই রূপের জ্বালা, যৌবনের দাহ যে কি অসহ্য ও মর্মান্তিক, তা কেউ জানে না, জানতেও চায় না। আমার মুখের হাসি দেখেই সবাই ভাবে আমার জীবনেও কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছিল, এসেছিল শ্রাবণের ধারা, জমেছিল ভাদ্দরের মেঘ। এই সংসারে একটি নিঃসঙ্গ মেয়েকে পথ চলতে হলে যে প্রতি পদক্ষেপে

কত বিপদ, কত নোংরামির মুখোমুখি হতে হয়, তা বলতেও ঘেন্না হয়। লজ্জা হয়। তবু আমি তোমাকে সব কিছুই বলব। সমাজের ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যে কত দৈন্য, কত নোংরামি, কত নীচতা ও হীনতা থাকতে পারে, তা জানলে তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

আচ্ছা ভাই, আমার কাহিনি শুনে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে না তো? ঘেন্না করবে না তো? খারাপ ভাবলে নাকি?

নিজের স্বপক্ষে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের অন্যান্য মেয়েদের মতো আমিও খুব বেশি উচ্চাভিলাষিণী ছিলাম না। বেথুন বা ভিক্টোরিয়া স্কুলের গণ্ডী পার হবার পর সাত পাকে বাঁধা পড়লেই সুখী হতাম কিন্তু বিধাতা পুরুষ আমাকে সহজ সরলভাবে এগিয়ে যেতে দিলেন না। শৈশব থেকেই বাধা দিতে শুরু করলেন। ধাপে ধাপে, প্রতিটি পদক্ষেপে। আমার জীবনে যত বাধা এসেছে, আমিও তত বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি, কিছুতেই হার স্বীকার করিনি। প্রতিটি খেয়াঘাটে কিছু সম্পদ হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু কোনো খেয়াঘাটেই দাঁড়িয়ে থাকিনি। পার হয়েছি। আমি কি খুব অন্যায় করেছি?

পুরুষদের আমি অবিশ্বাস করি, ঘেন্না করি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার সমস্ত অভিযোগ তোমার ভগবানের বিরুদ্ধে। তিনি কেন আমাকে সহজ, সরল পথে এগুতে দিলেন না? আমার মতো একটা নিঃসঙ্গ মেয়ের কিছু সম্পদ কেড়ে না নিলে কি তাঁর আত্মার তৃপ্তির হচ্ছিল না?

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

দুই

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আমার চিঠির জবাব দেবে, তা ভাবতে পারিনি। মনে হয়, তুমি আমার চিঠি পড়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছ এবং সেজন্য আমার চিঠি পাবার পরদিনই জবাব দিয়েছ। তুমি যে আমাকে কত ভালোবাস, তা তোমার চিঠি পড়তে পড়তে বার বার উপলব্ধি করেছি। তোমাকে ভালোবেসে আমি যে ভুল করিনি, তা আরেকবার বুঝতে পারলাম।

তোমার চিঠিটা অনেকবার পড়েছি। পড়তে পড়তে আমার প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। তারপর অনেক ভেবেছি। দু'তিন দিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। মনে মনে বিচার করেছি তোমার পরামর্শ। হয়তো পুরনো দিনের দুঃখের স্মৃতি রোমন্থন করার কোনো সার্থকতা নেই, কিন্তু ভাই, অতীতকে তো একেবারে মুছে ফেলা যায় না। তাছাড়া অতীতের ওপরই তো বর্তমান গড়ে উঠেছে। আবার আজকের এই বর্তমানের ভিতর থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যত। সুতরাং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত অবিচ্ছিন্ন।

বাইরের কাজকর্ম বা আচারে-ব্যবহারে আমরা অনেক সময় এই অবিচ্ছিন্নতার ধারাকে স্বীকৃতি দিই না। দিতে চাই না ; হয়তো দিতে পারি না। কিন্তু মন? তাকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমি তোমাকে সেই মনের কথাই বলব। আজ অনেক বছর ধরে নিজের মনের সঙ্গে নিজেই লুকোচুরি খেলছি। খেলতে খেলতে অনেকদিন আগেই হাঁপিয়ে গেছি কিন্তু এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য মানুষ পাইনি, যার কাছে ধরা দিতে পারি। তোমার কাছে আমি ধরা দেবই। দিতেই হবে। না দিয়ে আর যেন নিশ্বাস নিতে পারছি না। তোমার কাছে ধরা না দিলে আমি বোধহয়

আর বাঁচব না।

অন্য কেউ জানে না কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি, মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করি। দু'বারই অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছি। সেবার লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক আসার সময় বিষ নিয়ে প্লেনের টয়লেটে ঢুকেছিলাম। বিষ খাবার আগে কি যেন ভাবছিলাম। নানা চিন্তায় টয়লেটের দরজা লক্ করতে ভুলে যাই। কিছুক্ষণ পরে একজন মহিলা যাত্রী হঠাৎ দরজা খুলে টয়লেটে ঢুকতেই আমি চমকে উঠি এবং কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি।

এই পৃথিবীতে একলা থাকার অনেক আনন্দ, অনেক সুবিধা, কিন্তু দুঃখও কম নয়। নিঃসঙ্গ মানুষ কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে পারে না ঠিকই, কিন্তু একা একা দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা সবারই সীমিত। কোনো আদর্শ বা কোনো প্রিয়পাত্রের জন্য অনেক দুঃখ সহ্য করা যায়, কিন্তু নিজের জন্য তার একাংশও অসহ্য। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জ্বালা কম নয়। তাইতো আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, একার জন্য কেন এই জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করি? যে মানুষ চির বিদায় নিলেও এই পৃথিবীর কোনো মানুষের চোখের জল পড়বে না, তখন তার বেঁচে থাকার কি সার্থকতা?

এইসব আলতু ফালতু হাজার রকমের চিন্তা করতে করতে আবার একদিন ঠিক করলাম, না, আর নয়। এবার এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়াই ভালো।

ভালো বা মন্দ, কোনো বিষয়েই উৎসাহ বা বাধা দেবার মতো কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষ আমার নেই। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নেবার পর আর দেরি করলাম না কিন্তু সেবারও পারলাম না। প্রায় অন্তিম মুহূর্তে ওয়াশিংটন থেকে সুদীপ্ত আর মহুয়া তুতুলকে নিয়ে হাজির। ওয়াশিংটনে ওদের সঙ্গে কি তোমার আলাপ হয়েছে? বোধহয় হয়নি ; মনে হয় ওদের সঙ্গে আলাপ হলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বলতে।

আমি নিউইয়র্কে আসার বছর দুই আগেই সুদীপ্ত এদেশে এসেছে। কিন্তু মাত্র বছর পাঁচেক আগে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ওর সঙ্গে আমার আলাপ।

ঘরে ঢুকেই দেখি সুদীপ্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আমার বন্ধু মায়াকে বলছে, দেখ ছোড়দি, এই সংসারে সমস্ত স্নেহ ভালোবাসায় সঙ্গেই কোনো না কোনো স্বার্থ জড়িয়ে আছে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এ সংসারে দুর্লভ।

মায়া ওকে বকুনি দিয়ে বলল, দেখ খোকন, তুই বড্ড সিনিক হয়ে গেছিস। স্নেহ-ভালোবাসা না থাকলে সমাজ সংসার চলছে কি ভাবে?

সুদীপ্ত হেসে বলল, কেন চলবে না? পারস্পরিক স্বার্থে আমরা সবাই জড়িয়ে পড়েছি। বলেই সমাজ সংসার গড় গড় করে এগিয়ে চলছে।

মায়ার স্বামী ডক্টর সরকার এবার হাসতে হাসতে ওর স্ত্রীকে বললেন, তোমরা কি এবার চুপ করবে নাকি আমি আমার বান্ধবীকে নিয়ে দু-এক ঘণ্টার জন্য ব্যাটারি পার্ক ঘুরে আসব?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনার মতো স্ত্রৈণ পুরুষের সঙ্গে ব্যাটারি পার্ক তো দূরের কথা, হাওয়াই আইল্যান্ডে যেতেও আমি ইন্টারেস্টেড নই।

মায়া একটু গম্ভীর হয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বলেছিস। বিয়ের আগে জানলে আমিই এ বিয়েতে আপত্তি করতাম।

ডক্টর সরকার স্বল্পভাষী। আত্মকেন্দ্রিক। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেও একখানা বই নিয়ে

সারা সন্ধে কাটিয়ে দেন। তবে রসিক লোক। বললেন, দেখুন মিস চৌধুরী, আর্টিফিসিয়্যাল জুয়েলারি ব্যবহার করে করে আসল সোনার গহনা আর আপনাদের ভালো লাগে না।

আমরা কিছু বলার আগেই সুদীপ্ত বলল, ঠিক বলেছেন কমলদা।

মায়া কৃষ্ণনগরের মেয়ে। সুদীপ্তদের বাড়িও ওখানেই। সুদীপ্তর ছোড়দি আর মায়া স্কুলে একসঙ্গে পড়ত। সেই সূত্রেই এ বাড়িতে সুদীপ্তর যাতায়াত। সেদিন থেকেই যাতায়াত।

সেদিন থেকেই সুদীপ্তকে আমার বেশ লাগে। আশে পাশে যাদের দেখি, তাদের থেকে ও একটু স্বতন্ত্র। হঠাৎ ওর কথাবার্তা শুনলে মনে হবে ও যেন এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই এই পৃথিবীতে এসেছে। সব মানুষের বিরুদ্ধেই যেন ওর অভিযোগ। বাবা-মা, ভাই-বোন কাউকেই ও ভালোবাসে না অথচ ওদের প্রতি কর্তব্যে ত্রুটি নেই। প্রতি মাসে ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক মারফত দেশে টাকা পাঠাবেই।

পৃথিবীর বিরুদ্ধে সুদীপ্তর অভিযোগের কারণ আছে। রেলের স্টেশন মাস্টারের ঘরে জন্মেছে। শৈশব বা কৈশোরে দারিদ্রের সঙ্গে পরিচয় হবার কোনো সুযোগ হয়নি কিন্তু যৌবনের সিংহদ্বার পেরুতে না পেরুতেই ওর বাবা রিটায়ার করলেন। এক নিমেষে সুখের সংসার কোথায় ভেসে গেল। দারিদ্রের হাহাকার উঠল চারদিক থেকে। সুদীপ্ত জানল, তার বাবার অসৎ আয়ের দৌলতেই তার শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি মধুময় হয়েছিল। কি একটা বিচ্ছিরি বিস্বাদে ওর সারা মন ভরে গেল।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে দু-একদিন আসা যাওয়ার পর সুদীপ্ত একদিন কথায় কথায় বলল, দেখ কবিতাদি, একটা চরম সত্য আমি মর্মে মর্মে বুঝেছি।

কী সেই চরম সত্য?

এই পৃথিবীতে টাকা ছড়াতে পারলে সবার ভালোবাসা পাওয়া যায় আর না ছড়াতে পারলে বাবা-মার স্নেহও পাওয়া যায় না।

আমি আর প্রশ্ন করি না। একটু হাসি।

না, না, কবিতাদি, হাসির কথা নয়, আমি আমার বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে দেখেছি বলেই বলছি।

আমি কোনো মন্তব্য করি না, শুধু শুনি।

সুদীপ্ত একটু উত্তেজিত হয়েই বলল, আমার বাবার অসৎ উপায়ের টাকা উপভোগ করতে মার ভালো লাগত কিন্তু বাবার দুঃখের দিনে মার ব্যবহার দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। আমার দাদা আর দুই দিদির কীর্তি শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

বিচিত্র ছেলে এই সুদীপ্ত! বাবা-মা ভাই-বোনের উপর রাগ করে এ দেশে আসার চার বছর পর কলম্বিয়া থেকে ডক্টরেট হয়। তারপর বছর দুই কানাডায় চাকরি করার পর হঠাৎ একদিন মায়ার কাছে হাজির হয়ে বলল, ছোড়দি, এখানে আর একা একা থাকতে পারছি না। তুমি আমার বিয়ে দাও।

মায়া জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে দাও মানে? মেয়ে পছন্দ করেছিস?

মেয়ে পছন্দ হয়ে গেলে তোমার কাছে আসব কেন?

মায়া প্রতিশ্রুতি দিল, সামনের জুনে দেশে ফিরে গিয়েই বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

মায়া না থাকায় সুদীপ্ত মহুয়াকে নিয়ে আমার কাছেই প্রথম উঠেছিল। ওরা দুজনেই আমাকে

খুব ভালোবাসে। সময় পেলেই ওয়াশিংটন থেকে চলে আসে। আমাকেও যেতে হয়। আগে বিশেষ না গেলেও তুতুল হবার পর থেকে বেশিদিন ওকে না দেখে থাকতে পারি না। তুমি তো জান, এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু ছোট্ট সংসারের নিবিড় শান্তি এখানে প্রায় স্বপ্ন। ওদের ওই তিনটি প্রাণীর ছোট্ট সংসারে গেলে আমি যেন আমার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাই।

সেদিন আমি নিশ্চয়ই একটু অস্বাভাবিক ছিলাম। মহুয়া সন্দেহ করেছিল আমার শরীর ঠিক নেই কিন্তু সুদীপ্ত আমার অস্বাভাবিক মনের অবস্থা ঠিকই ধরতে পেরেছিল। মহুয়াকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ও আমাকে বলল, কবিতাদি, মহুয়া আর তুতুল তোমার কাছে সপ্তাহখানেক থাকবে।

ওরা এখানে থাকলে তোর অসুবিধা হবে না?

আমার আবার কি অসুবিধে? অফিস থেকে ফিরে এসে দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দু-এক রাউন্ড ড্রিঙ্ক করতে না করতেই সন্ধেটা বেশ কেটে যাবে।

সুদীপ্তর কথা শুনে মহুয়া আর তুতুল খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর তুতুল দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলল, তুমি এত গম্ভীর কেন পিসিমণি? আমার ওপর রাগ করেছ?

আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, আমি কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি?

রাগ না করলে কেউ এত গম্ভীর হয়?

আমি ওর মুখের উপর মুখ রেখে বললাম, না বাবা, আমি আর গম্ভীর হব না।

জানো ভাই, সেদিন সেই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, আত্মহত্যা করে এই পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাব না। আর কারুর জন্যে না হোক এই ছোট্ট অবোধ শিশুটির ভালোবাসার জন্য আমাকে বাঁচতেই হবে।

এখন তো ওসব কল্পনার বাইরে। এখন আমার জীবনের ভালো-মন্দর সঙ্গে তুমি এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছ যে তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি মৃত্যুর পরও শান্তি পাব না। তাছাড়া তুমিও তো একা না। তোমার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আরও একটি মেয়ের স্বপ্ন ও সাধনা জড়িয়ে আছে। তার স্বপ্ন ভেঙে দেবার অধিকার বা সাহস আমার নেই।

আমার মনের মধ্যে অনেক তিক্ততা, অনেক দুঃখ, বেদনার ইতিহাস, অনেক ব্যর্থতার গ্লানি চাপা থাকলেও এই পৃথিবীকে আমার নতুন করে ভালো লাগছে। বুঝতে পারছি, এই পৃথিবীর সব মানুষের মন এখনও বিষাক্ত হয়নি ; ঔদার্য ও ভালোবাসার অমৃতধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়নি।

ভাই রিপোর্টার, যে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্য একদিন পাগল হয়ে উঠেছিলাম, তোমার জন্য সেই পৃথিবীকে আমার আবার ভালো লাগছে। আমি বাঁচতে চাই, আমি ভালোবাসা চাই, আমি ভালোবাসতে চাই। তাইতো পুরনো দিনের সব ইতিহাস তোমাকে জানিয়ে আমি গ্লানিমুক্ত হতে চাই। একদিন পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য সমুদ্র মন্থনে উত্থিত সমস্ত বিষ ধারণ করে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন আর তুমি তোমার দিদির জন্য সামান্য এইটুকু বোঝা বহন করতে পারবে না?

তোমার সুখ ও সাফল্যের জন্য যে কালো মেয়েটি তার জীবনের সবকিছু পণ করেছে, তার একটা ছবি আমাকে পাঠাবে।

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

তিন

আমার নিজের কথা বলার আগে আমাদের পরিবারের বিষয়ে তোমাকে কিছু বলা দরকার।

আমাদের আদিবাড়ি হুগলিতে। চন্দননগরের খুব কাছে। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ আর ওয়াটসন সাহেব চন্দননগরের দরলেয়াঁ দুর্গ আক্রমণ করেন, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। ওই সময় আমাদের এক পূর্বপুরুষ একজন আহত ফরাসি সেনাপতিকে সেবা করে ফরাসিদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন এবং মনে হয় পরবর্তীকালে ইনি ফরাসিদের অধীনে কোনো চাকরি বা ব্যবসা শুরু করেন। এর বিষয়ে আমরা আর বিশেষ কিছু জানি না।

এই যুদ্ধের প্রায় ষাট বছর পর ইংরেজ চন্দননগরের ওপর ফরাসিদের পূর্ণ আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষের ভাগ্যও বদলে গেল। শুনেছি, ঈশ্বরীপ্রসাদ চৌধুরী শুধু ধনী নন, সেকালে একজন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনে স্কুল-কলেজ না থাকলেও ইনি অত্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন। ওঁর ইংরেজি জ্ঞানের কথা বলতে পারব না কিন্তু ইনি যে ফরাসি ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইনি ফরাসি ভাষায় বেশ কয়েকখানি বইও লেখেন। তার মধ্যে গঙ্গানদীর কাহিনি নিয়ে লেখা বইখানি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

আমি ছেলেবেলায় দাদুর কাছে এঁর সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। দাদু বলতেন, বিশ্বাস কর দিদি, আমার দাদুর মতো সুপুরুষ ও সুপণ্ডিত খুব কম নয়। দাদু প্যারিস গেলে এক বিখ্যাত আর্টিস্ট স্বেচ্ছায় তাঁর যে ফুল সাইজ অয়েল পেন্টিং করে দেন, তার সামনে দাঁড়িয়েই আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

আমার দাদু তাঁর দাদুর কথা বলতে শুরু করলে থামতেন না। একের পর এক কাহিনি বলতেন। তারপর হঠাৎ থামতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হয়ে যেত। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, এমন একজন মহাপুরুষ তুল্য মানুষের সন্তান হয়েও বাবা কি কেলেঙ্কারিই করলেন!

আমি তখন স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি। বয়স বেশি নয়। তাই দাদুর দুঃখের কারণটা ঠিক বুঝতাম না। তবে বেশ উপলব্ধি করতাম, দাদুর বাবা নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিলেন, যার জন্য তাঁর এই দীর্ঘনিশ্বাস।

আস্তে আস্তে আমার বয়স বাড়ল। সবকিছু জানতে পারলাম।

ঈশ্বরপ্রসাদ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ মারা যান।

ঈশ্বরীপ্রসাদের একমাত্র সন্তান গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরীর তখন বয়স মাত্র একুশ। বছর খানেক বিয়ে হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর টাকাকাড়ি বিষয় সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ বুঝে নিতেই দু-এক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার দাদুর জন্ম হল।

প্রচুর টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার গৌরব অর্জন করার পরই গঙ্গাপ্রসাদের রূপান্তর শুরু হল। প্রথমে লুকিয়ে, তারপর প্রকাশ্যে। শেষ পর্যন্ত সেদিন উনি এক ফরাসি সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সামনে তাকে চুম্বন করে সগর্বে ঘোষণা করলেন, মাই বিলাভেড নিউ ওয়াইফ, সেদিন সেই মুহূর্তেই গঙ্গাপ্রসাদের স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে ওই প্রসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন আমার দাদুর বয়স মাত্র বারো-তেরো।

কয়েক বছর এখানে ওখানে কাটাবার পর দাদু স্টীমার কোম্পানির বুকিং ক্লার্কের চাকরি নিয়ে প্রথমে চাঁদপুর, পরে গোয়ালন্দ এলেন।

আমরা হুগলির লোক হলেও ঢাকার বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

আর গঙ্গাপ্রসাদ? তিনি হুগলি আর চন্দননগরের সব বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে ওই ফরাসি সুন্দরীকে নিয়ে প্যারিস চলে যান এবং বছর দশেক পরে ওখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঢাকাতেই আমার জন্ম। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর দাদুকে স্টীমার কোম্পানির চাকরি করতে দেখিনি। শুনেছি আমার জন্মের দিনই দাদু একটা লঞ্চ কেনেন এবং তাই সে লঞ্চের নাম দেন দিদি।

ছেলেবেলার সেই ক'টা বছরের স্মৃতি কোনোদিন ভুলব না। বাবা মা বা দিদার চাইতে দাদুর সঙ্গেই আমার বেশি ভাব ছিল। আমার খাওয়া-শোয়া, ওঠা-বসা সবকিছুই দাদুর সঙ্গে ছিল। অনেক আগেকার কথা হলেও আমার বেশ মনে পড়ে, রোজ বিকেলবেলায় আমি সদরঘাটে যেতাম। দূর থেকে যাত্রী বোঝাই আমাদের লঞ্চ দেখেই দাদু বলতেন, দ্যাখ দিদি, তোর লঞ্চ আসছে। আমি আনন্দে, খুশিতে নাচতে শুরু করতাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লঞ্চ সদরঘাটে আসত। যাত্রীরা নেমে যাবার পর দাদু আমাকে নিয়ে লঞ্চে উঠতেই গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাকে কাঁধে তুলে নিতেন। আমার এখনও বেশ মনে আছে, উনি রোজ আমার জন্য কিছু আনবেনই। কোনোদিন মিষ্টি, কোনোদিন ফল বা লজেন্স। আমি তখন বুঝলাম না গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাকে কেন অত ভালোবাসতেন কিন্তু পরে জেনেছিলাম।

তখন আমি একটু বড় হয়েছি। বোধহয় ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। কোনোদিন কোনো কারণে দাদুর সঙ্গে সদরঘাটে যেতে না পারলে গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেনই।

দিদি, তোমার লঞ্চ চালিয়ে পেট চালাই। তাইতো ডাঙ্গায় নেমে তোমার মুখখানা না দেখে ঘরে ফিরতে পারি না।

আমি হাসি।

গিয়াসুদ্দীন চাচা হাসেন না। গম্ভীর হয়ে বলেন, না, না, দিদি, হাসির কথা নয়। তোমাকে দেখলে আমার পোড়া বুকখানা জুড়িয়ে যায়।

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না কিন্তু বেশ বুঝতে পারতাম, গিয়াসুদ্দীন চাচার মনে অনেক দুঃখ। আর বুঝতাম, উনি আমাকে সত্যি ভালোবাসেন।

তুমি কলকাতার ছেলে। পূর্ব বাংলায় যাওনি। বর্ষকালে পূর্ববাংলার রূপ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সেই বর্ষা-বাদলের দিনেও গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাকে দেখতে আসবেনই।

আমি হয়তো বলতাম, চাচা, এই বর্ষায় কেউ আসে?

গিয়াসুদ্দীন চাচা একমুখ হাসি হেসে জবাব দিতেন, সেই অঘ্রাণের আগে তো বর্ষা থামবে না। তাই বলে কি এই ক'মাস তোমার মুখখানা দেখব না?

দাদু আমাকে বলেছিলেন, গিয়াসুদ্দীন চাচার একমাত্র মেয়ে কলেরায় মারা যায় এবং পরের বছর ওর জন্মদিনেই আমার জন্ম হয়।

সেই সে সময় আমি স্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় একটা বই পুরস্কার পাই। দাদুর কাছে সে খবর শুনে গিয়াসুদ্দীন চাচার কি আনন্দ! হাতে সময় থাকলেই বলতেন, দিদি, আমাকে একবার 'কাজলাদিদি' কবিতাটা শুনিয়ে দাও তো—যেটার জন্য তুমি মেডেল পেয়েছ।

গিয়াসুদ্দীন চাচার প্রশংসায় আমি এমনই উৎসাহিত হয়েছিলাম যে যখন-তখন যাকে-তাকে 'কাজলাদিদি' কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতাম। ওই এক কবিতা হাজার বার শুনতে শুনতে বাড়ির সবাই পাগল হয়ে যেতেন কিন্তু গিয়াসুদ্দীন চাচার কথা মনে করে আমি মা বা দিদার হাসাহাসিকেও গ্রাহ্য করতাম না।

তারপর একদিন সদরঘাটে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরও আমাদের লঞ্চ এলো না। আস্তে আস্তে রাত হল। রাতের পাতলা অন্ধকার গাঢ় হল, কিন্তু গিয়াসুদ্দীন চাচা লঞ্চ নিয়ে ফিরলেন না। অনেক রাত্রে সর্বনাশের খবর এলো। আমি আর জীবনে কোনোদিন 'কাজলাদিদি' কবিতা আবৃত্তি করতে পারলাম না।

এরপর মাস খানেক বিছানায় শুয়েই দাদু বেঁচে ছিলেন। তারপর তিনিও চলে গেলেন। বছরখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই দিদাও দাদুর কাছে চলে গেলেন।

আমার ছোট দুনিয়া হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল।

আমার দাদু নিজে বিশেষ লেখাপড়া করতে পারেননি বলে বাবাকে এম. এ. বি এল. পর্যন্ত পড়ান। একে দাদু দিদার মৃত্যু তারপর ঢাকা কোর্টে ওকালতি করে বিশেষ সুবিধে না হওয়ায় বাবা ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। আসার পর জানলাম মার ক্যান্সার হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসার জন্যই বাবা ঢাকা ছেড়ে কলকাতা এসেছেন।

কলকাতায় আসার পর প্রায় বছর দুই মা মোটামুটি ভালোই ছিলেন। নিজেই সংসারের কাজকর্ম করতেন। আমি স্কুল থেকে ফিরলে ঘণ্টাখানেক গল্প করবেনই। তারপর বাবা কোর্ট থেকে ফিরলেই বলতেন, অমন করে তাকিয়ে দেখার কোনো কারণ হয়নি। আমি ভালোই আছি।

বাবা তাঁর সমস্ত উৎকণ্ঠা লুকিয়ে হাসি মুখে বলতেন, ভালো থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই ভালো থাকবে।

আমার বাবা অত্যন্ত সৎ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি আপন মনে নিজের কাজকর্ম-লেখাপড়া করতেন। তাইতো দাদু বাবাকে ব্যবসা-বাণিজ্যে না টেনে স্বাধীন পেশায় দেন, কিন্তু অমন লাজুক লোকের পক্ষে ওকালতিতেও সুবিধে করা সহজ নয়। বাবাকে কোনোদিন তাস-পাশা খেলতে বা কোথাও কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখিনি। কোর্টে যাওয়া-আসা ছাড়া সবই সময়ই নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করতেন। দাদু থাকতে আমি বাবার কাছে যেতাম না, কিন্তু কলকাতায় আসার পর আমাদের সবকিছু বদলে গেল। বাবার কাজকর্মের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেলেও বাবা আমার অনেক কাছের মানুষ হলেন।

গিয়াসুদ্দীন চাচা আর দাদুকে হারানোর পর এই পৃথিবীকে আমার মরুভূমি মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওই ক্ষণস্থায়ী সুখের স্মৃতি রোমন্থন করেই আমাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে, কিন্তু না, কলকাতায় আসার পর অসুস্থ মা আর কর্মব্যস্ত বাবা আমাকে স্নেহ-ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন। আমার পৃথিবী আবার সবুজ, সুন্দর হয়ে উঠল।

আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

চার

কলকাতা আসার মাস ছয়েক পরের কথা। সেদিন বাবার কোর্ট বন্ধ হলেও আমার স্কুল খোলা ছিল। আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই দেখি বাবা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা, বাবা কার সঙ্গে অত গল্প করছেন?

মা হেসে বললেন, উনি ওর বন্ধু।

বাবার বন্ধু! আমি অবাক হয়ে বললাম।

হ্যাঁ। ওরা একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে ল' পড়তেন।

এর আগে কী উনি আমাদের এখানে এসেছেন?

না। আজ ডাঃ রায়ের ওখানে হঠাৎ দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে।

বাবার বন্ধুর কি নাম?

হেমন্ত মজুমদার।

উনিও কি প্র্যাকটিস করেন?

না। উনি একটা সাহেবী কোম্পানিতে ভালো চাকরি করেন।

তুমি ওকে আগে থেকেই চিনতে?

আমার বিয়ের পরই একবার শিয়ালদা দেখা হয়েছিল।

আমি স্কুলের কাপড়-চোপড় ছেড়ে খেতে বসলে মা বললেন, তোর বাবার কাছে শুনেছি হেমন্তবাবু খুব আমুদে লোক। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সারা ক্লাসের ছেলেদের জমিয়ে রাখতেন। আজ দেখে মনে হল, উনি সেই রকমই আছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি থাকেন কোথায়?

বোধহয় এলগিন রোডের কাছাকাছি। একটু থেমে মা প্রায় আপন মনেই বললেন, ভদ্রলোক বিয়ে-টিয়ে না করে বেশ কাটিয়ে দিলেন।

খেয়ে-দেয়ে আমি আমার ঘরে যেতে না যেতেই বাবা ডেকে পাঠালেন। গেলাম। বাবা বললেন, আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম...

হেমন্তবাবু আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এ ব্যাচেলার কাকু তোমারও বন্ধু।

আমি একটু নীচু হয়ে ওকে প্রণাম করতে যেতেই উনি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, থাক, থাক, ও সব ফর্মালিটির দরকার নেই।

সেদিন কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেই উনি চলে গেলেন। এর পর থেকে উনি মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। কখনও কখনও আমাকে নিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতেও যেতেন। সত্যি হেমন্তকাকুকে বেশ লাগত। ওরা একটা ছোট্ট মরিস এইট গাড়ি ছিল। স্কুলের গণ্ডী পেরুবার আগেই আমি ওর উৎসাহে গাড়ি চালানো শিখি। সত্যি, সেদিনের উত্তেজনার কথা ভুলব না। মনে হল হেমন্তকাকু যেন আমার হাতে আকাশের চাঁদ এনে দিলেন।

পরের বছর আমি কলেজে ভর্তি হবার পরই হেমন্তকাকু একদিন বার মা'র সামনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল কবিতা, কি চাই?

কী আর চাইব!

না, না, কিছু চাইতেই হবে।

অনেকবার বলার পরও যখন আমি কিছু বললাম না, তখন উনি বললেন, চল, তোমাকে পুরী ঘুরিয়ে আনি।

আমি কিছু বলার আগেই বাবা বললেন, আমিও ভাবছিলাম সবাইকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি কিন্তু ডাক্তার বারণ করছেন বলে বেরুতে পারছি না।

সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন, আমরা যখন যেতে পারছি না তখন খুকি বরং ওর কাকুর সঙ্গে ঘুরে আসুক।

বাবা বললেন, তাতে আমার কি আপত্তি?

হেমন্তকাকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, গাড়িতে যাবে? নাকি ট্রেনে?

মা বললেন, না, না, গাড়িতে অত দূর যেতে হবে না।

দিন কয়েক পর আমি হেমন্তকাকুর সঙ্গে পুরী রওনা হলাম। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপে রিজার্ভ করা রয়েছে। মালপত্র রাখার পরই উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কবিতা, ঠিক আছে তো?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমার কাকুর প্ল্যানিং-এ কী কোনো ত্রুটি থাকতে পারে?

উনি হাসতে হাসতে বললেন, আমি শুধু তোমার কাকু না, বাট অলসো ইওর ফ্রেন্ড।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালাম, দ্যাট্‌স রাইট।

ট্রেন ছাড়ার তখনও দেরি ছিল। উনি বললেন, তুমি বস, আমি আসছি।

পনেরো বিশ মিনিট পরেই উনি দুটো সোডার বোতল নিয়ে আসতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কী দু' বোতল সোডা দিয়ে কী করবেন?

একটু চাপা হাসি হেসে হেমন্তকাকু বললেন, কেন? দুজনে খাব।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমার কি অম্বল হয়েছে যে সোডা খাব?

হেমন্তকাকু আর কিছু না বলে বাথরুম থেকে জামা-কাপড় বদলে নীচের বার্থে আমার বিছানা পেতে দিলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী শাড়ি-টাড়ি বদলে নেবে?

হ্যাঁ।

তাহলে যাও। বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।

আমি বাথরুম থেকে আসতে আসতেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কাকু আমার হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, এবার বস। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক।

বসলাম।

এবার উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী এই প্রথম পুরী যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

তোমার সমুদ্র ভালো লাগে, না পাহাড়?

দু-ই, কিন্তু কোনোটাই দেখা হয়নি।

ঠিক আছে। এরপর তোমাকে নিয়ে দার্জিলিং বা সিমলা যাব।

আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, তাই না কাকু?

উনি একটু হেসে আমার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললেন, হাজার হোক ব্যাচেলার। সংসার-টংসারের ঝুট-ঝামেলা তো নেই। তাই সুযোগ পেলেই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি।

সংসারের ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়াই ভালো।

সে কী? তুমিও কী বিয়ে করবে না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, বিয়ে-টিয়ে করা আমার একটুও ভালো লাগে না।

তাহলে কি করবে?

কী আর করব? পড়াশুনা করার পর চাকরি করব।

একলা একলা থাকবে?

একলা থাকব কেন! বাবা মা'র সঙ্গে থাকব।

কিন্তু বাবা মা তো চিরকাল থাকবেন না।

তখন আর কি করব? একলাই থাকব।

বিয়ে না করে থাকতে পারবে?

খুব পারব।

উনি একবার ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হয় না তুমি বিয়ে না করে থাকতে পারবে।

আমি একটু অবাক হয়ে কাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, পারব না কেন?

উনি হাসতে হাসতে আমাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের পক্ষে বিয়ে না করে থাকা খুব মুশকিলের।

আমি সুন্দরী?

কাকু চোখ দুটো বড় করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সুন্দরী না?

মোটেও না।

একশোবার, হাজারবার তুমি সুন্দরী।

আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

এ ব্যাপারে তর্ক না করাই ভালো।

কিন্তু সুন্দরী হলেই যে বিয়ে করতে হবে, এমন কোনো কারণ নেই।

কাকু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, কারণ আছে।

কী কারণ?

ছেলেদের উৎপাতে পাগল হয়ে যাবে!

আমি লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, আমাকে কেউ উৎপাত করবে না।

ঠিক আছে। দেখা যাবে আমি ঠিক নাকি তুমি ঠিক।

দেখবেন।

কাকু হঠাৎ নেমে দাঁড়িয়েই বললেন, এবার শুরু করা যাক, কি বল?

কি শুরু করা যাক?

একটু আনন্দ।

আনন্দ? আমি অবাক হয়ে ওর দিকেই তাকাই।

হেমন্তকাকু অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন, দুজনে বেড়াতে যাচ্ছি একটু হুইস্কি খাব না?

মদ। আমি প্রথম চমকে উঠলাম।

উনি দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরে বললেন, সারা পৃথিবীর লোক হুইস্কি খায়। হুইস্কি খাওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু মাতাল হওয়া অন্যায়।

কিন্তু মদ খেলেই তো লোকে মাতাল হয়।

ডোন্ট সে মদ, সে হুইস্কি।

হুইস্কি খেলেও তো মাতাল হবে।

কোনো জিনিসই বেশি খাওয়া ভালো নয়। যে কোনো জিনিস বেশি খেলেই শরীর খারাপ হয়, তাই না?

হ্যাঁ।

বেশি হুইস্কি খাওয়াও খারাপ। প্রথম কথা মাতাল হবে, দ্বিতীয় কথা শরীর খারাপ হবে।

কিন্তু নেশা কি কেউ হিসেব করে করতে পারে?

সব ভদ্র শিক্ষিত লোকেই পারে।

আমি এবার দৃষ্টিটা নীচের দিকে করে নিজের মনে মনে ওর কথাগুলো ভাবি। দু এক মিনিট নিজের মনে মনেই তর্ক করি কিন্তু ঠিক মেনে নিতে পারি না।

এবার উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছ, কবিতা?

বিশেষ কিছু না।

আমার হুইস্কি খাবার কথা ভাবছ?

এবার আমি ওর দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কাকু, আপনি হুইস্কি খান?

উনি মাথা নেড়ে বললেন, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার আগে একটু খাই।

রোজ?

হ্যাঁ।

খাওয়া দাওয়ার আগে কেন খান?

তাতে শরীর ভালো হয়।

এবার আমি আবার ভাবি। কোনো প্রশ্ন করি না, কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনোদিন আমাকে মাতাল হতে দেখেছ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

উনি এবার হাসতে হাসতে বললেন, আজ তো তুমিও একটু হুইস্কি খাবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললাম, না না, কাকু, আমি ও সব খাব না।

উনি আবার দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বললেন, আচ্ছা পাগলি মেয়ে! হুইস্কি খাবার নাম শুনেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়।

আমি একটু হেসে বললাম, মদ খেলে আমি মরেই যাব।

আর যদি না মরে যাও, তাহলে...

তাহলে মাতাল হব।

যদি মাতাল না হও।

তাহলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাব।

যদি তা-ও না হও?

মোট কথা, মারাত্মক কিছু হবেই।

কিছু মারাত্মক হবে না।

তবে কি মদ খাবার পরও আমি স্বাভাবিক থাকব?

একশোবার স্বাভাবিক থাকবে।

তাহলে মদ খেয়ে লাভ?

মনটা খুশিতে ভরে যাবে।

হেমন্তকাকু আর কথা না বলে হুইস্কির বোতল, ফ্লাস্ক, গ্লাস, সোডার বোতল নিয়ে বসলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একটু খাই?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম।

তোমার আপত্তি থাকলে আমি বাইরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে খেয়ে আসছি।

না, না, আপনি বাইরে যাবেন কেন? অসুবিধে হলে আমিই একটু বাইরে দাঁড়াব।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? তোমাকে বাইরে রেখে আমি এখানে বসে বসে ড্রিঙ্ক করব?

আমি বাইরে যাবই, তা তো বলছি না।

উনি একটা গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে আমার মুখের সামনে ধরে বললেন, চিয়ার্স! ফর আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ!

কাকু গ্লাসে চুমুক দিতেই আমি স্তম্ভিত হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পাঁচ

এর আগের চিঠিটা পড়ে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে, সে রাত্রে ট্রেনের মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হয়েছিল। না, সে রকম কিছু হয়নি। তবে দু' পেগ খাবার পরই কাকু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কবিতা আমি কি মাতাল হয়েছি?

আমি বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে বললাম, কোনো ভদ্র-শিক্ষিত লোক মাতাল হয় না। আমার কথা শুনে কাকু হো হো করে হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হুইস্কির গেলাসটা আমার মুখের সামনে ধরলেন, তুমি একটু খাবে না?

না কাকু, প্লিজ?

কেন? ভয় কী?

ভয় কেন করবে? ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে করছে না বোলো না। কিছুটা ভয় আর কিছুটা সঙ্কোচের জন্যই তুমি খাচ্ছ না।

কোনো ব্যাপারেই আমার ভয় বা সঙ্কোচ নেই।

কাকু মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললেন, বিশ্বাস করি না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সময় এলেই প্রমাণ পাবেন।

কাকু গেলাসের বাকি হুইস্কিটা একবারে গলায় ঢেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না।

একশোবার আপনাকে ভালোবাসি।

কিন্তু তার তো কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না।

শুধু হুইস্কি খেলেই বুঝি আপনি তার প্রমাণ পাবেন?

তা বলছি না ; তবে যদি ভালোবাসতে তাহলে এতবার অনুরোধ করার পর নিশ্চয়ই অন্তত এক পেগ খেতে।

তারপর হুইস্কি খেয়ে যদি মাতাল হই?

এমন ভাবে খাবে যাতে নেশা হবে না কিন্তু মৌজ হবে।

ঠিক আছে, জানা থাকল।

বেশি দিন নয়, মাত্র তিন দিন আমরা পুরী ছিলাম। সত্যি বলছি ভাই, এর আগে এমন আনন্দ কখনও হয়নি। হেমন্তকাকু বয়সে অনেক বড় হলেও সত্যি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন।

কলকাতা ফেরার পর আমাকে আনন্দে, খুশিতে ভরপুর দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, খুব আনন্দ করেছিস, তাই না?

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, হ্যাঁ মা। খুব আনন্দ করেছি।

খুব ঘুরেছিস?

খুব ঘুরেছি, খুব খেয়েছি, খুব সাঁতার কেটেছি, খুব ঘুমিয়েছি, খুব মজা করেছি।

কিছু আর বাকি রাখিসনি।

হেমন্তকাকু বাবাকে বললেন, তোর চাইতে তোর মেয়ের সঙ্গে আমার বেশি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, বিয়ে-টিয়ে যখন করলি না তখন আমার মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই জীবনটা কাটিয়ে দে।

মার জন্য বাবা কোর্টে ছাড়া কোথাও বেরুতেন না। সব সময় বাড়িতেই থাকতেন। তাই আমি মাঝে মাঝে কাকুর সঙ্গে কলকাতার মধ্যে এদিক ওদিক বা সিনেমা থিয়েটারে যেতাম। কখনও কখনও ছুটির দিন আমি কাকুর ফ্ল্যাটেই সারাদিন কাটাতাম। মাঝে মাঝে আমার দু-একজন বন্ধুও কাকুর ওখানে যেতো। তারপর হয়তো আমরা সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে যেতাম।

তারপর মার শরীর খারাপ হতে শুরু করল। মাঝে মাঝেই কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি বাবা কোর্টে যাননি। মার বিছানার ধারেই বসে আছেন। আমিও মার পাশে বসি। মার মাথায়, বুকে হাত বুলিয়ে দিই। মা বলেন, তুই চান-টান করে আয়।

আমি বলি, একটু পরে যাব।

মা আমার হাত দুটো নিজের দুর্বল হাতের মধ্যে নিয়ে বলেন, না মা, যা। অনিয়ম করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। মা একসঙ্গে বেশি কথা বলতে পারতেন না বলে একটু থেমে বলতেন, আমি অসুস্থ হয়েছি বলে তোরা কেন অনিয়ম করবি? আমি আর কোনো কথা না বলে উঠে যেতাম।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি বাবা চুপচাপ নিজের ঘরে বসে আছেন। আমাকে দেখেই একবার আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম জলভরা ভাদ্দরে মেঘের মতো দুটো চোখ টল টল করছে। আমি যেন সহ্য করতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে ডাকলেন, খুকি মা, শুনে যা।

আমি কাছে যেতেই বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথা রেখে অসহায় ছোট বাচ্চার মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোর মা চলে গেলে আমরা কি করে বাঁচব রে খুকি? এই পৃথিবীতে আমার তো আর কোনো বন্ধু নেই।

ভাই রিপোর্টার, সে দুঃখের দিনের কথা এত বছর পরও লিখতে গিয়ে আমার দু'চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। বাবার শৈশব-কৈশোর আমি দেখিনি। তার প্রথম যৌবনের খবরও আমি জানি না, কিন্তু আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর থেকেই দেখেছি মা ছাড়া বাবা এই পৃথিবীর আর কিছু চিনতেন না, জানতেন না। বাবা মাকে শুধু ভালোবাসতেন না, যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন। আমার বেশ মনে পড়ে কলকাতায় আসার পর বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন, জন্ম জন্ম তপস্যা করার ফলেই তোর মাকে আমি স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। বাইরের লোক ওর রূপ দেখে স্তম্ভিত হয় কিন্তু ওর গুণের কাছে রূপ কিছুই না।

মা এমনই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন যে বাবা সর্বস্ব কিছু পণ করেও তাঁকে বাঁচাতে

পারলেন না। মা চলে গেলেন। আমি তখনই জানতাম, বাবা এই আঘাত সহ্য করতে পারবেন না। আমার বি. এ. পরীক্ষা শেষ হবার দিন তিনেক পরেই বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। বাহাত্তর ঘণ্টা পার হবার পর হেমন্তকাকু বললেন, আর ভয় নেই। বিপদ কেটে গেছে।

আমার অদৃষ্টের মহাকাশে মুহূর্তের জন্য সূর্য উঁকি দিলেও আবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘে ঢাকা পড়ল। বাবাও চলে গেলেন।

সে-সব দিনের কথা বেশি লিখে তোমার মনে দুঃখ দেব না। তুমি সহজেই আমার অবস্থা বুঝতে পারছ। আমি ভাবতে পারিনি এমন অকস্মাৎ আমার জীবনের সব আলো নিভে যাবে। হেমন্তকাকুর বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ কিন্তু তা সত্ত্বেও মুক্তকণ্ঠে বলব, সেই অন্ধকার অমানিশার রাত্রিতে আর কোনো আত্মীয় বন্ধু নয়, শুধু উনিই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

কাকু আমাকে বললেন, ডোন্ট ফরগেট কবিতা, আমি এখনও বেঁচে আছি। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তুমি এম. এ. পাশ কর, ডক্টরেট হও ; তারপর ভেবে দেখা যাবে।

সত্যি আমাকে কিছু ভাবতে হল না। আমাদের কালীঘাটের বাড়িটা পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করলেন। ফার্নিচার আর বাবার আইনের বই-পত্তর বাবার জুনিয়ারকে দেওয়া হল। আমি কাকুর দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম।

কাকুর ফ্ল্যাটে একটা ড্রইংরুম, একটা বেড রুম, বেডরুমের সঙ্গেই বাথরুম আর ছোট একটা স্টাডি। এ ছাড়া একটা কিচেন। কাকুর সংসার-ধর্মের ভার সালাউদ্দিন নামে একজন খানসামা-কাম-বাবুর্চির উপর। ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গার সময় কাকু সালাউদ্দিনকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। তারপর থেকেই সালাউদ্দিন স্বেচ্ছায় কাকুর সংসারের ভার নিয়েছে। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে সালাউদ্দিন যখন আসে তখন কাকু ঘুমিয়ে থাকেন। ওর হাতের চা খেয়েই কাকুর ঘুম ভাঙে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে কাকু অফিস যান। আবার লাঞ্চের সময় আসেন। রাত্রের রান্না ফ্রিজে রেখে সালাউদ্দিন আড়াইটে তিনটে নাগাদ চলে যায়। শুধু রান্নাবান্না নয়, কাকুর সংসারের সব কিছু দায়িত্বই ওর। বাজার হাট, জামা কাপড়, বিছানা বালিশ, মোটর গাড়ির তদারকি ছাড়াও হুইস্কি সোডা এনে রাখার দায়িত্বও এই সালাউদ্দিনের।

কাকুর বেডরুমটা বেশ বড়। সুতরাং সে ঘরের এক পাশে আমার খাট আর একটা আলমারি রাখায় কারুরই কোনো অসুবিধে হল না। কাকুর ঘরেই শোবার ব্যাপারে একবার যে মনে খটকা লাগেনি, তা নয় ; তবে প্রথম কথা আর কোনো শোবার ঘর ছিল না, আর দ্বিতীয় কথা, যার স্নেহ অবলম্বন করে আমি এখানে এলাম, তাঁকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। পাশের স্টাডিটা আমিই নিলাম। ওখানেই পড়াশুনা করব।

তারপর একদিন কাকু নিজে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে এম এ'তে ভর্তি করে দিলেন আর বললেন, এতোদিনে নিশ্চয়ই আমাকে চিনেছ। ট্রিট মি অ্যাজ এ রিয়েল ফ্রেন্ড, কোনো ব্যাপারে দ্বিধা করবে না।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি আপনার ফ্ল্যাটে থাকছি বলে আপনিও কোনো ব্যাপারে দ্বিধা করবেন না।

কাকু বললেন, সন্ধের পর দু এক পেগ হুইস্কি খাই, তা তো তুমি জানো। সুতরাং আর কোনো ব্যাপারে তো আমার দ্বিধা হবার কোনো কারণ নেই।

হুইস্কি খাবার কথা বলছি না। আপনার জীবনধারণের অন্য কোনো ব্যাপারেও দ্বিধা করবেন না।

না, না, কোনো ব্যাপারেই দ্বিধা সঙ্কোচ নেই।

আমার নতুন জীবন বেশ ভালো ভাবেই শুরু হল। সালাউদ্দিন আসার আগেই উঠে পড়ি। স্নান সেরে বেরুতেই সালাউদ্দিন আসে। চা খাই। কাকুর সঙ্গে একটু কথা বলি। খবরের কাগজ পড়ি। তারপর একটু পড়াশুনা করি। পড়াশুনা করতে করতেই সামান্য কিছু খাই। তারপর কাকু অফিস বেরিয়ে যাবার পরই খেতে বসি! খেয়ে দেয়েই ইউনিভার্সিটি। বেরুবার সময় সালাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করি, চাচা, কিছু আনতে হবে?

এমনি কিছু আনতে হবে না, তবে সাহেবের গেঞ্জি কিনে আনলে ভালো হয়।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে কাকুর জন্য চারটে গেঞ্জি কিনেই বাড়ি আসি। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে কোনো দিন সালাউদ্দিনের দেখা পাই, কোনোদিন পাই না। একটু বিশ্রাম করি। হয়তো কোনো পত্র পত্রিকা একটু উল্টে দেখি। কোনো কোনোদিন দু-একজন বান্ধবী এসেও হাজির হয়। সবাই মিলে আড্ডা দিই, চা-টা খাই।

এর মধ্যে টেলিফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো! কে কাকু!

কী করছ?

সুপর্ণা আর আরতি এসেছে। ওদের সঙ্গে গল্প করছি।

নো বয় ফ্রেন্ড?

আমি হাসতে হাসতে বলি, নো দেয়ার ইজ নো বয় ফ্রেন্ড।

আমার সব বান্ধবীদের সঙ্গেই কাকুর খুব ভাব। আমার কথা শুনেই ওরা বুঝতে পারে, কাকুর ফোন। আরতি তাড়াতাড়ি উঠে এসে রিসিভারের সামনে মুখ দিয়ে বলে, কাকু, সিনেমা দেখাবেন না?

কাকু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে সিনেমা দেখার কথা বলল?

আমি বললাম, আরতি।

আর কেউ আছে?

সুপর্ণাও আছে।

ওদের বলে দাও রবিবার দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবে ও সিনেমা দেখবে।

এ রকম আনন্দ, হৈ-হুল্লোড় আমরা মাঝে মাঝেই করি। কখনও কখনও ছুটির দিনে আমি আর কাকু কোথাও আশে-পাশে ঘুরে আসি।

যাই হোক ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে আমি আর কোথাও যাই না। একটু বিশ্রাম করে দু-এক ঘণ্টা পড়াশুনা করি। কাকু অফিস থেকে বেরিয়ে অফিসের কাজে সলিসিটার অ্যাডভোকেটদের চেম্বার ঘুরে সাড়ে সাতটা আটটায় বাড়ি ফিরলেই আমি চা-টা দিই। একটু গল্প করি। তারপর উনি স্নান করতে গেলে আমি কোনো কোনোদিন সামান্য কিছু রান্নাবান্না করি।

এরপর কাকুর ড্রিঙ্ক করার পালা। এখন আর কাকুকে কিছু করতে হয় না। আমিই বোতল থেকে গেলাসে হুইস্কি ঢালি, সোডা মিশিয়ে ওকে দিই। ওকে সাহচর্য দেবার জন্য আমিও এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস বা অন্য কোনো সফ্‌ট্ ডিঙ্ক নিই। তারপর কাকু হুইস্কির গেলাসটা একটু উঁচু করে ধরে বলেন, চিয়ার্স। ফর আওয়ার লাস্টিং ফ্রেন্ডশিপ!

আমি মাথা নত করে হাসি মুখে কাকুর শুভ কামনা গ্রহণ করি।

দু-এক ঘণ্টা সময় কেটে যায়।

তারপর আমরা খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ি।

এইভাবেই দিনগুলো বেশ কাটছিল। দেখতে দেখতে ক'টা মাস পার হয়ে গেল।

সেদিন কাকুর জন্মদিন। কাকু অফিস থেকে ফিরেই আমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, আজ তুমি এই শাড়িটা পরলে আমি খুব খুশি হব।

নিশ্চয়ই পরবো।

এখুনি পরে এসো।

স্ট্যাডিতে গিয়ে প্যাকেট খুলে দেখি, বেশ দামি মাইসোর সিল্কের শাড়ি। পরলাম। তারপর আমার কিনে আনা উপহারটা কাকুকে দিয়ে প্রণাম করতেই উনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, এ বটল অফ্ স্কচ! লাভলি!

আমি ওকে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই উনি দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বললেন, গড ব্লেস ইউ।

তারপর কাকু স্নান করে আসতেই ওর গেলাসে নতুন স্কচের বোতল থেকে হুইস্কি ঢালতেই উনি দু'হাত ধরে বললেন, কবিতা, আজ আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

বলুন কি অনুরোধ?

আজ আমার সঙ্গে তোমাকেও একটু ড্রিঙ্ক করতে হবে।

এই পৃথিবীর সমস্ত আপনজনকে হারাবার পর যার স্নেহচ্ছায়ায় আমি আশ্রয় পেয়েছি, সেই কাকুর জন্মদিনে আমি কিছুতেই তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বললাম, করব।

কাকু নিজেই দুটো গেলাসে হুইস্কি-সোডা ঢেলে আমার হাতে একটা গেলাস তুলে দিতেই আমি বললাম, চিয়ার্স!

চিয়ার্স!

গেলাসে এক চুমুক দিয়েই বললাম, এ এমন কি মধু যে আপনি রোজ রোজ খান?

আস্তে আস্তে একটু একটু করে খাও। দেখবে কি ভালো লাগছে।

ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় এক পেগ শেষ করেই আমি দুজনের খাবার নিলাম। কাকু আবার দুটো গেলাস ভরে ডাইনিং টেবিলে আসতেই আমি বললাম, আবার!

আজ আমাকে দুঃখ দিও না কবিতা।

কথায় বলে, লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে। আমিও কাকুর অনুরোধে সেদিন দু' পেগ হুইস্কি খেলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওই নতুন মাইসোর সিল্কের শাড়ি পরেই আমি শুয়ে পড়লাম।

তখন কত রাত জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি, কাকু আল্‌তো করে আমার বুকের ওপর হাত রেখে আমার পাশে অসহায় শিশুর মতো অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলেও কিছুটা নেশার ঘোরে, কিছুটা ঘুমের ঘোরে আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ছয়

পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই কাকুকে আর আমার পাশে দেখলাম না। দেখি, উনি ওর বিছানাতেই ঘুমুচ্ছেন। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো নেশার ঘোরে আমার পাশে শুয়েছিলেন। তারপর নেশা কেটে যাবার পর ভোর রাত্রের দিকে হয়তো ঘুম ভাঙতেই উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমার পাশ থেকে নিজের বিছানায় চলে যান। তাই কাকুকে অপরাধী ভাবতে পারলাম না।

এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব। কাকু যখন আমাকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন, তখন আমার খারাপ লাগেনি ; বরং একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের স্বাদ পেয়ে ভালোই লেগেছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা স্বীকার করবে না কিন্তু এ সব কথা সর্বৈব সত্য যে যৌবনে পুরুষের স্পর্শ মেয়েদের ভালোই লাগে। বিশেষ করে সে পুরুষ যদি ঘৃণার পাত্র না হয়, তাহলে খারাপ লাগার কোনো প্রশ্নই নেই।

দিনগুলো আগের মতোই কেটে যাচ্ছে। কাকুর ব্যবহারে মুহূর্তের জন্যও কোনো অমার্জিত ভাব দেখতে পাই না। মনে মনে ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তারপর আবার একদিন মাঝরাত্রে কাকুকে আমার পাশে আবিষ্কার করলাম। সেদিন আমি নেশা করিনি। ঘুম ভাঙতেই সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম না। দেখি, আগের দিনের মতোই উনি আমার বুকের পর আলতো করে হাত রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আমি আস্তে ওর হাতটা সরাতেই উনি আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। আমি অনেকক্ষণ জেগে জেগে আবছা আলোয় ওর দিকে চেয়ে রইলাম। বিশ্বাস কর ভাই, আমি ওকে খারাপ ভাবতে পারলাম না ; রবং কাকুর প্রতি আমার দারুণ মায়া হল। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই আমি অবাক। দেখি, আমিই কাকুকে জড়িয়ে শুয়ে আছি।

এইভাবে মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলতে খেলতেই একটা বছর পার হল।

কবিতা, আজকে তুমি একটু ড্রিঙ্ক করবে?

আমি হাসতে হাসতে বলি, কেন কাকু? আজ তো আপনার জন্মদিন না।

আজ শনিবার।

তাতে কি হল?

কাল আমারও অফিস নেই, তোমারও ইউনিভার্সিটি নেই।

তাতে কি হল?

সব ব্যাপারে কাকুকে নিঃসঙ্গ রাখছ কেন? একটু থেমে বললেন, না হয় আমার মতো অপদার্থের জন্য তুমি একটু খারাপই হলে।

না, না, ভালো খারাপের কোনো ব্যাপার নয়।

তাহালে 'প্লিজ' গিভ মি কোম্প্যানি।

গত এক বছরে কাকুর অনুরোধে আমাকে দু'তিন দিন হুইস্কি খেতে হয়েছে কিন্তু ঠিক উপভোগ করিনি। সেই শনিবার সন্ধ্যায় আমি প্রথম হুইস্কি খেয়ে সত্যি আনন্দ পেলাম।

এক পেগ শেষ হবার পর আমিই কাকুকে বললাম, কাকু আরেক রাউন্ড হোক।

কাকু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

বেশ লাগছে।

প্রথম পেগ শেষ করতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগলেও সেকেন্ড পেগ আধ ঘণ্টায় শেষ হতেই কাকু আবার গেলাস ভরে আনলেন। আমি আপত্তি করলাম না। ওই গেলাস নিয়েই আমি ডাইনিং

টেবিলে বসলাম। সামান্য কিছু খেলাম। তারপর গেলাসের বাকি হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে দিয়েই দু'হাত দিয়ে কাকুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমাকে শুইয়ে দিন।

শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

না, না, বরং বেশ ভালো লাগছে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি, আমরা দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছি। আস্তে আস্তে আমি আবিষ্কার করলাম, আমরা দুজনে রোজই এক বিছানায় শুই। তবে ভাই, বিশ্বাস কর, কাকু কোনো দিনের জন্যও আমার কাছ থেকে এর বেশি দাবি করেননি।

তারপর আমি এম. এ. পাশ করলাম। ভালোই রেজাল্ট হল। রিসার্চ শুরু করলাম। সারাদিনে এত পরিশ্রম করতে হয় যে বাড়ি ফেরার পরই ঘুমিয়ে পড়ি। অধিকাংশ দিনই জানতে পারি না, কখন সালাউদ্দিন চলে যায় বা কাকু বাড়ি ফিরে আসেন।

সাড়ে সাতটা-আটটার সময় ঘুম ভাঙার পর স্নান করি। দু-এক ঘণ্টা লেখাপড়া করি। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে হয়তো দুজনে গল্পগুজব করি।

একদিন কাকু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, রিসার্চ তো প্রায় শেষ হয়ে এলো, এরপর কি করবে?

আগে শেষ হোক। তারপর ভেবে দেখব।

কাকু বলেন, কি আর করবে? কোথাও ভালো চাকরি নিয়ে চলে যাবে।

চলে গেলেও আপনি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসবেন।

তোমার স্বামী হয়তো আমার যাতায়াত পছন্দ করবেন না।

আমি বিয়ে-টিয়ে করছি না।

বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

কেন?

কেন আবার? তোমার মতো সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে অনেকেই বিয়ে করতে চাইবে।

অন্যের ইচ্ছায় তো আমি বিয়ে করব না।

অন্যের আগ্রহে তোমারও বিয়ে করার ইচ্ছা হবে।

তার কোনো মানে নেই।

মানে আছে কবিতা। কাকু আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের ওপর দুটো হাত রেখে বললেন, তুমি তো কোনোদিন হুইস্কি খেতে না কিন্তু আমার আগ্রহে আজকাল মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক কর, তাই না?

আমি মাথা নাড়ি। এবার কাকু বলেন, আমি নিজে আগ্রহ করে তোমার কাছে কিছু দিন শোবার পরে...

বুঝেছি।

আমার যদি আরও এগিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকত তাহলে হয়তো...

না কাকু, সে ইচ্ছা আপনার হবে না।

আমি কথার কথা বলছি, আমি আগ্রহ দেখালে তুমিও হয়তো বাধা দেবে না।

আমি কোনো কথা বলি না। মুখ নীচু করে বসে থাকি।

কিছুক্ষণ পরে কাকু আমার দুটি হাত ধরে বললেন, অনেক রাত হয়েছে। চল, শুতে যাই।

আমি নিঃশব্দে কাকুর সঙ্গে শুতে যাই।

কাকু ঘুমিয়ে পড়েন কিন্তু আমি জেগে থাকি। নানা কথা ভাবি, কাকুর কথা, আমার কথা। হয়তো বাবা-মা দাদুর কথাও ভাবি। ভাবি, আমার জীবনটা কি বিচিত্রভাবে ঘুরে গেল। ক'বছর আগে যাকে চিনতাম না, যে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল আজ আমি তারই পাশে শুয়ে আছি।

হঠাৎ পাশ ফিরে শুয়ে কাকুকে দেখি। একটু হাসি। ঘুমিয়ে পড়লে কাকুকে শিশুর মতো মনে হয়। ক্লান্ত, শ্রান্ত, অসহায়। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, ঘুমোলে কী সবাইকে এমন অসহায় মনে হয়?

আস্তে আস্তে ওর মুখে, মাথায় হাত দিই। হঠাৎ গলার কাছে হাত দিয়ে দেখি ভিজে গেছেন। নিজের আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিই। পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিই। কাকুর মুখের সামনে মুখ নিয়ে দেখি। ওর নিঃশ্বাস আমার মুখে এসে পড়ছে। বেশ লাগছে। ওকে যেন ভালো লাগে। নিজেই নিজেকে বলি, কাকু তো বাবার চাইতে সাত-আট বছরের ছোট। তার মানে উনি মোটামুটি আমার চাইতে দশ-বারো বছরের বড়। ব্যাস! আমি বোধহয় একটু ঘনিষ্ঠ হই। ঘুমের ঘোরেই কাকু আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেন। আমি আপত্তি করি না, ওকে দূরে সরিয়ে দিই না। পারি না। ওকে দূরে সরিয়ে দেবার মতো শক্তি আমি হারিয়ে ফেলি।

ভাই, তোমার কাছে স্বীকার করছি, সেদিন সেই অন্ধকার রাত্তিরে আমি কাকুকে ভালোবাসলাম আর সেই ভালোবাসার আগুনে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম।

বেশ কিছুকাল পরের কথা। আমার রিসার্চ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু রেজাল্ট বেরোয়নি। প্রায় সারা দিনই বাড়ি থাকি। তাছাড়া সালাউদ্দিন 'আজমীর শরীফ'এ তীর্থ করতে গেছে বলে আমিই রান্নাবান্না করি। দুপুরের দিকে কলিংবেলে বাজতেই দরজা খুলে দেখি, একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের সুন্দরী মহিলা।

আমি কিছু বলার আগেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, সালাউদ্দিন আছে?

না, ও আজমীর গিয়েছে।

তার মানে ওর ফিরতে দেরি হবে।

আপনি কি সালাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

উনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি কবিতা?

হ্যাঁ। আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।

আপনি আমাকে চিনবেন না। হেমন্তবাবুর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। বললাম, আপনি ভিতরে আসুন। উনি ভিতরে এলেন, বসলেন। আমি ওর সামনের সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নামটা জানতে পারি?

আমার নাম রমলা।

আপনি কি কাকুর অফিসে কাজ করেন?

আপনি বুঝি হেমন্তকে কাকু বলেন?

বিচিত্র হাসি হেসে উনি এই প্রশ্ন করতেই আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল। খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, হ্যাঁ উনি আমার কাকু।

উনি একবার খুব ভালো করে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, আপনার কাকু তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাই দ্য ওয়ে মাইশোর সিল্কের শাড়িটা আপনার পছন্দ হয়েছিল তো?

ওর কথা শুনে আমার গা জ্বলে গেল। বললাম, সবই তো বুঝলাম কিন্তু আপনার পরিচয়টা জানতে পারলাম না।

আপনার মতো হেমন্তও আমার বন্ধু।

তার মানে?

রোজ অফিস ফেরত আমার কাছে যায়। আগে মাঝে মাঝে রাত্তিরটা আমার কাছেই কাটাত কিন্তু আজকাল আপনার জন্য রাত্তিরে আর আমার কাছে থাকে না।

আপনি কি এই সব আজেবাজে কথা বলতে আমার কাছে এসেছেন?

উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না। এই দিকে একটু কাজ ছিল। তাই ভাবলাম, একবার আপনাকে দেখে যাই।

আপনার দেখা হয়েছে?

দরজার দিকে এগোতে এগোতে রমলা আরেকবার আমাকে ভালো করে দেখে বললেন, হ্যাঁ দেখলাম। বেশ লোভনীয় জিনিস।

উনি বেরিয়ে যেতেই আমি দরজা বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলাম। কাকুর উপর রাগে দুঃখে ঘেন্নায় সারা শরীর জ্বলে গেল। তারপর মনে মনে ঠিক করলাম, না, আর এখানে নয়।

সুপর্ণাকে টেলিফোন করলাম, শোন তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার।

কেন, কী হল?

তোর বরকে দিয়ে আমার একটা উপকার করিয়ে দিতে হবে।

কাজটা কি, তাই বল।

তুই বাড়িতে আছিস?

আর কোথায় যাব?

তাহলে আমি আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে সুপর্ণার বাড়ি গেলাম। সোজাসুজি বললাম, কাকুর চরিত্র ভালো নয়। আমি আর একদিনও ওখানে থাকতে চাই না।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, এখন তো আমার শ্বশুর-শাশুড়ি নেই, তুই আমার এখানে চলে আয়।

দরকার হলে আসব কিন্তু তোর বরকে দিয়ে Y. W. C. A-তে আমার একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

সে ব্যবস্থা হয়তো ও করে দেবে কিন্তু তাতে দু-এক মাস সময় লাগবেই।

কিন্তু আমি আর একদিনও কাকুর ওখানে থাকতে চাই না।

তুই আজই এখানে চলে আয়। তারপর ওখানে ঘর পেলেই চলে যাস।

তোর বরের মত না জেনে আমি আসতে পারি না।

আমার বর তোকে ওর আপন বোনের চাইতেও বেশি ভালোবাসে।

তা তো জানি কিন্তু তবুও তার মতামত না জেনে আমার আসা উচিত নয়।

ঠিক আছে, আজ রাত্রে আমি ওর সঙ্গে কথা বলে রাখব।

তুই আমাকে টেলিফোন করিস, তবে কাকু অফিস যাবার আগে করিস না।

এগারোটা নাগাদ করব।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

পরের দিন দুপুরের দিকে সুপর্ণা ওর বরের অফিসের গাড়ি নিয়ে আমার কাছে এলো।

আমি আমার সব জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলাম। কাকুকে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে এলাম—আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। আপনার কাছে এই ক'বছর থেকে আমি যে অপরিসীম অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, তা আমার ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় হয়ে রইবে। আমি যাচ্ছি। আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা নেই। আপনিও আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না। সব শেষে জানাই, আপনার বান্ধবী রমলা এসেছিল।

অকস্মাৎ আমার জীবন আবার মোড় ঘুরল।

তোমার দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

সাত

সুপর্ণার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের একটা ইতিহাস আছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হবার ক'দিন পরই হঠাৎ কি কারণে যেন স্ট্রাইক হল। ভাবছিলাম লাইব্রেরিতে বসে কাজ করব কিন্তু হঠাৎ সুপর্ণা এসে অনুরোধ করল, চলুন সিনেমায় যাই। বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও ওর অনুরোধে মত দিলাম। কিছুক্ষণ এর-ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এসপ্ল্যানেড পাড়ায় গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোনো হলে টিকিট পেলাম না। সুপর্ণার বাড়ি ফেরার মতলব ছিল না ; তাই ওকে আমার আস্তানায় নিয়ে গেলাম।

সারা দুপুর-বিকেল আমরা আড্ডা দিলাম। কত কি বললাম আর শুনলাম, তার ঠিক ঠিকানা নেই। ওই এক দুপুরবেলা আড্ডা দিতে দিতে আমরা কখন যে আপনি-তুমি পেরিয়ে তুই-এ পৌঁছেছি তা কেউই জানতে পারলাম না।

বাড়ি ফেরার আগে সুপর্ণা হাসতে হাসতে বলল, যাই বলিস কবিতা, প্রেমে পড়লে তোর এই আস্তানাটা দারুণ কাজে লাগবে।

আমিও হাসতে হাসতে জবাব দিলাম, স্বচ্ছন্দে কাজে লাগাস।

এরপর থেকে সুপর্ণা মাঝে মাঝেই ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমার ওখানে কাটিয়ে যেত। বলতো, কবিতা, একটা সত্যি কথা বলবি?

কেন বলব না?

তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে?

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করি, কেন? তোর বুঝি ইচ্ছে করছে?

সুপর্ণা খোলাখুলিই বলে, ঠিক বিয়ে করতে ইচ্ছে না করলেও ঠিক এ রকম একলা একলা থাকতেও ভালো লাগে না।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তুই কি কারুর প্রেমে পড়েছিস?

পড়িনি, তবে পড়লে ভালো হয়।

ইউনিভার্সিটিতে তো কত মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলল, একমাত্র শ্যামল ছাড়া আর কারুর পাশে বসতেও ইচ্ছে করে না।

শ্যামল সত্যি ভালো ছেলে। যেমন স্মার্ট তেমন...

আবার আমাকে বাধা দিয়ে বলল, সব চাইতে বড় কথা ভারি সুন্দর কথা বলতে পারে।

ওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললেও খারাপ লাগে না।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ওর আর কি গুণ আছে?

ওর সবচাইতে বড় গুণ ও তোকে ভালোবাসে।

কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছিস? শ্যামল যে তোকে ভালোবাসে আর ওকে যে তোরও ভালো লাগে এ কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন?

ভাই রিপোর্টার, এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন সে আর নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। নিঃসঙ্গ থাকতে চায় না। সে তখন প্রাণের মানুষকে কাছে চায়। এই শত-সহস্র লক্ষ বছরের পুরনো পৃথিবীকেই নতুন করে আবিষ্কার করতে চায়।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই অনেক আগে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। করবেই। তবে কারুর দু'দিন আগে কারুর দু'দিন পরে।

আমার বেশ মনে পড়ে, আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখনই কয়েকজনকে দেখেছি যারা দেহে ও মনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দু'তিনজন তো তখনই সংসার করার জন্য বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এ সব খুব অস্বাভাবিকও নয়। এক বিশেষ সময়েই প্রকৃতির জীবনে বসন্ত আসে কিন্তু মানুষ তো কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলার দাস নয়। তার জীবনে কখন বসন্ত আসবে, তা কেউ জানে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Age does not depend upon years, but upon temperament and health' সত্যি, বছরের হিসাব করলেই বয়স জানা যায় না ; মন ও স্বাস্থ্যের ওপরই বয়স নির্ভর করে।

ছেলেবেলায় শুনতাম বাঙালি মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয় কিন্তু এই নিউ ইয়র্কেই এক বাঙালি মহিলা আছেন যাকে দেখে মনে হয় তিনি কোনোদিনই বুড়ি হবেন না। বেশ ক'বছর আগে কলকাতার একজন বিখ্যাত গায়ক এ দেশে এসেছিলেন। এক অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনতে গিয়েই মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই দেখা হয়। ওকে নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলতেন। কেউ বলতেন, ওর স্বামী মারা গিয়েছেন, কেউবা বলতেন, উনি ডির্ভোস করেছেন। আবার এমন কথা বলতেও শুনেছি যে ওর একাধিক বিয়ে। এ সব কথা শুনে আমি হেসেছি। কারণ আমরা যতই প্রগতিবাদী হই না কেন, যতই বিলেত আমেরিকায় থাকি না কেন, একজন মেয়েকে একা থাকতে দেখলেই আমরা সমালোচনা না করে থাকতে পারি না।

সে যাই হোক মিসেস চ্যাটার্জির বয়স নিয়ে আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেও কোনো কিছু জানতে পারেনি। কেউ বলেন চল্লিশ, কেউ বলেন পঞ্চাশ। অনেকে আবার বলেন, কিছু না হলেও ওর বয়স ষাট হয়েছে। বয়স যাই হোক মিসেস চ্যাটার্জিকে দেখে এখনও অনেক পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য হয়। আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবার পর উনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, দ্যাখ কবিতা, যে মেয়েদের একলা একলা জীবন কাটাতে হবে, তাদের যৌবন আর অর্থ সব সময় মজুত রাখতে হবে।

আমি ওর কথা শুনে হাসি।

না, না, কবিতা, হাসির কথা নয়। যৌবন আর অর্থ না থাকলে আমাদের মতো মেয়েদের বেঁচে থাকাই মুশকিল।

মিসেস চ্যাটার্জি শ্যাম্পেনের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে আবার বললেন, পৃথিবীর সব দেশের

সব পুরুষরাই মেয়েদের যৌবনের মর্যাদা দেয়। আর অর্থ?

উনি একটু হাসলেন। অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজনের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

আমার শ্যাম্পেনের গেলাস তখনও ভর্তি। ওর গেলাস খালি হয়ে গেছে। আমি আবার ওর গেলাস ভরে দিলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি হাসতে হাসতে বললেন, হাজার হোক আমরা রামচন্দ্রের অকাল বোধনকেই যেমন সবচাইতে বড় উৎসব বলে মেনে নিয়েছি, সেই রকম জীবন যৌবনের ব্যাপারেও আমরা অকাল বোধন করতে অভ্যস্ত।

তার মানে?

আঠারো কুড়ি বাইশের পর আমাদের দেশের মেয়েরা আর যৌবন ধরে রাখতে পারে না। স্বামীর কাছে সে যৌবন উৎসর্গ করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

এবার আমি হাসতে হাসতে বলি, ঠিক বলেছেন।

অনেক দিন মিসেস চ্যাটার্জি সঙ্গে দেখা হয় না কিন্তু আজ তোমাকে সুপর্ণার কথা লিখতে বসে ওর কথাগুলো মনে পড়ছে। সত্যি, সুপর্ণা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। ও মাঝে মাঝে আমাকে যা বলত তা শুনে মনে হত, ও আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছে না। একদিন আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোর মতো বিয়ে পাগল মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।

সুপর্ণা একটু ম্লান হেসে বলল, আমার দাদা-বৌদির বেলেল্লাপনা দেখলে তুই আমার চাইতেও বেশি বিয়ে পাগল হয়ে উঠতিস।

তার মানে?

তার মানে আমি তোকে মুখে বলতে পারব না।

ওই কথা বলার পর আমি আর ওকে প্রশ্ন করিনি। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার সময় আমরা কেউই ভালো বা খারাপ কিছুই থাকি না। নিজেরা সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা ও সর্বোপরি পরিবেশ আমাদের ভালো বা মন্দ করে। তোমরা ছেলেরা হয়তো জানতেও পারো না আশেপাশের মানুষের জন্য মেয়েদের জীবনে কি নিদারুণ সমস্যা বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

যাই হোক, এম. এ. পরীক্ষা দেবার পরই সুপর্ণার বিয়ে হল। আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর বিয়েতে যেতে পারিনি। বিয়ের পর ওরাও কলকাতার বাইরে চলে গেল। বোধহয় মাসখানেক পরের কথা। হঠাৎ একদিন সুপর্ণা আর অমিয় আমার ওখানে এসে হাজির।

সুপর্ণা হাসতে হাসতে অমিয়কে বলল, যে কবিতার কথা এতদিন শুধু শুনেছ, সে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিয় বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাতেই আমি প্রশ্ন করলাম, কি এত ভাবছেন?

অমিয় একটু হেসে বলল, ভাবছি দু-এক মাস আগে আপনার সঙ্গে আলাপ হলে কি কেলেঙ্কারি হত!

সুপর্ণা প্রশ্ন করল, কি আবার কেলেঙ্কারি হত?

আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে অমিয় নির্বিকার চিত্তে বলল, ওঁর সঙ্গে আগে আলাপ হলে আমি হয় বিয়ে, না হয় আত্মহত্যা করতাম।

আমি লজ্জায় মুখ নীচু করে হাসি। সুপর্ণা হাসতে হাসতে আমাকে বলল, এই লোককে নিয়ে আমি কি করে ঘর করব, বল তো?

এবার আমি বলি, তোর ভয় নেই। আমি তোর ঘর ভাঙব না।

অমিয় বলল, আপনাকে ভাঙতে হবে না ; আমিই হয়তো আমাদের ঘর ভেঙে আপনার কাছে আসব।

আমি বললাম, আসলেও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

কয়েক মাস পরের কথা। ভাইফোঁটার দিন সকালবেলায় সুপর্ণাকে নিয়ে অমিয় এসে হাজির। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, হঠাৎ এতদিন পর এই সাত সকালে...

অমিয় বলল, চটপট আমার কপালে একটা ফোঁটা দাও, নয়তো তোমার কাছে আসতে পারছি না।

কেন? সুপর্ণা আসতে দিচ্ছে না?

সুপর্ণা বলল, আমি কেন আসতে দেব না? ও নিজেই ভাইফোঁটা না নিয়ে তোর কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

কেন?

সুপর্ণা অমিয়র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলব, কেন তুমি ওর কাছে আসতে ভয় পেতে?

অমিয় হাসতে হাসতে বলল, নির্বিবাদে।

ও বলে, বাবা, ভাই, সন্তান ছাড়া আর সব পুরুষ তোকে দেখে কামনার আগুনে জ্বলবেই।

এবার আমি লজ্জার হাসি হেসে বললাম, সুপর্ণা, তোর স্বামী এবার আমার কাছে মার খাবে।

যাই হোক সেদিন অমিয়কে ভাইফোঁটা দিলাম। তুমি শুনলে অবাক হবে এর আগে আমি আর কাউকে ভাইফোঁটা দিইনি।

ভাই বোনের সম্পর্ক যে কত মধুর, তা শুধু গল্প উপন্যাসে পড়েছিলাম ; কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না! অমিয় আমার সে অসম্পূর্ণতার দৈন্য সত্যি দূর করেছিল। কামনা লালসার আগুনে জর্জরিত না হয়ে যে কোনো পুরুষ সত্যি আমাকে ভালোবাসতে পারে, তার প্রথম অভিজ্ঞতা অমিয়।

সন্ধের পর অফিস থেকে ফিরেই অমিয় আমাকে বলল, তোমার ওপর আমি বেশ রাগ করেছি।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

আমার অনুমতি না নিয়ে বুঝি তুমি এখানে আসতে পারো না?

আমি একটু হেসে বললাম, নিশ্চয় পারি।

তাহলে কালই চলে এলে না কেন?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে ওর হাতের ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রেখে দিলাম।

অমিয় টাই-এর নট্ ঢিলা করতে করতে একটু মুচকি হেসে বলল, তারপর শুনছি, তুমি হস্টেলে চলে যাবে।

আমাকে দেখেই কি তোমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে? এবার আমি সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোর স্বামী কি রকম ঝগড়া করছে, দেখছিস?

সুপর্ণা বলল, তোমাদের ভাই বোনের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।

অমিয় কোট খুলে বলল, কবিতা, একটা কথা শুনে রাখ। যতদিন কলকাতায় থাকবে, ততদিন এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না।

আচ্ছা যাব না। এবার তোমার শান্তি তো!

যেতে চাইলেও যেতে দিচ্ছে কে?

ভাই রিপোর্টার, অমিয় আমার জন্য কি করেছে তা বললে, অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু তবু তোমাকে বলব।

তোমার আগামী জীবনের সঙ্গিনীকে বল, অনেক দিন তার চিঠি পাইনি। তুমিও চিঠি দিও। প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

আট

এই পৃথিবীতে যেমন আলো আঁধারের খেলা চলে, আমার জীবনেও ঠিক তেমনি ভালোমন্দের খেলা চলছে। কাকুর আশ্রয় ছেড়ে আসার সময় মনে হয়েছিল, এ অন্ধকার আমার জীবন থেকে কোনো দিন কাটবে না, কিন্তু এমনই আশ্চর্য ব্যাপার যে তার পরই আনন্দে খুশিতে আমার জীবন আবার ঝলমল করে উঠল।

পাঁচ সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে অমিয় বলল, যত দিন তুমি এ দেশে থাকবে ততদিন তুমি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে? এ দেশে ছাড়া আর কোন দেশে থাকব?

না তুমি এ দেশে থাকবে না।

বাজে বকো না। আমি আবার কোথায় যাব আমি হেসে বললাম, তোমাদের দুজনের ঘাড় ভেঙে যখন এমন মৌজ করে দিন কাটাচ্ছি তখন আর...

অমিয় অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, সে কী? তুমি খরচাপত্র দিচ্ছ না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি খরচ না দিলে কি তোমার একার দ্বারা এ সংসার এভাবে চলত?

যাই হোক অমিয় বলল, পাসপোর্টের অ্যাপলিকেশন এলেই তুমি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে।

কেন? পাসপোর্ট দিয়ে আমি কি করব?

এ দেশে থাকলে তোমার মতো মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তোমাকে এখানে থাকতে হবে না।

কিন্তু বিদেশ গিয়ে আমি কি করব?

হোয়েন ইউ উইল কাম টু দ্য ব্রিজ, ইউ ইউল ক্রস দ্য ব্রিজ। এখন সেসব কথা ভাবতে হবে না।

সেদিন আর কোনো কথা হল না। ও অফিস চলে গেল।

দু'একদিন পর অফিস থেকে ফিরেই অমিয় আমাকে পাসপোর্টের ফর্ম দিয়ে বলল, এটা ফিল আপ করে রেখ। তারপর সুপর্ণার সঙ্গে গিয়ে প্যারাডাইস স্টুডিও থেকে ছবি...

কিন্তু...

সুপর্ণা বলল, অত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন? তোর মতো মেয়ে বিদেশে গেলে কত সুযোগ পাবি...

হঠাৎ তোরা দুজনে আমাকে তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস কেন?

অমিয় গম্ভীর হয়ে বলল, যদি অবিলম্বে বিয়ে করে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে রাজি থাকিস, তাহলে অবশ্য বিদেশে না গেলেও চলবে।

আজে-বাজে কথা বললে, একটা থাপ্পড় খাবে।

মোটেও আজেবাজে কথা বলছি না ; ঠিক কথাই বলছি। তোমার মতো মেয়ের পক্ষে এদেশে একলা থাকা অসম্ভব।

কেন?

চারদিক থেকে এত শুভাকাঙ্ক্ষীর সমাগম হবে যে আত্মরক্ষার জন্য কোনো পথ পাবে না।

তারপর একদিন আমি সত্যি সতিই পাসপোর্ট পেলাম।

অমিয় জিজ্ঞাসা করল, জাহাজে যাবে, নাকি প্লেনে যাবে?

কোথায়?

আপাতত লন্ডনে।

তারপর?

তারপর যেখানে তোমার অদৃষ্ট টেনে নেবে, সেখানেই যাবে।

লন্ডনে গিয়ে কি করব?

বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া টাকা যখন আছে, তখন আরো দু এক বছর লেখাপড়া করে জীবন সংগ্রাম শুরু করে দাও।

আমি মুখ নীচু করে একটু গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি সত্যি তুমি আমাকে যেতে বলছ?

হ্যাঁ কবিতা। এই সতী-সাবিত্রীর দেশে তোমার মতো নিঃসঙ্গ যুবতীর শান্তিতে থাকা সত্যি অসম্ভব। তুমি বাইরেই চলে যাও।

বিদেশে কি সবাই সাধু?

না, তা নয় ; তবে সেখানে ছুঁচোর মতো রাতের অন্ধকারে কেউ তোমাকে বিব্রত করবে না। যারা তোমাকে চাইবে, তারা সোজাসুজি তোমাকে সে কথা বলতে দ্বিধা করবে না।

আমি মুখ নীচু করেই চুপ করে বসে থাকি। কোনো কথা বলি না। ভাবি। নানা কথা। আকাশ-পাতাল। অতীত-ভবিষ্যৎ।

অমিয় আবার বলে, ও দেশে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলতে পারেন আমি বেজন্মা, বাস্টার্ড! আর এ দেশে? ছত্রিশ কোটি দেবতার দেশে আমরা মহাবদমাইস হয়েও ভদ্দরলোকের খোলস পরে বেশ দিন কাটাচ্ছি।

আমি আর সুপর্ণা দুজনেই হাসি।

অমিয় রেগে ওঠে, না, না, হাসির কথা নয়। আমরা কত বিধবা আর কত ঝিয়ের সর্বনাশ করেও ভদ্দরলোকের ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছি।

সুপর্ণা প্রশ্ন করে, তাই বলে বিলেতে কি কেউ কোনো মেয়ের সর্বনাশ করে না?

হাইকোর্টের পাকা ব্যারিস্টারের মতো অমিয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, করে, কিন্তু তারা নবজাত শিশুকে ডাস্টবিনে ফেলে আসে না।

রাত্তিরে খেতে খেতে অমিয় বলল, আমার এক অধ্যাপক ডক্টর সরকার এখন লণ্ডনে আছেন। আমি তাঁকে লিখে দেব। তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপর তুমিই তোমার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

যদি না পারি?

ফিরে এসো। এ বাড়ির দরজা তো তোমার কাছে সব সময়ই খোলা থাকবে।

সুপর্ণা বলল, একবার গেলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবি না। তারপর একটু হেসে বলল, তুই

ওখানে থাকলে একবার হয়তো আমরাও ঘুরে আসব।

অমিয় বলল, হয়তো মানে? ডেফিনিট্‌লি যাব।

ভাই রিপোর্টার, যখনকার কথা বলছি, তখন পাসপোর্ট পাওয়া কঠিন ছিল কিন্তু বিদেশ যাওয়া সহজ ছিল। জাহাজ প্লেনের ভাড়াও অনেক কম ছিল। তবু কলকাতা ছেড়ে বিদেশ যাবার কথা মনে হতেই খারাপ লাগল। এই এত বড় পৃথিবীতে আমার কোনো আপনজন না থাকলেও নিজের দেশ, সমাজ সংসার ছেড়ে বিদেশ যেতে মনে মনে বিশেষ উৎসাহবোধ করলাম না। আবার মনে হল, না, না, চলেই যাই। কি হবে এদেশে থেকে? কে আছে আমার? এখানে একলা থাকলেই অসংখ্য পরিচিত অপরিচিত মানুষের সমালোচনার শিকার হতে হবে। শৈশবে মা-বাবা, কৈশোরে ভাইবোন, যৌবনে স্বামী ও বার্দ্ধক্যে সন্তান ছাড়া এ দেশে কোনো মেয়ের পক্ষে একা থাকা স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়! এই যে অমিয় আর আমি! নিছকই ভাইবোন কিন্তু পারব কি আমরা দুজনে একসঙ্গে হাসতে, খেলতে, গল্প করতে? না। প্রত্যেকটি দর্শক এক একটি আরব্য উপন্যাস সৃষ্টি করবে। যে দেশে ভাইবোন একসঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যেতে পারে না, সে দেশে না থাকাই ভালো।

আবার মনে মনে ভাবি, যে সমালোচনা করবে করুক, তবু তো এটা আমার দেশ। এখানে আমার ইচ্ছামতো হাসতে ও কাঁদতে পারি কিন্তু বিদেশে? সেখানে কে আমার আনন্দে হাসবে? দুঃখের দিনে কে আমার জন্য চোখের জল ফেলবে? তাছাড়া একবার বিদেশ গেলে তো চট করে আর আসতে পারব না।

অমিয়, ভাই একটা কথা বলব।

বল।

তুমি এখানেই আমার একটা চাকরি জোগাড় করে দাও। আমি একলা একলা বেশ থাকতে পারব।

ও হাসতে হাসতে বলল, তুমি কি ভাইফোঁটা দিয়ে সব পুরুষ মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করতে পারবে?

আমি কি হেলেন অফ ট্রয়?

ঈষৎ তির্যক দৃষ্টিতে অমিয় একবার আমাকে দেখে নিয়ে সুপর্ণাকে বলল, তোমার বান্ধবীকে বলে দাও, এই পৃথিবীর সব পুরুষ আমার মতো সন্ন্যাসী নয়।

সুপর্ণা হাসতে হাসতে বলল, তুমি সন্ন্যাসী!

অব কোর্স!

তোমার মতো কামুক এ পৃথিবীতে আর কেউ আছে?

ক'জন পুরুষ সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা আছে সুন্দরী?

একজনকে দেখে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আর দেখার দরকার নেই।

অমিয় গম্ভীর হয়ে বলল, শাস্ত্র বলেছে, ধর্ম রক্ষার জন্য বংশরক্ষা করা পুরুষের অবশ্য কতর্ব্য।

এতক্ষণ আমি মুখ টিপে হাসছিলাম। এবার বললাম, তাই বুঝি এক দিনের জন্যও বৌকে ছেড়ে থাকতে পারো না?

মিস চৌধুরী, ইউ আর মিসটেকেন্‌। আমার স্নেহালিঙ্গন ছাড়া আমার স্ত্রীর ঘুম আসে না।

সুপর্ণা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, হা ভগবান! কি মিথ্যেবাদী! আমাকে রাগালে আমি হাটে

হাঁড়ি ভেঙে দেব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণার হাত ধরে বললাম, প্লিজ, এখনি ভাঙতে শুরু কর!

আস্তে আস্তে দিনগুলো এগিয়ে চলে আর অমিয়ও আমার বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে আনে। হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে এসেই আমাকে একটা চিঠি দিয়ে বলল, হিয়ার ইজ এ লেটার ফ্রম ডক্টর সরকার। পড়ে দেখ। বেশ এনকারেজিং চিঠি।

চিঠিখানা পড়ে দেখি ডক্টর সরকার লিখেছেন, তোমার বোন ডক্টরেট হলে এখানে নিশ্চয়ই ভালো সুযোগ পাবে এবং আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব। মনে হয় তোমার বোনের কোনো অসুবিধা হবে না।

ডক্টর সরকারের এই চিঠিখানা পড়ার পর বিদেশ যাওয়া সম্পর্কে আমিও উৎসাহ বোধ করলাম। অমিয় আর সপুর্ণাকে বললাম, সামনের মাসের সাত তারিখে আমার ভাইবা। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই রেজাল্ট জানতে পারব। যদি সত্যি সত্যি ডক্টরেটটা পেয়ে যাই তাহলে ভাবছি চলেই যাব।

অমিয় বলল, ভাবছি মানে? তোমাকে বিদায় না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

আমি সুপর্ণাকে বললাম, দ্যাখ, তোর স্বামীর নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। তা নয়তো ও আমাকে তাড়াবার জন্য এমন পাগল হয়ে উঠেছে কেন?

সুপর্ণা বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

অমিয় বলল, খুব স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগর মশাইকে পর্যন্ত কত অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। সুতরাং আমার মতো মহাপুরুষকেও যে তোমরা বদনাম দেবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সুপর্ণা ঠোঁট উল্টে বলল, তুমি মহাপুরুষ!

এ গ্রেট ইজ নোন বাই দ্য নাম্বার অফ হিজ এনিমিজ–

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠি।

ভাই রিপোর্টার, আশু মুখুজ্যে মারা যাবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বারোটা বেজেছে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমিও ডক্টরেট পেলাম। আমার রেজাল্ট বেরুবার পর অমিয় প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আমাকে বিলেত পাঠাবার ব্যাপারে যে কি পরিশ্রম করেছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

আমার বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে এত কিছু লেখার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তবু আমি না লিখে পারলাম না। এই পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ বিশেষ কাজের জন্য আসে সে কাজ শেষ হইলেই তারা চলে যায়। আমার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার জন্যই বোধহয় ও এসেছিল। তা না হলে আমি চলে আসার এক বছরের মধ্যে অমিয় ক্যান্সারে কেন মারা গেল? আমার স্থির বিশ্বাস, ও থাকলে আমার জীবনটা এমন হতাশায় ভরে যেত না।

অমিয়কে হারাবার পর আমি নতুন করে উপলব্ধি করলাম, এ পৃথিবীতে শুধু দুঃখ ভোগের জন্যই আমি এসেছি। আমার মুখের হাসি ভগবান কিছুতেই সহ্য করবেন না।

নয়

হঠাৎ একটা পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। তখন সবে স্কুলে ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। একটু আধটু স্বাধীনতা আর নতুন বন্ধুদের নিয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটছে। কারণে অকারণে হাসি, অহেতুক ঘুরে বেড়াই, অপরিচিতকেও পরিচিত মনে হয়। একদিন তিন-চারজন বন্ধু প্রায় জোর করেই শিখা সরকারের বাড়ি নিয়ে গেল। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম, শিখার কাকুর কাছে ওরা হাত দেখাতে এসেছে।

এসব ব্যাপারে কোনো কালেই আমার আগ্রহ ছিল না কিন্তু সবার শেষে কাকুর কাছে হাত এগিয়ে দিলাম।

আমার বেশ মনে আছে, আমার হাতের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই উনি আপন মনে বললেন, ভারি অদ্ভুত হাত!

আমরা কেউ কিছু প্রশ্ন করার আগেই শিখা জিজ্ঞাসা করল, অদ্ভুত হাত মানে?

কাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, এ রকম অদ্ভুত হাত খুব কম মেয়ের হয়।

শিখা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, যা বলতে যাও, সোজাসুজি বল।

কাকু মুখ নীচু করে আমার হাত দেখতে দেখতে বললেন, তোদের সামনে বলব না। তবে তোরা জেনে রাখ, এ সবদিক থেকেই তোদের হারিয়ে দেবে।

একটা অদ্ভুত অস্বস্তি নিয়েই ফিরে এলাম এবং প্রয়োজন হলেও শিখার বাড়ি যেতাম না। বছর দুই পরে কি একটা জরুরি কারণে ওর বাড়ি গিয়ে দেখি কাকু ছাড়া আর কেউ নেই। বাধ্য হয়ে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেছিলাম।

সেদিন কাকু আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ?

ভালো। আপনি?

আমি খুব ভালো আছি। তোমাকে এতদিন দেখিনি কেন?

ঠিক আসা হয়ে ওঠেনি।

কাকু এবার আর কোনো ভূমিকা না করে বললেন, দেখি তোমার হাতটা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত এগিয়ে দিলাম। একটা নয়, আমার দুটো হাতই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখার পর কাকু বললেন, তোমাকে দু-চারটে কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না।

কাকুর কথায় বেশ আন্তরিকতার স্বাদ পেয়ে বললাম, না, না, কি মনে করব।

সবচাইতে বড় কথা, তুমি কাউকে হাত দেখাবে না।

কেন?

তোমার জীবনের সব কথাই তোমার হাতে লেখা আছে। এসব কথা অন্য কারুর না জানাই ভালো।

আমি চুপ করে আছি। কাকু আপন মনে আমার হাত দেখছেন। কত কি ভাবছেন। বোধহয় মনে মনে নানারকম হিসাব নিকাশ করছেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করবে।...

উনি কথাটা বলতে না বলতেই আমি হাসি।

না, না, কবিতা, হাসির কথা নয়। তোমার অধিকাংশ বন্ধুদের চাইতে তুমি অনেক বেশি লেখাপড়া করবে। চাকরি-বাকরিতে এমন উন্নতি করবে যে...

আমি চাকরি করব?

নিশ্চয়ই করবে এবং তোমার কর্মজীবন বিদেশেই কাটবে।

আমি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলি, বিদেশে!

উনি যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, তুমি বহু দূর দেশে জীবন কাটাবে এবং আজ এ কথাও বলে দিচ্ছি যে, হঠাৎ এমন একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে, যার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টাতেই তুমি বিদেশ যাবে।

আমি একটু হেসে বললাম, এখন তো এসব কথা আমার কল্পনার বাইরে।

তোমার জীবনে বারবার এমন ঘটনা ঘটবে বা তুমি স্বপ্নেও ভাববে না।

যেমন?

কিছু মনে করবে না?

না।

যেসব কথা বলব, তা নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব।

শিখা বা অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনকেও বলতে পারবে না।

না, কাউকে বলব না।

বারবার তোমাকে বহু পুরুষের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে হবে।

তার মানে?

এর চাইতে বেশি পরিষ্কার করে বলার সময় এখনও আসেনি।

আমি চুপ করে ভাবি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কাকু বললেন, তবে তুমি হেরে যাবার মেয়ে নও। যাই হোক না কেন, তুমি এগিয়ে যাবেই।

মেয়েদের পক্ষে কি বেশি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব?

অধিকাংশ মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি অনেক দূর এগোবে।

কাকু, একটা প্রশ্ন করব?

নিশ্চয়ই করবে।

আমাকে কি বিয়ে করতে হবে?

কেন, তুমি কি বিয়ে করতে চাও না?

না।

মনে হয় না তুমি বিয়ে করবে। আর বিয়ে করলেও অনেক পরে করবে।

এই কাকুর কথা আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। অমিয় যখন আমার বিদেশ যাত্রার সবকিছু ঠিক করল, তখন হঠাৎ কাকুর কথা মনে পড়ল। কাকুর কথাগুলো মনে মনে রোমন্থন করে দেখলাম, ওর প্রতিটি কথাই আমার জীবনে বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

কলেজ ছাড়ার পর শিখার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। ওদের বাড়ির ঠিকানাটাও ভুলে গিয়েছিলাম। তিন-চারদিন নানা জায়গায় ঘোরাঘুরির পর শিখাদের বাড়ির ঠিকানা পেলাম তারপর সেখানে গিয়ে দেখি কাকু নেই। ওখান থেকে বারাসতের ঠিকানা নিয়ে আমি কাকুর কাছে হাজির হলাম।

প্রথমে উনি আমাকে চিনতে পারেননি। পরিচয় দিতে উনি তো অবাক! কাকু ও কাকিমা

খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। তারপর কাকুকে একলা পেয়ে বললাম, আপনার অনেক কথাই মিলে গেছে।

কাকু বললেন, তখন তো তুমি ছোট ছিলে ; তাই সব কথা বলতেও পারিনি।

আমি কোনো কথা না বলে হাত এগিয়ে দিলাম।

দু-তিন মিনিট ধরে আমার দুটো হাত খুব ভালোভাবে দেখে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, নিশ্চয়ই অনেক পড়াশুনা করেছ?

এম. এ. পাশ করার পর রিসার্চ করেছি।

ডক্টরেট হয়েছ?

হ্যাঁ।

এবার তো তোমার বিদেশ যাওয়া উচিত।

সামনের সপ্তাহের শেষের দিকে লন্ডন যাচ্ছি।

কাকু আপন মনে হেসে বললেন, যেতেই হবে। কিন্তু...

কিন্তু কি?

খুব বেশি দিন ওখানে থাকবে না।

দেশে ফিরে আসব?

না, না। অন্য কোথাও চলে যাবে!

এবার আমি নিজের থেকেই বললাম, আপনি বলেছিলেন হঠাৎ এক শুভাকাঙ্ক্ষীর চেষ্টাতেই আমি বিদেশ যাব। ঠিক তা-ই হল।

কাকু আমার কথার জবাব না দিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে তোমার জীবনে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয়।

হ্যাঁ কাকু, ঘটেছে।

এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটবে।

আমি চমকে উঠে বললাম, আরো ঘটবে?

তখন তুমি ছোট ছিলে বলে এসব কথা বলিনি কিন্তু এখন তুমি বড় হয়েছ, অনেক লেখাপড়া করেছ বলে সাবধান করে দিচ্ছি।

কাকুর কথাটা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। উনি তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তবে তুমি জীবনে খুব নিকৃষ্ট লোকের সান্নিধ্যে আসবে না কিন্তু, এরা প্রত্যেকেই তোমার কিছু না কিছু উপকার করবেন।

এবার আমি বেশ গম্ভীর হয়েই বললাম, নিজেকে বিলিয়ে দিলে তো অনেক পুরুষই উপকার করবে।

না, না, তুমি নিজেকে বিলিয়ে দেবে না, কিন্তু ঘটনাচক্রে এ সব ঘটবেই। তুমি শত চেষ্টা করেও এদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

যদি বিয়ে করি?

কাকু অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, চট করে তুমি বিয়ে করবে না।

এবার আমি প্রশ্ন করি, আমার বিদেশ যাওয়া কি উচিত হবে?

তোমাকে যেতেই হবে। শুধু বিদেশে যাওয়া নয়, প্রায় সারা কর্ম-জীবনই বিদেশে থাকবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, কাকু, আমাকে কি সারা জীবনই এই সব গ্লানির বোঝা বইতে হবে?

কাকু একটু হেসে বললেন, বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ প্রতিপত্তি বিদেশ ভ্রমণ যেমন উপভোগ করবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দু'চারটে ঘটনাও ঘটবে। তার জন্য দুঃখ করছ কেন?

একটু চুপ করে থেকে উনি আবার বললেন, কোনো মানুষের জীবনই সরলরেখা নয়।

স্বয়ং ডক্টর সরকারই আমাকে লণ্ডন এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা করলেন। কাস্টমস্ এনক্লোজারের বাইরে এসে ওঁকে প্রণাম করতেই উনি বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ইয়েস ফাদার, ইউ উইল হ্যাভ টু লুক আফটার মী অ্যাজ ইওর চাইল্ড।

আই উইল।

আমি যখন লণ্ডন এলাম তখন ওখানে শরৎকালীন ছুটি চলছে। এয়ারপোর্ট থেকে বার্কিংহাম প্যালেস রোডের এয়ারওয়েজ টার্মিনালে যাবার পথেই ডক্টর সরকার বললেন, দিন সাতেক আমার ছুটি আছে। এই ক'দিন আমরা কোনো কাজের কথা বলব না। এই বুড়ো তোমাকে নিয়ে সারাদিন ঘুরবে।

কোথায় ঘুরবেন?

ঘুরে ঘুরে শহর দেখব।

কিন্তু আপনার তো সব কিছু দেখা। আপনি আবার কেন ঘুরবেন?

এটা কলকাতা বা দিল্লি বোম্বে নয় ; এখানে সারা জীবন কাটিয়েও সব কিছু দেখা হয় না।

আমি মোটর কোচ-এর ভিতরে বসে জানালা দিয়ে দু'চোখ ভরে লণ্ডন দেখছি। দু'-চার মিনিট পরে ডক্টর সরকার আমাকে বললেন বেঞ্জামিন ডিসরেলী এই মহানগরী সম্পর্কে কি বলেছিলেন জানো?

না।

একবার বলেছিলেন, London—a nation not, a city।

আমি হাসি।

হাসির কথা নয় মা ; উনি বোধহয় আরো এক ধাপ বাড়িয়ে বলতে পারতেন, এ শহরটা একটা ক্ষুদে পৃথিবী। তবে ডিসরেলী ঠিকই বলেছিলেন, London is roost for every bird!

আমি ওর কথা শুনে হাসি আর কোচের জানালা দিয়ে দেখি।

ডক্টর সরকার একটু হেসে বললেন, এ শহর যত দেখবে, ততই মনে হবে কিছুই দেখা হল না। আজকে বিশ্রাম নাও। কাল থেকে আমরা ঘুরব।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু আপনার মতো বুড়ো মানুষকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত হবে?

উনি হাসতে হাসতে বললেন, নো ওয়ান ইজ টু ওল্ড ইন লণ্ডন। তাছাড়া এটা তো কলকাতা নয়, সন্ধেবেলায় ফিরে এসে খানিকটা ওয়াইন খেলেই আবার যৌবন ফিরে আসবে।

আমি হাসি।

হাসির কথা নয় মা! এই মহানগরীতে শরীর ও মনকে সতেজ রাখার সব ব্যবস্থা আছে।

আমি হাসি মুখে বলি, সে সুযোগ বোধহয় সব বড় শহরেই আছে।

না, মা, তা ঠিক নয়। নিউইয়র্ক অনেক বড় শহর কিন্তু সারা শহরটাই যেন স্টক এক্সচেঞ্জ

আর ডালহৌসি-চৌরঙ্গি।

আপনি আমেরিকাতেও গিয়েছেন?

উনি হাসতে হাসতে বললেন, শুধু কোনো সুন্দরী নারীর মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারিনি ; তাছাড়া আর কোথাও যাওয়া বাকি নেই।

ওর কথা শুনে আমি আরও হাসি। জিজ্ঞাসা করি, আপনি বিয়ে করেননি?

বিয়ে করলে কি এমন বুক ফুলিয়ে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বৃদ্ধ ডক্টর সরকার বললেন, একদিন জোর করে দু'বোতল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খাইয়ে দিও। আমার জীবনের সব কথা বলে দেব।

এর পরের চিঠিতে ডক্টর সরকারের কথা লিখব। অবাক হবে ওর জীবন কাহিনি জেনে।

দশ

বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই এমন একজন সহৃদয় মানুষের দেখা পাব, তা কল্পনাও করিনি।

হ্যামস্টেড-এ ওঁর আস্তানায় ঢুকতেই ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, ট্রিট দিস হাউস অ্যাজ ইওর ওন।

আমি শুধু একটু হাসি।

হাসি নয়। আজ থেকে এ সংসার তোমার, আমি তোমার প্রজা।

চা খেয়েই উনি সবকিছু আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, সারা জীবন একলা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন মনে হয়, কেউ যদি আমার ওপর খবরদারি করত, তাহলে খুব ভালো লাগত।

কথাটা শুনেই আমি একটু আনমনা হয়ে গেলাম।

ডক্টর সরকার বললেন, যৌবনে বা প্রৌঢ় অবস্থায় নিঃসঙ্গ থাকা যায় কিন্তু বাধর্ক্যে নিঃসঙ্গ থাকা সত্যিই অসহ্য।

এবার আমি বললাম, কোনো আত্মীয়স্বজনকে কাছে রাখেন না কেন?

আত্মীয়! ডক্টর সরকার যেন চমকে উঠলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আগে দু-একজন আত্মীয় ছিলেন, এখন আর কোনো আত্মীয় নেই।

আমি একটু এগিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললাম, হতাশ হবেন না, আমিও আপনার দলে।

উনি হঠাৎ ঘুরে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আমিও এই রকমই আশা করছিলাম।

লন্ডনের জীবন বেশ ভালোভাবেই শুরু হল। ডক্টর সরকারের ফ্ল্যাটে তিনখানি ছোট বড় ঘর। কোন্‌টি ড্রইংরুম আর কোন্‌টি বেডরুম, তা বোঝা যায় না। সব ঘরেই হাজার হাজার বই। তিনটি ঘরেই ডিভান আছে। পড়াশুনা করতে করতে ক্লান্ত হলেই যে কোনো ঘরে ঘুমানো যায়। কাগজ কলম আর চশমা যত্রযত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আছে আরও অনেক কিছু। তার মধ্যে সবার আগে চোখে পড়ল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন আর মার্টিনীর খালি বোতল। বুঝলাম, এই বোতলগুলো

শূন্য করে ডক্টর সরকার তাঁর মন পূর্ণ করার চেষ্টা করেন।

সন্ধের দিকে ডক্টর সরকার আমাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হ্যামস্টেড হিথ গেলেন। পাহাড়ের ওপর থেকে এমন সুন্দর বাগান দেখে খুব ভালো লাগল। ভেবেছিলাম আরো কিছুক্ষণ কাটাব কিন্তু উনি বললেন, চল, ওয়েল ওয়াক ঘুরে বাড়ি যাই।

ওয়েল ওয়াক! নাম শুনে কিছুই বুঝলাম না। চুপচাপ ওর সঙ্গে চললাম, হ্যামস্টেড হাই স্ট্রিটের কাছেই ওয়েল ওয়াক।

হঠাৎ ডক্টর সরকার আমাকে প্রশ্ন করলেন, বিখ্যাত কবি কীটস্ এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?

হ্যাঁ।

উনি এখানে অনেক দিন ছিলেন।

আমি অবাক হয়ে চারদিক দেখি।

ডক্টর সরকার ডানদিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ওদিকে খানিকটা গেলেই ওয়েস্ট ওয়ার্থ প্লেস। ওর বাগানে বসেই কীটস্ তাঁর বিখ্যাত কবিতা ODE TO A NIGHTINGALE লিখেছিলেন।

তাই নাকি?

ডক্টর সরকার আপন মনে আবৃত্তি শুরু করেন,

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
or emptied some dull opiate to the drains
one minute past, and Le the-wards had sunk...

মনে পড়ে কবিতাটা?

মনে পড়ে তবে আপনার মতো মুখস্ত নেই।

আরেকটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে।

A thing of beauty is a joy for ever;
Its loveliness increases; it will never
Pass into no thingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and...

ওকে কবিতাটা শেষ করতে না দিয়েই বললাম, আমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা অত মুখস্থ করতে পারি না।

তোমরা যা পারো, তা আমরা পারি না।

আপনাকে দেখে মনে হয়, আপনি সবই পারেন।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুঃখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে...

রবীন্দ্রনাথও আপনার মুখস্ত?

ওই সমুদ্র কি পাড়ি দেওয়া সম্ভব? তবে মাঝে মাঝে ওই সমুদ্রে স্নান করি।

বাড়িতে ফিরে এসে ডক্টর সরকার এক বোতল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন নিয়ে বসলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি অফার করতে পারি?

আমি হেসে বললাম, প্রয়োজন নেই।

এবার উনি হেসে বললেন, এসব সময় সাহচর্য পেলে অনেক বেশি আনন্দ হয়।

আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।

নো, নো, নট দ্যাট...

আপনি ড্রিঙ্ক করুন। আমি গল্প করছি।

এটা হুইস্কি নয়, ফ্রেঞ্চ ওয়াইন। তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

আমার মতো বাঙালি মেয়ের কাছে দুইই সমান।

প্লিজ ডোন্ট সে দ্যাট। ফ্রেঞ্চ ওয়াইন হচ্ছে শরতের মেঘ ; কোনো গ্লানি নেই, মালিন্য নেই, অহঙ্কার নেই। কালিদাসের মেঘদূতের মতো সে স্বচ্ছ প্রবাহিনী। আর হুইস্কি হচ্ছে...

শ্রাবণধারা!

ইয়েস, ইয়েস। যেমন গর্জন, তেমন বর্ষণ!

ডক্টর সরকার বোতল থেকে অমৃতধারা দুটি গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, যখন বিদেশে এসেছ, তখন একটু আধটু অভ্যেস থাকা ভালো।

চিয়ার্স!

চিয়ার্স!

গেলাসে এক চুমুক দিয়েই উনি আমাকে বললেন, তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য তোমাকে ওয়াইন খেতে দিলাম না।...

না, না, ও কথা আপনি বলবেন না।

তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সর্বোপরি যুবতী। বেশি সহজ সরল হলে বোধহয় তোমার ক্ষতি হবে। তাই...

কিন্তু শুনেছি আমাদের দেশের চাইতে এসব দেশে আমার মতো মেয়ের পক্ষে একলা থাকা অনেক ভালো।

অনেক দিক থেকে ভালো হলেও কে যেন কোনো অসতর্ক মুহূর্তে তোমার ক্ষতি করবে, তা বলা মুশকিল।

আমি চুপ করে শুনি। ডক্টর সরকার একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, এখানে সবাই সম্পদ আর সম্ভোগের নেশায় মশগুল। এমন কি আমাদের দেশের মানুষও এখানে শুধু উপভোগ করতে চায়।

আমি এবারও কোনো কথা বলি না। উনি এক চুমুকে গেলাস খালি করে দিয়ে বললেন, দেখো মা, আজ তোমার বিদেশ বাসের প্রথম দিন। তোমাকে তাই সাবধান করে দিচ্ছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কাউকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করো না।

এবার আমি বললাম, আপনি তো আছেন। আমার অত ভয় কী?

না, না, আমাকেও বিশ্বাস করো না। আজ না হোক, ভবিষ্যতে যে আমি তোমার ক্ষতি করব না, তা কে বলতে পারে?

অসম্ভব!

আবার গেলাস ভর্তি করে নিয়ে ডক্টর সরকার রুক্ষভাবে বললেন, অসম্ভব!

আমি আবার জোর করে বললাম, একশোবার অসম্ভব।

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে ম্লান মুখে বললেন, না, না, অসম্ভব না। মানুষ যে কখন পশু হয়ে যায়, তা কেউ বলতে পারে না।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আমাকে দেখে কী খুব সাধু বলে মনে হয়?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সাধু বলে কেন মনে হবে? মনে হয়, আপনি একজন শিক্ষিত আদর্শবান মানুষ।

রাইট ইউ আর। সবাই তাই ভাবে, কিন্তু আমি তো জানি আমি কি রকম আদর্শবান।

তার মানে?

এককালে কত ছাত্রীকে যে উপভোগ করেছি...

সত্যি?

তোমাকে যখন মা বলে ডেকেছি, তখন তোমাকে মিথ্যা বলব না। তাইতো বলছিলাম, বাহির হইতে দেখো না এমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে।

আমি একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলাম, আমিও তো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি কিন্তু...

না, না, তারা নয়। যেসব ছাত্রীরা অধ্যাপনা করত বা আমার আন্ডারে রিসার্চ করত, তারা অনেকেই এই ব্যাচেলার অধ্যাপককে নিয়ে এমন মাতামাতি করত যে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না।

কী আশ্চর্য!

আবার আশ্চর্য হচ্ছ? এই পৃথিবীতে কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হবে না। আমরা যাদের বেশি ভালো মনে করি, তারা যে কত খারাপ, তা ভাবা যায় না ; আবার যাদের অত্যন্ত খারাপ ভাবি, তারা যে কত মহৎ হতে পারে, তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

আমার গেলাস তখনও খালি হয়নি। আমার গেলাসের দিকে নজর পড়তেই উনি প্রশ্ন করলেন, একি! এখনও শেষ করোনি? চটপট শেষ করে নাও।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

আরেক রাউন্ড নেবে তো।

না, না, আমি আর নেব না।

তাই কি হয় মা? বুড়ো ছেলের অনুরোধ মাকে শুনতে হয়।

আমার লন্ডনবাসের প্রথম সন্ধ্যায় ওই বুড়ো ছেলের অনুরোধে আমাকে গেলাসের পর গেলাস ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেতে হয়েছিল। উনিও খেয়েছিলেন। আর খেতে খেতে বলেছিলেন ওর নিজের কথা।

ডক্টর সরকার বাংলাদেশের এক বিখ্যাত জমিদার বাড়ির ছেলে। আজকের কথা নয়, প্রায় একশো বছর আগে ওদের জমিদারির আয় ছিল সাড়ে তিন লাখ টাকা। আর বড় জমিদার বাড়ির ছেলে হয়েও ডক্টর সরকারের বাবা জমিজমা বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। উনি পড়াশুনাই বেশি পছন্দ করতেন। অর্থের চিন্তা ছিল না বলে উনি কলকাতার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতেন এবং একে একে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে তিনটি এম. এ. পাশ করেন!

শুনেই আমি চমকে উঠি, বলেন কী?

ডক্টর সরকার একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন, বাবা সত্যি পড়াশুনা ভালোবাসেন। ওকে কোনোদিন তাস-পাশা খেলতে বা আড্ডা দিতে দেখিনি।

শুনেছি, কিছু কিছু জমিদার লেখাপড়া গানবাজনা নিয়েই জীবন কাটাতেন...

আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে উনি বললেন, আর কিছু কিছু জমিদার মদ-মেয়েছেলে

নিয়েই জীবন কাটাতেন।

হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছি।

আমার ঠাকুর্দা এই দ্বিতীয় ধরনের জমিদার ছিলেন।

আমি হাসি।

হাসছ? আমার ঠাকুর্দার ক'জন রক্ষিতা ছিল জানো? দশ-বারোজন।

আমি আবার হাসি। উনিও হাসতে হাসতে বলেন, ঠাকুর্দার দুজন রক্ষিতা আমাদের বাড়িতেই থাকতেন এবং আমার ছেলেবেলায় তাদের রাঙা ঠাকুমা আর গোলাপি ঠাকুমা বলে ডাকতাম।

আপনার আসল ঠাকুমা আপত্তি করতেন না?

না ; কারণ সব জমিদার বাড়িতেই এ সব অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল।

আপনার বাবার মধ্যে তো এসব দোষ ছিল না।

একেবারেই না।

ডক্টর সরকার একবার মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমার মা বিশেষ ভালো ছিলেন না।

তার মানে?

তিনিও তো জমিদার বাড়ির মেয়ে ছিলেন। তাই আত্মভোলা পণ্ডিত স্বামী পেয়ে তিনি সুখী হতে পারেননি। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আর এক ম্যানেজারবাবুর সঙ্গেই...

বলেন কি?

হ্যাঁ, মা, ঠিকই বলছি। তাছাড়া মা ড্রিঙ্ক না করে থাকতে পারতেন না।

এসব কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, আমাদের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়।

বিশ্বাস কর মা, আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না।

না, না, আমি তা বলছি না।

আমাকে দেখতে ঠিক আমার বাবার মতো। যদি খুঁজে পাই তাহলে তোমাকে একটা অ্যালবাম দেখাবো। দেখবে, আমার আর বাবার চেহারায় বিন্দুমাত্র অমিল নেই।

তাই নাকি?

উনি আমার প্রশ্ন না শুনেই বললেন, আমার অন্য দুই ভাইকে দেখলেই বোঝা যাবে, তারা আমার বাবার সন্তান নয়।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করি না, মন্তব্যও করি না।

এবার উনি হাসতে হাসতে বললেন, আমার চরিত্রের দশ আনা বাবার মতো আর ছ' আনা মায়ের মতো। লেখাপড়াও করেছি, জীবন উপভোগও করেছি।

বিয়ে করলেন না কেন?

ওই মায়ের সন্তান হয়ে বিয়ে করলেও কী সুখী হতে পারতাম?

বেশ কিছুক্ষণ কেউই কোনো কথা বললাম না। তারপর ডক্টর সরকারই বললেন, এয়ারপোর্টে তোমাকে দেখেই মা বলে কেন ডাকলাম, তা জানো?

কেন? বয়সে সন্তানতুল্যা বলে?

না। মনে হল তোমার মতো স্নিগ্ধ শান্ত একটা মেয়ে যদি আমার মা হতো, তাহলে বেশ হতো।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এবার যদি আমি বলি, বাহির হইতে দেখো না এমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে।

আমার কথা শুনে উনিও হাসলেন। বললেন, তা বলতে পারো। তবে তোমাকে দেখেই মনে হয়, তোমার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই, মালিন্য নেই।

যা দেখে মনে হয়, তাই কি ঠিক?

আমার মন বলছে, তুমি বড় পবিত্র। তাই তো তোমাকে মা বলে ডাকছি।

আমি মুখ নীচু করে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুতেই বলতে পারলাম না, আপনার সব ধারণা ভুল, সব মিথ্যা। আমি ভালো নই। আমি দিনের পর দিন মদ্য পান করেছি, অবিবাহিতা হয়েও রাতের পর রাত একজন পুরুষের কামনা-বাসনার আগুনে নিজেকে স্বেচ্ছায় আহুতি দিয়েছি।

ভাই রিপোর্টার, সত্যি কথা বলা যে এত কঠিন, তা এর আগে জানতাম না। এই পৃথিবীর সব মানুষ সব সময় নিজেকে মহৎ বলে প্রচার করতে চায় কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন যে জীবনের নিভৃততম গোপন কথা প্রাণপ্রিয় কাউকে বলতে চায়। তুমি আমার সেই প্রাণপ্রিয় ভাই ও বন্ধু। তাই না?

পরের দিন অনেক বেলায় দুজনের ঘুম ভাঙল। আমি আমার ঘর থেকে বেরুতেই ডক্টর সরকার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মা, নতুন দেশে নতুন ছেলের বাড়িতে এসে ঘুম হয়েছিল তো?

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই এমন মিষ্টি সম্বোধনে আমার মন প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হেসে বললাম, ছেলের বাড়িতে এসেও মার ঘুম হবে না?

ডক্টর সরকার দু' এক পা এগিয়ে এসে আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, চপটপ তৈরি হয়ে নাও। তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।

কোথায় যাবেন?

তোমাকে শহরটা দেখিয়ে দেব না?

আপনার কাজকর্মের ক্ষতি হবে না?

না, না, কিছু ক্ষতি হবে না।

ডক্টর সরকার হাতের ঘড়িটা দেখে বললেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরুতে পারলে আমরা বার্কিংহাম প্যালেসের চেঞ্জিং দ্য গার্ডস্ দেখতে পাব।

আমরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। বার্কিংহাম প্যালেসের সামনে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন সওয়া এগারোটা। চেঞ্জিং দ্য গার্ডস্ সাড়ে এগারোটায় কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ ভীড় হয়েছে। অধিকাংশই ট্যুরিস্ট। কিছু ইংরেজ তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন। ছেলেবেলা থেকে যে বার্কিংহাম প্যালেসের গল্প শুনেছি, পড়েছি, তার সামনে এসে বেশ লাগল, কিন্তু আরো ভালো লাগল চারপাশের মানুষ দেখে। হাসি খুশিতে প্রত্যেকটা মানুষ যেন আমাকে মুগ্ধ করল। এদের কেউই অসাধারণ নয়, সবাই সাধারণ মধ্যবিত্ত। অনেকে দেশে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা মানুষ দেখা তো দুর্লভ ব্যাপার। অনেকে হাসিঠাট্টা হৈ-হুল্লোড় করলেও তাদের মুখ দেখলেই মনে হয় ওরা সবাই ক্লান্ত, শ্রান্ত, বোধহয় পরাজিতও। চেঞ্জিং দ্য গার্ডস খুব ভালো লাগল কিন্তু আরো বেশি ভালো লাগল এতগুলি হাসিখুশি ভরা মানুষ দেখে।

ডক্টর সরকার বললেন, রাজপ্রাসাদ হিসেবে বার্কিংহাম প্যালেস খুব বেশি পুরনো নয়।

আমি বললাম, কিন্তু এই বার্কিংহাম প্যালেস সম্পর্কে এত শুনেছি ও পড়েছি যে মনে হয়, এটা অনেক পুরনো।

রাজপ্রাসাদ হিসেবে কুইন ভিক্টোরিয়াই এটা প্রথম ব্যবহার করেন ; তবে খুব নিয়মিত নয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সপ্তম এডওয়ার্ডই এটা প্রথম সব সময়ের জন্য ব্যবহার করেন।

আমাদের এখনকার রানি এলিজাবেথ দ্য সেকেন্ড তো এখানেই থাকেন?

হ্যাঁ, তবে রানি হবার পর তিন মাস পর্যন্ত উনি ক্লারেন্স হাউসে ছিলেন।

কনস্টিটিউশন হিল আর ওয়েলিংটন আর্চ ঘুরে গ্রীনপার্কের পাশ দিয়ে রিজ হোটেল আর ডিভনশায়ার হাউস দূরে রেখে আমরা ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের সামনে এলাম। ওখানে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলছিল বলে ভিতরে যাওয়া হল না। ডক্টর সরকার বললেন, প্যালেসগুলো বাদ দিলে লন্ডনে এত সুন্দর বাড়ি নেই।

এখানে কে থাকেন?

এখন এটা সরকারি অতিথিশালা। কখনও কখনও এখানে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয়।

ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের পাশেই সেন্ট জেম্‌স প্যালেস। ইতিহাসের পাতায় বার বার এর উল্লেখ।

এর পাশেই ক্লারেন্স হাউস।

ডক্টর সরকার বললেন, রানির মা কুইন এলিজাবেথ এখানেই থাকেন।

এবার উনি হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, এভাবে যদি তোমাকে লন্ডন দেখাই তাহলে কতদিন লাগবে জানো?

কত?

মোটামুটি দু-তিন বছর।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে আমার আর এ শহর দেখা হল না।

উনি খুব জোরের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কেন? তুমি কি এখানে বেশি দিন থাকবে না?

আমার অদৃষ্টে কি এত সুখ, এত ভালোবাসা সহ্য হবে?

ডক্টর সরকার হাসতে হাসতে আমার হাতটা ধরে বললেন, এ তো মায়ের মতো কথা হল না।

ওর কথায় আমার গাম্ভীর্য, আনমনা ভাব কোথায় ভেসে যায়। হাসি। বলি, না, আর বলব না।

এবার উনি বললেন, আজ আর ঘুরব না। কিছু খেয়ে-দেয়ে মার্বেল আর্চের ধারে বসে গল্প করি।

সত্যি বলছি ভাই রিপোর্টার, একজন বৃদ্ধ মানুষের সান্নিধ্য সাহচর্য হাসিঠাট্টা যে এত মধুর ও সুখের হতে পারে, তা আগে জানতাম না।

যৌবনে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের উপেক্ষা আর অনাদর করাই নিয়ম বলে জানতাম। আমাদের বয়সী একজন ছেলেমেয়েকেও কোনো বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখিনি। ওরা চৈত্রের ঝরাপাতার মতো উপেক্ষিত, কিন্তু এই বৃদ্ধ ডক্টর সরকারকে দেখে জানলাম পরিণত বয়সে পরিণত মনের সৌন্দর্য ও মনের মাধুর্য সত্যি অনন্য। ভোরের সূর্য আর অস্তগামী সূর্যের রূপই যুগ যুগ ধরে অজস্র সহস্র কোটি মানুষকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে। এই সূর্যের আলোতেই তো আমরা সবাই আলোকিত, আমাদের জীবন শক্তির প্রধান। তাই বোধহয় শৈশব আর বার্ধক্যের রূপ এত সুন্দর, এত মনোরম।

আজ হঠাৎ আমাকে জরুরী কাজে টরান্টো যেতে হচ্ছে। তাই বড্ড ব্যস্ত কিন্তু তবু তোমাকে চিঠি না লিখে পারলাম না।

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

শ্রদ্ধেয়া দিদি,

তোমার চিঠিগুলো পড়তে সত্যি খুব ভালো লাগছে। প্রথম যখন তুমি জানালে, চিঠি লিখে আমাকে তোমার বিচিত্র জীবন কাহিনি জানাবে, তখন বিশেষ উৎসাহবোধ করিনি। তোমার চিঠিগুলোর মধ্য দিয়ে শুধু তোমার বিচিত্র জীবন কাহিনিই জানতে পারছি না, জানতে পারছি মানুষের নানা রূপ। আরো কত কি।

তোমার প্রশংসা করার জন্য এ চিঠি লিখছি না। যে কালো মেয়েটা তোমাকে দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে আর তোমার ধারণা যার জন্য আমার সব কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, সেই মেয়েটা হঠাৎ একটা এরোগ্রাম এনে বলল, দিদিকে একটা চিঠি লেখ।

আমি বললাম, এই তো দু'তিন দিন আগে দুজনেই দিদিকে চিঠি দিলাম ; আজ আবার লিখব কেন?

ও হাসতে হাসতে বলল, খুব জরুরী দরকার।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, জরুরী দরকার?

ও হঠাৎ হাসতে হাসতে আমার মুখোমুখি বসেই বলল, আচ্ছা, তুমি তো স্বীকার কর রূপে-গুণে স্বভাব চরিত্রে দিদির কোনো তুলনা হয় না।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঠাট্টা করে বললাম, সুন্দরী, তুমি আমার জীবনে না এলে হয়তো তোমার এই দিদিকেই আমি...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও রাগে আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, এ ধরনের নোংরা কথা বললে আর কোনো দিন আমি তোমার কাছে আসব না।

দিদি, তুমি তো জানো, ওই কালো মেয়েটার বড় বেশি অভিমান। আর যখন অভিমান হয় তখন ওকে দেখতে আরও ভালো লাগে। আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর না করে পারি না। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

তারপর আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে চাপা গলায় বলল, আচ্ছা, দিদি তো এত কথা লিখছেন কিন্তু কোনোদিন কাউকে ভালোবেসেছেন কিনা তা তো লিখছেন না।

আমি তোমাকে সমর্থন করার জন্য বললাম, দিদি হয়তো কাউকে ভালোবাসেনি।

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, অসম্ভব।

অসম্ভব কেন?

তুমি পুরুষ। মেয়েদের মনের কথা তুমি বুঝবে না। সব মেয়েই চায় তাকে কেউ ভালোবাসুক, আদর করুক। কোনো একজন পুরুষের কাছে সে অনন্যা হতে চায়।

তুমি চাও?

ও একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, চাই না বলেই তো সমাজ সংসার উপেক্ষা করে নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিয়েছি।

তোমাকে যখন দিদি বলে ডাকি, শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তখন আমাদের প্রেম, ভালোবাসার বিশদ বিবরণ তোমাকে না জানানোই উচিত।

যাই হোক, সুন্দরী জানতে চায় তুমি কাকে ভালোবেসেছিলে? কেন তাকে বিয়ে করলে না? সবকিছু জানাবে ; তা নয়তো ওর মন ভরবে না আর আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পাগল করে তুলবে।

আমি ওকে বলেছিলাম, তুমিই দিদিকে লেখ।

ও বললে, না, আমি এসব কথা দিদিকে লিখতে পারব না। তুমিই লেখ।

দিদি, তুমি তো জানো, আমি ওর কথায় কুতব মিনারের ওপর থেকে লাফ দিতে পারি। তাই ওর কথা মতো এই চিঠি লিখছি। রাগ করো না।

আমাদের দুজনের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিও।

–তোমার রিপোর্টার ভাই

এগারো

তোমার এরোগ্রামের চিঠিটা পড়তে পড়তে শুধু হেসেছি। তোমার ওই কালো সুন্দরী মেয়েটাকে আমি দেখিনি কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ওকে তত বেশি ভালো লাগছে। বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়, আমার মনের একান্ত শুদ্ধ ও নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে অনুভব করি, ও সত্যি কত গভীর ভাবে তোমাকে ভালোবাসে আর আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমার শোবার ঘরে আর স্টাডিতে তোমাদের দুজনের দুটো বড় বড় ছবি আছে। আজ রবিবার। এই উইকএন্ডে কোথাও যাইনি। এই তিনখানা ঘরের অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যেই বন্দিনী আছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য নিঃসঙ্গ বোধ করিনি। রবিবার তোমাদের দুজনের পুরনো চিঠিগুলো পড়েছি আর তোমাদের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি। মাঝে মাঝে তোমাদের দুজনের ফটোটা বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি।

যাই হোক, তোমার সুন্দরীকে বোলো, সে ঠিক কথাই বলেছে। এই পৃথিবীর সব মেয়ের মনেই স্বপ্ন থাকে, কোনো না কোনো পুরুষ আদর ভালোবাসায় তার মন প্রাণ ভরিয়ে দেবে। আমারও সে স্বপ্ন ছিল। বোধহয় সে স্বপ্ন এখনও মরে যায়নি। এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, মনের মানুষকে কাছে পেলে নিজেকে বিলিয়ে দিতাম, ভাসিয়ে দিতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয় স্বপ্নভঙ্গের, বিশ্বাসঘাতকতার, পিছিয়ে আসি, নিজেকে গুটিয়ে নিই।

যে বয়সে অধিকাংশ মেয়ে স্বপ্ন দেখে, পৃথিবীকে রঙিন মনে করে, মনের মানুষ খুঁজে বেড়ায়, আমি তখন সত্যি স্বপ্ন দেখিনি। অবকাশ ছিল না। মার অসুস্থতা, বাবার মৃত্যু আমাকে এমনই বিব্রত করে তুলেছিল যে সমাজ সংসার পৃথিবী, সবকিছুই বিরূপ লেগেছিল। তারপর তো হঠাৎ একটা স্রোতের টানে ভেসে গেলাম। তখনও স্বপ্ন দেখার অবকাশ হয়নি। তারপর কিছুকাল নিজেই নিজেকে এমন ধিক্কার দিয়েছি যে জীবনের সূক্ষ্ম সুন্দর দিকগুলো মাথা উঁচু করতে পারেনি। লন্ডনে ডক্টর সরকারের স্নেহ ভালোবাসায় আবার আমি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলাম। যে সবুজ শ্যামল পৃথিবী হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে আবার ফিরে পেলাম।

লন্ডন আসার মাস খানেক পরের কথা। এই মাস খানেকের মধ্যে লন্ডনের প্রায় সব দ্রষ্টব্যই আমার দেখা হয়েছে। শহরটাকে মোটামুটি চিনে ফেলেছি। এখন আমি টটেনহাম কোর্ট রোড টিউব স্টেশনে এসে নর্দান লাইনের গাড়ি দেখলেই উঠি না ; দেখে নিই এজঅয়ার যাবে কি না। হ্যামস্টেডে থাকি বলে হ্যামস্টেড স্টেশনেই নামি না, গোল্ডার্স গ্রীনে নামি।

সেদিন কি একটা কাজে যেন বেরিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকতেই বুঝলাম, ডক্টর সরকার ফিরে এসে কারুর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি আমার ঘরে স্কার্ফ কোট জুতো খুলে তোয়ালে দিয়ে মুখটা একটু মুছে নেবার পর ওঁর ঘরে যেতেই উনি বললেন, এসো মা, আমার এক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আমি দু-এক পা এগোতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন ও বললেন, আমি সন্দীপন ব্যানার্জি।

আমি কবিতা চৌধুরী।

ভাই রিপোর্টার, তোমার সুন্দরীকে বলো, এই সন্দীপন ব্যানার্জিকে দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল, বড় আপনলোক। হঠাৎ মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে অনেকগুলো স্বপ্ন একসঙ্গে ভীড় করে আমাকে আনমনা করে দিয়েছিল।

সন্দীপন বলল, বসুন।

সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর সরকার বললেন, হ্যাঁ, মা, বস।

বুঝলাম, স্বপ্নের ঘোরে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই ওদের কথায় একটু লজ্জিতই হলাম। আমি ওদের দুজনের মুখোমুখি বড় ডিভানের এক পাশে বসতেই ডক্টর সরকার হাসতে হাসতে বললেন, জানো মা, সন্দীপনরা চার ভাই বোনই আমার স্টুডেন্ট।

তাই নাকি? কিন্তু আপনি তো শুধু এরই প্রশংসা করেছেন ; অন্য ভাই বোনদের কথা তো কিছু বলেননি।

সন্দীপন হাসতে হাসতে বলল, প্রশংসা করার মতো ছাত্র তো আমি নই। স্যারের অনেক ছাত্রছাত্রীই আমার চাইতে অনেক ব্রিলিয়ান্ট।

আমিও হাসি। বলি, সেসব খবর আমি জানি না ; তবে আমার এই বুড়ো ছেলে আমার কাছে দিনের পর দিন আপনার প্রশংসা করেছেন।

ডক্টর সরকার হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা দুজনেই প্রশংসার যোগ্য অ্যান্ড আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ টু।

দু-চার মিনিট আরো কথাবার্তা বলার পর আমি চা করতে গেলাম। হঠাৎ সন্দীপন প্যান্ট্রির সামনে এসে আমাকে বলল, শুধু চা খাওয়াবেন না ; আমার কিন্তু বেশ খিদে লেগেছে।

কি খাবেন? স্যান্ডউইচ?

আপত্তি নেই।

আর একটা কথা, আমি চা স্যান্ডউইচ খেয়েই চলে যাব না। একটু কাজে লন্ডন এসেছি। কয়েক দিন এখানে থাকব।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কে আপত্তি করছে? এ বাড়িতে আমার চাইতে আপনার দাবি অনেক বেশি।

ছিল ঠিকই কিন্তু আপনি এসে তো সব শেয়ার কিনে নিয়েছেন।

চা স্যান্ডউইচ নিয়ে ঘরে যেতেই ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, সন্দীপ যখনই ব্রিস্টল থেকে আসে তখনই আমার এখানে থাকে। এবারও কয়েক দিন থাকবে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, যিনি মায়ের বিরুদ্ধে ছেলের কাছে নালিশ করেন, তাকে থাকতে না দেওয়াই...

না, মা না, ও নালিশ করেনি।

সন্দীপন বলল, আমি এত বোকা না যে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করব।

তিনজনেই হেসে উঠলাম। হাসি থামলে ডক্টর সরকার বললেন, সন্দীপ, অনেক কাল তোমার হাতের মাংস রান্না খাই না!...

স্যার, আজই খাওয়াব।

একটু ভালো ওয়াইনও তো খাওয়াবে?

নিশ্চয়ই খাওয়াবো স্যার। এবার সন্দীপন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ, ডক্টর মিস্ চৌধুরী।

আমি আমার মনের ইচ্ছাটা ঠাট্টাচ্ছলে হাসতে হাসতে বললাম, আই উইল বি হ্যাপি উইথ ইওর কোম্প্যানি ওনলি!

সে-রাত্রে আমাদের বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। তিন চার রাউন্ড ড্রিঙ্ক করার পর বৃদ্ধ ডক্টর সরকার গাইলেন, 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—'

ডক্টর সরকারের গান শেষ হতে না হতেই সন্দীপন শুরু করল, 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি—'

আমি আর ডক্টর সরকার হো হো করে হেসে উঠি।

সে রাত্রে হাসি-ঠাট্টা গান থামতে থামতে একটা দেড়টা বেজে গেল। তারপর খেতে বসেও ঘণ্টা খানেক সময় কেটে গেল।

পরের দিন সকালে আমিই প্রথম উঠলাম। ওরা দুজনে তখনও ঘুমুচ্ছেন। আমি সন্দীপনের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ওকে দেখলাম। মনে হল, ওর পাশে বসে ওকে ডাকি, সন্দীপ, উঠবে না? নাকি বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখছ? মনে মনে আরো কত কি বলেছিলাম মনে নেই কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে সন্দীপন হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে তাকাতেই আমি লজ্জায় ভয়ে সঙ্কোচে পা নাড়াতে পারলাম না। পাথরের মূর্তির মতো ওখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বোধহয় মিনিট খানেক এভাবেই কেটে গেল।

সন্দীপন বলল, গুডমর্নিং!

গুডমর্নিং।

অনেক বেলা হয়েছে বলে ডাকতে এসেছেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। আপনাকে দেখছিলাম।

ও খুশির হাসি হেসে চোখ দুটো বড় করে বলল, আমি কি টাওয়ার অব লণ্ডন যে আমাকে দেখছিলেন?

দেখছিলাম, কাল রাত্রের আপনি আর এখনকার আপনার মধ্যে কত পার্থক্য।

তাই নাকি?

আমি শুধু মাথা নাড়লাম।

কি পার্থক্য দেখলেন?

এখন আপনাকে কত শান্ত, স্নিগ্ধ লাগছে।

আর কাল রাত্রে?

সে তো কালবৈশাখী!

সন্দীপন হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু ওই কালবৈশাখীর ঝড়েই সব ধুলো বালি মালিন্য উড়িয়ে নিয়ে যায়।

আর আমি কথা বাড়ালাম না। বললাম, উঠে পড়ুন। আমি চা করছি।

ডক্টর সরকার তখনও ঘুমুচ্ছিলেন। আমরা দুজনে চা খাচ্ছিলাম। চা খেতে খেতে আমি ওকে বললাম, এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। আমাকে একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দিন।

আপনি ইচ্ছে করলে তো আজই চাকরি পেতে পারেন।

ইচ্ছা তো করছে কিন্তু পাচ্ছি কই।

একটু চুপ করে থাকার পর সন্দীপন জিজ্ঞাসা করল, বাইরে যেতে আপত্তি আছে?

বাইরে মানে?

লন্ডনের বাইরে।

বিন্দুমাত্র না।

ডক্টর সরকার আপত্তি করবেন না তো?

উনি কেন আপত্তি করবেন? একটু থেমে আমি বললাম, তবে ওঁর পরামর্শ নেওয়া আমার কর্তব্য।

একশোবার।

পট থেকে আরো খানিকটা চা নিজের কাপে ঢালতে ঢালতে উনি বললেন—ঠিক আছে, আমিই স্যারের সঙ্গে কথা বলব।

সেদিন নয়, পরের দিন রাত্রে খাবার টেবিলে ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, মা, সন্দীপন তোমার জন্য একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা করেছে।

আমি একটু অবাক হবার ভান করে বললাম, তাই নাকি?

আমি দেখলাম, সন্দীপন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কিন্তু ডক্টর সরকার তা লক্ষ্য না করেই বললেন, হ্যাঁ ; তবে এখানে নয়, ওদের বিস্টলে।

এবার আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মতো আছে?

একশোবার। বুঝলে মা, জীবনে কোনো সুযোগই দু'বার আসে না।

আপনার মতো থাকলে নিশ্চয়ই যাব।

তবে মাঝে মাঝে উইক-এন্ডে এসো। তা নয়তো এই বুড়ো ছেলেকেই মায়ের কাছে ছুটতে হবে।

নিশ্চয়ই আসব।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা তিনজনে তিন ঘরে শুতে গেলাম। আমি, আমার ঘরে গিয়ে শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে নাইটি পরলাম। চুল ব্রাশ করছি, এমন সময় দেখি আমার ঘরের দরজার নীচে দিয়ে একটা খাম এগিয়ে আসছে। প্রথমে একটু অবাক হলেও পর মুহূর্তে বুঝলাম, নিশ্চয়ই সন্দীপন দিয়ে গেল। যা ভেবেছিলাম, তাই। খুলে দেখি ছোট্ট একটা কাগজে লেখা, 'কদিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বলতে চেষ্টা করছি কিছুতেই বলতে পারছি না।'

ছোট্ট কাগজখানা হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে হাসছিলাম আর ভাবছিলাম নানা কথা। তারপর ওই কাগজেরই উল্টো দিকে লিখলাম, 'সে কথা কী শুধু আমাকে বলতে হবে?'

দরজার নীচে দিয়ে কাগজখানা ওপাশে দিয়ে দেবার এক মিনিটের মধ্যেই জবাব এলো, 'হ্যাঁ, শুধু আপনাকেই সে কথা বলব!'

'ঠিক আছে, কাল বলবেন।'

পরের দিন সকালে সন্দীপন ব্রেকফাস্ট না খেয়েই বেরিয়ে গেল। খানিকটা পরে ব্রেকফাস্ট শেষ করেই ডক্টর সরকার বেরিয়ে গেলেন! তার ঘণ্টা খানেক পরেই সন্দীপন ফিরে এলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, প্রফেসর ব্রুকস-এর সঙ্গে দেখা হল?

হ্যাঁ। স্যার কখন ফিরবেন?

বিকেলের দিকে ফিরবেন।

কিন্তু...আমার কাজ হয়ে গেছে। তাই ভাবছিলাম, দুপুরেই চলে যাব।

ডক্টর সরকারের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কেমন করে?

যাব না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, না।

কাল চলে যাব?

এখানকার কাজ যখন হয়ে গেছে তখন আর শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন কেন?

সন্দীপন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, না, সব কাজ হয়নি ; একটা কাজ বাকি আছে।

সে কাজটা সেরে নিন।

আপনি অনুমতি দিচ্ছেন?

আমি অনুমতি দেব?

হ্যাঁ, সে কাজটা আপনার সঙ্গে।

বলুন, কী কাজ।

সন্দীপন কোনো কথা না বলে আমার দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিতেই আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেলাম। ও দুহাতে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

অনেক রাত হয়েছে। শুতে যাচ্ছি। পরের চিঠিতে বাকি ইতিহাস জানাব।

তুমি আর তোমার সুন্দরী আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

বারো

আমার কথা শুনলে তোমরা দুজনে হয়তো হাসবে, কিন্তু ভাই বিশ্বাস কর, সেদিন সন্দীপনের বুকের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন এই নির্মম রূঢ় পৃথিবী ছেড়ে আনন্দময় অমরাবতীতে চলে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, আমি লাল বেনারসী পরেছি, মাথায় ওড়না। সন্দীপন আমাকে তার জীবনবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু করে সাতপাক ঘুরছে। আমার গলায় মালা দিল। আমি পলকের জন্য বিমুগ্ধ মনে ওকে দেখলাম। সানাই শাঁখ আর উলুধ্বনিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে মাতাল করেছে আমাদের, চারপাশের মানুষকে। সন্দীপন একটু হাসল। দুটি স্বপ্নাতুর চোখ দিয়ে আমাকে ফিস ফিস করে বলল, কবিতা, আমার সর্বস্ব তোমাকে দিলাম।

ওই কয়েকটা অবিস্মরণীয় মুহূর্তের মধ্যেই আমি অনুভব করলাম, বাসর রাত্রির আনন্দ ফুলশয্যার উন্মাদনা। দ্বিধা, সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে আমি যেন আনন্দ-সমুদ্রে স্নান করলাম। মনে মনে কত কথা বললাম, কত কথা শুনলাম।

জানো কবিতা, তোমাকে প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম, ঈশান কোণের মেঘের মতো তুমি একদিন আমার সারা আকাশ ভরিয়ে দেবে।

আমিও জানতাম, এই দিগন্তবিহীন অনন্ত সমুদ্রে একদিন আমি নিজেকে তলিয়ে দেব।

আর কি জানতে?

জানতাম, সেই সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে সব ধনরত্ন তুলে নিয়ে আমার শূন্য মন পূর্ণ করব।

স্বপ্ন দেখলাম আরো অনেক কিছু। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবিত সম্ভাবনায় আমি মাঝে মাঝে সব যন্ত্রণা ভুলে যাচ্ছি। আবার যন্ত্রণার বেগ বাড়তেই আমি চিৎকার করে বললাম, সন্দীপন, আমাকে একটু জড়িয়ে ধর, আমাকে একটু আদর কর। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

নিদারুণ দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ দেখেই ভেবেছিলাম, এই

তাপক্লিষ্ট পৃথিবীতে এবার সবুজের মেলা বসবে।

হঠাৎ সন্দীপন দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলল, কবে ব্রিস্টল আসছ?

আমি কপট গাম্ভীর্য আনলেও চোখে-মুখে আমার মনের আনন্দের সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল। বললাম, সত্যি আসব?

ও আমার কানে কানে বলল, না।

তাহলে কালই আসছি।

দুজনেই প্রাণভরে হেসে উঠলাম।

ভাই রিপোর্টার, তুমি তোমার সুন্দরীকে বোলো, সেদিন আনন্দে আর চাপা উত্তেজনায় আমি যেন চঞ্চলা ষোড়শী হয়ে গিয়েছিলাম। সন্দীপনের স্পর্শে, ওই কয়েক মুহূর্তের নিবিড় সান্নিধ্যে আমি মৃগনাভী হরিণীর মতো পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আমার জীবনে এমন আনন্দময় দিন আর আসেনি। এমন পরিপূর্ণ দিনও আমার জীবনে আর আসেনি।

অনেক বেলায় দুজনে খেতে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এতকাল বিয়ে করনি কেন?

সন্দীপন নির্বিবাদে উত্তর দিল, তোমার সর্বনাশ করব বলে।

আমি বুকে ভরে নিশ্বাস নিয়ে বললাম, ঠিক বলেছ। আমিও বোধহয় তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

বিকেলবেলায় ডক্টর সরকার ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই সন্দীপন চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, ব্রিস্টলে আসুন। কোনো অসুবিধে হবে না। তবে আসার আগে একটা টেলিফোন করবেন।

সন্দীপন চলে যাবার সময় আমার মন এমনই খারাপ হয়েছিল যে আমি বিশেষ কোনো কথা বলতে পারলাম না। ও আমার মনের অবস্থা বুঝেছিল বলেই ডক্টর সরকারকে প্রণাম করেই হ্যান্ডসেক করার জন্য আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম। ও আমার হাতটা শুধু একটু টিপে দিল।

সন্দীপনের অভাব এত বেশি অনুভব করছিলাম যে রাত্রে খাবার সময় ডক্টর সরকারকে বলেই ফেললাম, আজ হঠাৎ বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

ঠিক বলেছ মা। ও যখনই চলে যায় তখনই আমার মন খারাপ হয়!

হ্যাঁ, ক'দিন বেশ জমিয়ে রেখেছিলেন।

ও সত্যি বড় আমুদে ছেলে।

ডক্টর সরকার একটু হেসে বললে, সন্দীপন শুধু আমার ছাত্র নয়, বাট এ ফ্রেন্ড অ্যাজ ওয়েল।

আমি হেসে বললাম, আমিও তাই দেখলাম। একটু থেমে, একটু পরে বললাম, ওদের সব ভাইবোনই বুঝি আপনার ছাত্র?

ওরা সাত ভাইবোন। তার মধ্যে তিন বোন আর সন্দীপনই আমার স্টুডেন্ট। ডক্টর সরকার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, সন্দীপনের বড়দি আমার খুবই প্রিয় ছাত্রী ছিল।

আমি ইঙ্গিতটা বুঝলেও গম্ভীর হয়ে বললাম, তাই নাকি?

উনি একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সি ইজ এ ডেঞ্জারাস গার্ল!

ডেঞ্জারাস মানে?

যে রকম সর্বনাশা সুন্দরী, সেই রকম বুদ্ধিমতী; অ্যান্ড সি ইজ এ ভেরি ফাস্ট গার্ল!

এবার আর আমি হাসি চেপে রাখতে পারি না। হেসে বলি, তাই নাকি?

হ্যাঁ মা। কয়েকটা বছর ওকে নিয়ে খুবই আনন্দে কাটিয়েছি।

উনি কি সন্দীপনবাবুর চাইতে অনেক বড়?

হ্যাঁ, অনেক বড়। সি মাস্ট বি অ্যাবাউট ফিফটি-ফাইভ বাই নাউ।

উনি এখন কোথায় আছেন?

কলকাতায়।

আপনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে?

ডক্টর সরকার হেসে বললেন, এখনও মাসে একখানা প্রেমপত্র লেখে।

আপনি লেখেন?

লিখি বৈকি।

দেখাশুনো?

কলকাতায় গেলেই দেখা হয়। উনি একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, এখনও ওর রূপ দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।

বিয়ে করেছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, বিয়ে করেছে। বেশ সুখেই ঘর-সংসার করছে।

সন্দীপনবাবুর অন্যান্য ভাইবোনেরা...

ওদের বাড়িটা যেন অভিশাপগ্রস্ত। সন্দীপনের বড়দা ক্যান্সারে ভুগে ভুগে মারা গেলেন এই বছর তিনেক আগে। মেজদা মারা গিয়েছেন মোটর অ্যাকসিডেন্টে। এছাড়া তিনটি বোন বিধবা।

ইস!

এইসব কারণেই তো সন্দীপন বিয়ে করল না।

এরপরই হঠাৎ ডক্টর সরকার বললেন, ও যদি বিয়ে করতে রাজি হয়, তাহলে আমি ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব।

আমি হাসি।

না, মা, হাসির কথা নয়! তোমার মতো সন্দীপনও বড় নিঃসঙ্গ। তাছাড়া ছেলেমেয়ে হিসেবে তোমাদের দুজনেরই তুলনা হয় না।

আমি চুপ করে বসে থাকি। কোনো কথা বলি না।

উনিই আবার বললেন, ব্রিস্টলে তোমার সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে যদি ওর মতের পরিবর্তন হয়, তাহলে তুমি মা ওকে বিয়ে করো। আমি বলছি, তোমরা নিশ্চয়ই সুখী হবে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকার পর ডক্টর সরকার বললেন, দেখ মা, এই পৃথিবীর সমাজ-সংসার এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে একা থাকা বড় কঠিন। আমার কথাই ধর। আই হ্যাড প্লেন্টি অব সেক্স কিন্তু কোনো নারীর সান্নিধ্য, সাহচর্য আর ভালোবাসা পেলাম না। আমি একটা ক্যাক্টাস হয়েই রইলাম।

ডক্টর সরকারের কথাগুলো শুনে আমার মনের মধ্যে স্বপ্নের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না। মাথা নীচু করে বসে রইলাম। তবে মনে মনে অনেক কথা বললাম। বললাম, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনি যা ভেবেছেন, যে স্বপ্ন দেখছেন, আমরাও তাই ভেবেছি। আর বললাম, সন্দীপন দুহাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নেবার অনেক আগেই আমি মনে মনে উপলব্ধি করেছিলাম, সন্দীপনই আমার জীবন দেবতা।

ডক্টর সরকার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কবে ব্রিস্টল যেতে চাও?

ভাবছি, সপ্তাহখানেক পরে যাব।

প্রত্যেক শুক্রবার বিকেলে আসবে তো?

আসব।

হ্যাঁ এসো। আবার সোমবার সকালে ফিরে যেও। সঙ্গে সন্দীপনকে আনতে পারলে আরো ভালো হয়।

আমি হাসি।

ডক্টর সরকার একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, না, না, মা, হাসিরা কথা নয়। আমার গর্ভধারিণীর চরিত্র ভালো ছিল না বলে আমি সারাজীবন মেয়েদের শুধু উপভোগের সামগ্রী ভেবেছি, কিন্তু হেরে গেলাম শুরু তোমার কাছে।

ওঁর দুটো চোখ ছলছল করে উঠল। গলার স্বরও ভারি হয়ে গেল। বললেন, মা পেয়েছিলাম কিন্তু মাতৃস্নেহ পাইনি ; নারী পেয়েছি কিন্তু নারীর ভালোবাসা পাইনি। এখন এই বুড়ো বয়সে সেই মাতৃস্নেহ আর ভালোবাসা পাবার জন্য বড় লোভ হয়েছে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে ওঁর পাশে দাঁড়ালাম। দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে ওঁর মাথার ওপর থুতনি রেখে বললাম, এখন তো মা পেয়েছেন ; আবার দুঃখ কিসের?

নিশ্চয়ই পেয়েছি, কিন্তু তুমি তো চলে যাচ্ছ।

আপনি বারণ করলে যাব না।

না, মা, তা হয় না।

এবার আমি ওঁর হাত ধরে বললাম, চলুন, আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ডক্টর সরকার শুয়ে পড়েন। আমি ওঁর পাশে মাথায় হাত দিই। ছোট্ট অসহায় শিশুর মতো উনি আমার কোলের ওপর হাত রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন। তবু আমি উঠতে পারি না। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কতক্ষণ ওইভাবে বসেছিলাম, জানি না। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই উঠে গেলাম।

হ্যালো!

আমি সন্দীপন।

আমি হেসে বললাম, এত রাত্রে টেলিফোনের বেল শুনেই বুঝেছি, ডক্টর সরকারের পাগল ছাত্রের টেলিফোন।

আমি পাগল?

পাগল না হলে আমাকে পাগল করতে পারো?

যাক, শুনে খুশি হলাম।

খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

হাফ বট্‌ল হুইস্কি শেষ করেছি।

হুইস্কি খেলেই পেট ভরবে?

এতদিন ভরতো, কিন্তু আজ ভরলো না।

কেন?

আজ মনে হচ্ছে, বোধহয় হুইস্কির বোতলে জল ছিল।

তার মানে?

রোজ নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না।

এভাবে ড্রিঙ্ক করলে আমি আসছি না।

তুমি এলে আমি আর এত ড্রিঙ্ক করব না।

ঠিক বলছ?

কবিতা, যেদিন দেখবে আমি তোমাকে একটা মিথ্যে কথা বলছি, সেদিনই তুমি চলে যেও। আমি বাধা দেব না।

তুমিও মিথ্যে বলবে না, আমিও চলে আসব না।

এবার সন্দীপন জিজ্ঞাসা করল, স্যার কি ঘুমোচ্ছেন?

একটু আগেই ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

তুমি কি নাইটি পরেছ?

আমি হাসি। বললাম, কেন?

তোমার ওই লাল নাইটি দেখলে...সন্দীপন কথাটা শেষ করল না।

আমি জানতে চাইলাম, আমার নাইটি দেখলে কি হয়?

ফুলশয্যার দিন বলব।

আমি হাসতে হাসতে বলি, এতদিন অপেক্ষা করতে হবে? তার আগে...

এতদিন অপেক্ষা করতে না চাইলে আগেই ফুলশয্যা হবে। তারপর সময় মতো বিয়ে-টিয়ে করা যাবে।

এবার তুমি মার খাবে।

সন্দীপন আর বিশেষ কিছু বলল না। শুধু বলল, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়। গুড নাইট।

পরের ক'টা দিন আমি যেন সন্দীপনের স্বপ্নের বিভোর হয়েই রইলাম। সব সময় শুধু ওর কথা ভাবি ; প্রতি মুহূর্তে ওকে চোখের সামনে দেখি। ডক্টর সরকার বাড়িতে না থাকলে আমি মনে মনে ওর সঙ্গে কথাও বলি।

সন্দীপন, উঠবে না? লক্ষ্মীটি উঠে পড়। অনেক বেলা হয়ে গেছে। আর ঘুমোতে হবে না।...কি? উঠবে না? বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।...আঃ। ধরো না। আমি সত্যি যাচ্ছি। আমার অনেক কাজ আছে।

ওইসব স্বপ্ন দেখি আর আমি আপন মনেই হাসি। ভাবি, আমি কি পাগল হলাম? না, না, পাগল হব কেন? যাকে ভালোবাসি তাকে স্বপ্ন দেখব না? নিশ্চয়ই দেখব, একশোবার দেখব।

ভাই রিপোর্টার, ভালোবাসা বহু ব্যবহৃত শব্দ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ভালোবাসার ছড়াছড়ি। শুনি, সব ছেলেমেয়েরাই প্রেমে পড়ে। কিন্তু সত্যি কি সবাই ভালোবাসতে পারে? সবাই কি প্রেমে পড়তে পারে? বোধহয় না। দেহে যখন বিপ্লব আসে, তখন স্বপ্ন দেখবেই। তখন সমস্ত পৃথিবীতেই রামধনুর রঙ দেখা যায় কিন্তু ভালোবাসা তো স্বপ্ন নয়। পৃথিবীকে রঙিন দেখার জন্যই তো প্রেম নয়। ভালোবাসা মানুষকে দেবতা করে ; প্রেম আনে অমরত্ব। তাই তো আমরা শ্রীকান্তকে ভুলতে পারি না, রাজলক্ষ্মীকে সবাই ভালোবাসি। যে ভালোবাসা নারী-পুরুষকে শুধু বিয়ের বন্ধনে বাঁধে, শুধু উপভোগের অধিকার দেয়, সে ভালোবাসায় প্রেম নেই এবং সেইজন্যই আমাদের ঘরে ঘরে এত অশান্তি, এত সংঘাত, এত দ্বন্দ্ব।

তুমি বিশ্বাস কর, আমি শুধু কামনা-বাসনা লালসার তৃষ্ণা মেটাবার জন্য সন্দীপনকে ভালোবাসিনি। যে কোনো পুরুষকে দিয়েই এ তৃষ্ণা মেটানো যায় কিন্তু যে কোনো পুরুষকে কি ভালোবাসা যায়? না, তা সম্ভব নয়। আমি আমার সমস্ত-অনুভূতি দিয়ে সন্দীপনকে নিজের মধ্যে বরণ করেছিলাম, চেয়েছিলাম সমস্ত সত্ত্বা বিলীন করে ওর মধ্যে মিশে যেতে।

দিন দুই পরের কথা। আমি ব্রিস্টল যাবার জন্য কেনাকাটা করতে অক্সফোর্ড সার্কাসের দিকে গিয়েছিলাম। বৃষ্টির জন্য ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকে ডক্টর সরকারের মুখ দেখেই ঘাবড়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে আপনার? এভাবে মুখ কালো করে বসে কেন?

উনি মুখ নীচু করে বললেন, মনটা বড় খারাপ।

কেন? কি হয়েছে?

সন্দীপন টেলিফোন করে একটা দুঃসংবাদ জানালো।

আমি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি দুঃসংবাদ জানালো?

ওর সব চাইতে ছোট বোনটি বিধবা হয়েছে।

ইস!

আমাকে আর প্রশ্ন করতে হয় না। ডক্টর সরকার নিজেই বললেন, এই ছোটবোনকে সন্দীপন কি অসম্ভব ভালোবাসত তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাবা-মা মারা যাবার পর সন্দীপনই ওর বাবা-মা ছিল। বাড়িতে তিন-চারটে ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও সন্দীপন ওকে নিজের হাতে চান করাতো, খাওয়াতো। ছোট বোন পাশে না শুলে সন্দীপন ঘুমুতে পারত না।

আমি বোবার মতো দাঁড়িয়ে চোখের সামনে যেন ওইসব দৃশ্য দেখছি।

ডক্টর সরকার থামেন না। বলে যান, বিলেত আসার বছর খানেক আগে সন্দীপনই ওর বিয়ে দিল, কিন্তু বিধাতা পুরুষ ওর স্বপ্ন চুরমার করে দিলেন।

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কখন খবর পেলেন? তুমি বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেলিফোন এলো।

উনি কি বললেন?

শুধু সর্বনাশা সংবাদটা জানিয়েই টেলিফোন রেখে দিল।

আর কিছু বললেন না?

না। বলার মতো অবস্থা ওর ছিল না। একটু থেমে ডক্টর সরকার বললেন, আমি অনেকবার ওকে ফোন করলাম কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না।

আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডক্টর সরকার বললেন, নিশ্চয়ই বেঢপ মাতাল হয়ে পাগলের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কথাটা শুনেই আমার সমস্ত বুকটা জ্বলে-পুড়ে গেল। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চাইলাম, ছুটে গিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি, চোখের জল মুছিয়ে দিই, কিন্তু না ভাই, সে সুযোগ এলো না। কোনোদিনও আসবে না।

রাত্রে আমরা দুইজনেই আরো অনেকবার সন্দীপনকে ফোন করলাম কিন্তু ওকে পেলাম না। অনেক রাত্রে শুতে যাবার আগে ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, একটু সজাগ থেকো। ও হয়তো পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে এখানে এসে হাজির হতে পারে।

সন্দীপনের প্রতীক্ষায় সারা রাত জেগেই রইলাম, কিন্তু না, সে এলো না। একেবারে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ ডক্টর সরকারের চিৎকার শুনেই পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলাম। ওঁর কাছে ছুটে যেতেই উনি আমাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মা, আমার সন্দীপন নেই!

ডক্টর সরকারের আশঙ্কাই ঠিক হল। সন্দীপন বেঢপ মাতাল হয়ে পাগলের মতো গাড়ি নিয়ে ঘুরছিল সারা শহর। শেষ রাত্তিরের দিকে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট করে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

ভাই রিপোর্টার, শুনলে আমার প্রেমের কাহিনি? কেমন লাগল? এ সংসারে কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা ধুলো হাতে নিলে সোনা হয় ; আবার কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের ছোঁয়ায় সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আমার এই সুন্দর দেহটার মধ্যে একটা অভিশপ্ত আত্মা লুকিয়ে আছে। তাই তো আমার দ্বারা এ পৃথিবীর কোনো মানুষের কোনো কল্যাণ হবে না, হতে পারে না। অসম্ভব।

তোমার সুন্দরীকে বোলো, পরবর্তীকালে আমার এই দেহটা অনেক পুরুষ উপভোগ করেছে। যাদের এ দেহ দিয়েছি, তাদের সবাইকে আমি ঘেন্না করি কিন্তু শুধু সন্দীপনের ওপর অভিমান করে এ দেহ তাদের বিলিয়ে দিয়েছি। পরে কেঁদেছি। অবোধ শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদেছি। হাত জোড় করে হাজার বার সন্দীপনের কাছে ক্ষমা চেয়েছি।

সন্দীপন মারা গেছে কিন্তু হারিয়ে যায়নি। তাকে আমি সযত্নে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। সেখান থেকেও কি সে পালিয়ে যাবে? না, তাকে আমি কোথাও যেতে দেব না। সে চিরদিনের, চিরকালের জন্য শুধু আমার।

আর লিখতে পারছি না। আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো। দোহাই তোমাদের, আর কোনোদিন আমার সন্দীপনের কথা জানতে চেও না!

আমার প্রাণভরা বুকভরা ভালোবাসা নিও।

তেরো

প্রিয়বরেষু ভাই রিপোর্টার,

সন্দীপনকে হারাবার পর হঠাৎ পৃথিবীটা বদলে গেল। শুধু আমার নয়, ডক্টর সরকারেরও। দুজনেই ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতাম ; একেবারেই বেরুতাম না। সারাদিন দুজনের কেউই কথা বলি না। খাবার টেবিলেও দুজনে মুখ নীচু করে খেয়েই উঠে পড়ি। শুধু তাই নয়, শোকে দুঃখে কেউই কারুর দিকে তাকাতে সাহস করি না। দুজনে দুজনের ঘরে চুপচাপ বসে থাকি ; হয়তো শুয়ে পড়ি, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। চোখের পাতা ভারি হয়ে এলেই চমকে উঠি। ওই সামান্য ক'টা দিনের সুখস্মৃতি যক্ষের ধনের মতো বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। বার বার সে স্মৃতি রোমন্থন করি।

কত রাত পর্যন্ত জেগে থাকি, তা বুঝতে পারি না, কিন্তু যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণই বুঝতে পারি ডক্টর সরকারও ঘুমোননি। মাঝে মাঝেই ওঁর পায়চারি করার শব্দ শুনতে পাই। যে ডক্টর সরকার প্রতি সন্ধেয় মদের বোতল নিয়ে বসতেন, সেই মানুষটা হঠাৎ মদ স্পর্শ করাও ছেড়ে দিলেন। তারপর দিন দশেক পরে উনি কিছু না বলেই সন্ধের সময় বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন মাঝ রাত্তিরের পর পাঁড় মাতাল হয়ে। আমি তো অবাক্। আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না। আপন মনে এলোমেলো করে গাইছেন, 'কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে

রে...।'

ওঁকে যত দেখি, আমার মন তত খারাপ হয়। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু জোরে কাঁদতে পারি না। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি। কাঁদেন ডক্টর সরকারও। তিনি আমারই মতো চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন।

এর দিন দশেক পরে ডিনার খেতে খেতে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, একটা কথা বলবে? তোমার আর সন্দীপনের বিয়ের তারিখ কী ঠিক হয়েছিল?

আমি লুকোবার চেষ্টা না করে বললাম, না, বিয়ের কোনো কথা হয়নি, তবে আমরা দুজনেই জানতাম, আমরা বিয়ে করব।

অনেকক্ষণ উনি কোনো কথা বললেন না। তারপর আপন মনে একটু হেসে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই এর আগে কাউকে ভালোবাসনি?

না।

উনি খুব জোর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, লোকে বলে প্রথম ভালোবাসা কখনও সাকসেসফুল হয় না। কথাটা বোধহয় ঠিকই। তারপর উনি মুখ নীচু করে বললেন, আমি তো সেই জ্বালাতেই সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরছি। তুমিও এ জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে না।

এ কথার কী জবাব দেব—আমি চুপ করে বসে থাকি।

ডক্টর সরকার একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, জানো মা, ফার্স্ট লাভ সাকসেসফুল না হবার জন্যই আমি এত খারাপ হয়ে গেলাম। সহজ ভাবে মানুষের জীবন না এগুতে পারলেই পারভার্টেড হয়।

এইভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে মাসখানেক পার হল। ডক্টর সরকার পুরোদমে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। আমিও বাড়ির মধ্যে আর নিজেকে বন্দিনী রাখতে পারি না ; বেরিয়ে পড়ি।

সেদিনও বেরিয়েছিলাম। একদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লাম। বইপত্তর ওলটাতেই সারাটা দিন কেটে গেল। ঠিক বেরুবার মুখে একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন কী? আপনার নামই কী কবিতা?...

হ্যাঁ।

আমি তন্ময় মুখার্জি।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করতেই উনি বললেন, আমিও আপনার কনটেম্পোরারি—তবে ইতিহাসের ছাত্র। তিনমাস হল এসেছি।

রিসার্চ করছেন?

রিসার্চ না, একটা পেপার লিখব বলে কাজ করছি। এটা শেষ করেই আমি স্টেট্স এ চলে যাব।

কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে পড়লাম। এলোপাথাড়ি ঘুরতে ঘুরতে স্ট্র্যান্ড-এ চলে এলাম। টেমস-এর পাড় দিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর দুজনেই বেঞ্চে বসলাম।

তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে কী করছেন?

কিছু করছি না। ভাবছি একটা চাকরি-বাকরি করব।

কোথায়? কোনো ইউনিভার্সিটিতে...

না, না, কোনো ইউনির্ভাসিটিতে নয়। কোনো অফিস-টফিসে...

আপনার কী মাথা খারাপ?

কেন?

আপনি অফিসে চাকরি করবেন?

হ্যাঁ। আমি একটু হেসে বললাম, কোনো মতে দিনটা কেটে গেলেই আমি খুশি।

তন্ময় কি যেন ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কাল আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

কেন জানি না আমি বললাম, হ্যাঁ হবে!

পরের দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই বাড়ি ফিরে এলাম।

চৌদ্দ

পরের দিন ঠিক সময় চারিং ক্রশ-এ কালেক্টস পেঙ্গুইন বুকশপে একটু ঘোরাঘুরি করতেই তন্ময়ের দেখা পেলাম। ও বেশ কয়েকটা বই কিনেছিল। তাছাড়া একটা বড় ও ভারী ব্রীফ কেস তো ছিলই। দোকান থেকে বেরুবার সময়ই ওকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হল। ভাবছিলাম, বইগুলো আমিই নেব কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই তন্ময় বলল, কবিতা, বইগুলো ধরবে?

হঠাৎ ও আমার নাম ধরে কথা বলতেই আমি একটু বিস্মিত হলাম কিন্তু তা প্রকাশ না করে বললাম, নিশ্চয়ই।

বইগুলো আমার হাতে তুলে দিয়েই ও রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বলল, বড্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি।

আমি কিছু বলার আগেই তন্ময় আবার বলল, এ দেশে লেখা-পড়া কাজকর্মের অনেক সুযোগ, কিন্তু বড্ড পরিশ্রম করতে হয়।

এবার আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমার এখনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়নি, কিন্তু দেখে শুনে তাই মনে হয়।

তন্ময় বলল, আমাদের কলকাতার অধ্যাপকরা নোটস্ লিখিয়ে লিখিয়ে এমন অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে যে বিদেশে পড়াশুনা করতে এসে বড় কষ্ট হয়।

আমি বললাম, হতে পারে, কিন্তু আমরা তো মনে করি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার চাইতে আনন্দ আর নেই।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমার মতো বান্ধবী থাকলে নিশ্চয়ই আনন্দের।

তার মানে?

তন্ময় হাসে! বলে, তুমি তো জানো না তোমাকে নিয়ে আমাদের কত আলোচনা, কত গবেষণা হতো।

আমি বিস্ময়ের হাসি হেসে প্রশ্ন করি, আমাকে নিয়ে গবেষণা?

হ্যাঁ, গবেষণা।

আমি আপনার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ও বলল, তুমি আমাকে আপনি আপনি বলছ কেন? হাজার হোক এটা লন্ডন; তার ওপর আমরা সমসাময়িক।

অভ্যাস।

চেঞ্জ দ্যাট হ্যাবিট।

আই উইল ট্রাই।

ট্রাই ফ্রম নাউ অন।

আমি আর কিছু বলি না। শুধু হাসি।

কথা বলতে বলতে আমরা বাস স্টপে এসেছি। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়েছি। তারপর বাসে উঠেছি। বাসে পাশাপাশি বসে কথা হচ্ছে।

তন্ময় বলল, সত্যি বলছি, এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন আমরা তোমাকে নিয়ে আলোচনা করিনি।

ওর কথা শুনে আমার মজা লাগে। জিজ্ঞাসা করি, এত আলোচনা কী ছিল?

তোমার মতো সুন্দরী ও বিদুষী মেয়েকে নিয়ে...

আমি সুন্দরী? আমি বিদুষী?

তন্ময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সত্যি সুন্দরী।

আমি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম।

তন্ময় আবার বলল, কাল তোমাকে দেখে আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, কোনো রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে তোমাকে নিয়ে অচিন দেশে চলে গেছে।

আমি হেসে বললাম, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা না করে বাংলার গল্প উপন্যাস লিখলেও আপনার ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

আপনি নয়, তুমি!

আমি হাসতে হাসতেই বললাম, তুমি।

ধন্যবাদ!

যাই বল ভাই রিপোর্টার, ছাত্রজীবনের শেষে কলেজ ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো লাগে। সব মানুষের কাছেই ছাত্র জীবনের স্মৃতি বড় সুখের, বড় আনন্দের। তন্ময়ের সঙ্গে আমি একই ক্লাসে পড়িনি ; কিন্তু সমসাময়িক তো। তাই বিবর্ণ বিষণ্ণ জীবনের এক শূন্য মুহূর্তে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সত্যি ভালো লাগল। কিছু দিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই এত ভালো লাগত না। কিন্তু কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো মহাশূন্যে তিল তিল করে জ্বলে পুড়ে ঘুরে বেড়াবার সময় ওর দেখা পাওয়ায় আমি পরম আর্শীবাদ বলে মনে করলাম। তুমি আমার মনের অবস্থা উপলব্ধি করবে কিনা জানি না ; তবে ভাঙাচোরা নোনা ধরা বাড়িকে মেরামত করে কালার-ওয়াশ করলে যেমন ভালো লাগে, সুন্দর মনে হয়, আমিও সেই রকম বদলে গেলাম।

দেখ কবিতা, মানুষ হলেই দুঃখ পেতে হবে। এর থেকে কারুর মুক্তি নেই।

তা ঠিক, কিন্তু...

এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই। সব দুঃখকে হয়তো মানুষ ভুলতে পারে না কিন্তু তাকে জয় না করলে তো আমরা কেউ বাঁচব না।

আমি মুখ নীচু করে বলি, সবাই কী দুঃখ জয় করতে পারে?

হ্যাঁ, সবাই পারে ; কেউ দু'দিনে, কেউ দু' বছরে। স্বামী হারাবার পর, সন্তান হারাবার পর, বাবা-মা হারাবার পর ক'টা মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়?

আমি উত্তর দিতে পারি না। তন্ময় একটু হাসে। তারপর আবার বলে, তুমি তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে বুড়ি বিধাবারা যত বেশি দুঃখ পেয়েছে তারা সংসারের প্রতি তত বেশি আসক্ত,

তারা তত বেশি অত্যাচারী কিন্তু এত দুঃখ পাবার পর তো তাদের সন্ন্যাসিনী হওয়া উচিত ছিল।

তন্ময় ওপাশ থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসে। আলতো করে কাঁধে হাত রাখে। তারপর বলে, এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখবে দারুণ গ্রীষ্মের পরই বর্ষা ; আবার পচা ভাদ্দরের পরই শরতের আনন্দ।

তন্ময়ের কথায় বড় যাদু। ওর স্পর্শে সারা শরীরে কি যেন একটা উন্মাদনা আনে। আমি তর্ক করতে পারি না, প্রতিবাদ করতে পারি না। ও আর একটু নিবিড় হয়। আমি বাধা দিতে পারি না। ওর হুইস্কীর গেলাসটা আমার ঠোঁটের সামনে ধরে, আমি চুমুক দিই।

ঠিক মনে নেই ; তবে বোধহয় পুরো গেলাসটাই আমি শেষ করেছিলাম। সেই কলকাতায় কাকাবাবুর কাছে একটা হুইস্কী খাবার পর এই প্রথম হুইস্কী খেয়ে বেশ লাগল। আর ভালো লাগল ওর আলিঙ্গন, নিবিড় আলিঙ্গন আর চুম্বন। আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা করল। সন্দীপনকে হারাবার দুঃখ ভুলতে পারলাম না কিন্তু যে বেদনা বিষণ্ণতায় মন ভরে গিয়েছিল, তার থেকে মুক্তি পেলাম। তন্ময়ের সঙ্গে দিন দশ-পনেরো মেলামেশা করার পরই হঠাৎ কলকাতা থেকে খবর এলো, ডক্টর সরকারের ছোট-ভাই মারা গিয়েছেন।

খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডক্টর সরকার বললেন, জানো মা, সন্দীপন চলে যাবার পর থেকেই মনে হচ্ছিল আমার কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে।

ওঁকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার ছিল না। শুধু বললাম, এখন তো আপনার অনেক কর্তব্য। ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিদের মানুষ করতে হবে।

হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার কিন্তু মনে হয় আর ফিরতে পারব না।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। বোধহয় সামনের সপ্তাহেই আমি চাকরি পাব।

কিন্তু থাকবে কোথায়?

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে বললেই ব্যবস্থা করে দেবে।

পরের দিনই প্যাকিং কোম্পানির লোকজন এসে ডক্টর সরকারের বইপত্তর ও অন্যান্য সবকিছু প্যাক করা শুরু করল। মালপত্র ওরাই জাহাজে কলকাতা পাঠাবে বলে দিন তিনেক পরেই উনি একদিন ভোরে বি-ও-এ-সি'তে কলকাতা রওনা হলেন।

ডক্টর সরকার ভিক্টোরিয়া এয়ার টার্মিনাল থেকেই চলে যেতে বললেও আমি চলে গেলাম না। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গেলাম।

উনি বললেন, মা, তোমাকে এভাবে হঠাৎ ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে বলে মনে মনে বড়ই দুশ্চিন্তা রইল। তবে তোমাকে বলে রাখছি, তোমার যে কোনো প্রয়োজনে এই বুড়ো ছেলেকে মনে করলে আমি সত্যি খুশি হব।

বেশি কথা বলার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। শুধু বললাম, প্রয়োজনের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে জানাব? আমার তো আর কেউ নেই।

ডক্টর সরকার কোনোমতে চোখের জল সম্বরণ করে বললেন, তোমার এই বুড়ো ছেলে একাই একশো। আর কাউকে কী দরকার?

হিথরো এয়ারপোর্টের অত লোকজনের ভীড়ে আমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ল না কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতেই শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতার জ্বালায় আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম।

কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টের পাইনি। কোথা দিয়ে যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, তাও টের পেলাম না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ ওই অন্ধকারের মধ্যেই চুপচাপ বসে রইলাম। খুব ক্ষিদে লেগেছিল কিন্তু তবু শুধু নিজের জন্য কিচেনে গিয়ে খাবার-দাবার তৈরি করতে ইচ্ছা করল না।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ তন্ময় এলো। আমার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, বুড়ো ছেলের জন্য এত মন খারাপ কোরো না। তোমার ছেলে আবার একদিন হঠাৎ এসে হাজির হবে।

ওর কথার কি জবাব দেব? মুখ নীচু করে চুপচাপ বসে রইলাম।

দু-এক মিনিট পরে তন্ময় প্রশ্ন করল, নিশ্চয়ই এয়ারপোর্ট গিয়েছিলে?

আমি মাথা নাড়লাম।

দেখে মনে হচ্ছে, সারাদিন শুধু কেঁদেছ ; খাওয়া-দাওয়া করনি।

আমি এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিই না।

তন্ময় প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে কিচেনে গেল। দুজনে মিলেই কিছু খাবার-দাবার তৈরি করলাম। খেলাম। তারপর টুকটাক এ-কথা সে-কথার পর ও জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে কতদিন থাকবে?

ডক্টর সরকারের কিছু কাজ আছে বলে এ মাসটা এখানেই থাকতে হবে।

একলা একলা থাকতে পারবে?

বিকেলের দিকে তুমি রোজ একবার এসো।

তা আসব, কিন্তু...তন্ময় কথাটা শেষ করে না।

আমি একটু ম্লান হেসে বললাম, অনেক কিন্তু নিয়েই আমার জীবন সুতরাং সেজন্য চিন্তা কোরো না।

তুমি বললেই কী চিন্তা না করে থাকতে পারব?

তুমি আর ক'দিনই বা এখানে আছ? দু-এক মাসের মধ্যেই তো চলে যাবে।

তন্ময় হেসে বলল, তোমাকে একলা ফেলে যাব, তা ভাবলে কী করে?

তবে কী আমিও তোমার সঙ্গে স্টেটস্-এ যাব?

দোষ কী?

এবার আমি হেসে বললাম, কলকাতা ছেড়ে লন্ডন এসেছি, এই যথেষ্ট। আর আমেরিকা গিয়ে কাজ নেই।

ভাই রিপোর্টার, তোমাকে তো আগেই বলছি, আমার জীবনে অনেক পুরুষ এসেছেন। তাদের অনেকেই আমাকে এক এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন কিন্তু ওই বৃদ্ধ ডক্টর সরকার আর আমার কলকাতার ভাই ছাড়া আর কোনো পুরুষই নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করেননি। বাকি সবাই কিছু না কিছু কানাকড়ি নিয়েই আমাকে একটা খেয়াঘাট পার করে দিয়েছেন।

তুমি রাগ কর না। আমি জানি, এ পৃথিবীতে মেয়েদের চাইতে পুরুষের মহত্ত্ব অনেক বেশি। ভগবান যীশু, ভগবান বুদ্ধ থেকে শুরু করে এই পৃথিবীতে কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। ধর্ম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাধনায় পুরুষদের চাইতে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে কিন্তু তবু বলব, উবর্শী রম্ভা বা ক্লিওপেট্রার মতো লক্ষ কোটি পুরুষও ওই রকমই খ্যাতি অর্জন করলেও পুরুষ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের পাতায় তাদের স্থান দেননি। শুধু নিজের অভিজ্ঞতা নয়, কলকাতা, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও আরো অনেক শহর-নগরের বহুমেয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

জোর করে বলতে পারি, বনের হিংস্র পশুর চাইতে বহু পুরুষই আরো ভয়ঙ্কর। ভদ্দরলোকের মুখোশ পরে যারা থাকেন তাদের হয় সাহস নেই, নয় তো সুযোগ নেই। কলকাতার বা ভারতবর্ষের বহু নিরীহ গোবেচারা ভদ্দরলোকদের যে রূপ বিদেশে দেখেছি, তাতে ভদ্দরলোক সম্পর্কে আমার আর শ্রদ্ধা ভক্তি নেই।

তন্ময়ের সাহায্য সহযোগিতার কথা সকৃতগজ্ঞ চিত্রে চিরকাল মনে রাখব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুলতে পারব না তার হিংস্র লোলুপ লালসার রুদ্রমূর্তি।

পনেরো

পরের দুটো তিনটে দিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। নানা জায়গায় নানা জনের সঙ্গে দেখাশুনা করে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হতো। তন্ময় নিশ্চয়ই আসত কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হতো না।

সেদিন শনিবার। ক'দিনের অত্যধিক ঘোরাঘুরির জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলে বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ খুব জোরে ডোর বেল বাজতেই উঠতে হল। দরজা খুলে দেখি তন্ময়।

তুমি এখনও ঘুমোচ্ছো?

কেন? ক'টা বাজে?

তন্ময় একটু হেসে বলল, বেশি না, সাড়ে দশটা।

আমার চোখে তখনও ঘুম। সেই ঘুম ঘুম চোখে একটু হেসে বললাম, ভাবছি, আরো একটু ঘুমোব।

ঘুমোও। কে বারণ করছে?

আমি সত্যি সত্যি আবার আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুমোলাম না কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে শুয়েই তন্ময়কে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি এর মধ্যে এসেছিলে?

রোজই এসেছি কিন্তু তোমার মতো নিঃসঙ্গ সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হয়নি।

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, বেঁচে গেছ। আমার মতো ডাইনীর সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভালো।

তন্ময় চেয়ারটা আমার বিছানার খুব কাছে টেনে নিয়ে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলল, তুমি সত্যি একটা ডাইনী। তোমার পাল্লায় পড়লে কোনো পুরুষের রেহাই নেই।

আমি আবার একটু হাসি। বলি, কি হল? এই সাত সকালে হঠাৎ এত রোমান্টিক হয়ে পড়লে কেন?

ছাত্রজীবনে যাকে দূর থেকে দেখে ধন্য হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, তার এত কাছে এসেও রোমান্টিক হব না?

এখন তুমিও ছাত্র নেই, আমিও সেদিনের মতো সুন্দরী বা যুবতী নেই। তাহলে এখন আবার রোমান্টিক হবে কেন?

তন্ময় একবার আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, আমিও ছাত্র আছি। তুমিও সেদিনের মতো সর্বনাশী আছ।

আমি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি সর্বনাশী হলেও নিজের সর্বনাশ করেই খুশি থাকব ; অন্যের সর্বনাশ করব না।

ও আমার মুখের পরে ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি কথায় কথায় এত সিরিয়াস হবে না। তুমি নিজের সর্বনাশ করতে চাইলেও আমি তা করতে দেব না।

আমি জোরে হেসে উঠে বললাম, তুমি আমার কে যে আমাকে বাধা দেবে?

তন্ময় দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলল, তুমি যে আমার কবিতা।

আমি আবার একটু হাসলাম। বললাম, বিদেশে একলা একলা ভালো লাগছে না বলে মোহের ঘোরে কেউটে সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।

আজে বাজে কথা না বলে এবার ওঠ।

কেন? বেশ তো শুয়ে আছি!

তুমি শুয়ে থাকবে আর আমি তোমার পাশে বসে থাকব, তা হয় না।

কেন?

তন্ময় হাসতে হাসতে বলল, তা আমি পারব না।

তাহলে আমিও উঠব না।

না, না, কবিতা, প্লিজ, উঠে পড়। চা খাওয়াও।

বরং আমি শুয়ে থাকি ; তুমি চা করে আনো।

সত্যি তন্ময় চা করে আনল। আমি বিছানায় বসে বসেই চা খেলাম।

চা খাওয়া শেষ হতেই ও প্রশ্ন করল, ডক্টর সরকারের কাজকর্ম শেষ করতে আর ক'দিন লাগবে?

কেন?

কেন আবার কি? চাকরি-বাকরি করবে না?

তুমি কী কোথাও কথা বলেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায়?

ঠিক কোথায় হবে জানি না ; তবে ডক্টর জ্যাকসন বলেছেন, আই উইল ফিক্স হার আপ সামহোয়ার।

আমি আপন মনে বললাম, একটা চাকরি হলে ভালোই হয়। সময়টা বেশ কেটে যাবে।

এ বাড়ি কবে ছাড়বে?

আগে একটা আস্তানা ঠিক করে নিই ; তারপর...

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, শাঁখা সিঁদুর না পরেই কি তোমার ওখানে থাকা ঠিক হবে?

তন্ময়ও হাসল। বলল, মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও এ কথা শোনার পর আর সাহসে কুলোবে না।

যাই হোক, সারাটা দিন বেশ কাটল। দুজনে মিলে ব্রেকফাস্ট তৈরি করলাম। খেলাম। গল্প করলাম। চা খেলাম। একটু কেনাকাটা করলাম। রান্না করলাম। রান্না করতে করতে দু-তিনবার চা খেলাম। লাঞ্চ খেতে খেতে বেশ বেলা হল। দুজনে পাশাপাশি বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর তন্ময় বলল, চল, সিনেমায় যাই।

বেশ বৃষ্টি পড়ছিল। তাছাড়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছিল। বললাম, না, না, এই ঠাণ্ডায় বেরুব না। তার চাইতে ঘরে বসে গল্প করে অনেক আনন্দ পাব।

গল্প করতে করতে আরো দু-একবার কফি খেলাম। তারপর তন্ময় বলল, কবিতা, চীজ্ পাকৌড়া ভাজো। আমি বরং একটা হুইস্কি কিনে আনি।

তারপর?

তারপর একটু খিচুড়ি। তারপর প্রস্থান।

কিন্তু না, সে রাত্রে তন্ময় যেতে পারল না। আমিই ওকে যেতে দিলাম না। ও যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল কিন্তু বাইরের দরজা খুলতেই আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, না না তন্ময়, এই ওয়েদারে যেও না। মারা পড়বে।

বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। তার সঙ্গে দারুণ ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস। তন্ময় বলল, এ ওয়েদারে আগে বেরুতে ভয় করত কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। তারপর হেসে বলল, তাছাড়া পেটে গরম খিচুড়ি ছাড়াও দু-চার পেগ হুইস্কি পড়েছে।

না, না, আজ যেও না। কাল তো রবিবার। তাছাড়া দুটো ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। শুধু শুধু কেন এই দুর্যোগের মধ্যে যাবে?

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তন্ময় আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তাহলে যাব না?

আমি শুধু মাথা নেড়ে বললাম, না।

তন্ময় হঠাৎ দু'হাত দিয়ে আমাকে ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কাম অন, লেট আস ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্যান্স।

আমি ঘরের দিকে পা বাড়িয়েই বললাম, ডিনারের পর কেউ ড্রিঙ্ক করে না।

ও সব নিয়ম-কানুন আমার জন্য নয়।

কেন?

বাইরের দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তুমি আমাকে যেতে দিলে না কিন্তু ভিতরের দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে তো আমাকে মাতাল হতেই হবে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভিতরে আবার কিসের দুর্যোগ?

তন্ময় একটু হেসে বলল, তোমার মতো আগ্নেয়গিরির...

সত্যি ভাই রিপোর্টার, সে রাত্রে আমরা দুজনেই ভালোবাসার নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি ; হয়তো ইচ্ছাও ছিল না। শুধু এইটুকু জানি, সমস্ত দেহ বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, মন চেয়েছিল অতীতকে নতুন ইতিহাসের পলিমাটির তলায় লুকিয়ে রাখতে। এ অস্বাভাবিক অবস্থার স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ হয়নি। যখন আবার স্বাভাবিক হলাম তখন ঘরে-বাইরের দুর্যোগ থেমে গেছে আর লন্ডনের আকাশ সূর্যের আলোয় ভরে গেছে।

ষোল

আমার ইচ্ছায় নয়, তন্ময়ের প্রচেষ্টায় আমার জীবনে আবার মোড় ঘুরল। ডক্টর জ্যাকসন আমাকে দেখেই বললেন, মাই ডিয়ার ডটার, তুমি কালকেই অক্সফোর্ডে গিয়ে ডক্টর রবার্ট কিং-এর সঙ্গে দেখা করবে। হি ইজ লুকিং ফরোয়ার্ড টু সী ইউ অ্যান্ড টোনময়।

পরের দিনই আমি আর তন্ময় অক্সফোর্ড গেলাম। ডক্টর কিং সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা

করলেন। নিজে কফি তৈরি করে খাওয়ালেন। তারপর বললেন, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে তুমি আমার ইউনেস্কো প্রজেক্টে কাজ করতে পারো। বাট ইউ উইল হ্যাভ টু লিভ ব্রিটেন।

আমি জবাব দেবার আগেই তন্ময় বলল, স্যার, তাতে কবিতার কোনো আপত্তি নেই ; বরং ঘুরে-ফিরে কাজ করতে পারলে ও বেশি খুশি হবে।

দ্যাট্স নাইস! সিগারেটে টান দিয়ে ডক্টর কিং বললেন, আমার মনে হয় কোবিটা উইল লাইক হার ওয়ার্ক।

আম বললাম, ইউনেস্কো প্রজেক্ট কাজ করা তো পরম সৌভাগ্যের কথা এবং এই সুযোগের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসেই ল্যান্ডলেডিকে ফোন করে জানালাম, দু'দিনের মধ্যেই বাড়ি ছাড়ছি। তারপর শাঁখা সিঁদুর না পরেই তন্ময়ের অ্যাপার্টমেন্টে উঠলাম। ওখানে থাকতে আমার আগ্রহ না থাকলেও অনিচ্ছা ছিল না। আমি জানতাম, তন্ময়ের সাহায্য দরকার। তাই কিছুটা স্বার্থপরের মতোই ওর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ওর আস্তানায় গেলাম।

আর্য ফ্যাক্টরির কয়েকটা সুটকেশ সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে লন্ডন এসেছিলাম। উঠেছিলাম বাঙালি অধ্যাপক ডক্টর সরকারের বাড়িতে, কিন্তু এবার আমাকে প্রথমেই যেতে হবে প্যারিস। তারপর আশেপাশের দেশগুলিতে। থাকতে হবে হোটেলে বা অন্য কোনো অস্থায়ী আস্তানায়। মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের পক্ষে বেশ চিন্তার ব্যাপার। চিন্তার আরো কারণ ছিল। লন্ডন বিদেশ হলেও সর্বত্র কলকাতার গন্ধ পাওয়া যায়। অভাব নেই ভারতীয়দের। পথেঘাটে, বাসে-টিউবে, দোকানে বাজারে সর্বত্র ভারতীয় দেখা যায়। সুতরাং নবাগত ভারতীয়কে এখানে বিপদে পড়তে হয় না, কিন্তু প্যারিস বা রোম বা ব্রুসেল্স-এ সে সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই তো তন্ময়ের সাহায্য সহযোগিতা আমার চাই-ই। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের কাছেই নিজেকে হীন মনে হল।

চুপ করে বসেছিলাম। বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ। তাই তন্ময় ঘরে ঢুকেই বলল, তুমি এখনও ওইভাবে চুপ করে বসে আছ।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

ও আবার জিজ্ঞাসা করল, কী এত ভাবছ?

আমি মুখ না তুলেই বললাম, তোমার কথা ভাবছি।

আমার কথা? ও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ আমার কথা ভাবার কী কারণ ঘটল!

এবার খোলাখুলিই বললাম, এখন তোমার সাহায্য দরকার বলে ঠিক তোমার কাছে চলে এলাম। আমি জানতাম না আমি এত স্বার্থপর!

তন্ময় খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, তুমি স্বার্থপর আর আমি মহাপুরুষ, তাই না? ও একটু এগিয়ে এসে আমার দুটো হাত ধরে বলল, কবিতা, এ সংসারে আমরা সবাই স্বার্থপর ; কেউ বেশি, কেউ কম।

আমি মুখ নীচু করেই বসে রইলাম।

দু-এক মিনিট পরে তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, কফি খাবে?

এবার আমি বললাম, তুমি তো নিজেই রান্নাবান্না করে খাও ; যে দু-চারদিন আমি আছি,

সে ক'দিন আর তোমাকে কিছু করতে হবে না।

তারপর যদি সংসারী হতে ইচ্ছা করে?

হবে। আমার আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে?

কিন্তু তোমার সম্মতি তো চাই।

তুমি সংসারী হবে, তাতে আমার কী ভূমিকা আছে? আমি দূর থেকে শুধু শুভেচ্ছা জানাব।

কিন্তু...।

না, আর কোনো কিন্তু শুনলাম না। আমি কফি তৈরি করে আনতেই তন্ময় বলল, তোমার নিশ্চয়ই কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

হ্যাঁ।

আমাকে কী সঙ্গে থাকতে হবে?

ও সব দেশে চাকরি করতে গেলে বা ঘোরাঘুরির জন্য কি দরকার, তা তো আমি জানি না। তাই তুমি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।

তাহলে চল, একটু পরেই বেরিয়ে পড়ি।

রান্না করব না?

কী দরকার? বাইরেই খেয়ে নেব।

না, না, আমি রান্না করি! একটু থেমে হেসে বললাম, বাইরের খাবার তো সব সময়ই খাও। দু-চারদিন না হয় আমার রান্নাই খেলে।

অযথা কেন কষ্ট করবে?

এতে কষ্টের কী আছে? রান্না করতে আমার ভালোই লাগে।

ঠিক আছে। তাহলে খাওয়া দাওয়া করেই বেরুব।

তন্ময় ছেলেবেলায় মাকে হারালেও আদর-যত্নের অভাব হয়নি ওর জীবনে। জ্যাঠার কোনো ছেলে না থাকায় তন্ময় বড়মার কাছে মাতৃস্নেহই পেয়েছে। বোধহয় একটু বেশিই পেয়েছে। এই সামান্য কিছু দিন মেলামেশা করেই জানতে পেরেছিলাম, পাঁচ রকম ভালো মন্দ খেতে ও ভালোবাসে। তাই তো যে ক'দিন ওখানে ছিলাম আমি অনেক কিছু রান্না করতাম। ও আমাকে বলত, তুমি অনেকটা বড়মার মতো রান্না কর। তাই তো এত বেশি খেলাম।

ওর কথা শুনে আমি হাসি। বলি, তাই কী হয়? তুমি ছাড়া আর কেউই আমার রান্নার প্রশংসা করল না।

না, না, কবিতা, তুমি সত্যি খুব ভালো রাঁধতে পারো। তাছাড়া তুমি ঠিক বড়মার মতো অনেক রকম রান্না কর। তন্ময় একটু থেমে বলে, বড়মাকে হারাবার পর এমন যত্ন করে আর কেউ খাওয়ায়নি।

আমার প্যারিস যাবার প্রস্তুতি আর এই রান্নাবান্না-গল্পগুজব করেই দিনগুলো বেশ কেটে যেত। রাত বারোটা, সাড়ে বারোটার আগে শুতে যেতাম না। প্রথম দিন অনেক আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছিল। আমাকে ক্লান্ত দেখে ও দু-একবার শুতেও বলল, কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই দেরি করলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, তন্ময় নিশ্চয়ই এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে না। এবং আমিও হয়তো ওকে বাধা দেব না, বা বাধা দিলেও ও গ্রাহ্য করবে না। যাই হোক গল্প করতে করতে অনেক রাত হল। তারপর তন্ময় আমার দুটো হাত ধরে বলল, যাও, শুতে যাও। অনেক রাত হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি যাও। আমি একটু পরে শোব।

না, না, তুমি আগে শুতে যাও। আফটার অল তুমি আমার গেস্ট।

আমার মতো গেস্টকে অত সৌজন্য দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে আগে শুতে যেতে পারো।

এবার তন্ময় বলল, আমি আলো অফ করে শুয়ে পড়লে তুমি তোমার ঘরে যেতে অসুবিধায় পড়বে।

আমি বুঝলাম, ও আমাকে ওর ঘরে শুতে বলবে না। একটু আশ্বস্ত হলাম ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ভাবলাম, হয়তো মাঝরাতে আমার কাছে আসবে। হয়তো আমাকে বিরক্ত করবে—কিন্তু কী আশ্চর্য, যে ক'দিন ওর কাছে ছিলাম তন্ময় আমাকে কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্যও বিরক্ত করল না। এত যত্নে, এত সমাদরে ও আমার দেখাশোনা করল যে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে ওকে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না।

তন্ময়ের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিয়েই আমি নতুন জীবন শুরু করার জন্য প্যারিস রওনা হলাম, কিন্তু এই শ্রদ্ধা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আমি প্যারিস আসার মাস খানেক পরেই ব্রুসেল্‌স্‌ থেকে তন্ময়ের চিঠি পেলাম—কবিতা, আমি ব্রুসেলস্‌-এ এসেছি। আগামী ন' মাস এখানেই থাকব। মনে হয়, বিধাতা পুরুষ আমাকে তোমার কাছ থেকে বেশি দূরে রাখতে চান না। তাইতো অতলান্তিক পাড়ি দেবার আগে এখানে এলাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় আসছি।

চিঠিটা পেয়ে খুশিই হলাম কিন্তু একটু দ্বিধায় পড়লাম। আমার একটাই ঘর। আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করলেও এই এক ঘরেই থাকতে হবে! তন্ময় আমার এত উপকার করেছে যে ওকে হোটেলে থাকতে দেওয়া যাবে না। মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও তন্ময়কে কাছে পেয়ে ভালোই লাগল।

আমার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেই তন্ময় আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, ভাগবানের বোধহয় ইচ্ছা নয় আমি তোমার থেকে দূরে থাকি।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবানের নাম দিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা বলছ না তো?

আমার ইচ্ছা তো তোমার এই অ্যাপার্টমেন্টেই সারা জীবন কাটিয়ে দিই।

তাই নাকি?

এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

তোমার মনে দ্বন্দ্ব না থাকলেও আমার মনে তো থাকতে পারে।

খানিকটা স্যাম্পেন খাবার পর এ সব দ্বন্দ্ব কোথায় উড়ে চলে যাবে, তার ঠিক-ঠিকানা পাবে না।

ভাই রিপোর্টার, তুমি তো জানো পৃথিবীর অন্যান্য সব মহানগরীতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো সম্ভব হলেও প্যারিসে তা কল্পনাতীত। শুধু তাই নয়, এখানে সন্ধ্যার পর দুটি ছেলে বা দুটি মেয়েকে একসঙ্গে দেখাও যায় না। অনেকের কাছেই তা বিস্ময়ের। এবং কৌতূহলের।

শুধু তাই নয়, দু' চার সপ্তাহ প্যারিস বাস করেই বুঝতে পেরেছিলাম, কোনো সময়ের পক্ষেই একা থাকা নিরাপদ নয়! তাইতো মনের মধ্যে যত দ্বন্দ্ব, যত ভয়ই থাকুক, উন্মত্ত নারীলোভী অপরিচিত পুরুষদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তন্ময়কে কাছে পেয়ে খুশিতে ভরে গেলাম।

ওকে কফি খেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বল, কী খাবে?

ও কফির পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, আসতে না আসতেই খাবার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ন'টা বাজে। তাই ভাবছিলাম রান্না সেরেই গল্পগুজব করব।

ও হো হো করে হেসে উঠল। বলল, আজ শুক্রবার। কাল-পরশু ছুটি। আজকের এই সন্ধ্যায় কেউ বাড়িতে বসে থাকে?

তা জানি কিন্তু তুমি ক্লান্ত হয়ে এসেছ বলেই ভাবছিলাম আজ আর বেরুব না।

ও আমার কোনো কথা শুনল না। আমাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুধু তন্ময়কে দোষ দেব না। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভুলে গেলাম আমরা বাঙালি, ভারতীয়। ভুলে গেলাম আমরা অবিবাহিত। আনন্দে উন্মত্ত হয়ে আমরা প্রায় নাচতে নাচতে ঘুরে বেড়ালাম। যত্র-তত্র-সর্বত্র। সাইড ওয়াক কাফেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক বোতল ওয়াইন খেয়ে দুজনেই বেশ মদীর হয়ে উঠলাম। তারপর তন্ময় বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সবার সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তারপর আরো ঘুরলাম, আরো ওয়াইন খেলাম। নাচ দেখলাম। তিন-চারটে কাফে থেকে কিছু কিছু খেয়ে ডিনারের পর্ব শেষ করলাম।

বোধহয় রাত দুটো-আড়াইটের সময় অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলাম। তারপরের কথা আর লিখব না। শুধু জেনে রাখ, পরের দিন অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের সামনে দুটি উলঙ্গ নারী-পুরুষের পেন্টিং দেখে বিস্মিত হলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই আমার বিস্ময় কেটে গেল। বুঝলাম, ওটা কোনো শিল্পীর সৃষ্টি নয় ; সামনের আয়নায় আমার আর তন্ময়ের প্রতিচ্ছবি!

আজ এখানেই শেষ করছি।

সতেরো

তন্ময় তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। নানা কথা ভাবলাম। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তন্ময় আমাকে এমন করে জড়িয়ে ছিল যে আমি পাশ ফিরতে পারলাম না। তবু মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখলাম। দেখতে ইচ্ছা করল। ভেবেছিলাম, ওকে দেখেই রাগ হবে, ঘৃণা হবে কিন্তু রাগও হল না, ঘৃণা করতেও পারলাম না। আমার মায়া হল। তারপর হঠাৎ মনে হল, আমার একটা সন্তান হলে বেশ ভালো হতো। মনে হল, যে হয়তো এইভাবেই আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকত ; হয়তো আমি পাশ ফেরবার চেষ্টা করলে ঘুমের ঘোরে ও আমাকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরত। মনে হল আরো কত কী! তারপর একবার ক্ষণিকের জন্য মনে হল, তন্ময় যদি হঠাৎ শিশু হয়ে যায় অথবা ঠিক ওর মতো একটা শিশু যদি আমার সন্তান হত, তাহলে বেশ হতো।

মাথার দিকের জানালা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক রোদ্দুর আমার মুখের ওপর পড়তেই আমার স্বপ্ন দেখা শেষ হল। তন্ময়ের ঘুম না ভাঙিয়ে অতি কষ্টে উঠে পড়লাম। দেখি, ঘরের মেঝের কার্পেটের ওপর আমাদের দুজনের জামা কাপড় ব্যাগ-পার্স ইত্যাদি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। একটু হাসলাম। ভাবলাম, কাল রাত্রে কী দুজনেই একসঙ্গে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম?

তন্ময়ের গায়ে একটা চাদর দিয়ে আমি বাথরুমে গেলাম। আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে

এসে দেখি ও তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বুঝলাম, কাল রাত্তিরে একটু বেশিই ড্রিঙ্ক করেছিল। তারপর অত রাত্তিরে ফিরে এসে আমাকে নিয়ে কতক্ষণ পাগলামি করেছে, তার ঠিক নেই। তাই ভাবলাম, ওকে ডাকব না।

আমি নিজের জন্য এক কাপ চা করেই রান্নাবান্নার উদ্যোগ শুরু করলাম। তারপর একটু হাত খালি হতেই ঘরদোর ঠিক করতে এলাম। তন্ময়ের জামা-কাপড় তুলতে গিয়েই দেখি পার্সের ভিতর থেকে কিছু কাগজপত্র বাইরে পড়ে রয়েছে। ওই কাগজপত্র তুলতে গিয়েই চমকে উঠলাম। তন্ময়ের ওপর রাগে-ঘেন্নায় আমার সারা মন প্রাণ বিদ্রোহ করে উঠল। একবার মনে হল, হাতের কাছে একটা চাবুক থাকলে আশা মিটিয়ে মারতাম। অথবা...

না, আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারলাম না। একবার মনে হল, ঘরের দরজা লক করে বেরিয়ে পড়ি। আবার মনে হল, না, না, আমি কেন পালাব। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতেই কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলাম। তারপর চুপ করে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ পিছন থেকে এসে তন্ময় আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, সারারাত উপভোগ করেও মন ভরেনি?

তন্ময় আমার কাঁধের ওপর মুখ রেখে বলল, সারারাত কেন, সারা জীবন ধরে তোমাকে উপভোগ করলেও আশা মিটবে না।

সত্যি বলছ?

ও আমার বুকের ওপর একটা হাত রেখে বলল, সত্যি বলছি।

বুকের মধ্যে জ্বলে গেলেও জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাকে খুব আদর করবে?

তন্ময় একটু হেসে বলল, এ কথা আবার জানতে চাইছ? বলেই ও আমাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েই চুমু খেল ওষ্ঠে, মুখে, গলায়। বারবার, বহুবার।

তোমাকে দেখে তো মনে হয়নি তুমি কোনো দিন এভাবে চাইতে পারো।

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, মানুষকে দেখে কতটুকু জানা যায়?

ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তো নিশ্চয়ই জানা যায়।

জানি না।

জানি না বলছ কেন? আমি যেমন তোমাকে চিনেছি, জেনেছি, সেই রকম তুমিও তো আমাকে চিনেছ, জেনেছ।

আমি একটু হেসে বললাম, তোমরা বল, পুরুষস্য ভাগ্যম স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও জানেন না কিন্তু আমি যদি পারতাম তাহলে এই শ্লোকটা পালটে দিতাম।

কেন?

বলতাম শুধু মেয়ে না পুরুষের চরিত্রও সত্যি অবোধ্য।

হঠাৎ, এ কথা বলছ কেন?

না, এমনি মনে হল বলে বলছি।

সবাইকে না জানলেও আমাকে তো জেনেছ।

নিশ্চয়ই কিছু জেনেছি।

যা জেনেছ তাতে কী তুমি খুশি?

আবার আমি হাসি। বলি, যা জেনেছি, যা পেয়েছি, তাতে কোন মেয়ে খুশি হবে না?

একটু চুপ করে থাকার পর তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, চা খেয়েছ?

সরি! এখুনি তোমাকে চা দিচ্ছি।

চা এনে দিতেই তন্ময় হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, আজকেও তোমাকে কালকের মতো পাবো তো?

ঠিক কালকের মতো কি আজ হতে পারে? কাল কালই ফুরিয়ে গেছে ; ঠিক কালকের মতো দিন তো কখনই ফিরতে পারে না।

এ কথা বলছ কেন? কাল কী তোমার ভালো লাগেনি?

কাল যখন তোমার সঙ্গে সমান তালে ঘুরেছি-ফিরেছি হেসেছি খেলেছি তখন নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল কিন্তু...

আমি কথাটা শেষ করি না। হঠাৎ থেমে যাই। মুখ নীচু করে বসে থাকি।

তন্ময় আমার মুখখানা আল্‌তো করে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বলেই থামলে কেন?

এমনি।

আমি আবার মুখ নীচু করেই বসে রইলাম, কিন্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মনের মধ্যে যে আনন্দ-উত্তেজনা, যে স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠছিল তা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় সত্যি কান্না পাচ্ছিল। আমি জীবনে একজনকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি। তাকে হারাবার পর আর কাউকে ভালোবাসতে না চাইলেও তন্ময়কে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল। এই ভালো লাগা টিকে থাকলে হয়তো অতীতের দুঃখ ভুলে নতুন করে ভালো ভাবে বাঁচার কথা ভাবতাম। ভাবতাম কেন, বোধহয় মনে মনে ভাবতে শুরু করেছিলাম। আমার ও কথা হয়তো শুনতে তোমার খারাপ লাগছে, কিন্তু ভাই, কোনো দুঃখই তো মানুষ চিরকাল মনে রাখে না। মনের বেলাভূমিতে নিত্য-নতুন পলিমাটি জমতে জমতে অতীতের দুঃখ কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

মনে মনে এলোপাথাড়ি হাজার রকমের চিন্তা করছিলাম। তন্ময়ও বিশেষ কথাবার্তা বলল না। বাথরুমে গেল। ফিরে এসেই বলল, কবিতা, দারুণ খিদে পেয়েছে। খেতে দেবে?

হ্যাঁ দিচ্ছি।

খাবার সময়ও বিশেষ কথাবার্তা হল না। ও একবার শুধু জিজ্ঞাসা করল, খেয়ে উঠেই বেরুবে?

আমি বললাম, না।

কেন?

টায়ার্ড। ঘুমোব।

খেয়ে উঠেই আমি শুয়ে পড়লাম। তন্ময়ও কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। আমি পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরতেই বললাম, ঘুমোতে দাও।

কথাও বলবে না?

এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া এ রকম ভাবে জড়িয়ে থাকলে আমার ঘুমও আসবে না।

কাল রাত্রে ঘুমোলে কী করে?

কাল রাত্রে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ছিলাম না।

তন্ময় একটু হেসে বলল, যা-ই হোক কাল খুব এনজয় করেছি। সত্যি কবিতা, জীবনে এত আনন্দ কোনো দিন পাইনি।

আমার মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলেও তন্ময় দেখতে পেল না। বললাম, সত্যি?

এই আনন্দ আর কোথায় পাবো?

এ প্রশ্নের জবাব কী আমার কাছে চাও?

তন্ময় হঠাৎ এক টানে আমাকে ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে?

কিছু না।

কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই দেখছি তুমি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে রয়েছ।

আমি হেসে বললাম, ঘুমোতে দাও। সব-ঠিক হয়ে যাবে।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতেই দেখি তন্ময় বিয়ার খাচ্ছে। আমাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখেই ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, আর ইউ রেডি ফর ইভনিং প্রোগ্রাম?

মুহূর্তের মধ্যে মনে নানা চিন্তা এলো, গেল। তারপর মনে মনে ভাবলাম, স্বাভাবিক অবস্থায় নিশ্চয়ই সব কথা বলতে পারব না। সুতরাং...

হাসতে হাসতে বললাম, টয়লেট থেকে এসেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

আমার কথা তন্ময় শুনেই খুশিতে লাফ দিয়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, দশ মিনিট ধৈর্য ধর।

তারপর আমি একটু তৈরি হয়েই এক বোতল হুইস্কি বের করলাম।

তন্ময় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হুইস্কি বের করছ কেন? বিয়ার খাবে না?

বিয়ার খেয়ে কী নেশা হয়? ওতে শুধু আমেজ আসে।

কিন্তু...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি হুইস্কির বোতল খুললাম। গেলাসে ঢাললাম। তারপর দু-চারটে আইস-কিউব দিয়েই গেলাস তুলে ধরে বললাম, চিয়ার্স।

তন্ময় কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ বিয়ারের জাগটা তুলে ধরে বলল, চিয়ার্স!

দু-তিন রাউন্ড হুইস্কি খাবার পরই আমি তন্ময়কে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে তোমার ভালো লাগে?

তন্ময় হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, তোমাকে ভালো লাগবে না এমন পুরুষ মানুষ আছে?

আর কাউকে আমার মতো ভালো লাগে না তো?

তুমি পাগল হয়েছ?

আমি দু' হাত দিয়ে তন্ময়ের মুখখানা জড়িয়ে ধরে বললাম, না, না, আমি পাগল হইনি। তুমি বল আর কাউকে আমার মতো ভালো লাগে কিনা।

এমন করে ভালো লাগার মতো মেয়ে কী আর কেউ আছে?

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ঠাস করে ওর গালে একটা একটা চড় মেরে বললাম, শিখাকেও আমার মতো ভালো লাগে না?

আমার কথা শুনেই তন্ময় মুহূর্তের মধ্যে বোবা হয়ে গেল। পাথরের মতো স্থির হয়ে রইল। আমি জোর করে ওকে চেপে ধরে বললাম, আমাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। হিয়ার অ্যান্ড নাউ। বিয়ে না করলে আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দিচ্ছি না।

জানো রিপোর্টার, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আরো অনেক কথা ওকে বলেছিলাম কিন্তু সব কথা আজ আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে বেশ কিছুক্ষণ বকাবকি করার পর ও বলেছিল, আমাকে বিয়ে করে তোমার লাভ নেই।

লাভ-লোকসানের কথা বাদ দাও। আমাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে।

তন্ময় মুখ নীচু করে বলল, আমাকে বিয়ে করলে তো তুমি কোনোদিনই সন্তানের মা হতে পারবে না।

আমি উন্মাদের মতো চিৎকার করে বললাম, তাই বুঝি কলকাতায় বিয়ে করা বৌ রেখে এসে লন্ডনে শিখাকে নিয়ে ফূর্তি করতে?...শিখাকে মাতাল করে তার নেকেড ছবি তুলেছ কেন? ওকে ব্ল্যাক মেলিং করবে?

তন্ময় চুপ।

আমাকে উলঙ্গ করে আমার ছবি তুলবে না? কাম অন! হ্যাভ মাই নেকেড ফটোগ্রাফ!

তন্ময় তখনো চুপ।

আমি এক লাথি মেরে হুইস্কির বোতলটা ফেলে দিয়ে বললাম, এনাফ ইজ এনাফ! নাউ গেট্ আউট মাই বয়। বেরিয়ে যাও ; এখুনি বেরিয়ে যাও।

সত্যি বলছি ভাই, সেদিন তন্ময়কে তাড়িয়ে দেবার পর আর কোনোদিন ওর কথা আমি মনেও করিনি।

আঠারো

বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রীয় সংস্থা ইউনেস্কোতে বছর তিনেক ছিলাম। নানা কাজে সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের সমাগম হয় ইউনেস্কো হেড কোয়ার্টার্সে। কখনও কাজে, কখনও ককটেল-ডিনার রিসেপশনে তাদের অনেকের সঙ্গেই আমার দেখা হতো। আলাপ হতো। কখনও কখনও এদের সঙ্গে ঘুরতে হতো বিভিন্ন দেশে।

ওই তিন বছরে এমন অনেককে কাছে পেয়েছি যাদেব সান্নিধ্য-লাভে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। এদের কাছে কত কথা শুনেছি, কত কথা জেনেছি। আমি বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি এদের পাণ্ডিত্য ও মহানুভবতা দেখে।

তন্ময় আমাকে অনেক দুঃখ, ব্যথা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে মনে আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ? কারণ ওরই আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় আমি ডক্টর রবার্ট কিং-এর সান্নিধ্যে আসি এবং আমার জীবনে এক অনন্য অধ্যায়ের সূচনা হয়। আজ যে আমি ইউনাইটেড নেশনস্ এ আছি, তার পিছনেও তো ওদেরই অবদান।

একদিন রাগ করেই কাকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সুপর্ণা-অমিয়র আস্তানায় উঠি। কিন্তু আজ যখন নিজের অতীতের কথা ভাবি, ভালো মন্দের হিসাব দেখতে বসি, তখন মনে হয়, আমার জীবনে ওই চরিত্রহীন কাকুর অবদানও কম নয়। হাজার হোক, পিতৃ-মাতৃহীন তোমার এই দিদি তারই স্নেহচ্ছায়ায় উচ্চ শিক্ষালাভ করে। আমি লেখাপড়ায় নেহাত খারাপ ছিলাম না কিন্তু পড়াশুনার জন্য খুব বেশি পরিশ্রম করতে একটুও ভালো লাগত না। বিশেষ করে বাবা-মাকে হারাবার পর এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমি সত্যি সত্যি লেখাপড়া ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু না, তা হয়নি ; হতে পারেনি শুধু ওই মানুষটার জন্য। যখন রিসার্চ করছি, তখন মাঝে মাঝেই মনে হতো, কী হবে রিসার্চ করে? ডক্টরেট হব? অধ্যাপনা করব? না, না, পোষা ময়না পাখির মতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই কথা ছাত্রছাত্রীদের বলতে পারব না।...

পর পর তিন-চারদিন শুধু গল্প-উপন্যাস পড়ছিলাম আর বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখছিলাম। প্রথম ক'দিন কাকু কিচ্ছু বললেন না। তারপর একদিন ইভনিং শো'তে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতেই কাকু হাসতে হাসতে বললেন, আই ফিল হ্যাপি টু' সী ইউ এনজয়িং।

আমি একটু হেসে বললাম, থ্যাঙ্কস।

মাঝে মাঝে এই রকম আনন্দ করা খুব ভালো।

আমি তো ভাবছি এইভাবে আনন্দ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেব।

শুধু আনন্দ করেই কাটিয়ে দেবে?

হ্যাঁ।

পারবে?

না পারার কি আছে?

কাকু মাথা নেড়ে বললেন, না কবিতা, পারবে না। কোনো মানুষই শুধু আনন্দ করে জীবন কাটাতে পারে না। কম-বেশি কিছু কাজ কর্ম দায়িত্ব পালন না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। তুমিও পারবে না।

আমি তর্ক না করে চুপ করে রইলাম।

পরে, রাত্রে শোবার পর কাকু বললেন, সবাই লেখাপড়া করে না। সম্ভবও না। তোমার বাবা-মা বেঁচে থাকলে কেউ কিছু বলতে পারত না, কিন্তু এখন তুমি লেখাপড়া বন্ধ করলে সবাই আমাকে দোষারোপ করবে। সবাই মনে করবে, লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ নেই বলেই তোমার লেখাপড়া হল না।

তাই কী?

হ্যাঁ কবিতা, সবাই তাই ভাববে। তাছাড়া তুমি লেখাপড়া না করলে আমি নিজেও মনে মনে অপরাধী হয়ে রইব।

আমি চুপ করে থাকি।

কাকু আবার বলেন, তুমি এম. এ. পাশ করলে, ডক্টরেট হলে আমিও সবাইকে গর্ব করে বলতে পারতাম...।

বিশ্বাস কর ভাই, কাকু কত রাত্রি না ঘুমিয়েও আমার নোট্স টুকে দিয়েছেন। রিসার্চ করার সময় যে বই আমি কোথাও খুঁজে পেতাম না, সে বই কাকুই জোগাড় করে এনে দিতেন। শুধু কী তাই? কাকু নিজে টাইপরাইটারে টাইপ করে দিয়েছিলেন আমার থিসিস। অত্যন্ত পরিশ্রমের ও একঘেয়ে কাজ। আমি বার বার বারণ করেছিলাম কিন্তু না, উনি কিছুতেই শুনলেন না।

দু'হাত দিয়ে হুইস্কীর গেলাসটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে কাকু বললেন, আমি জানি কবিতা, তুমি কিছু টাকা খরচ করলেই থিসিসটা ছাপিয়ে দিতে পারো কিন্তু তোমার থিসিস আমি নিজে টাইপ করলে আমি যে আত্মতৃপ্তি পাব যে আনন্দ পাব...

কিন্তু কাকু বড্ড পরিশ্রমের কাজ।

হোক। এবার কাকু এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে আমার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলেন, একদিন হয়তো তুমি অনেক দূরে চলে যাবে। হয়তো আমার সঙ্গে তোমার সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আর কোনো কারণে না হোক, অন্তত এই থিসিস টাইপ করার জন্য তুমি আমাকে ভুলবে না।

সেদিন আমি কাকুর কথার প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, আপনি থিসিস টাইপ না করলেও

আমি কোনোদিন আপনাকে ভুলব না।

কাকু একটু হেসে বললেন, ও কথা বোলো না কবিতা। অনেক প্রিয়জনকেই মানুষ ভুলে যায়। তুমি যে একদিন আমাকে ভুলে যাবে না এ কথা জোর করে বলা যায় না।

সেদিন কাকুর সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ তর্ক করেছিলাম কিন্তু এতদিন পরে আজ আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, কাকু ঠিকই বলেছিলেন।

কাকু আমার বাবার বন্ধু হলেও বয়স ও মানসিক দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক থেকে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে কোনো সংশয় হয়নি। তারপর ওর ফ্ল্যাটে থাকার সময় আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আমার সঙ্গে ওর দৈহিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কাকুকে কোনোদিনই চরিত্রহীন মনে করিনি। রমলাকে দেখার পরই মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলাম। হঠাৎ একটা ঘটনাবহুল অধ্যায়ের যবনিকা টেনে আমি সুপর্ণার কাছে চলে গেলাম।

কাকুর কথা, আমার পুরনো দিনের কথা আজকাল আমি মনে করি না। বোধহয় মনে করতে চাই না। প্রয়োজনও অনুভব করি না। তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আমার পুরনো দিনের অনেক কথাই নতুন করে মনে পড়ছে। আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি, ইদানীং কালে মাঝে মাঝেই আমার কাকুর কথা মনে হয়। জানি না তিনি কোথায়। তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না। বেঁচে থাকলেও হয়তো সুস্থ নেই। হয়তো সালাউদ্দিন কাকুর ওখানে কাজ করছে না। তার কোনো খবরই জানি না। তাই তো হাজার রকমের খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে ভীড় করে। কাকু ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছেন কী? উনি অর্থনৈতিক কষ্ট পাচ্ছেন না তো?

যে মানুষটাকে একদিন অসহ্য মনে হয়েছিল, যাকে অসম্ভব ঘৃণা করেছি, এখন মাঝে মাঝে সারারাত তারই কথা ভাবি। না ভেবে পারি না। মাঝে মাঝেই ওকে দেখতে খুব ইচ্ছা করে। এখন বোধহয় কাকুকে আর ঘৃণা করি না।

বলতে পারো ভাই, কেন এমন হয়? তাই তো বলছি, যারাই আমার কাছে এসেছেন, তারাই আমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছেন, কিছু দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে অমিয়র মতো পুরুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য না করলেও এই সংসারের চোদ্দ আনা মানুষই ব্যবসাদার। সবাই লেনদেন চায়।

অমিয় স্বতন্ত্র নয়, অনন্য, অসাধারণ। ওদের কথা আলাদা। অমিয়কে শুধু ভালোবাসিনি, শ্রদ্ধাও করি। ইউনেস্কোর আজিজুল ইসলাম ওই ধরনের।

ইন্ডিয়ান এম্বাসির কালচারাল কাউন্সিলার মিঃ গিদওয়ানীর বাড়ির এক পার্টিতে আমার সঙ্গে আজিজুলের প্রথম আলাপ। সেইদিনই বুঝেছিলাম, এই ঢাকাই বাঙাল সত্যি অনন্য। আর দশজনের মধ্যেও ওকে চিনতে কষ্ট হয় না।

গিদওয়ানী আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ও আমাকে বলল, আপা, তুমি আমাকে আজিজ বলেই ডাকবে।

আপা মানে?

দিদি! দিদি! আজিজ হেসে বলল, জানো আপা, ইউরোপ আমেরিকা অনেকদিক থেকে এগিয়ে আছে কিন্তু হালাগো সমাজে আপাও নাই, ভাবীও নাই।

আমি বলি, ঠিক বলেছ।

আজিজ এবার একটু গম্ভীর হয়েই বলে, হতভাগারা গার্লফেন্ড নিয়ে বড্ড বেশি নাচানাচি করে কিন্তু দিদি বা বৌদির চাইতে ভালো গার্ল ফ্রেন্ড কী হতে পারে?

আমি চুপ করে থাকি।

ও আবার বলে, এ ছাড়া শালী বা দেওর যে কী অদ্ভুত জিনিস তাও শালারা বুঝল না।

আমার মতো আজিজও একটা ইউনেস্কো প্রজেক্ট কাজ করত। বছর দুই শুধু আজিজ ছাড়া আর কোনো পুরুষকে আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে দিইনি।

তন্ময়ের জন্য সমস্ত পুরুষকেই আমি ঘেন্না করতে শুরু করেছিলাম কিন্তু আজিজকে পেয়ে বুঝলাম, না, এই পৃথিবীর সব পুরুষই কামনা-বাসনার আগুনে জ্বলে না।

আজ আর লিখছি না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। দু-চারদিন পরেই আবার চিঠি দিচ্ছি। তোমাদের দুজনের চিঠি আজই পেলাম।

উনিশ

আজিজুল প্যারিস ছেড়ে যাবার মাস দেড়েক পরে হঠাৎ অফিস থেকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই ডক্টর সরকারের চিঠি পেলাম।...

মা, আমি তোমার নেহাতই অপদার্থ সন্তান। তাই তো আজকাল তোমাকে বিশেষ চিঠিপত্রই লিখি না। তোমার চিঠি যে খুব নিয়মিত পাই, তা নয় কিন্তু তবুও তুমি সময় পেলেই আমাকে চিঠি লেখ। তাছাড়া কিছুদিন আগে আজিজুল নামে একটি ছেলে তোমার পাঠানো দুটি শার্ট, দুটি টাই আর কয়েক প্যাকেট ব্লেড দিয়ে গেল। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম, ও তোমার বিশেষ গুণগ্রাহী ও ভক্ত। ভেবেছিলাম, জিনিসগুলো পাবার প্রাপ্তি সংবাদ পাঠাবে, কিন্তু তা আর হল না। সপ্তাহখানেকের জ্বরে শরীর এমন কাহিল হল যে বহুদিন কোনো কাজকর্মই করিনি। অমিয় আর সুপর্ণা মাঝে মাঝেই আমাকে দেখতে আসে। মনে হয় জিনিসগুলির প্রাপ্তি সংবাদ ওদের চিঠিতেই জেনেছ।

এবার একটু কাজের কথায় আসি। আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রথম ব্যাচের ছাত্র নবেন্দু এখন শিক্ষাজগতের একটি ধ্রুবতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ামণি। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি স্বদেশে এবং বিদেশে। কতবার যে বিদেশ গেছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। যাতায়াতের পথে প্যারিসে থেকেছে দু-একদিন কিন্তু এর বেশি নয়। এবার নবেন্দুকে প্যারিসেই থাকতে হবে তিন মাস। ওখানকার কর্তৃপক্ষই ওর সব ব্যবস্থা করবেন। তোমাকে দুটি অনুরোধ। আমার পরামর্শ মতো নবেন্দু শনিবার (৭ই সেপ্টেম্বর) সকাল দশটায় এয়ার ফ্রান্স-এর ফ্লাইটে ওরলি এয়ারপোর্টে পৌঁছবে। সেদিন তো তোমার ছুটি। তাই তুমি যদি এয়ারপোর্ট থেকে ওকে তোমার ওখানে একদিনের জন্য নিয়ে যাও, তাহলে খুব ভালো হয়। রবিবার বিকেলের দিকে ওর নির্দিষ্ট আস্তানায় চলে যেতে একটু সাহায্য করবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবেন্দু ভোজনরসিক এবং আমাদের নিজস্ব খাবার ছাড়া অন্য কোনো দেশের কোনো খাবার খেয়েই নাকি ওর পেট ভরে না। তাই শনিবার-রবিবার তোমার অন্য কোনো প্রোগ্রাম না থাকলে ওকে মাঝে মাঝে তোমার ওখানে আসতে বল। নবেন্দু মহাপণ্ডিত লোক। মনে হয় ওর সান্নিধ্যে তোমার ভালোই লাগবে।...

পূজা আসছে। তাই নবেন্দুর সঙ্গে তোমার জন্য একটা শাড়ি পাঠাচ্ছি। এ ছাড়া চিড়ে-মুড়ি-বড়ি ইত্যাদি ধরনের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও দু-তিনটে পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা পাঠাব...

৭ই সেপ্টেম্বর সকালে গাড়ি নিয়ে ছুটলাম ওরলি এয়ারপোর্টে। ঠিক সময়েই প্লেন এলো। শাড়ি পরা আর কোনো মেয়ে ছিল না বলে আমাকে চিনতে নবেন্দুবাবুর একটুও কষ্ট হল না।...আই হোপ তুমিই কবিতা?

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

তোমাকে অনেক কষ্ট করে আসতে হল।

না, না, কষ্ট কিছু না ; বরং মাঝে মাঝে নিজের দেশের মানুষকে কাছে পেলে ভালোই লাগে।

তা ঠিক কিন্তু...

ডক্টর সরকার যখন বলেছেন তখন দ্বিধা করার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক মালপত্র পিছনের সীটে বোঝাই করে ওকে সামনের দিকের ডানদিকে বসালাম। গাড়ি স্টার্ট দিলাম। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ফোর্থ গিয়ার। প্রায় একশো কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছি। হঠাৎ নবেন্দুবাবু বললেন, তুমি তো দারুণ জোরে গাড়ি চালাও।

হেসে বললাম, এখানে চালাতেই হয়।

তা ঠিক। তবে লেফট্-হ্যান্ড ড্রাইভ গাড়ি চালাতে অসুবিধে হয় না?

আমি তো কলকাতায় গাড়ি চালাতাম না ; তাই কোনো অসুবিধে হয় না।

তুমি বোধহয় অনেক দিন দেশে যাও না..

হ্যাঁ, দেশ ছাড়ার পর আর যাইনি।

যেতে ইচ্ছে করে না?

ইচ্ছে করে ঠিকই কিন্তু ঠিক নিজের কেউ নেই বলে আর এত খরচ করে যেতে মন চায় না।

ছুটিতে কোথাও যাও না?

গতবার এথেন্সে গিয়েছিলাম। এবার কোথায় যাব ঠিক করিনি।

কবে ছুটি পাবে?

ফার্স্ট অক্টোবর থেকেই আমার ছুটি।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেই নবেন্দুবাবু বললেন, অপূর্ব সাজিয়েছ তো।

আমি একটু হেসে বললাম, স্বামী-পুত্রের ঝামেলা তো নেই। তাই অফিস থেকে ফিরে এসে ঘর গুছিয়েই সময় কাটিয়ে দিই।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে কফি করতে গেলাম। কফি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই নবেন্দুবাবু দুটো প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ডক্টর সরকার পাঠিয়েছেন বুঝি?

একটা উনি পাঠিয়েছেন, অন্যটা অমিয়।

খুলে দেখি, ওরা দুজনেই দুটি সুন্দর সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছেন। এছাড়াও আরো অনেক কিছু। এবার উনি দু'তিনটে শারদীয় সংখ্যা এগিয়ে দিতেই বললাম, এগুলো দেখলেই কলকাতার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

সত্যি, এই শারদীয় সংখ্যা নিয়ে সারা বাংলাদেশে যে চাঞ্চল্য দেখা যায়, তেমন আর কোথাও হয় না।

কফি খেতে খেতেই বলি, বিদেশে এসে অনেক কিছু পেয়েছি, কিন্তু কলকাতা ছাড়ার জন্য অনেক কিছু হারাতেও হয়েছে।

এবার উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আর কত কাল বিদেশে থাকবে?

আমার কাছে দেশ-বিদেশ দুইই সমান।

ও কথা বোলো না কবিতা। হাজার হোক নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের ভাষা, বন্ধুবান্ধবের আকর্ষণ তো আলাদা।

তা ঠিক কিন্তু ওখানে আমার মতো মেয়ের পক্ষে একলা থাকা খুবই কঠিন।

যদি কলকাতায় থাকতে না চাও তাহলে দিল্লি বা বোম্বেতে থাকো।

এবার একটু হেসে বললাম, দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়?

নবেন্দুবাবুকে দেখেই বোঝা যায়, উনি বোদ্ধা। চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য। বয়স পঞ্চাশের ঘরে হলেও সারা চেহারায় যৌবনের দীপ্তি। কথাবার্তায় অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন। মনে মনে বললাম, ডক্টর সরকার ঠিকই লিখেছেন।

কফি খাওয়া শেষ হলে উনি সুটকেশ থেকে একটা শাড়ি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, দিস ইজ-এ টোকন প্রেজেনটেশন ফ্রম ইওর নিউ ফ্রেন্ড!

অত্যন্ত দামি কাঞ্চিপুরম সিল্কের শাড়ি দেখেই বললাম, এত দামি শাড়ি আনার কি দরকার ছিল?

নবেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, তুমি পরলে কোনো শাড়িকেই দামি মনে হবে না। তোমার রূপ-গুণের কাছে আর সবকিছু ম্রিয়মান হয়ে যায়।

কথাটা শুনেই একটু বেসুরো মনে হল কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, ডক্টর সরকার যাকে মা বলেন সে তো সাধারণ মেয়ে হতে পারে না।

হেসে বললাম, সত্যি আমি অসাধারণ?

নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট!

আমার আগের অ্যাপার্টমেন্টের চাইতে এটা একটু বড় হলেও শোবার ঘর একটাই। এই ঘরেই আমার সবকিছু। অন্য ঘরের একদিকে ছোট্ট একটা খাবার টেবিল। টেবিলের দু'দিকে দুটো চেয়ার। অন্যদিকে বসার ব্যবস্থা। ছোট্ট একটা প্যান্ট্রি। ছোট্ট একটা বাথ-কাম-টয়লেট। কোনোমতে স্নানাদি সারা যায় কিন্তু কোনোমতেই কাপড়-চোপড় বদলানো যায় না। তাছাড়া বাথরুম হচ্ছে প্যান্ট্রির পাশে। কাপড়-চোপড় পরার জন্য আমাকে ড্রইংরুম পার হয়ে শোবার ঘরে যেতে হয়। একলা থাকি বলে এই ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধে হয় না। আজ নবেন্দুবাবু আসায় একটু মুশকিলই হল।

আমি বললাম, আমার অ্যাপার্টমেন্ট নেহাতই ছোট। চটপট কিছু করা মুশকিল। তাই এবার উঠুন।

নবেন্দুবাবু বললেন, অ্যাপার্টমেন্ট ছোট হলেও সবকিছুই তো আছে।

এবার আমি হাসতে হাসতে বললাম, আছে সবকিছুই ; তবে আমি বাথরুম গেলে আপনাকে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

উনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মানে?

বাথরুম খুবই ছোট। তাই এই ঘর হয়ে শোবার ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরতে হয়।

সর্বাঙ্গ আবরণকারী কিছু ব্যবহার কর না?

অ্যাপার্টমেন্টর মধ্যে ওই তো একমাত্র পোশাক।

তাহলে আর চিন্তার কি?

না না, চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু চটপট কাজ করতে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে।

তোমার অসুবিধে না হলে আমারও হবে না।

আমি আগের দিন রাত্রেই সবকিছু রান্না করে রেখেছিলাম। তাই নবেন্দুবাবু বাথরুমে যেতেই আমি ভাত বসিয়ে দিলাম। অন্যান্য খাবার-দাবার গরম করতে না করতেই উনিও তৈরি হয়ে গেলেন।

খেতে বসে নবেন্দুবাবু বললেন, এত রান্না করেছ কেন?

রান্না করতে আমার ভালো লাগে। তাছাড়া শনি-রবিবারেই শুধু একটু বেশি রান্না করি। অন্যদিন তো যাহোক কিছু খেয়ে নিই।

উনি হেসে বলেন, তুমি রান্না করতে ভালোবাস আর আমি খেতে ভালোবাসি।

আমি জানি।

স্যার সে কথাও তোমাকে জানিয়েছেন?

আমরা দুজনেই হাসি।

খেয়ে নবেন্দুবাবু সত্যি তৃপ্তিলাভ করলেন। আমার রান্না খেয়ে তন্ময়ও এমনি তৃপ্তিলাভ করত। খাওয়া-দাওয়া শেষে উনি বললেন, ওবেলায় রান্না করো না।...

কেন?

প্যারিসে এসেও শনিবার সন্ধ্যা বাড়ির মধ্যে কাটাব?

না, সেদিন সন্ধ্যায় নবেন্দুবাবু আমার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে বন্দী রইলেন না। বেরিয়ে পড়লেন। একলা নয়, আমাকে সঙ্গে নিয়েই বেরুলেন।

যেসব ভারতীয়রা নিজের স্ত্রীর হাত ধরে রাস্তায় চলাফেরা করতেও অভ্যস্ত নয়, যারা বেশি চা খাওয়া পর্যন্ত পছন্দ করেন না, তারাই প্যারিসে এসে বোতল বোতল শেরি-স্যাম্পেন বা ওয়াইন খান আর বিবস্ত্রা সুন্দরী যুবতীর নাচ দেখেন।

কলকাতার বিখ্যাত অধ্যাপক নবেন্দুবাবুও ব্যতিক্রম হলেন না। নাচ দেখতে দেখতে উনি আমাকে বললেন, যাই বল কবিতা, এরা প্রাণ খুলে আনন্দ করতে জানে। আর এরা প্রাণভরে আনন্দ করে বলেই প্রাণভরে কাজও করে।

আমি বললাম, বোধহয় প্রাণভরে কাজ করে বলেই এমন আনন্দ করতে পারে।

আরো এক বোতল ওয়াইন পেটে যাবার পর নবেন্দুবাবু হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কবিতা, আমরা খুব কাজও করব, খুব আনন্দও করব।

আমি বুঝলাম, উনি স্বাভাবিক নেই। তাই হেসে বললাম, নিশ্চয়ই আপনি কাজও করবেন, আনন্দও করবেন।

প্যারিসে এসে প্রথম সন্ধ্যা ওর ভালোই কাটল। নাচ-গান খানা-পিনা সেরে আমরা যখন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলাম, তখন রাত প্রায় দুটো।

অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকতেই উনি আমার কোমর জড়িয়ে কাছে টান দিয়ে বললেন, কবিতা, তুমি বড় ভালো মেয়ে।

আমি হেসে বললাম, ধন্যবাদ। ওর হাতে টান দিয়ে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি শোবার ব্যবস্থা করি।

এই সন্ধেবেলায় শোবে?

এখন অনেক রাত হয়েছে।

সো হোয়াট? হ্যাভ ইউ গট এনি ড্রিঙ্ক?

নো।

প্যারিসে থাকো আর বাড়িতে একটা বোতল রাখ না?

না। এবার আমি একটু জোর করেই ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম। বললাম, আপনি অনেক ড্রিঙ্ক করেছেন। এবার আপনি জামাকাপড় পাল্টে শুয়ে পড়বেন।

নো ডার্লিং! আই মাস্ট নট শ্লিপ টু নাইট।

তাহলে আপনি এ ঘরে বসে থাকুন ; আমি ঘরে শুতে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, চল, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

আমার এমনিই ঘুম আসবে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

তোমার মতো সুন্দরীকে ঘুম পাড়াতে আবার কষ্ট হয় নাকি? বরং...

আঃ! কী যা তা বলছেন?

আই অ্যাম সরি কবিতা।

যাই হোক প্রায় জোর করেই ওকে শুইয়ে দিলাম। মাঝখানের দরজা লক করে আমিও শুয়ে পড়লাম। তখন প্রায় তিনটে বাজে।

পরের দিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। ও ঘরে নবেন্দুবাবু তখনো ঘুমোচ্ছেন। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চা খেলাম। কাপড়-চোপড় বদলেই কিছু কেনাকাটার জন্য দরজা লক করে বেরিয়ে পড়লাম। কিছু সব্জি আর চিকেন কিনে ফিরে এসে দেখি, নবেন্দুবাবু ড্রইংরুমে বসে আছেন।

আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সংসারের কাজকর্ম আরম্ভ করে দিয়েছ?

একটু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলাম।

চা খাওয়াবে?

নিশ্চয়ই।

চা খেতে খেতেই নবেন্দুবাবু বললেন, কবিতা তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কী অপরাধ করেছেন যে ক্ষমা চাইছেন?

কাল রাত্রে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করিনি।

আমি হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কী করে জানলেন আপনি খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করেননি?

আমার লেখাপড়া-বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় বাইরের লোকজন জানতে পারে কিন্তু আমার আসল স্বভাব চরিত্রের খবর শুধু আমিই জানি।

এ কথা তো সবার বেলায় প্রযোজ্য।

তা ঠিক কিন্তু সবার স্বভাব-চরিত্রের তো তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য খবর থাকে না—আমার আছে।

আমি আর প্রশ্ন করি না। চুপ করে থাকি। চা খাই। নবেন্দুবাবু বলেন, আমি বিশেষ ড্রিঙ্ক করি না। কাল ড্রিঙ্ক করলাম প্রায় বছর খানেক বাদে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এবার একটু হেসে বললেন, গত বছর সিমলা ইনস্টিটিউট অব হায়ার স্ট্যাডিজে গিয়েছিলাম দেড় মাসের জন্য। অস্ট্রেলিয়ার এক অল্পবয়স্কা অধ্যাপিকাও তখন ওখানে এসেছিলেন। ক'দিনের ছুটিতে চাইল বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ আমার হোটেলেই ওর সঙ্গে দেখা।...

আমি বললাম, ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তখন ড্রিঙ্ক করেছিলেন বুঝি?

নবেন্দুবাবু বললেন, শুধু ড্রিঙ্ক করিনি, তিনটে রাতও ওরই সঙ্গে কাটাই।

আমি পট থেকে ওর কাপে চা ঢেলে দিই। উনি চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, আমাদের দেশে বদমাইসি করার চাইতে বদমাইসি করার খবর ছড়িয়ে পড়াকে সবাই ভয় করে। আমিও করি। তাই আমিও এসব কথা কখনও কাউকে বলি না।

তাহলে আমাকে বলছেন কেন?

ঠিক কী কারণে বলছি, তা বলতে পারব না ; তবে তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে।

কেন?

উনি একটু হেসে বললেন, ডক্টর সরকার আর অমিয়র কাছে তোমার এত প্রশংসা শুনেছি যে মনে মনে তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু ভেবেছিলাম।

কী ভেবেছিলেন?

সে আর শুনতে চেয়ো না। তোমাকে এয়ারপোর্টে দেখেই আমার রক্ত টগবগ করতে শুরু করে। তারপর সারাটা দিন অনেক কিছু ভেবেছি।

আমি হাসি। জিজ্ঞাসা করি, তারপর?

বদ মতলব মাথায় নিয়েই কাল সন্ধেবেলায় তোমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার সংযম দেখে বুঝলাম, তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার হবে না।

ওর কথা শুনে আমি একটু জোরেই হাসি।

না, না, কবিতা, হাসির কথা নয়। যে মেয়ে ওয়াইন খেয়ে ওই রকম অশ্লীল ও উত্তেজনা পূর্ণ নাচ দেখতে দেখতেও নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তাকে শ্রদ্ধা করা যায়, ভালোবাসা যায় কিন্তু তাকে নিয়ে বদমাইসি করা যায় না।

বললাম, আমাকে শ্রদ্ধা করারও দরকার নেই, ভালোবাসাও দরকার নেই।

এবার নবেন্দুবাবু একটু হেসে বললেন, ওটা আমার মনের ব্যাপার। তারপর উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাই হোক, তোমাকে অনেক কিছু বলব।...

কী দরকার?

হাজার হোক তুমি একলা থাকো। তোমার জানা দরকার, তোমার আশেপাশে আমার মতো হিংস্র নেকড়েও ঘোরাঘুরি করছে।

সত্যি রিপোর্টার, নবেন্দুবাবু আমার এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। যে কালো মেয়েটির দুটি বড় বড় ঘন কালো চোখের আলোয় তুমি অন্ধকার পথ দেখতে পেয়েছ, সে আর তুমি আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

কুড়ি

নবেন্দুবাবু প্যারিস থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে থাকলেও প্রায় প্রত্যেক শুক্রবার বিকেলে এসে হাজির হতেন ; তবে হ্যাঁ, আমার ওখানে উঠতেন না। আমার অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই একটা ছোট হোটেলে উঠতেন। আমরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, গল্পগুজব, ঘোরাঘুরি করতাম। বেশ কেটে যেত সপ্তাহের শেষ দুটো দিন।

মাস দুই এইভাবে চলার পর সত্যি আমরা দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। প্রথম প্রথম বিদেশে আসার পর পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভয় করত, দ্বিধা হতো। আস্তে আস্তে এই ভয় বা দ্বিধা সংকোচ কেটে গেল। তাই তো নবেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে খুব

বেশি সময় লাগল না।

কফি খেতে খেতে আমি বললাম, সারাদিনই তো আমার এখানে কাটান। রাত্তিরের ক'টা ঘণ্টা কাটাবার জন্য এতগুলো ফ্রাঙ্ক নষ্ট করে হোটেলে থাকার কী দরকার?

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, শুধু তোমার জন্যই তো হোটেলে থাকি।

আমার জন্য আপনি হোটেলে থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার জন্য।

আমার জন্য আপনি কেন হোটেলে থাকবেন?

সত্যি বলছি কবিতা, তোমার জন্যই হোটেলে থাকি। দিনেরবেলা তবু কোনোমতে নিজেকে সংযত রাখতে পারি। সন্ধের পর কয়েক পেগ হুইস্কি বা দু-এক বোতল ওয়াইন পেটে পড়ার পর তোমাকে দেখে যে আমার কি মনে হয়...

অত ভূমিকা না করে আসল কথা বলুন।

এবার উনি হেসে বললেন, আমার মতো দস্যু রাত্তিরে তোমার এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে কত কী সম্পদ যে লুঠ করবে, তার কী ঠিকঠিকানা আছে?

আমিও হেসে বলি, কোনো দস্যুই এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কিছু ক্ষতি করতে পারে না।

কথাটা সত্যি হলেই ভালো।

আরো কিছুদিন এইভাবে মেলামেশা করার পর মনে হল নবেন্দুবাবু চরিত্রহীন হলেও মানুষ হিসেবে ভালোই। তাছাড়া মনে হল, এত বিদ্যা-বুদ্ধি সাফল্যের মধ্যেও ওর মনে অনেক ব্যথা-বেদনা লুকিয়ে আছে।

ভাই রিপোর্টার, দুনিয়ার সবাই জানে মদ্যপানের অনেক দোষ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে মদ্যপান মানুষকে সত্যবাদী করে। মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় যে কথা কোনোদিন কাউকে বলতে পারবে না, মদ্যপানের পর সেই মানুষই তার সব গোপন কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারে। একদিন মদ্যপানের পর নবেন্দুবাবুও আমাকে অনেক দুঃখের কথা বললেন।

একে গরিব স্কুল মাস্টারের ছেলে, তার ওপর ন'টি ভাইবোন। এ ছাড়াও এক বিধবা পিসিমা ও তার কন্যা। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেই নবেন্দু স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হলেন। প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষার খাতা দেখেই অধ্যক্ষ ঊষানাথ বসু চমকে উঠলেন। কয়েকদিন পরে ক্লাসে এসে নবেন্দুর খোঁজ করতেই টের পেলেন, দীর্ঘদিন মাইনে না দেবার জন্য ওর নাম রেজিস্টারে নেই।

অন্ধকার রাত্রির পরই সূর্যোদয়। অধ্যক্ষ ঊষানাথ বসুর কৃপায় নবেন্দু সসম্মানে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করে এম. এ পড়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন।

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, এম. এ পড়ার সময় পেয়ে গেলাম ডক্টর সরকারকে। উনি না থাকলে আমার এম. এ. পাশ করা হতো না। বাড়িতে থাকলে লেখাপড়া করতে অসুবিধে হবে বলে পরীক্ষার আগের তিন মাস উনি আমাকে ওঁর বাড়িতেই রেখে দিলেন।

সত্যি, ডক্টর সরকারের মতো মানুষ হয় না।

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওঁর সংগ্রহ করা মেটিরিয়ালস আর নোট্‌স নিয়েই আমি আমার প্রথম বই লিখি। নবেন্দুবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমি জীবনে আর কোনো অধ্যাপক দেখিনি যিনি ছাত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য এমন ভাবে স্বার্থত্যাগ করবেন।

তারপর?

পরীক্ষার ফল ভালোই হয়েছিল বলে অধ্যক্ষ উষানাথ বসু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একশো পঁচিশ টাকার লেকচারার করে দিলেন গিরিডির এক কলেজে।

নবেন্দুবাবু গেলাসে শেষ চুমুক দিতেই আমি আবার গেলাস ভরে দিলাম।

এ কী? আবার দিলে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। তারপর কী হল বলুন।

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, অধ্যক্ষ মহাশয় লুকিয়ে আমার গরিব বাবাকে কিছু অর্থ দিয়ে আমাকে কিনে নিলেন।...

আমি একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি, কিনে নিলেন মানে?

নবেন্দুবাবু গেলাসে চুমুক দিয়ে আবার একটু হাসেন। বলেন, অধ্যক্ষ কন্যা শ্রীমতী শিখারাণীর সঙ্গে আমার বিবাহ হল এবং মাত্র ছ' মাস পরই তিনি একটি পুত্ররত্ন প্রসব করলেন।

ছ' মাসে?

হ্যাঁ কবিতা, ছ' মাসে। গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য আমি না জেনে গর্ভবতী শিখারাণীকেই বিয়ে করেছিলাম।

কী আশ্চর্য! কিছু আশ্চর্যের না। এই পৃথিবীতে যে যত বেশি ঠকাতে পারে সে তত বেশি বুদ্ধিমান।

তারপর কী করলেন?

শিখারাণী হাসপাতাল থেকে ফেরার আগেই আমি গিরিডি ছেড়ে পালালাম।

কোথায় গেলেন? বাড়িতে?

না, না। বাবা আর শ্বশুরমশায়ের ওপর এত ঘেন্না হল যে...

বাবা কি অন্যায় করলেন?

একে অধ্যক্ষ মশায়ের মেয়ে, তার ওপর নগদ কয়েক হাজার টাকায় বাবা এমনই বশীভূত হয়ে গেলেন যে বিয়ের আগে তিনি মেয়েও দেখতে গেলেন না।

হা ভগবান!

আরো শুনতে চাও কবিতা?

আপত্তি না থাকলে বলুন।

ছাত্র জীবনে নবেন্দুবাবু লেখাপড়ার নেশায় এমনই মত্ত ছিলেন যে অধ্যক্ষ মশায়ের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত করলেও শিখারাণীর দিকে নজর দেবার তাগিদ বোধ করেননি। নবেন্দুবাবুর মতো আরো অনেক ছাত্রই ও বাড়িতে যাতায়াত করত কিন্তু দু-একটা মৌমাছি যে শিখারাণীর জন্যই অধ্যক্ষ মশায়ের অনুগত ছিলেন, তা উনি জানতেনও না।

যাই হোক, সংসার জীবনের শুরুতেই এমন বিশ্বাসঘাতকতার বলি হয়ে নবেন্দুবাবু হঠাৎ একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গিরিডি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। প্রথমে কিছু দিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালেন যত্র-তত্র। তারপর আবার অধ্যাপনা শুরু করলেন। প্রথমে আগ্রা, তারপর লুধিয়ানা। কয়েক মাস লুধিয়ানায় থাকার পর ফিরোজপুর। না, ওখানেও বেশি দিন থাকতে পারলেন না। চলে গেলেন লক্ষ্মৌ ; লক্ষ্মৌ থেকে কাশী।

বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুপুরুষ নবেন্দুবাবুর ওপর নজর পড়ল প্রবীণ অধ্যাপক প্রমোদ মিত্তিরের। এক রবিবার সকালে উনি হঠাৎ নবেন্দুবাবুর কাছে হাজির।

নবেন্দুবাবু চমকে উঠলেন, আপনি!

হ্যাঁ আমি। তুমি একলা থাক বলে মাঝে মাঝেই সন্ধের পর আসি, কিন্তু কোনো দিনই

দেখা পাইনি।

আপনি আমার এখানে এসেছিলেন?

প্রমোদবাবু একটু হেসে হাতের ছড়িটাকে পাশে রেখে বললেন, এসেছিলেন মানে? বেশ কয়েকদিন এসেছি।

নবেন্দুবাবু অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করেন। বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমি তো জানতাম না, তাই...

প্রমোদবাবু আবার হাসেন। বলেন, তোমার মতো ব্যাচেলার হলে আমিও থাকতাম না। যাকগে, ওসব কথা বাদ দাও। আজ দুপুরে আমার ওখানে চলে এসো। আড্ডাও হবে, খাওয়া-দাওয়াও হবে।

কিন্তু...

ওসব কিন্তু-টিন্তু বললে চলবে না। তোমাকে আসতেই হবে।

নবেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, প্রমোদবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি, আমার শ্বশুর, শাশুড়ি ও শিখারাণী তার জারজ সন্তান নিয়ে হাজির।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। আমি জানতাম না প্রমোদবাবু ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

আমি অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করি, তারপর কি হল?

স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর মুখে যে দুঃখ বেদনা থাকে, তার চিহ্নমাত্রও শিখারাণীর মুখে দেখলাম না!

বলেন কি?

হ্যাঁ কবিতা ঠিকই বলছি। রাগে, দুঃখে ঘৃণায় আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রমোদবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সেই রাত্রেই কাশী ছেড়ে সোজা হরিদ্বার চলে গেলাম।

প্রশ্ন করলাম, আপনার বাবা-মার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না?

চিঠিপত্র লিখতাম না, কিন্তু প্রত্যেক মাসে মাকে টাকা পাঠাতাম।

আচ্ছা, তারপর বলুন।

নবেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন, হরিদ্বারে গিয়ে অঘটন ঘটে গেল।

ওর হাসি দেখে আমারও হাসি পায়। বলি, কী আবার অঘটন ঘটল?

আবার কোনো প্রমোদবাবুর সঙ্গে যাতে দেখা না হয়, এই ভেবে আমি গুজরাতিদের একটা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। আসার সময় ট্রেনে ঘুম হয়নি বলে প্রথম দিন ঘুমিয়েই কাটালাম। তারপর থেকে দু-এক ঘণ্টা ব্রহ্মকুণ্ডে ঘোরাঘুরি ছাড়া বাকি সব সময় ধর্মশালায় নিজের ঘরেই থাকতাম।

সারাদিন ঘরে বসে কী করতেন?

আমার ঝোলার মধ্যে সঞ্চয়িতা ছিল। সারাদিন আপন মনে কবিতা পড়তাম। কখনও জোরে জোরে, কখনও মনে মনে।

তারপর?

দু-একদিন পরে দুপুরের পর হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছেলের হাত ধরে নবেন্দুবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবেন?

ভদ্রমহিলা পরিষ্কার বাংলায় বললেন, না এমনিই এলাম।

নবেন্দুবাবু ওর হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর না দেখে ভেবেছিলেন উনি গুজরাতি। তাছাড়া পরনে সাদা শাড়ি। তাই একটু অবাক হয়েই বললেন, আপনি বাঙালি?

হ্যাঁ।

নবেন্দুবাবু বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন। তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার ছেলেটি তো ভারি সুন্দর।

ও আমার ভাইপো।

ও! এবার নবেন্দুবাবু শতরঞ্চিটা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, বসুন।

ওরা শতরঞ্চিতে বসতেই নবেন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা বুঝি দল বেঁধে বেরিয়েছেন?

না, দাদা-বৌদির সঙ্গে এসেছি।

দাদা বৌদিকেও ডাক দিন।

ওরা আজ হৃষিকেশ গেলেন। কাল ওখান থেকে কেদার বদ্রী রওনা হবেন।

আপনি গেলেন না?

ভদ্রমহিলা একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, বিধবা বোনকে হরিদ্বার পর্যন্ত এনেছে, আর কত ঘোরাবে?

নবেন্দুবাবু চমকে উঠলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভাইপোকে আপনি কাছেই রেখে দিলেন?

হ্যাঁ, ও আমার কাছেই সব সময় থাকে।

সব সময় মানে?

ভদ্রমহিলা আবার একটু হাসেন। বলেন, আমার বৌদিও চাকরি করেন ; তাছাড়া একটু বেশি ঘোরাঘুরি পছন্দ করেন।

এবার নবেন্দুবাবুও একটু হেসে বলেন, বুঝেছি।

ভদ্রমহিলাও হাসেন। বলেন, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের চেহারাটা বদলালেও চরিত্রটা বদলায়নি। যাক, আমার কথা বাদ দিন। আপনার কথা বলুন।

কী জানতে চান বলুন।

হরিদ্বারে কেন এলেন?

তীর্থস্থানে কেন এসেছি ; তাও বলতে হবে?

আপনি তো তীর্থ করতে আসেননি। সারাদিন তো ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে আবৃত্তি করেই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

কোনোমতে কিছু সময় কাটাবার জন্যই এখানে এসেছি। তা আপনি কি করে দিন কাটাচ্ছেন।

গঙ্গস্নান, রান্নাবান্না, দিবানিদ্রা, গঙ্গারতি...

আপনি রোজ গঙ্গায় স্নান করেন?

হ্যাঁ। আপনি গঙ্গায় স্নান করেননি?

না। কেন, হরিদ্বারে এলেই বুঝি গঙ্গাস্নান করতে হয়?

তা নয়, তবে এখানকার গঙ্গায় স্নান করার একটা আলাদা আনন্দ আছে।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই। এবার ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন, কাল সকালে আপনাকে গঙ্গায় নিয়ে যাব। দেখবেন, স্নান করে কি আরাম।

নবেন্দুবাবু হাসেন। কিছু বলেন না।

ভদ্রমহিলা এবার বললেন, আমাদের এই ধর্মশালা থেকে গঙ্গা এত কাছে যে আমার তো মনে হয়, সময় পেলেই গঙ্গায় স্নান করে আসি।

গঙ্গাস্নান করতে আপনার এত ভালো লাগে?

গঙ্গাস্নান করতে ভালো লাগে না ; তবে এখনাকার গঙ্গায় স্নান করতে সত্যি ভালো লাগে।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, পরদিন গঙ্গায় স্নান করেছিলেন?

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, পরদিন ভোরবেলায় উমা যখন ডাকল, তখন আর না করতে পারলাম না।

গঙ্গাস্নান করে কেমন লাগল?

নবেন্দুবাবু আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, গঙ্গাস্নান করে সারা শরীরটা জুড়িয়ে গেল ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উমাকে দেখে আমার সারা শরীরে আবার আগুন জ্বলে উঠল।

কেন?

ওখানে মেয়ে পুরুষের স্নান করার কোনো আলাদা ঘাট নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, নবেন্দুবাবু একটু থামলেন ; যেন হরিদ্বারের গঙ্গাস্নানের দৃশ্যটা একবার ভালো করে মনে করে নিলেন। তারপর বললেন, উমা ভাইপোকে স্নান করিয়ে আমার পাশেই স্নান করতে নামল। তারপর স্নান করে দুজনেই একসঙ্গে উঠলাম।

প্রশ্ন করলাম, তারপর?

ভেজা কাপড়ে ওকে দেখেই আমি চমকে উঠলাম। তারপর ওই অবস্থায় ওর পাশাপাশি ধর্মশালা পর্যন্ত আসতে আসতে...

উনি কাপড় বদলে নিলেন না কেন?

ঘাটের ওপর অত লোকের সামনে ও কাপড় বদলাতো না। গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে ধর্মশালায় এসেই...

তারপর বুঝি গঙ্গাস্নানের ব্যাপারে আপনিও খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন?

শুধু গঙ্গাস্নানের ব্যাপারে নয়, সব ব্যাপারেই অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলাম।

নবেন্দুবাবুর কথায় কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও প্রশ্ন করলাম, সব কিছু ব্যাপারে মানে?

উনি একটু হেসে বললেন, উমার দাদা-বৌদি কেদার-বদ্রী ঘুরে আসার আগেই আমাদের নাটক জমে উঠল।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই উনি বললেন অবাক হচ্ছ কেন? যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কী এমন শিকার ছেড়ে দিতে পারে?

কিন্তু বাঘিনী?

তার অবস্থাও তো আমারই মতো।...

কিন্তু...

উনি একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, জোয়ারের জলে ওসব কিন্তু কোথায় যে চলে গেল, তা কেউই টের পেলাম না।

নবেন্দুবাবু এবার চুপ করে যান। কিছু বলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করলাম, কী হল? চুপ করে গেলেন কেন? তারপর কী হল?

উনি খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। শুধু জেনে রাখ, সত্যি আমি উমাকে ভালোবেসেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, ও নতুন করে বেঁচে উঠুক, কিন্তু

ও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হল না।

কেন?

বিধবা হবার পর বিয়ে করার জন্য মনের যে জোর চাই, তা ওর ছিল না।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করি না। চুপ করে থাকি।

নবেন্দুবাবু বললেন, উমা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মনে হল, এ তো আরেক শিখারাণী। পর পর দু'বার আঘাত পেয়ে আমিও ওদের মতো ব্যাভিচারী হয়ে উঠলাম।

এবারও আমি কোনো প্রশ্ন করি না।

উনি বললেন, তুমি বিশ্বাস কর কবিতা, ওদের দুজনের নোংরামির জন্যই আমিও নোংরা হয়ে গেলাম। এখন এতই খারাপ হয়ে গেছি যে আর ভালো হতে ইচ্ছাও করে না। বোধহয় সম্ভব নয়।

জানো রিপোর্টার, নবেন্দুবাবু দেশে ফিরে যাবার দিন ওরলি এয়ারপোর্টে আমাকে বলেছিলেন, কবিতা, তোমার কাছেই প্রথম হেরে গেলাম, কিন্তু তবু মনে কোনো অতৃপ্তি নিয়ে দেশে ফিরছি না। জীবনে যে কোনো প্রয়োজনের দিনে আমাকে মনে করলে আমি সত্যি খুশি হব।

একুশ

সত্যি বলছি, আমি কোনো পুরুষের সঙ্গেই বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে চাই না কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে বার বার বহু পুরুষেরই সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে হয়েছে আমাকে। তোমার মতো দু' চারজনের কথা আলাদা। তোমার মতো একজনকে কাছে পেলে তো আমি ধন্য হয়ে যেতাম কিন্তু তা কী আমার কপালে সম্ভব?

যাই হোক নবেন্দুবাবু চলে যাবার পর সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল। এই সংসারে শুধু পুরুষরাই মেয়েদের ক্ষতি করে না ; মেয়েরাও বহু পুরুষের সর্বনাশ করে। নবেন্দুবাবুর প্রতি সমবেদনা অনুভব করলাম মনে মনে। শুক্রবার বিকেলবেলায় মনে হতো, আরো ক'টা দিন ওকে আটকে রাখলে বেশ ভালো হতো।

নবেন্দুবাবুর চিঠি এলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম। আবার ওর চিঠি এলো, আবার আমি জবাব দিলাম। প্রতি সপ্তাহে আমি ওর চিঠি পাই, আমি ওকে চিঠি দিই! এইভাবেই বেশ ক'টা মাস কেটে গেল।

সেদিন শনিবার। ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানায় শুয়ে আছি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো!

নমস্কার!

এক ভদ্রলোকের গলায় বাংলা শুনেই আমি চমকে উঠে বসলাম।

আমি প্রতি নমস্কার জানাবার আগেই উনি বললেন, আমি মিঃ ব্যানার্জি। একদিনের জন্য প্যারিস এসেছি ; কালই নিউইয়র্ক চলে যাব...

আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

না, আপনি আমাকে চিনবেন না। নবেন্দুবাবু আমার দাদার বন্ধু। উনি আপনার জন্য একটা প্যাকেট পাঠিয়েছেন।...

কিন্তু উনি তো আমাকে কিছু জানাননি।

মনে হয় আমি হঠাৎ চলে এলাম বলে কিছু জানাবার সময় পাননি।

সেদিন আমার কোনো এনগেজমেন্ট ছিল না। তাই একটু গল্প গুজব করার লোভে আমি নিজেই ওকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি একা একা আসতে পারবেন তো? আপত্তি না থাকলে আমি আপনাকে নিয়ে আসতে পারি।

না, না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই পৌঁছে যাব।

ঠিক সময়েই মিঃ ব্যানার্জি এলেন। সুদর্শন ও সুপুরুষ। বয়স আমারই মতো হবে। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স থেকে বি. এ. পাশ করার পর কলকাতা থেকে কনটেমপোরারি হিস্ট্রির এম. এ.। তারপর পরীক্ষা দিয়ে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে প্রবেশ করেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে বদলি হয়ে নিউইয়র্কে আমাদের ইউ. এন. মিশনে যাচ্ছেন।

মিঃ ব্যানার্জি নবেন্দুবাবুর প্যাকেট দেবার পর কোটের পকেট থেকে একটা ক্যাসেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমার প্রিয় শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের গান আছে ; শুনবেন।

নিশ্চয়ই শুনব। উনি আমারও প্রিয় শিল্পী।

উনি হেসে বললেন, আমি পঙ্কজ মল্লিক আর দেবব্রত বিশ্বাসের গানের ক্যাসেট ছাড়া আর কিছু কাউকে প্রেজেন্ট করি না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

খুব ভালো।

লাঞ্চের আগে মিঃ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম, মে আই অফার ইউ এ ড্রিঙ্ক?

ধন্যবাদ! ড্রিঙ্কের কোনো প্রয়োজন নেই।

আপনি ড্রিঙ্ক করেন তো?

ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে এক-আধ পেগ খেতেই হয় ; তাছাড়া খাই না।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কেন?

আমার স্ত্রী ঋতু পছন্দ করে না। মিঃ ব্যানার্জি হেসে বললেন, ওর অমতে একদিন ড্রিঙ্ক করলে ও এক মাস আমাকে পাশে শুতে দেবে না।

ওর কথায় আমি হেসে উঠি।

আমার হাসি থামলে উনি বলেন, বিয়ের পর মেয়েদের জীবনে স্বামী ছাড়া আর কী আছে বলুন? আর সেই স্বামীই যদি তাকে দুঃখ দেয়, তাহলে সে বাঁচবে কেমন করে?

ওর কথায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রথমে মনে মনে ; তারপর বলেই ফেললাম, আপনার মতো পুরুষের সংখ্যা আরো কিছু বেশি হতো তাহলে এই পৃথিবীটা সত্যি অনেক সুন্দর, শান্তির হতো।

কথাবার্তা খাওয়া-দাওয়া করতে করতেই আবিষ্কার করলাম, আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু হয়ে গেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতু কবে তোমার ওখানে যাবে?

মাস খানেকের মধ্যেই আসবে।

ঋতু যদি কদিন আমার এখানে না থেকে সোজা নিউইয়র্ক যায় তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ঋতু নিশ্চয়ই তোমার কাছে কদিন থাকবে কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে।

তুমি কী ব্যবসাদার যে এক হাতে দেবে, আরেক হাতে নেবে?

তা নয় তবে...

আগে কথা দাও ঋতুও আসছে ; তারপর তোমার কথা শুনছি।

নিশ্চয়ই ঋতু আসবে।

এবার বলো, তোমার কী দাবি?

তোমাকেও নিউইয়র্ক আসতে হবে।

সত্যি?

তবে কী তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি?

কথা দিচ্ছি, তোমরা নিউইয়র্ক থাকতে থাকতেই আমি একবার ঘুরে আসব।

ভাই রিপোর্টার, মানুষের জীবন পথ যে কখন কোথায় মোড় ঘুরবে, তা কেউ জানতে পারে না। নবেন্দুবাবুর পাঠানো একটা প্যাকেট দিতে এসে বাদল আমার বন্ধু হলো, ভাই হলো। নিউইয়র্ক যাবার পথে ঋতু এসেছিল। কথা ছিল, তিনদিন থাকবে কিন্তু সাতদিন পরে ওরলি এয়ারপোর্টে বলেছিল, এখন মনে হচ্ছে আরো ক'দিন থাকলেই ভালো হতো।

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে বললাম, আমার তো মনে হচ্ছে, তুমি না এলেই ভালো হতো।

ঋতু জোর করেই একটু হাসল। তারপর বিদায় নেবার ঠিক আগে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে বললো, বেশি দেরি করো না ; তাড়াতাড়ি এসো।

সত্যি বলছি ভাই, আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি আমি আমেরিকা যাব। তুমি তো জানো লন্ডন-প্যারিসের রাস্তার মোড়ে মোড়ে সস্তায় আমেরিকা ঘুরে আসার বিজ্ঞাপন। আমি কোনোদিন ভুল করেও ওসব বিজ্ঞাপন দেখতাম না। প্রয়োজন মনে করিনি। মনে হতো আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরের দরকার কী?

বাদল আর ঋতুর সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে রাস্তাঘাটে পত্রপত্রিকায় শুধু ওই বিজ্ঞাপনগুলোই আমার চোখে পড়তে শুরু করল। তারপর ওদের দুজনের কয়েকটা চিঠি আসার পর আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সত্যি সত্যি ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার ফ্রান্সের প্লেনে নিউইয়র্ক রওনা হলাম!

বিধাতা পুরুষ সত্যি বিচিত্র। ডক্টর সরকারের চিঠি দিয়ে এলেন নবেন্দু ; নবেন্দুবাবুর পাঠানো কিছু জিনিসপত্র দেবার জন্য এলো বাদল—মিঃ এস কে ব্যানার্জি আই-এফ-এস। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে স্থায়ী ভারতীয় মিশনের সেকেন্ডে সেক্রেটারি। এলো ঋতু। জন এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে ওরা যেভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করল, তাতে মনে হলো ওরা যেন কত কালের পরিচিত, কত আপন, কত ঘনিষ্ঠ।

সেই প্রথম দিন রাত্রেই ডিনার খেতে খেতে বাদল বললো, কবিতা, শনিবারই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

কোথায়?

কোথায় আবার? ঘুরতে।

না, না, আমি কোথাও যাচ্ছি না।

কেন?

আমি তো আমেরিকা দেখতে আসিনি ; এসেছি তোমাদের দেখতে। ক'টা দিন তোমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেই বেশ কেটে যাবে।

বাদল আবার আমাকে প্রশ্ন করল, সত্যি কোথাও যেতে চাও না?

আমি হেসে বললাম, ছেলেবেলায় ভেবেছিলাম, ঢাকার সদর ঘাট আর রমনা দেখেই বেশ জীবনটা কেটে যাবে। যখন কলকাতায় এলাম, তখন মনে হয়েছিল, ওখানেই সারা জীবন থাকব।...

বাদল আমার মুখের কথা কেড়ে বললো, তারপর কলকাতা থেকে এলে লন্ডন, লন্ডন ছেড়ে এলে প্যারিস। তাই আর দেশ দেখার শখ নেই, তাই তো?

বললাম, জানি না, ভগবান আমাকে আরো কত ঘোরাবেন। তাই নিজের উদ্যোগে আর ঘুরতে চাই না। ক'টা দিন তোমাদের দুজনকে বিরক্ত করেই কাটিয়ে দিতে দাও।

ঋতু একটু চাপা হাসি হেসে বাদলকে বললো, ও কদিন আমাদের বিরক্ত করুক। তুমি আর আপত্তি করো না।

বাদল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, তবে তাই হোক।

জানো ভাই রিপোর্টার, বেশ কাটছিল দিনগুলো। গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টা, মাঝ রাত্তিরে টাইমস্ স্কোয়ার-ব্রডওয়েতে ঘুরে বেড়িয়ে প্রথম সপ্তাহটা বেশ কাটল। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হলো নেমন্তন্নর পালা।

সেদিন পাকিস্তান মিশনের মিঃ আলমের বাড়িতে আমাদের ডিনারের নেমন্তন্ন। বাদল যখন সিঙ্গাপুরে, মিঃ আলমও তখন ওখানে ছিলেন। বাদলের মতো উনিও বিশুদ্ধ বাঙালি। ওদের বন্ধুত্বের আরো একটি কারণ ছিল। আলম সাহেবের মতো ঋতুদেরও দেশ ছিল বরিশালে। সুতরাং আলম সাহেব আর ওর স্ত্রী পারুল এসে আমাকে নেমন্তন্ন করলে আমি সানন্দে তা গ্রহণ করলাম।

ওই আলম সাহেবের ডিনারেই ইউনাইডেট নেশনস-এ কর্মরত কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ হলো। তাদেরই একজন মিঃ মুখোপাধ্যায়। বয়স পঞ্চাশের ঘরে। রঙটা একটু ময়লা হলেও সুপুরুষ। চিরকুমার। উনি বলেন, স্কচ, হুইস্কির প্রেমে পড়ার পর জীবনের সব অভাব মিটে যায়। তাই আবার বিয়ে করে শুধু শুধু ঝামেলা বাড়াই কেন?

ঋতু আমার পাশে এসে হাসতে হাসতে ওকে দেখিয়ে বললো, জানো কবিতা, মুখোদার হাতের চিকেন কারি খেলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।

আমি বললাম, তাই নাকি?

ঋতু বললো, শনিবার তো মুখোদার ওখানে যাচ্ছি। তখন দেখো।

শনিবার মিঃ মুখোপাধ্যায়ের আস্তানায় ডিনার খেতে গিয়েই কথায় কথায় হঠাৎ বাদল ওকে বলল, আচ্ছা মুখোদা, কবিতা তো ইউনেস্কোতে কাজ করছে ; ওকে ইউ এন হেড কোয়ার্টাসে আনা যায় না?

মিঃ মুখোপাধ্যায় হাসতে হাসতে বললেন, স্কচ খেলে ও খাওয়ালে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়।

ঋতু বললো, ক' বোতল চাই?

মিঃ মুখোপাধ্যায় হেসে বললেন, আগে থেকে কী বলা যায়? আগে আমি খবর করি ; তারপর তুমি আমার সেলার ভরে নিও।

আমি বললাম, না, না, আমার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি প্যারিসেই বেশ আছি।

বাদল আর ঋতু প্রায় একসঙ্গে বললো, তুমি চুপ করো।

জীবনে যা কোনোদিন ভাবিনি, আশা করিনি, তা আবার ঘটল। ওই বাদল আর ঋতুর আগ্রহে এবং মিঃ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে ছ'মাস পরে আমি প্যারিস ছেড়ে নিউইয়র্কে চলে এলাম।

তারপর?

ক'টা মাস সত্যি আনন্দে কাটালাম। কর্মক্ষেত্র ইউনাইটেড নেশনস্ হেড কোয়ার্টার্স। সারাটা দিন সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষের মিলন তীর্থে বেশ আনন্দে ও উত্তেজনার মধ্যে কেটে যায়। কখনও কাছ থেকে, কখনও দূর থেকে দেখি বিশ্বের বরেণ্য নেতাদের। চোখের সামনে ঘটতে দেখি এমন অনেক ঘটনা যা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। এর উপর আছে বাদল আর ঋতু।

সত্যি বলছি ভাই, নিউইয়র্কে আসার পর প্রথম কিছুকাল কি নিদারুণ আনন্দে দিন কাটিয়েছি তা তোমাকে লিখে বোঝাতে পারব না। ইতিমধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মিঃ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে আরো কয়েকজনের সঙ্গে ; আর আলাপ পরিচয় হয়েছে বহুজনের সঙ্গে।

তারপর হঠাৎ একদিন বাদল ফার্স্ট সেক্রেটারি হয়ে চলে গেল রাওয়ালপিণ্ডি। যে জন. এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে ওরা আমাকে অভ্যর্থনা করেছে, সেই এয়ারপোর্টেই আমি চোখের জলে বিদায় জানিয়ে এলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলাম আর ভাবছিলাম, ভগবান কী আমাকে নিঃসঙ্গ না রাখলে শান্তি পান না। আরো কত কী ভাবছিলাম আর কাঁদছিলাম ; কাঁদছিলাম আর ভাবছিলাম।

হঠাৎ মিঃ মুখোপাধ্যায় এসে হাজির।

অবাক হয়ে আমি বললাম, আপনি? এ সময়?

মিঃ মুখোপাধ্যায় একটু হেসে বললেন, আজ আপনার মনের অবস্থা চিন্তা করেই চলে এলাম।

ভালোই করেছেন।

কেন বলুন তো?

আজ একলা একলা থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।

উনি আর কোনো ভূমিকা না করেই বলেন, নাউ গেট আপ। চলুন বেরিয়ে পড়ি।

কোথায়?

আমার ওখানে।

আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে ওর ওখানে চলে গেলাম। তারপর উনি আমাকে হুইস্কি অফার করতেই বললাম, আমি তো বিশেষ খাই না।

উনি বললেন, আজ আর আপত্তি করবেন না। দেখবেন, ভালোই লাগছে।

আমি একটু হাসি।

উনি গেলাস তুলে বললেন, ফর ইওর হ্যাপিনেস।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাস তুলে বললাম, ফর ইওর হ্যাপিনেস অ্যাজ ওয়েল।

সত্যি বলছি ভাই, বেশ কেটে গেল সময়টা। দু'তিন পেগ হুইস্কি খেলাম ; ডিনারও খেলাম। মিঃ মুখোপাধ্যায়ই আমাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিলেন। উনি নীচে থেকেই বিদায় নিচ্ছিলেন কিন্তু আমিই ওকে যেতে দিলাম না। বললাম, না, না, মিঃ মুখোপাধ্যায়, তা হয় না। ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক।

ড্রিঙ্ক!

ইয়েস। ওয়ান ফর দ্য রোড।

গাড়ি থেকে নামতে গিয়েই দুটো পা টলমল করে উঠল। মিঃ মুখোপাধ্যায় তাড়াতাড়ি আমার একটা হাত ধরতেই সামলে নিলাম। এলিভেটরে উপরে উঠে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময়ও উনি আমাকে আলতো করে ধরে নিয়ে গেলেন।

তারপর মিঃ মুখোপাধ্যায়কে ড্রিঙ্ক অফার করতেই উনি বললেন, আপনাকেও সঙ্গ দিতে হবে।

না, না, আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। আর এক পেগ খেলেই আমি বেসামাল হয়ে পড়ব।

এখন আর ভয় কী? এখন তো নিজের অ্যাপার্টমেন্টে এসে গেছেন।

তা ঠিক কিন্তু...

কোনো কিন্তু নয়। আমি একা একা ড্রিঙ্ক করব না। জাস্ট এ পেগ ওনলি। আপনি শুয়ে পড়বেন ; আমিও চলে যাব।

কী আর করব? এ পেগ খেতেই হলো। মিঃ মুখোপাধ্যায় কোনো অশালীন ব্যবহার করলেন না। বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে শুধু আমার চিবুকে একটা চুমু খেলেন। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

বাদল-ঋতু না থাকায় উনিই আমার একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠলেন। দুজনেই ইউনাইটেড নেশনস'এ কাজ করি। রোজ না হলেও প্রায়ই ক্যাফেটেরিয়ায় দেখা হয়। একসঙ্গে কফি খাই, গল্পগুজব করি। ওর সাহায্যে আমার ছোটখাটো সমস্যার সমাধান হয়। উইক-এন্ডে উনি আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসেন ; খাওয়া-দাওয়া করেন। আমিও ওর ওখানে সারাদিন কাটিয়ে আসি।

বেশ কেটে গেল ছ' সাত মাস। তারপর ওরই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় আমি ইউ. এন. স্পেশ্যাল কমিটিতে আসি। মাইনেও বেড়ে গেল অনেক। সেই সঙ্গে সম্মান ও সুযোগ। বয়সের ব্যবধান ভুলে আমরা সত্যি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম।

তারপরের ইতিহাস শুনতে চাও? হাজার হোক তুমি আমার আদরের ভাই ; আমি তোমার দিদি। সব কথা বলতে পারব না। বোধহয় প্রয়োজনও নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, মিঃ মুখোপাধ্যায় তিলে তিলে আমাকে গ্রাস করলেন। উনি ওর কামনা-বাসনার আগুনে আমাকে জ্বালিয়ে প্রায় সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়ে আমার জীবন থেকে হঠাৎ বিদায় নিলেন। আমি রাগে-দুঃখে প্রায় হতবাক হয়ে গেলাম। আত্মহত্যা করতে গিয়েও পিছিয়ে এলাম। মনে হলো, ওই একটা পশুর উপর অভিমান করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কোনো যুক্তি নেই, কোনো সার্থকতা নেই।

পুরুষদের উপর তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণা নিয়ে আমি আবার নতুন করে বাঁচতে চাইলাম। কিন্তু ভাই, এই পুরুষ-শাসিত সমাজে তো বেশি দিন পুরুষদের থেকে দূরে থাকা যায় না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পুরুষদের কাছে মেয়েদের যেতেই হবে। না যেয়ে কোনো উপায় নেই। আমার মতো নিঃসঙ্গ ও চাকুরিজীবি মেয়ের পক্ষে তো পুরুষদের এড়িয়ে চলা নিতান্তই অসম্ভব।

ভাই রিপোর্টার, তোমার কাছে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব, আমার জীবনে আরো অনেকে এসেছেন। দু, একজন প্রথিতযশা ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ আমার রূপ যৌবনের

কাছে এমন নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন যে ভাবতে গেলেও আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠি। শুধু তোমার কাছেই বলেছি, স্বীকার করছি, কখনও কখনও আমার দেহ ও মন এমন বিদ্রোহ করে উঠেছে যে আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি সদ্য পরিচিত বন্ধুদের কাছে।

একটা পুরনো কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন আগে মার এক দূর সম্পর্কের মাসি আমাকে আপাদ-মস্তক দেখার পর বলেছিলেন, হারামজাদী, তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দিদি, তুমি একথা বলছ?

ওরে হারামজাদী, তোর যা রূপ, তোর যা শরীর, তাতে কী পুরুষরা তোকে শান্তিতে থাকতে দেবে?

বাজে কথা বলো না।

ওরে হতাভাগী, মেয়েদের এমন সর্বনাশা রূপ, এমন ডাগর-ডোগর দেহ থাকা যে কী অভিশাপ, তা পরে বুঝবি।

আমার সেই দিদিমার কথাটা আমি সেদিন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে আমি মর্মে মর্মে বুঝেছি, মনে মনে স্বীকার করেছি, মেয়েদের রূপ-সৌন্দর্য সত্যি মহা অভিশাপ।

সেই বেশ ক'বছর আগে কাকাবাবু থেকে শুরু করে অনেক পুরুষের সঙ্গেই অনেক খেলাই খেলতে হলো। অনেকে আমাকে শিকার করলেন ; আমিও কাউকে কাউকে শিকার করে মনের জ্বালা, দেহের দাবি মিটিয়েছি। সত্যি বলছি ভাই, আর ভালো লাগছে না। এখন আমার দেহে মনে নতুন জ্বালা, নতুন স্বপ্ন, নতুন দাবি ; এখন আর আমার এই দেহ কোনো কামনা-জর্জরিত হিংস্র পশুর কাছে বিলিয়ে দিতে পারি না, পারব না কিন্তু এই এত বড় পৃথিবীতে এমন একজন পুরুষও কী নেই যে আমাকে আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে নিয়ে আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারে? আমাকে সমস্ত অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? রাতের অন্ধকারে আমাকে তাঁর বলিষ্ঠ দুটো হাতের মধ্যে, বুকের কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিতে পারে?

তুমিই বলো ভাই, এই পৃথিবীতে কী এমন একজনও উদার মহৎ পুরুষ নেই যিনি আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেন? আমাকে অন্তত একটা সন্তানের জননী হবার গৌরব দান করতে পারেন?

মনে হয়, এই মাটির পৃথিবীতে এমন উদার, মহৎ পুরুষ নেই। এই সংসারের চরম ব্যাভিচারি পুরুষও সতী-সাবিত্রীর মতো স্ত্রী আশা করেন। তাই তো আমি জানি, আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবেন না কেউ ; আমাকে উপভোগ করার মতো পুরুষের অভাব নেই কিন্তু আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সন্তানের মা হবার গৌরব দান করতে সবারই কুণ্ঠা, সবারই দ্বিধা।

মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? মনে হয়, চিৎকার করে সবকিছু বলে দিই। যারা আমাকে উপভোগ করার পরও সুখে শান্তিতে সংসার করছেন, তাঁদের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিই। যেসব গুণী, জ্ঞানী, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা আমার কাছে এসে বার বার ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের মুখোশ খুলে দিই। একবার তো একজন শ্রদ্ধেয় ভারতীয় নেতা ভোরবেলায় আমার বেডরুম স্লিপার পরেই এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে চড়ে দেশে রওনা হয়েছিলেন। তোমাকে কী বলেছি, আমার কাছে বহু গুণী-জ্ঞানী ও যশস্বী নেতার অসংখ্য অশ্লীল প্রেম-পত্র আছে?

এসব কথা বাইরে কাউকে বলিনি, বলব না। বলে কী লাভ? আমি সুখী হলাম না বলে পাঁচজন সুখী মেয়ের সংসারে আগুন লাগাব কেন? নিজের বুকের জ্বালা নিজের বুকের মধ্যেই

চেপে রেখে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছি।

ভাই রিপোর্টার, তোমার ওই তন্বী শ্যামা শিখরদশনা'র সন্তান হলে তারা যেন আমার স্তন্যপান করে আমাকে মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ দেয় ; ওরা যেন আমাকে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত না করে।

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

—তোমাদের দিদি

ব্যাচেলার



অক্সফোর্ড স্ট্রিটে কিছু কেনাকাটা করে রাস্তা পার হয়ে বন্ড স্ট্রিট টিউব স্টেশনে ঢুকতে গিয়েই মুখোমুখি দেখা। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বললাম, 'আপনি?'

দেবব্রত হাসতে হাসতে বললো, 'আমি তো বহুদিনই এখানে। আপনি কবে এলেন?'

'প্রায় দু'সপ্তাহ হতে চললো। এবার তো ফেরার পালা।'

'সে কি? এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাবেন?'

'ফেরার পথে কয়েক জায়গায় স্টপওভার করব বলে পরশুই রওনা হচ্ছি।'

অজস্র যাত্রী আসা-যাওয়া করছেন। দেবব্রত আমার হাত ধরে একটু পাশে সরে গিয়ে বললো, 'পরশু যাওয়া হচ্ছে না।'

'একটু আগেই রিজার্ভেশন করে এলাম।'

'দ্যাটস নাথিং। ক্যানসেল করে দিলেই হবে।' তারপর হাসতে হাসতে বললো, 'এতকাল পরে দেখা হলো আর আমার হাতের রান্না না খাইয়েই ছাড়ব?'

আমি বললাম, 'খেলে রঞ্জনার হাতের রান্নাই খাব।'

'রঞ্জনা তো এখানে আসেনি। ও দিল্লিতেই...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

আমার হাতে টুকিটাকি কয়েকটা প্যাকেট। তাছাড়া বন্ড স্ট্রিট-টিউব স্টেশনে দাঁড়িয়ে কথা বলাও অসম্ভব। দেবব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'হোটেলে।'

'কোনো হোটেলে? সেই স্ট্রান্ড...'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হোটেলে আসবেন?'

'আপনি থাকবেন?'

'থাকব। আজ আর কোথাও বেরুচ্ছি না।'

দেবব্রত হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'সেকি? লন্ডনে এসে সন্ধেবেলা হোটেলে শুয়ে কাটাবেন?'

'কি করব? কদিন এত পরিশ্রম করতে হয়েছে যে আজ আর একটু রেস্ট না নিয়ে পারছি না।'

'কোনো পুরনো বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন নেই?'

'ছিল কিন্তু তাকে বললাম কাল যাব।'

'কিন্তু আমি এলে তো আপনার বিশ্রাম হবে না।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'পরিশ্রমও হবে না।'

'দেন আই অ্যাম কামিং। এই ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আসছি।'

'আসুন। গল্প করা যাবে।'

আমি তর তর করে নিচে নেমে গেলাম। দেবব্রত অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ভিড়ে মিশে গেল।

ঠিক পনের বছর আগেকার কথা। নেহরুর সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স কভার করতে এসেছি লন্ডনে। তাছাড়া প্রথমবার লন্ডন দেখছি। বেশ চঞ্চল। প্রায় উত্তেজিত। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মার্লবোরা হাউসেই কাটাই। মাঝে মাঝে সময় পেলেই রাস্তার ওপাশে গিয়ে সেন্ট জেমস প্যালেসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাই আর মনে মনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের কয়েকটা পাতা উল্টে যাই। ইংল্যান্ডের ইতিহাসের কত অবিস্মরণীয় চরিত্র এখানে বাস করেছেন। সপ্তম হেনরি, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, এলিজাবেথ, মেরী। প্রথম চার্লস ফাঁসির মঞ্চে চড়ার আগে এই সেন্ট জেমস প্যালেসের চার্চেই মহামতি যীশুর নাম স্মরণ করে ঈশ্বরের কাছে তাঁর শেষ প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আমাদের কোহিনূর মাথায় নিয়ে এখানেই শপথ নিয়েছেন সপ্তম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ, ষষ্ঠ ও আজকের রানী এলিজাবেথ দ্য সেকেন্ড। এই সেন্ট জেমস প্যালেসের এক ব্যালকনি থেকেই রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রথম ঘোষণা করা হয়, দ্য কিং ইজ ডেড! লং লিভ দ্য কিং! এখনও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের পরিচয় পত্রে লেখা থাকে 'অ্যাম্বাসেডর টু দ্য কোর্ট অব সেন্ট জেমস'! অথবা অন্য কোনো জার্নালিস্টের সঙ্গে গল্প করি। একটু বেশি সময় পেলে ল্যাংকাস্টার হাউস পেরিয়ে বাকিংহাম প্যালেসের আশেপাশে অহেতুক ঘোরাফেরা করি। বাকিংহাম প্যালেসের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি কিন্তু যতটা ভালো লাগবে আশা করেছিলাম, তা লাগে না। সেন্ট জেমস প্যালেস, মার্লবোরা হাউস বা অন্যান্য রাজপ্রাসাদের মতো বাকিংহাম প্যালেস দেখে ইতিহাস মনে পড়ে না; তবে সামনের ভিক্টোরিয়ার পাথরের মূর্তিটা দেখতে ভালো লাগে। ইতিহাসের অনেক স্মৃতি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রথমবার বিলেত দেখতে এসে সব কিছুর সঙ্গে ইতিহাস আর মনের ছবি মিলিয়ে নিতে গিয়ে কোথাও ভালো লাগে, কোথাও দুঃখ পাই। বিকেলে নিউজ পাঠাবার পরই হোটেলে আসি। স্নান করি। কালো স্যুট-টাই পরে আবার বেরিয়ে পড়ি। রিসেপসন, কক্‌টেল, ডিনার। রোজই কিছু না কিছু থাকে। শুরু হয়েছে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের প্রেস রিসেপসন দিয়ে। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরই সাংবাদিকদের সম্মানে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের পার্টি। মার্লবোরা হাউসের পিছনের গার্ডেনের প্রবেশ পথে স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার নিজ হাতে তুলে দেন ড্রিঙ্ক। হুইস্কি, জিন, ব্রান্ডি, বিয়ার। তারপর কোনোদিন অস্ট্রেলিয়া হাউসে আর ঘানা হাই-কমিশনে, কোনোদিন স্যাভয় বা ক্লারিজ হোটেলে। অথবা কেনসিংটন গার্ডেনে ইন্ডিয়ান হাই-কমিশনারের বাড়িতে স্কচের গেলাস হাতে নিয়ে কাশ্মীরী কার্পেট বা ইন্দ্রাণী রহমানের ওডিসি নাচের আলোচনা থেকে আয়ুব—সিকিউরিটি কাউন্সিল ডিঙিয়ে একেবারে ভারতীয় সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের ডিপ্লোম্যাটরা। এসব শেষ হলেও ছুটি পাই না। কোনো না কোনো আড্ডায় আটকে পড়ি। তারপর হোটেলের রিসেপসনে এসে ঘরের চাবির জন্য হাত বাড়িয়ে সামনের বড় ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে। দু চার পেগ হুইস্কি পেটে থাকলেও চমকে উঠি। দুটো! আড়াইটে!

ছটা দিন এভাবেই কেটে গেল। পরের দিন সকালে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনারের বাড়িতে মস্কো-বন-প্যারিসের ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডরদের সঙ্গে নেহরু ঘণ্টা দুই আলাপ-আলোচনা করলেন। তারপর প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের নানা সমস্যা নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। প্রাইম মিনিস্টারের সম্মানে ইন্ডিয়ান হাই-কমিশনারের লাঞ্চের সময় নেহরু নিজেই কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে এসে বললেন, 'ডু ইউ নো আই উইল বী মিটিং আওয়ার স্টুডেন্টস অ্যাট ফোর—পাঁচটায় নয়।'

প্রাইম মিনিস্টারের প্রোগ্রাম চেঞ্জ হওয়ায় আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

হোয়াই দিস চেঞ্জ, স্যার?'

নেহরু হাসতে হাসতে বললেন, 'ভয় নেই, নট সাইনিং এনি এগ্রিমেন্ট উইথ পাকিস্তান অ্যাবাউট কাশ্মীর।'

আমরাও হাসলাম।

নেহরু এবার বললেন, 'কিছু বন্ধুবান্ধব দেখা করতে আসবেন বলেই পাঁচটার বদলে চারটার সময় স্টুডেন্টদের সঙ্গে মীট করব।'

পনের বছর আগেকার কথা হলেও আমার সব কিছু স্পষ্ট মনে আছে। ভারি মজা হয়েছিল ঐ মিটিং-এ।

প্রথমে নেহরু একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। কিছু উপদেশ। শেষে একটি অনুরোধ, তোমাদের অনেকেরই জ্ঞান, বুদ্ধি দেশের কাজে নিয়োজিত হলে ভারতবর্ষের অসংখ্য মানুষের কল্যাণ হবে। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটু ক্ষতি স্বীকার করেও দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করব।

এরপর শুরু হলো ছাত্রদের প্রশ্ন, নেহরুর উত্তর। নানা বিষয়ে নানা প্রশ্ন। দু' চারজন ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করলেন, অনেকেই দেশে গিয়ে চাকরি না পেয়ে ফিরে এসেছেন।

নেহরু বললেন, 'সবাইকে চাকরি দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে ইন্ডিয়া ইজ ভেরি ফাস্ট ডেভলপিং ইন্টু এ মডার্ন নেশন এবং সেজন্য সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির ছাত্রদের আমাদের বেশি দরকার।'

সঙ্গে সঙ্গে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

নেহরু হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'ইয়েস, মিঃ ইয়াংম্যান।'

'স্যার, আমি ইলেকট্রনিক্সের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স পড়ছি কিন্তু আমাদের দেশে ইলেকট্রনিক্সের বিশেষ উন্নতি হয়নি বলে আমরা অনেকেই বেশ চিন্তিত।'

নেহরু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তোমরা চাকরি পাবেই কিন্তু বাইচান্স যদি না পাও তাহলে আই উইল অ্যাপয়েন্ট ইউ অ্যাজ মাই ইলেকট্রনিক্স অ্যাডভাইসার।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রটি আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আই অ্যাম সিওর ইউ উইল নট প্রমোট মী টু বী মিনিস্টার অব ইলেকট্রনিক্স।'

আবার হাসি।

হাসতে হাসতেই নেহরু জবাব দিলেন, 'ভুল করে তোমাকে মন্ত্রী করলেও আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি প্রথম সুযোগেই তোমাকে ড্রপ করব।'

হাসিতে ফেটে পড়লেন সবাই।

আরো কত জনের কত রকমের প্রশ্ন! লন্ডনের আবহাওয়াই এমন যে কেউই কিছু মনে করেন না।

'স্যার, দেশে ফিরে যাবার সময় যদি বিদেশিনী স্ত্রীকে নিয়ে যাই?'

চেয়ারে নয়, টেবিলের উপর বসে হাসতে হাসতে প্রাইম মিনিস্টার বললেন, 'যদি কেন, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে কিন্তু সঙ্গে কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জ আর স্কচের বোতল নিয়ে যেতে ভুল না। ইন্ডিয়াতেও দুটোরই বড় অভাব।'

হাসি।

'স্যার! দশ বছর এখানে থাকার পর দেশে ফিরে গেলে সব শহরই নোংরা মনে হবে। আমাদের শহরগুলোর কি উন্নতি করা যায় না?'

'আমি সব কিছু করে গেলে তুমি প্রাইম মিনিস্টার হয়ে কি করবে?'

হাসি।

'স্যার।' চিৎকার করল একটা ছেলে, 'ডু ইউ থিংক উই উইল গেট ব্যাক অকুপায়েড ক্যাশমীর?'

'ফিরে না পেলে ফিরিয়ে নেব।'

সভার শেষে ছাত্রছাত্রীরা অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে প্রাইম মিনিস্টারকে ঘিরে ধরলেন। অটোগ্রাফ দিতে দিতে নেহরু টুকটাক ঠাট্টা করতে করতে হঠাৎ ইন্ডিয়ান হাই-কমিশনারের দিকে ফিরে বললেন, 'ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট মাই ইলেকট্রনিক্স মিনিস্টার?'

পনের বছর আগেকার কথা হলেও আমার সব কিছু মনে আছে। কিচ্ছু ভুলিনি। হাই কমিশনার নিজে খোঁজখবর করে ছেলেটিকে ভিড়ের মধ্যে থেকে নিয়ে এলেন প্রাইম মিনিস্টারের সামনে। প্রাইম মিনিস্টার ওর সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলতে বলতে এগুতে গিয়ে সামনে কয়েকজন ফটোগ্রাফারকে দেখে বললেন, 'তোমাদের ক্যামেরায় কি ফিল্ম নেই যে, আমার ইলেকট্রনিক্স মিনিস্টারের সঙ্গেও আমার একটা ছবি তুলছ না?'

পরের দিন লন্ডনের বহু মর্নিং পেপারেই এই ছবিটা ছাপা হয়েছিল। দিল্লিতে ফিরে আসার পর দেখেছিলাম, জেনেছিলাম ভারতবর্ষের নানা কাগজেও এই ছবি ছাপা হয়েছে।

দেবব্রত চৌধুরীকে সেই প্রথম দেখি কিন্তু সেদিন আলাপ হয়নি। সুযোগ হয়নি। তাছাড়া হাতে সময় ছিল না।

পরের দিন নেহরু দিল্লির পথে কায়রো রওনা হলেন। আমি গেলাম না, থেকে গেলাম। তিন চার দিন পরে এক সাংবাদিক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে হোবর্ন টিউব স্টেশনে দেবব্রত চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা। প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। নেহরুর ঐ মিটিং-এ দূর থেকে ভালো লেগেছিল, সাক্ষাৎ পরিচয়ে আরো অনেক বেশি ভালো লাগল।

উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লন্ডনে কতদিন থাকবেন?'

বললাম, 'ইচ্ছে আছে আরো দিন পনের থাকার, তবে আগেও ফিরে যেতে পারি।'

'না না, আগে ফিরে যাবেন কেন? এত দূর দেশে এসে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না।'

'তা ঠিক কিন্তু চাকরি আছে যে।'

দেবব্রত চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, 'জার্নালিজমের মতো সুখের চাকরি আছে নাকি?'

আমি হাসলাম। 'টিউব স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বেশি তর্ক করা যায় না। আমি স্ট্রান্ড কন্টিনেন্টালে আছি। কাল বিকেলের দিকে আসুন গল্পগুজব করার পরে নিচের তলার ইন্ডিয়া ক্লাবের রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে মাছ-ভাত খাওয়া যাবে।'

প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না আমার আমন্ত্রণ। 'আচ্ছা আসব।'

আমি বললাম, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

নোট বই—পেন্সিল আর টাইপ রাইটার নিয়ে ঘুরছে কত শহর-নগর গ্রাম-গঞ্জ। ঘুরছি স্বদেশে বিদেশে। দেখছি কত মানুষ, মিশছি বহুজনের সঙ্গে। কাউকে ভালো লাগে, কাউকে লাগে না। টাইপ রাইটার খটখট করে নিউজ টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যাই অধিকাংশ মানুষকে। সামান্য মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্মৃতি একটু বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় কিন্তু তারপর ভুলে যাই। মুছে যায় সব স্মৃতি। হঠাৎ কদাচিৎ কখনও দু-একজনের দেখা পাই যারা আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে। নেহরুর মিটিং-এ ওই কয়েক

মিনিটের মধ্যেই দেবব্রত চৌধুরী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অনেক ছেলে-মেয়ের বুদ্ধি থাকে, চালাক হয়, স্মার্ট হয় কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে একটা মাধুর্য? আপন বৈশিষ্ট্য? বড় কম। সর্বত্রই। বিশেষ করে লন্ডন প্রবাসী ভারতীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে আরো কম।

টেলিফোনের বেল বাজতেই রিসিভার তুললাম। রিসেপসন থেকে মেয়েটি বললো, 'স্যার, মিঃ চাউডারী ইজ হিয়ার।'

'ডু প্লীজ সেন্ড হিম টু মাই রুম।'

একটু পরেই দরজায় নক করার আওয়াজ হলো। দরজা খুলেই বললাম, 'আসুন, আসুন।'

দেবব্রত ঘরে না ঢুকেই বললো, 'আমাকে তুমি বলাটাই বোধহয় বেশি সমীচীন হবে, তাই না?'

'আগে ভিতরে আসুন। তারপর...'

'ঘরে যখন ডাকছেন তখন ঘরের মতো করে নেওয়াই কি ঠিক নয়?'

'ইলেকট্রনিক্স ছাড়াও আপনি কি টেম্পলস ইন-এ ব্যারিস্টারি পড়ছেন?'

দেবব্রত আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'ইন ফ্যাকট, দাদা আমাকে ব্যারিস্টার করতেই চেয়েছিলেন।'

'ইলেকট্রনিক্স পড়ছেন কি বাবার অনুরোধে নাকি নিজের ইচ্ছায়?'

'আমার বাবা নেই। আমার খুব ছেলেবেলায় উনি মারা যান।'

কথাটা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'মা আছেন তো?'

'না, তিনিও নেই।'

দেবব্রত অত্যন্ত সহজভাবে বললেও আমার মুখ থেকে হাসির শেষ রেশটুকুও উবে গেল। মিনিটখানেক বোধহয় মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর আলতো করে ওর একটা হাত ধরে খুব নিচু গলায় বললাম, 'বসুন।'

দু-চার মিনিট দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম। তারপর দেবব্রতই প্রথম কথা বললো, 'বাবা-মা না থাকা নিঃসন্দেহে দুঃখের কিন্তু দাদা আমার সব অভাব দুঃখ ভুলিয়ে দেন।'

'দাদা বুঝি আপনাকে খুব ভালোবাসেন?'

দেবব্রত হাসল। ভালোবাসেন বললেই দাদার ভালোবাসা বোঝান যায় না। আমার দাদার মতো দাদা বোধহয় আর কেউ পায়নি, পাবে না।' উনি আবার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, 'হি ইজ সিম্পলি ইউনিক।'

দাদার কথা বলতে বলতে ওর সারা মুখখানা আনন্দে, গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবা-মা নেই বলে সামান্যতম দুঃখের চিহ্ন সে মুখে দেখলাম না। একটু বিস্মিত হলাম। চন্দ্র-সূর্যের মতো বাবা-মার অভাব নাকি অপূরণীয়। এতকাল এই কথাই শুনে এসেছি, জেনে এসেছি কিন্তু আজ দেবব্রতকে দেখে বুঝলাম, না তা নয়। হিমালয়ের বুক চিরে গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে। তার দুধারে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির, তীর্থক্ষেত্র। সে চির পবিত্র। সুখে-দুখে আনন্দ-উৎসবে জীবনে-মরণে গঙ্গার অনন্য ভূমিকা অনস্বীকার্য কিন্তু গোদাবরী-কাবেরী, নর্মদা-সিন্ধুও কম পবিত্র নয়। ওদের, দুধারেও অসংখ্য বিগ্রহের মন্দির আছে, আছে তীর্থক্ষেত্র।

'গঙ্গা তীরে বাস করতে করতে আমরা অনেকেই ভুলে যাই গোদাবরী-কাবেরী নর্মদা-সিন্ধুও সমানভাবে পবিত্র কিন্তু একথা জানতে হলে...'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দেবব্রত বললো, 'গোদাবরী-কাবেরীর দেখা পাওয়া চাই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন কিন্তু সবাই তো দেখা পায় না।'

'ঠিক, কিন্তু আমি পেয়েছি। গোদাবরী-কাবেরী নয়, মানস সরোবর পেয়েছি।'

হঠাৎ অবিশ্বাস্য মনে হলো, 'বলেন কি?'

'বিলিভ মী, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।'

শুনেছি, পড়েছি ভগবতী দেবীকে পেয়েছিলেন বলে বিদ্যাসাগর মশাইকে কোনো বিগ্রহের পূজা করতে হয়নি। দেবব্রত কি বিদ্যাসাগরের মতোই ভাগ্যবান?

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে বললাম, 'নিন।'

'থ্যাঙ্কস। আমি সিগারেট খাই না।'

'তাহলে হোয়াট ক্যান আই অফার ইউ?'

'কিচ্ছু দরকার নেই।'

'খেতে যাবার তো এখনও অনেক দেরি।'

'বেশ তো গল্প করছি। আমার কিচ্ছু লাগবে না।'

'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আই ক্যান অফার ইউ এ ড্রিঙ্ক।'

'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'দিল্লি বা কলকাতা হলে চা-কফি খেতে খেতে গল্প করা যেতো কিন্তু এখানে এক কাপ চায়ের চাইতে এক পেগ হুইস্কি অফার করা অনেক সহজ।'

দেবব্রত হাসল, 'তা ঠিক।'

'আপনি ড্রিঙ্ক করেন কি?'

'করি না বললে মিথ্যা বলা হবে, তবে খুব কম। কদাচিৎ, কখনও আর কি।'

শেষ পর্যন্ত দু গেলাস হুইস্কি নিয়েই দুজনে শুরু করলাম গল্প করতে।

'কোথায় লেখাপড়া করেছেন?'

'দিল্লিতে।'

'সে কি! আপনি দিল্লির ছেলে?'

'হ্যাঁ, তাই বলতে পারেন। দাদা তো দিল্লিতেই থাকেন।'

'বরাবরই দিল্লিতে? আপনার বাবাও দিল্লিতে থাকতেন?'

'শুধু বাবা কেন, আমার গ্রান্ড ফাদারও দিল্লিতে জীবন কাটিয়েছেন।'

'বাংলাদেশের সঙ্গে বোধহয় বিশেষ যোগাযোগ নেই?'

'না, একেবারেই নেই। তবে দাদার সঙ্গে দু'একবার হুগলিতে গেছি।'

'হুগলিতে বুঝি আপনাদের আদি বাড়ি ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার হেড কোয়ার্টার্স কলকাতা থেকে দিল্লি আনার সঙ্গে সঙ্গেই বহু বাঙালী পরিবার বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে চলে আসেন।'

'আমাদের ফ্যামিলি কিন্তু গভর্নমেন্ট মুভ করার জন্য দিল্লি আসে না।'

'তবে?'

'সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং টু।'

দুই

নরহরি চৌধুরী কোম্পানির দপ্তরে নানা ধরনের নথিপত্রের দেখাশুনা করতেন। মাইনে পেতেন অতি সামান্য। বোধহয় সাত বা আট টাকা। দুঃখে-কষ্টে কোনোমতে সংসার চলে। হঠাৎ বুড়ো সাহেব বদলী হয়ে বিলেত চলে গেলেন, এলেন এক ছোকরা সাহেব। দু চার মাস যেতে না যেতেই সাহেব কাজকর্ম দেখা প্রায় ছেড়ে দিলেন। নরহরির উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে সাহেব জানবাজারের এক বড়লোক বাঙালিবাবুর সঙ্গে রোজ বাইজিদের নাচ দেখতে শুরু করলেন। খুব জরুরী কাজকর্ম থাকলেও নরহরি নথিপত্র নিয়ে বাইজি বাড়ি হাজির হয়ে সাহেবের শরণাপন্ন হতো। খুব বেশি মদ না খেলে সাহেব নথিপত্র সই করে নরহরিকে বিদায় করতেন কিন্তু মদ্যপান একটু বেশি হলে বা বাঈজির নাচ বেশি জমে উঠলেই মুশকিল হতো। সাহেব নথিপত্রে সই তো দিতেনই না, উপরন্তু নরহরিকেও আটকে রাখতেন।

নরহরি মদ্যপান করতেন কিনা বা বাইজিদের সঙ্গে তার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিনা, তা কেউ জানে না। তবে একথা সবাই জানে জাল নথিপত্রে সাহেবের দস্তখত করিয়ে নেবার ফলেই দীনদুঃখী নরহরি আহিরীটোলার বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়। আস্তে আস্তে আরো অনেক কিছু হলো। আহিরীটোলার সম্পত্তি ছাড়াও নিমতলা আর কালীঘাটের অনেক বাড়ি ও জমিজমা হলো। হুগলির গ্রামের বাড়ি পাকা করার সময় হলো না নরহরির, কিন্তু সে অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করলেন তার ছেলে শ্রীহরি চৌধুরী।

দেবব্রত হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আগে আমাদের দেশের কোনো বড়লোকই বোধহয় জোচ্চুরি না করে বড়লোক হননি।'

'এখনও কি জোচ্চুরি না করে আমাদের দেশে বড়লোক হওয়া যায়?' এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে বললাম, 'আগে শুধু জমির মালিকানা এদিক-ওদিক করে বড়লোক হতো, এখন ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পত্তি সব কিছু নিয়েই জোচ্চুরি করে বড়লোক হচ্ছে।'

'তবে মাই ফোর ফাদার নরহরি ওয়াজ এ গ্রেট স্কাউনড্রেল!'

চৌধুরীবাড়ির দীর্ঘ ইতিহাস দেবব্রত জানে না। তবে শুনেছে অনাচার ব্যভিচারের জন্য আস্তে আস্তে চৌধুরীবাড়ির গৌরব ম্লান হতে শুরু করল। বৃন্দাবন চৌধুরী নিজে বিশেষ লেখাপড়া না জানলেও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। শোনা যায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য উনি নিমতলার একটা বাড়ি আর নগদ পাঁচ শ টাকা বিদ্যাসাগর মশাইকে দিয়েছিলেন। বহু আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ উপেক্ষা করে উনি তার বড় ছেলে জনার্দনকে ডাক্তারি পড়ার জন্য বিলেতে পাঠালেন। সাত-আট বছর পর আহিরীটোলার বাড়িতে যেদিন বিলেত থেকে খবর এলো জনার্দন পাস করেছে, সেদিন বৃন্দাবন চৌধুরী বেঁচে নেই। স্ত্রী বহু আগেই গত হয়েছিলেন। আহিরীটোলার বাড়িতে তখন জনার্দনের ছোট ভাই গদাধর কিছু দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের নিয়ে থাকেন আর কলেজে এফ-এ পড়ছেন।

ডাক্তারি পাস করার পরও জনার্দন বিলেতে থেকে গেলেন। লেখাপড়া করার জন্য উনি ছোট ভাইকেও বিলেত যেতে বললেন কিন্তু আত্মীয়দের অনুরোধে ও কিছু বন্ধু-বান্ধবের চাপে গদাধর কলকাতাতেই থেকে গেলেন। বিশেষ করে হেমন্ত মামা কিছুতেই যেতে দিলেন না। হেমন্ত সরকার আপন মামা না হলেও বৃন্দাবন চৌধুরীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বৃন্দাবনবাবুর মৃত্যুর পর ইনিই সম্পত্তির দেখাশুনা করতেন। সুতরাং তার পরামর্শ উপেক্ষা করা গদাধরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আরো একটা বিশেষ কারণ ছিল। বাবা-মা নেই, দাদা বিলেতে। কিছু নেই নেই করেও আহিরীটোলা-নিমতলার সাতখানা বাড়ি ছাড়াও সামান্য কিছু শেয়ার আর বেশ কিছু সোনাদানার

মালিক। কিছু রসিক বন্ধুবান্ধব গদাধরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছিল। এমন সময় হেমন্ত মামা তার এক দূর সম্পর্কের শালীর সঙ্গে গদাধরের বিয়ের প্রস্তাব আনলেন। ক্ষিদের মুখে হাতের কাছে পাকা আমটি পেয়ে গদাধর মামার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে পারলেন না।

'এই গদাধর চৌধুরীই আমার দাদু।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'বছর দুই পরে বড় দাদু দেশে ফিরলেন। ঠিক করেছিলেন কলকাতায় প্র্যাকটিশ করবেন, কিন্তু জাহাজে আসার সময় সব প্ল্যান উল্টে গেল।'

'কেন?'

দেবব্রত হাসল। 'ঐ জাহাজেই কাপুরতলার মহারাজাও দলবল নিয়ে বিলেত থেকে দেশে ফিরছিলেন। মহারাজার এক প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে বড়দাদুর আলাপ হয়। মহারাজার কাছ থেকে ছুটি পেলেই উনি বড় দাদুর সঙ্গে গল্প করতেন। কখনও কেবিনে, কখনও আপার ডেকে। কখনও আবার বার-এ। রাজাদের রাজপ্রাসাদের গল্প শুনতে বড় দাদুর ভারি মজা লাগত।...

মহারাজার পার্সোন্যাল পার্টির জন্য ছ'টা ফার্স্ট ক্লাস কেবিন ছিল। মহারাজা নিজে একটা স্পেশ্যাল ডিল্যুক্স কেবিনে ছিলেন। এছাড়া কয়েকজন সাধারণ কর্মচারী সেকেন্ড ক্লাস কেবিনে ছিলেন। ডাঃ জনার্দন চৌধুরী দেখেশুনে অবাক। 'মহারাজা কি ফ্যামিলি নিয়ে ট্র্যাভেল করছেন?'

প্রাইভেট সেক্রেটারি হাসলেন, 'ফ্যামিলি নিয়ে মহারাজা বিলেত যাবেন? ফ্যামিলি নিয়ে গেলে কি আনন্দ হয়?'

'দেন হু আর ট্র্যাভেলিং উইথ হিম? এতগুলো কেবিনে কারা যাচ্ছেন?'

'ডিল্যুক্স কেবিনে হিজ হাইনেস। চারটি ফার্স্টক্লাস কেবিনে মহারাজার চারজন গার্ল ফ্রেন্ড, ফিফথ কেবিনে আমি আর অন্যটিতে হিজ হাইনেসের একজন এ-ডি-সি।'

'চারজন গার্ল ফ্রেন্ড?'

প্রাইভেট সেক্রেটারি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'হিজ হাইনেস হ্যাজ গট ফোর হানড্রেড গার্ল ফ্রেন্ডস্।'

'মাই গড!'

'মহারাজাস' আর লাইক দ্যাট।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

ডাঃ চৌধুরী স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে ভাবেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেকেন্ড ক্লাস কেবিনে কারা আছেন?'

'গার্ল ফ্রেন্ডদের দুজন লেডি অ্যাটেনডান্ট, হিজ হাইনেসের চারজন পার্সোন্যাল অ্যাটেনডান্ট', আমার একজন অ্যাটেনডান্ট আর একজন ট্রেজারী অফিসার।'

'এই জাহাজেও চারজন পার্সোন্যাল অ্যাটেনডান্ট চাই মহারাজার?'

'দিস ইজ দি লিস্ট রিকয়ারমেন্ট। হিজ হাইনেস যখন প্যালেসে থাকেন তখন প্রত্যেক সিফট-এ পঞ্চাশ জন পার্সোন্যাল অ্যাটেনডান্ট ডিউটি দেয়।'

মন্থর গতিতে জাহাজ চলে। এক পরিবেশ, এক দৃশ্য দেখে দেখে যাত্রীর দল ক্লান্ত হলেও ডাঃ জনার্দন চৌধুরীর দিনগুলো বেশ কেটে যায়। 'এই চারজন পার্সোন্যাল অ্যাটেনডান্টের কি কাজ?'

'একজন হিজ হাইনেসকে ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ফুড সার্ভ করছে, একজন টয়লেট অ্যান্ড বাথ-এ হেলপ করে, একজন হিজ হাইনেসকে জামাকাপড় পরিয়ে দেয় আর একজন নাইট ডিউটি দেয়।'

'টয়লেট আর বাথ-এ কি হেলপ করতে হয়?'

'হিজ হাইনেস কি নিজে নিজে স্নান করবেন?'

'মহারাজাকে স্নান করিয়ে দিতে হয়?'

'অব কোর্স।'

জাহাজ ফ্রেঞ্চ কোস্ট ছাড়ার পরই মহারাজার এক গার্ল ফ্রেন্ডের খুব সিরিয়াস সী সিকনেস হলো। এ-ডি-সি-র কাছে খবর পেয়েই হিজ হাইনেস অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওর পার্সোন্যাল ফিজিসিয়ানকে খবর দিতে বললেন। এ-ডি-সি মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জানালেন, 'ইওর হাইনেস, আপনার পার্সোন্যাল ডাক্তার তো আমাদের পার্টিতে নেই।'

ব্যস! হিজ হাইনেস রেগে লাল। তলব করলেন প্রাইভেট সেক্রেটারিকে। প্রাইভেট সেক্রেটারি কেবিনে ঢুকতেই রাগে ফেটে পড়লেন, 'ডু ইউ থিংক আই অ্যাম এ বেগার? আমি আমার একজন ডাক্তারকে নিয়ে বিলেত যেতে পারি না? জানেন, আমি পুরো একটা জাহাজ ভাড়া করে সারা পৃথিবী চক্কর দিতে পারি? আজ যদি আমার অসুখ হতো, তাহলে? তাহলে কি হতো? কে দেখত? আমি মরে গেলে কে রাজত্ব সামলাবে?' এক নিঃশ্বাসে হাজারটা প্রশ্ন করার শেষে বললেন, 'আপনার মতো প্রাইভেট সেক্রেটারির আমার দরকার নেই। হ্যাঁ, জাহাজের ডাক্তার দিয়ে যেন আমার গার্ল ফ্রেন্ডদের চিকিৎসা না করা হয়।'

প্রাইভেট সেক্রেটারি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে নিবেদন করলেন, 'ইওর হাইনেস! আমি আপনার অনুমতি না নিয়েই বিলেত থেকে একজন অত্যন্ত ভালো ডাক্তারকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি।'

মহারাজা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'রিয়েলি?'

'ইয়েস ইওর হাইনেস!'

'কোথায় সেই ডাক্তার?'

'এক্ষুনি ডেকে আনছি ইওর হাইনেস।'

একটু পরেই প্রাইভেট সেক্রেটারি ডাঃ জনার্দন চৌধুরীকে এনে মহারাজার সামনে হাজির করলেন, 'ইওর হাইনেস, ইনিই আপনার নতুন পার্সোন্যাল ফিজিসিয়ান।'

চৌধুরীবাড়ির গল্প শুনতে শুনতে হাসি পায়।। প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হলেও জানি এমন হতো। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু রাজপ্রাসাদে গেছি, থেকেছি। নানাজনের সঙ্গে মিশেছি, শুনেছি অসংখ্য কাহিনি। এর চাইতেও অনেক অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনি।

গল্প করতে করতে হুইস্কির গেলাস খালি হয়। আমি আবার ভরে নিই, দিই। দুজনেই চুমুক দিই। ও একটু ভাবে। আনমনে একবার জানলা দিয়ে লন্ডনের ঘোলাটে আকাশের দিকে তাকায়।

'বড় দাদুর আর কলকাতায় ফেরা হলো না। বোম্বে থেকে সোজা চলে গেলেন কাপুরতলা। তারপর সিমলা।'

'সিমলায় কেন?'

'মহারাজা বছরের চার-পাঁচ মাস সিমলায় কাটাতেন বলে বড় দাদু ওখানেই থাকতেন। সিমলার কাপুরতলা হাউসে গেলে এখনও বড় দাদুর সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের ছবি দেখতে পাবেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি দাদার সঙ্গে অনেকবার সিমলা গেছি আর প্রত্যেকবার কাপুরতলা হাউসে গিয়ে বড় দাদুর ছবিগুলো দেখেছি।'

শুধু কতকগুলো ফটো নয়, আরো কিছু আছে। এখনও অনেক বৃদ্ধের মুখে ডাঃ জনার্দন চৌধুরীর কথা শোনা যাবে, জানা যাবে অনেক মজার ঘটনা। নতুন বিলেত ফেরত ডাক্তার বলে মহারাজা ওঁকে বেশি পছন্দ করতেন। বিশ্বাসও করতেন অনেক বেশি। সেজন্য মহারানী বা মহারাজার প্রমোদ সঙ্গিনীদের কোনো কিছু হলেই ডাঃ চৌধুরীর তলব হতো। রাজপ্রাসাদের অন্য দুজন পুরনো ডাক্তার এজন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং ডাঃ চৌধুরীর কুৎসা প্রচার করতে শুরু করলেন। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিই ছিলেন ডাঃ চৌধুরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও একমাত্র ব্যক্তিগত বন্ধু। মহারাজাও ওঁকে ভালোবাসেন। সুতরাং হিজ হাইনেসের কানে সেই কুৎসার কাহিনি পৌঁছে দেওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু তবু একদিন সত্যি সত্যি পৌঁছল। কোর্ট মিনিস্টার দেওয়ান গুরুবচন সিং মহারাজাকে বললেন, 'ইওর হাইনেস, ডাঃ চৌধুরী সম্পর্কে অনেক কথা শুনছি। অবশ্য ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না হলেও অনেকের কাছে শুনছি বলেই আপনাকে জানান কর্তব্য মনে করলাম।'

'ডাক্তার ড্রিঙ্ক করা শুরু করেছে নাকি?'

'না ইওর হাইনেস, উনি ড্রিঙ্ক করেন না ঠিকই কিন্তু শুনছি...'

'কি শুনছেন?'

'শুনছি চিকিৎসা করার সুযোগ নিয়ে ডাঃ চৌধুরী আপনার কয়েকজন বান্ধবীদের সঙ্গে...'

'কি? ইজ হি এনজয়িং দেয়ার কোম্পানি?'

'তাইতো শুনছি ইওর হাইনেস।'

মহারাজা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কিছু শুনেছেন?'

'শুনছি তো আরো অনেক কিছু কিন্তু ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।'

'আরো কি শুনছেন?'

'ইওর হাইনেস, সেসব কথা আপনার না শোনাই ভালো।'

মহারাজার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না কোর্ট মিনিস্টার। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'শুনছি দু-একজন মহারানীদের সঙ্গেও ডাঃ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠতা নাকি অনেক দূর গড়িয়েছে।'

মহারাজা হাসতে হাসতে শুধু বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

ঠিক পরের দিনই মহারাজা অর্ডার দিলেন, মহারানী ও বান্ধবীদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ডাঃ চৌধুরীর। শুধু তাই নয়। কারুর একটু সামান্য মাথা ব্যথা করলেই মহারাজ ডাঃ চৌধুরীকে ডেকে বলতেন, 'ডক্টর, রাতে পেসেন্টের কাছে থাকবেন।'

ডাঃ চৌধুরী হাসতে হাসতে বলতেন, 'ইওর হাইনেস, সেরকম কিছু হলে আমি নিশ্চয়ই থাকব কিন্তু দিস ইজ নাথিং।'

'তা হোক। আপনি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব ; নয়তো চিন্তায় সারা রাত ঘুমুতে পারব না।'

কোনো মহারানী বা মহারাজার প্রিয় বান্ধবীর কিছু হলেই তার পাশের ঘরে ডাঃ চৌধুরীর থাকার ব্যবস্থা হতো। দুটো ঘরের মাঝখানে দরজা। যখন ইচ্ছা পেসেন্টকে দেখাশুনা করা যাবে। ডাঃ চৌধুরীর ঘরে ওষুধপত্র ইনজেকশন থাকত। হসপিট্যালের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে টেলিফোন। ডাঃ চৌধুরী মনে মনে হাসেন, অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু অসহায়। প্রাইভেট সেক্রেটারি সাহেবকে সব কথা জানালেন। উনি সুযোগ মতো মহারাজার কাছেও কথাটা তুললেন কিন্তু মহারাজা বললেন, নো নো নো।

তিন মাস কেটে গেল।

সেদিন রাত্রে মহারাজার ডিনার। কয়েকজন নিমন্ত্রিত। কোর্ট মিনিস্টার, প্রাইভেট সেক্রেটারি, তিনজন ডাক্তার, দুজন এ-ডি-সি, চীফ প্যালেস গার্ড কর্নেল হরকিষণ সিং আর সমস্ত মহারানী ও বান্ধবীরা। ডিনারের আগে ড্রিঙ্কস এলো কিন্তু মহারাজা কাউকে বেশি ড্রিঙ্ক করতে দিলেন না। বললেন, ডিনারের পরে গল্প করবেন। ডিনার শেষ হলো। তারপর মহারাজা একটা বিরাট ডায়মন্ডের আংটি আর একটা সোনার ঘড়ি ডাঃ চৌধুরীকে উপহার দিতেই সবাই চমকে উঠলেন। হিজ হাইনেস অনেককেই অনেক কিছু উপহার দেন কিন্তু এমন সুন্দর ও দামি উপহার বিশেষ কেউ পান না। মহারাজা হাসতে হাসতে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, শুনেছিলাম ডাঃ চৌধুরীর চরিত্র নাকি ভালো নয়, সেজন্য মহারানী ও বান্ধবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য ডাঃ চৌধুরীকে অনেক সুযোগ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল হরকিষণকে অর্ডার দিলাম মহারানী ও বান্ধবীদের ঘরের স্কাই লাইটের পাশে ক্যামেরা নিয়ে একজন প্যালেস গার্ড বসে থাকবে।

মহারাজের কথা শুনে সবাই হতবাক। মহারাজা থামলেন না, কর্নেলকে বলেছিলাম ডাঃ চৌধুরীর দুর্বল মুহূর্তের একটা ছবি নিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। কিন্তু পুরস্কারের টাকা আমি কাউকে দিতে পারলাম না বলে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

এরপর শুরু হলো ড্রিঙ্কস, আনন্দ হুল্লোড়। মহারাজা একটা স্কচের গেলাস নিয়ে ডাঃ চৌধুরীকে বললেন, আজ একটু টেস্ট করবে নাকি?

দেবব্রত আমার হাতটা চেপে ধরে বললো, 'জানেন, বড়দাদু কি বলেছিলেন?'

'কি?'

'বলেছিলেন ইওর হাইনেস, আপনার হুকুম অমান্য করতে পারি, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই।'

আমি কৌতূহল চাপতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহারাজা কি বললেন?'

'না, মহারাজ অনুরোধ করেননি। কোনোদিন করেননি।'

কর্নেল হরকিষণ সিং এখনও জীবিত। সোলনে থাকেন। অনেক বয়স হয়েছে। চুল দাড়ি সাদা ধবধবে। তাঁর কাছে গেলে এখনও ডাঃ চৌধুরীর অনেক গল্প শোনা যায়। কাপুরতলা বা সিমলার আরো অনেকের কাছে শোনা যায়, জানা যায়।

'বড় দাদুর খুব ইচ্ছা ছিল কলকাতায় থাকার, কিন্তু পারেননি। কাপুরতলার মহারাজকে ছেড়ে আসতে পারেননি। তাছাড়া এত লোকের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা হয়েছিল যে তাদের সবাইকে ছেড়ে আসাও অসম্ভব ছিল।'

আমি বললাম, 'তা তো বটেই।'

দেবব্রত বললো, 'বড় দাদুর জন্য আমার দাদুও প্রায় কাপুরতলা বা সিমলা আসতেন। তারপর আস্তে আস্তে উনিও একদিন সিমলার বাসিন্দা হয়ে গেলেন।'

তিন

পনের বছর আগেকার ঘটনা। ছোটখাট অনেক ঘটনাই মনে নেই, ভুলে গেছি। তবে মনে আছে দেবব্রত চৌধুরী তিন-চারদিন আমার হোটেলে এসেছে, গল্প করেছে, খেয়েছে। একদিন কথায় কথায় বললো, আপনার সঙ্গে আগে আলাপ হলে আমি নিশ্চয়ই জার্নালিস্ট হতাম।'

আমি হাসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

'কেন নয় বলুন? চাকরি করলেও দাসত্বের শৃঙ্খল নেই, তাছাড়া কি দারুণ একসাইটিং অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং কাজ বলুন তো?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিলাম। ও কিছু শুনতে চাইছিল। আমার নীরবতা বোধহয় ভালো লাগছিল না। 'কি হলো? কিছু বলছেন না শুধু হাসছেন?'

এবারে আমি জবাব দিলাম, 'আমি যদি ডক্টর দেবতোষ চৌধুরীর ভাই হতাম তাহলে আমি নিশ্চয়ই ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়তাম,' আবার একটু হুইস্কি গলায় ঢেলে বললাম, 'আদার্স লন ইজ অলওয়েজ গ্রীনার, তাই না?'

দেবব্রত বললো, 'যাই বলুন জার্নালিস্টদের রেসপেক্টই আলাদা। তাছাড়া দারুণ গ্লামারস প্রফেশন।'

'এককালে সত্যি সাংবাদিকদের সম্মান ছিল কিন্তু এখন নেই।'

'কেন?'

'থাক। এসব আলোচনা না করাই ভালো।'

দেবব্রত আর তর্ক করেনি। 'ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়তে অবশ্য আমার ভালোই লাগছে। ভারি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট।'

আমি সাংবাদিক। সংবাদপত্রের পরিভাষায় স্পেশাল করসপনডেন্ট। বিশেষ সংবাদদাতা। প্রাইম মিনিস্টার—মিনিস্টার এম পি-দের নিয়েই আমার কারবার। পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে আড্ডা দিই। চা কফি সিগারেট। পরনিন্দা-পরচর্চা। নোট বই-পেন্সিল-টাইপ রাইটার। টেলিফোন, ট্রাংকল। টেলিপ্রিন্টার-টেলেক্স। দিনটা এইভাবেই কাটে। সন্ধ্যার পর কালো স্যুট টাই। হায়দ্রাবাদ হাউস অথবা অশোকা হোটেল। অথবা ডিপ্লোম্যাটিক পার্টি। রিসেপসন। স্কচ। ওয়াইন। অথবা ভডকা। তবু কান সতর্ক থাকে। নতুন গোপন কোনো খবর পেলেই পাঠিয়ে দেব অফিসে। ছাপা হবে পরের দিন সকালের কাগজে।

এই ত আমার, আমাদের দিল্লির জীবন। কখনও কখনও বাইরে যেতে হয়। দূরে, কাছে। বাসে ট্রেনে মোটরে প্লেনে। কখনও পাড়ি দিতে হয় বিদেশ। ছায়ার মতো অনুসরণ করতে হয় ভি আই পিদের। কত কি দেখি, শুনি, জানতে পারি কিন্তু রাজনৈতিক দুনিয়ার বাইরের কোনো কিছু জানি না বললেই চলে। বিভিন্ন রাজ্যের ডজন ডজন মন্ত্রী বা নেতাদের নাম আমাদের মুখস্থ কিন্তু কলকাতা দিল্লি বোম্বে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ভাইস-চ্যান্সেলারের নাম জানেন, এমন সাংবাদিক ভারতবর্ষে নেই বললেই চলে। তবু কিছু কিছু সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিকের খবর আমাদের রাখতে হয়। নানা কারণে, নানা উপলক্ষ্যে এদের জানতে হয়, চিনতে হয়। তিন মূর্তি ভবনে বা সাউথ ব্লকের অফিসে প্রাইম মিনিস্টার মাঝে মাঝেই দুচারজন বৈজ্ঞানিক বা অর্থনীতিবিদ্ বা ওই ধরনের কিছু জ্ঞানী-গুণীকে আমন্ত্রণ জানান। আলোচনা করেন, পরামর্শ করেন। প্রাইম মিনিস্টারের ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এদের ঘিরে ধরি, প্রশ্ন করি। 'এক্সকিউজ মী স্যার, কাশ্মীর ক্রাইসিসের

জন্য কি ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের কিছু মেজর চেঞ্জ হচ্ছে?'

লাইব্রেরিয়ান ফ্রেমের মোটা চশমাটা ঠিক করতে করতে প্রফেসর প্রসাদ বললেন, 'ডোন্ট থিংক সো তবে বর্ডার এরিয়া কিছু স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্ট পাবে বলে মনে হয়।'

'আমাদের দেশের যা অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে এগ্রিকালচার, হেভী ইন্ডাস্ট্রি ও ডিফেন্স—এই তিনটি ক্ষেত্রেই কি সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব?'

ডাঃ দত্ত বললেন, 'কোনোটাকে নেগলেক্ট করতে চান? কোনোটাকেই নেগলেক্ট করা যাবে না এবং হবে না।'

পরের দিন সকালে সব খবরের কাগজে সে সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়। এই রকম একটা মিটিং-এর পরই ডক্টর দেবতোষ চৌধুরীকে আমি প্রথম দেখি।

আমার বেশ মনে আছে সেদিনের কথা। আমন্ত্রিত সব বৈজ্ঞানিকই স্যুট পরে এসেছিলেন। ডক্টর চৌধুরী এসেছিলেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। দেখে ভারি ভালো লেগেছিল। তাছাড়া চেহারাটি মনে রাখার মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সাহিত্য বা দর্শনের অধ্যাপক। মনেই হয় না ইনি ল্যাবরেটরিতে বসে সূর্যরশ্মি নিয়ে গবেষণা করে যশস্বী হয়েছেন।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'দাদার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?'

'না, আলাপ নেই। তবে দেখেছি, দু-একবার সামান্য দুচারটে কথাও বলেছি।'

'এবার দিল্লি ফিরে দাদার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'নিশ্চয়ই দেখা করব।'

'দাদা খুব খুশী হবেন।' দেবব্রত একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'অমন মানুষের সঙ্গে আলাপ করে আপনারও ভালো লাগবে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কিন্তু ওর সঙ্গে তো আমি বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না।'

'কেন?'

'অত বড় পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে কি বেশিক্ষণ কথা বলা যায়?'

দেবব্রত হাসল, 'এখন কিছু বলব না, আলাপ করে আমাকে চিঠি দেবেন।'

তিন সপ্তাহ পরে দিল্লি ফিরেই টেলিফোন করলাম। পেলাম না, পুণা গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে আবার টেলিফোন করতেই ডক্টর চৌধুরী নিজে টেলিফোন ধরলেন। পরিচয় দিতেই বললেন, 'দেবুর চিঠিতে আপনার কথা জানলাম।' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর শরীর ভালো আছে তো?'

'ভালোই আছে।'

'আপনি কদিন ওকে খুব খাইয়েছেন।'

আমি না হেসে পারলাম না, 'সে কথাও লিখেছে?'

ডক্টর চৌধুরীও হাসলেন, 'ও একটু পেটুক আছে। তাছাড়া আমাকে ও সব কথাই জানায়।'

আমি যেদিন ডক্টর চৌধুরীর বাড়ি প্রথম গেলাম সেদিন রবিবার। দরজার সামনে দাঁড়াতেই গান শুনতে পেলাম। শিল্পীর কণ্ঠস্বর চিনতে না পারলেও সুর শুনে বুঝলাম রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড। মিনিট খানেক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বেল বাজালাম। প্রথমে চাকর, তারপর স্বয়ং ডক্টর চৌধুরী। আসুন আসুন।

ছোট্ট লবী পার হয়ে লিভিংরুমে ঢুকতে ঢুকতে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনেকবার বেল বাজিয়েছেন?'

'না, না, একবারই বাজিয়েছি।'

'দেন ইউ আর রিয়েলি লাকি।'

'কেন বলুন তো?'

হঠাৎ একটু প্রাণ খুলে হাসলেন ডক্টর চৌধুরী। 'যখন তখন এমন গান শুনতে মেতে যাই যে কেউ বেল বাজালেও শুনতে পাই না। অবশ্য চাকরটাকে বার বার বলে রেখেছিলাম—'

লিভিংরুমে ঢুকতেই অবাক হলাম, বাঃ! চমৎকার! পর পর অতগুলো কাংড়া ভ্যালী পেন্টিং দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

'ডু ইউ লাইক পেন্টিং?'

'কিছু বুঝি না কিন্তু দেখতে ভালো লাগে।'

'কাম টু মাই স্টাডি।'

ডক্টর চৌধুরীকে অনুসরণ করে ওঁর পড়ার ঘরে ঢুকতেই সারা দেওয়াল ভর্তি স্কেচ দেখতে পেলাম।

'আমার পোর্ট্রেটটা দেখেছেন?'

'বাঃ! ভারি সুন্দর!'

'ডু ইউ নো হু ইজ দ্য আর্টিস্ট?'

'আপনি নিশ্চয়ই!'

'না, না, আমার এত গুণ নেই...'

'কোনো ছাত্রের বুঝি?'

'না, দেবু।'

'মাই গড! পোর্ট্রেটটা ওর করা?'

'অব কোর্স। এ ঘরের সব স্কেচ আর পোর্ট্রেটই ওর করা।' মুহূর্তের জন্য নিজের পোর্ট্রেটটা দেখে ডক্টর চৌধুরী একটু চাপা গলায় গর্বের সঙ্গে বললেন, 'দেবু রিয়েলি একটা জুয়েল।'

পনের বছর আগের কথা। সব কথা মনে না থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, ডক্টর চৌধুরীর প্রতিটি কথায় ছোট ভাই সম্পর্কে তাঁর গভীর ভালোবাসা ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। ওঁর একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না—দেবু ইজ এ পীস অব ড্রিম, দেবু আমার একটা স্বপ্ন, সাধনা। আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চাইতেই উনি বললেন, 'রিসার্চ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও আমার দুঃখ নেই। আজ না হয় কাল, কাল না পরশু কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সাকসেসফুল হবেনই কিন্তু দেবুর ব্যাপারে ব্যর্থ হলে আমার সব স্বপ্ন, সাধনা.....

আমি ওঁকে কথাটা শেষ করতে দিলাম না, 'না না সে ভয় আপনার নেই।'

এই পৃথিবীর অজস্র কোটি কোটি মানুষ আপন আপন কাজে নিমগ্ন। কবি কাব্য রচনা করেন, শিল্পী রূপ দেন তাঁর মনের স্বপ্নকে, বৈজ্ঞানিক সাধনা করেন আপন গবেষণাগারে, সাহিত্যিক মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনি লিপিবদ্ধ করেন। মাঠে-ঘাটে, অফিসে-আদালতে, কল-কারখানায় অসংখ্য মানুষ সংগ্রাম করছেন দিন রাত্রি কিন্তু কেন? শুধুই কি অর্থ যশ প্রতিপত্তির জন্য? দু'মুঠো অন্নের জন্য? না, কখনই নয়। আপন মুক্তির জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ সাধনা করেননি, খ্যাতির জন্য বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ দেননি, কিছু ফিরিঙ্গি সাহেবের প্রশংসার জন্যও রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ করতে উদ্যোগী হননি। মার্কস বা এডিসন বা অন্য কোনো মহাপুরুষই শুধু আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেননি। কোনো মানুষই করে না। সব কর্মকাণ্ডের পিছনেই, সাধনার অন্তরালে কিছু মানুষের কল্যাণ,

ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। ডক্টর চৌধুরীর কথা শুনে, দেবব্রতর প্রতি ওঁর ভালোবাসা দেখে এই কথাগুলো আবার নতুন করে আমার মনে পড়ল।

বেশিক্ষণ ছিলাম না। ঘণ্টা খানেক বা ঘণ্টা দেড়েক। একজন মানুষকে চেনার পক্ষে সময়টা কিছুই নয়। তবু বড় ভালো লেগেছিল দেবব্রতর দাদাকে। এত বড় বৈজ্ঞানিক হয়েও বড় সহজ, সরল অমায়িক ব্যবহার। বিয়ে করেননি। নিশ্চয়ই করবেন না। বিয়ে করার কোনো বয়স নেই ঠিকই কিন্তু মন তো চাই। আনন্দের জন্য, উপভোগের জন্য, সম্ভোগের জন্য ডক্টর চৌধুরীর বিয়ে করার দরকার নেই। ল্যাবরেটরি, মিটিং, সেমিনার করে যেটুকু সময় হাতে থাকে সেটুকু সময় পরিপূর্ণভাবে উনি উপভোগ করেন। সকালবেলা বেরুবার সময় রেডিওগ্রামে কয়েকটা রেকর্ড চাপিয়ে চলে যান। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেই সুইচ টিপে দেন। ঘর ভর্তি বাংলা বই। গল্প, উপন্যাস, কবিতার বই। দিল্লিতে কারুর বাড়িতে এত বাংলা বই দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একটু অবাক হয়ে একবার বললাম, 'আপনার তো বাংলা বইয়ের দারুণ কালেকশন।'

ডক্টর চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, 'বাড়িতে বাংলা বই আর গানের রেকর্ড না থাকলে দেবুর স্ত্রী সারাদিন কাটাবে কি ভাবে?'

আমি হাসলাম।

উনিও হাসলেন। এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে বললেন, 'সুভাষ মুখার্জির একটা কবিতায় পড়েছিলাম—বিংশ শতাব্দীতে।

মানুষের শোকের আয়ু
বড় জোর এক বছর।'

উনি চুপ করে রইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ ঐ কবিতাটা মনে হলো কেন?'

'কথাটা নির্মম হলেও বড় সত্যি। এ যুগের কোনো শোকের আয়ুই এক বছরের বেশি নয়। আমি মরে গেলেও হয়তো দেবু বা বৌমা এক বছর পর আমাকেও ভুলে যাবে কিন্তু এই বইগুলো, এই সব পেন্টিং বা গানের রেকর্ড শুনতে শুনতে নিশ্চয়ই আমার কথা ওদের মনে পড়বে।'

মুগ্ধ হয়ে, বিস্মিত হয়ে আমি ওঁর কথা শুনছিলাম।

বিদায় নেবার আগে ডক্টর চৌধুরী বললেন, 'এরপর যেদিন আসবেন সেদিন আপনাকে আমার তোলা ফিল্মের প্রজেকশন দেখাব।'

'আপনি বুঝি ছবিও তোলেন?'

'তুলবো না? জ্যেঠু বড় না হলে তো বই পড়বে না বা গান শুনবে না। তাই তো ওর জন্য ছবি তুলে রাখছি।'

এ সব পনের বছর আগেকার কথা। কত কি ঘটে গেছে এই দীর্ঘ পরিসরে। দ্বিতীয় বার বিলেত গেলাম তখন দেবব্রতর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। রিজেন্ট পার্ক লেকের ধারে বসে দুজনে গল্প করেছি, ডুরি লেন থিয়েটারে 'মাই ফেয়ার লেডি'র অভিনয় দেখেছি। আরো কত কি। দুদিনের জন্য এসেক্সের সমুদ্র সৈকত ঘুরে এলাম। ঐ দুদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত সমুদ্র পাড়ে বসে দুজনে গল্প করেছিলাম।

আমি দিল্লি ফিরে আসার কয়েক দিন পরেই দেবব্রত চিঠিতে জানলাম ভালোভাবে পাস করেছে। দুতিন সপ্তাহ পরে দিল্লি ফিরেই আমাকে টেলিফোন করেছিল কিন্তু পায়নি। আমি ছুটিতে কলকাতা গিয়েছিলাম। ছুটির শেষে দিল্লি ফিরে এলাম। মাস খানেক কেটে গেল। হঠাৎ একদিন পুরনো চিঠিপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেবব্রতর একটা চিঠি হাতে পড়তেই ডক্টর চৌধুরীকে

একবার টেলিফোন করলাম, 'দেবু ফিরছে কবে?'

'ও তো অনেক দিন হলো ফিরেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।

'ও কি এখানেই আছে?'

'ও তো চাকরি নিয়ে বাঙ্গালোরে চলে গেছে।'

আমি একটু অবাক হলাম, দুঃখিত হলাম। 'আমার সঙ্গে একবার দেখা না করেই চলে গেল।'

ডক্টর চৌধুরীও অবাক হলেন, 'সেকি? ও তো আপনার ওখানে কয়েক দিন গিয়েছে, দেখা হয়নি?'

'না। তাহলে বোধহয় আমি তখন কলকাতায় ছিলাম।

'তাই হবে।'

দেবব্রত হারিয়ে গেল। চিঠি লেখার অভ্যাস আমার নেই। বোধহয় ওরও তাই। তাছাড়া এমন বিশ্রী অর্থহীন উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কেটে যায় যে বহু পরিচিত, ঘনিষ্ঠ মানুষের কথাও মনে পড়ে না। হঠাৎ মাঝে মাঝে খবরের পাতায় পড়ে বা রেডিওতে ডক্টর চৌধুরীর নাম শুনলেই লন্ডনের সেই ছাত্রসভার ছেলেটির কথাও মনে পড়ে। ভাবি চিঠি লিখব কিন্তু লিখি না। পরের দিনের উত্তেজনায় সে ইচ্ছা হারিয়ে যায়। তলিয়ে যায়।

ডক্টর চৌধুরীর সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই। কারণ আছে। উনি আর এখন ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির অন্ধকার গবেষণাগারের মধ্যে বন্দী নন। উনি এখন ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সদস্য ছাড়াও প্ল্যানিং কমিশনের উপদেষ্টা। প্রায় ভি আই পি। খবরের কাগজের পাতায় প্রায় নিত্যই নাম ছাপা হচ্ছে। আজ শিলং, কাল সিমলা। দুদিন পরেই হায়দ্রাবাদ। পরের দিনই মাদ্রাজ হয়ে সিঙ্গাপুর। কলম্বো প্ল্যানের কনসালটেটিভ কমিটি মিটিং। কদাচিৎ কখনও বিজ্ঞান ভবনের কমিটি রুমে বা লবীতে দেখা হয়। আমাকে উনি চিনতে পারেন। জিজ্ঞাসা করেন, ভালো আছেন? আমি ছোট্ট জবাব দিই, হ্যাঁ। ওঁর কুশল জিজ্ঞাসা করার অবকাশ আমার হয় না, তার আগেই উনি কোনো মন্ত্রী বা আই-সি-এস সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান। ডক্টর চৌধুরীর এই উন্নতির জন্য দেবব্রতর অহঙ্কার হয়েছে কিনা জানতে পারি না। কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা হয়, ভয় হয়। মাঝে মাঝে ওকে চিঠি লেখার ইচ্ছা হলেও ঠিক উৎসাহবোধ করিনা। পিছিয়ে যাই। কাগজ-কলম নিয়ে বসেও লিখতে পারি না।

দুটি বছরে আরো কত কি ঘটে গেল। আরো কত মানুষকে জানলাম, চিনলাম, ভালোবাসলাম, কত মানুষকে ভুলে গেলাম দূরে সরিয়ে রাখলাম।

বেশ মনে আছে তার আগের দিন পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন শেষ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দীর্ঘ ভাষণ নিয়ে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মে মাসের বিশে পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা নিয়ে সাড়ে সাত শ' এম পি'র মতামত শুনে ক্লান্ত হয়ে গেছি। সকালে ওঠার তাড়া নেই। রাধাকিষণকে বলেছি, চা নিয়ে ডাকাডাকি করিস না। অনেক বেলা অবধি ঘুমুব বলে টেলিফোনের প্লাগ খুলে রেখেছি। তাছাড়া রবিবার। নটা বেজে গেলেও আমি ঘুমুচ্ছিলাম। মোটা পর্দার ব্যূহ ভেদ করে সূর্যরশ্মি পর্যন্ত আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারেনি কিন্তু সুভাষ রায় এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই চিৎকার, গেট আপ জার্নালিস্ট! গেট আপ!

চাদর সরিয়ে মুখ বের করতেই সুভাষদা বললেন, 'ভয় নেই, কোনো পাওনাদার না, আমি

তোমার সুভাষদা।'

সুভাষদা!

আমি ভূত দেখার মতো চমকে লাফিয়ে উঠলাম। 'সুভাষদা, আপনি?'

'এখনও কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে?'

'না কিন্তু আপনি কবে এলেন? বৌদি কোথায়? রমার কি খবর?' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললাম।

সুভাষদা হাসতে হাসতে বললেন, 'সবাই এসেছে। তুমি চোখে মুখে জল দিয়ে এসো, তারপর সব বলছি।'

আমি বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কই ওরা কোথায়? বৌদি আর রমা কি গাড়িতে...।'

'ওরা এখন আমার সঙ্গে আসেনি ; তবে দিল্লিতেই আছে।'

'ওদের নিয়ে এলেন না কেন?'

'বলছি তো চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো, তারপর সব জানতে পারবে।'

আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে রাধাকিষণকে ডেকে বললাম, 'পর্দা হঠাও আর চা বানাও।'

তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে আসতেই সুভাষদা বললেন, 'কত কাণ্ড করে যে তোমার এখানে এসেছি তা ভাবতে পারবে না।'

'কেন, আপনি আমার বাড়ির ঠিকানা জানতেন না?'

সুভাষদা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার মতো নটোরিয়াস ব্যাচেলার কখনও বাড়ির ঠিকানা জানায়?'

লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুব ঘুরতে হয়েছে বুঝি?'

'টেলিফোন এনকোয়ারি থেকে ভুল ঠিকানা জানাল। তাছাড়া দিল্লি এত বদলে গেছে যে নতুন এসে তালগোল পাকিয়ে যায়।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'দেখে-শুনে মনে হয় এরা বোধহয় দিল্লিকে প্যারিস বানাতে চায়।'

'গৌরী সেনের টাকায় নিত্য-নতুন স্কীম হচ্ছে আর মাসে-মাসে শহরের চেহারা বদলে যাচ্ছে।'

'কিন্তু তার ঠেলায় তো আমাদের মতো নিউ-কামারদের জান বেরিয়ে যায়।'

'আই অ্যাম সরি। যাই হোক আর চিন্তা নেই। এবার বলুন কবে এলেন, কোথায় উঠেছেন?'

রাধাকিষণ চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুভাষদা বললেন, 'রাগ করো না, ঠিক একমাস হলো এসেছি...'

আমি অবাক হই, 'একমাস?'

'একমাস এসেছি ঠিকই কিন্তু নতুন করে সংসার পাতার যা ঝামেলা, সে আর বলার না। তাছাড়া অফিসেও অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি অথচ তোমার বৌদি তোমাকে খুঁজে বের করার জন্য পাগল করে ছাড়ছেন...'

হাসলাম। 'তারপর?'

'রোজই ভাবি আমাদের কোনো পি আর ওকে তোমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করব কিন্তু রোজই ভুলে যাই। আজ সকালে তোমার বৌদি এমন বকবক করতে শুরু করলেন যে না বেরিয়ে পারলাম না।'

আমি শুকনো হাসি হেসে বললাম, 'আপনি যাই কৈফিয়ত দিন আমি স্যাটিসফায়েড হচ্ছি না'।

'সত্যি বিশ্বাস কর ভাই, এবার দিল্লিতে এসে যা হয়রানি সহ্য করেছি, তা তুমি ভাবতে পারবে না।'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু এসেই কেন আমার খোঁজ করলেন না?'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সুভাষদা বললেন, 'আই জাস্ট গট লস্ট ইন প্রবলেমস।'

সুভাষদার স্ত্রী, মিসেস জয়ন্তী রায়, আমার বৌদি সত্যি আমাকে ভালোবাসেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আমেরিকা গিয়ে ওঁদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমাদের অ্যাম্বাসীর ডিপ্লোম্যাট অন্যান্য স্টাফ ও তাদের ফ্যামিলী 'মেম্বারদের ইনফরম্যাল 'গেট-টুগেদার' এ বৌদিকে দেখেই ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাউ আর ইউ জয়ন্তী?'

বৌদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে প্রণাম করে বললেন, 'ভালো আছি স্যার।'

'শুধু ফ্যাশান শো অর্গানাইজ করছ না কি কিছু লেখাপড়াও করছ?'

'সামান্য কিছু লেখাপড়াও করছি স্যার।'

'গুড। ভেরি গুড।' এবার আমার দিকে ফিরে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বললেন, 'ডু ইউ নো, জয়ন্তী আমার কিছু কিছু লেখা বাংলায় অনুবাদ করেছে অ্যান্ড আই অ্যাম টোল্ড দে আর ভেরি গুড।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি?'

আমি একটু মুগ্ধ দৃষ্টিতে বৌদির দিকে তাকালাম, বৌদিও আমাকে দেখলেন। পরে মাঝে মাঝেই বৌদি মজা করে হাসতে হাসতে সুভাষদাকে বলতেন, 'তোমার জার্নালিস্ট সেদিন যে কি রোমান্টিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল তা তুমি ভাবতে পারবে না।'

সুভাষদা আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইশারা করেই বৌদিকে বললেন, 'তোমারও নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল।'

'তুমি তো জীবনেও কোনোদিন অমন করে তাকাওনি, সুতরাং ভালো না লাগার তো কারণ নেই।'

এবার সুভাষদা স্ত্রীকে খুশী করার জন্য বললেন, 'তাছাড়া জার্নালিস্টের রোমান্টিক হবারও কারণ ছিল। তোমাকে দেখে তো বোঝা যায় না তোমার কত বয়স! নো ডাউট ইউ আর স্টিল ভেরী চার্মিং!'

সুভাষদা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঠাট্টা করলেও কথাটা ঠিক। জয়ন্তী বৌদি সত্যি সুন্দরী! পরিপূর্ণ নারীত্বের সৌন্দর্য ছাড়াও চোখে-মুখে বুদ্ধি-দীপ্তির ছাপ বৌদিকে আরো সুন্দরী করেছিল। রমার মধ্যে এটা আরো বেশি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ত।

বহু মেয়ের দৈহিক সৌন্দর্য থাকে। বিদ্যাবুদ্ধিরও একটা নিজস্ব লাবণ্য আছে। রমার মধ্যে এই সৌন্দর্য আর লাবণ্যের মিলনে একটা অদ্ভুত শ্রী সবার দৃষ্টি টেনে নিত।

বৌদির অনুরোধ রক্ষা করতে কলকাতা যাবার পথে বেনারস গেছি রমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি আগে থেকে ওকে চিঠি দিয়েছিলাম আমার আসার সব কিছু খবর জানিয়ে। ওদের হোস্টেলের কাছাকাছি এসে দোতলার বারান্দায় কয়েকটি মেয়েকে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিলাম ঠিকই কিন্তু ঐ সামান্য কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই একটা শ্রীমণ্ডিত মুখের চেহারা আমার মনের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই ঐ মেয়েটিই আমার সামনে এসে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হোস্টেল খুঁজতে বেশি কষ্ট হয়নি তো?'

আমি ওর প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি করে জানলে আমিই...'

'আপনার কতগুলো ছবি আমার কাছে তা জানেন?'

'আমার ছবি?'

'হ্যাঁ, আপনার ছবি। মা পাঠিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'তা না হলে আমি কি করে আপনাকে দেখেই উপরের বারান্দা থেকে নেমে এলাম?'

সেদিন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কিছু সময় কাটিয়েই হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে আসার আগে রমা জিজ্ঞাসা করল, 'কদিন এখানে থাকবেন?'

'কদিন মানে? কালই রাত্রে চলে যাব।'

'সেকি? দুচার দিন থাকবেন না?'

'দুচার দিন কেন থাকব?'

'আপনি থাকলে আমিও একটু ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারব, নয়তো ওই হোস্টেলের মধ্যেই...'

'কেন? তোমরা বেড়াতে যাও না?'

'বেরুতে দেয় নাকি? বাবা চিঠি দিয়েছিলেন বলেই তো আপনার সঙ্গে একটু বেরুতে পারব।'

পরের দিন রাত্রেই আমি কলকাতা রওনা হলেও সারাদিন দুজনে খুব ঘুরেছিলাম। টাঙ্গায় চড়ে সারনাথ যাবার পথে আমি আর না বলে পারলাম না, 'তুমি বাবার বুদ্ধি আর মার সৌন্দর্য পেয়েছ, তাই না?'

রমা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ একথা বলছেন?'

'ভাবছিলাম বলব না কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলে থাকতে পারলাম না।'

এবার রাষ্ট্রপতি আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে একদিন রাইস অ্যান্ড ফিসকারী খাইয়ে দিও। মাছের ঝোল—ভাত না খেলে তো কোনো বাঙালিরই শান্তি নেই।'

তিনদিন ওয়াশিংটনে কাটিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবার আগে বৌদি আমাকে বললেন, নিউইয়র্ক থেকেই পালিয়ে যাবেন না, ওঁর সঙ্গে ফিরে আসবেন।' সুভাষদাকেও সতর্ক করে দিলেন, 'না পারলে বলো আমি স্যারকে বলছি।'

সুভাষদা হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি প্রেসিডেন্টের ছাত্রী বলে সামান্য একজন ফার্স্ট সেক্রেটারিকে ভয় দেখাচ্ছ কেন?'

ওয়াশিংটন ছাড়ার সময় বৌদির আতিথ্য উপভোগ করে ফিরে আসার সঠিক কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও ফিরে এসেছিলাম। ওয়াশিংটন থেকে অ্যাম্বাসেডর, মিনিস্টার কাউন্সেলার আর ফার্স্ট সেক্রেটারি সুভাষদা-ও প্রেসিডেন্টস পার্টিতে যোগ দিলেন। ঘুরলাম চিকাগো, বস্টন স্যানফ্রান্সিসকো, নিউইয়র্ক। এ সাত দিন সুভাষদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশলাম। রোজ রাত্রে আমরা দুজনে অনেক গল্প করতাম। সুভাষদা ডিপ্লোম্যাট। কূটনীতিবিদ। উঁচু গলায় কোনো কিছু প্রচার করা তাঁর ধর্ম নয়। স্বভাবও নয়। উন্মত্ত পদ্মা পাড়ের মানুষ হয়েও ওঁর স্বভাবটি ভাগীরথীর মতো শান্ত ও মিষ্টি। উচ্ছ্বাস নেই কিন্তু মাধুর্য আছে। সুভাষদার সঙ্গে নিউইয়র্ক থেকে আবার ওয়াশিংটন ফিরে গেলাম। সাতদিন ওদের অ্যাডাম্স মিল রোডের অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম। অবিস্মরণীয় সাতটি দিন। রমা তখন ছিল না। বৌদির পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। কথা দিয়েছিলাম দেশে ফিরে এসে রমার সঙ্গে দেখা করব।

এর ক'বছর পর ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে কায়রো গিয়ে দেখি সুভাষদা আমাদের অ্যাম্বাসীর মিনিস্টার—কাউন্সেলার। তখন রমাও ওখানে। বেশিদিন নয়, মাত্র দুটি দিন ওদের কাছে ছিলাম। আসার দিন এয়ারপোর্টে পৌঁছে বৌদিকে বললাম, 'বৌদি, ঋণের বোঝা বড্ড বেশি বাড়ছে।'

'কার? তোমার না আমার?'

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'আপনার।'

বৌদি জবাব দিলেন, 'ন্যাকামি না করে মেয়েটার একটা পাত্র দেখে দাও তো।'

বৌদির অনুরোধটা শুনতে আমার ভালো লাগেনি। কেন, তা জানি না ; তবে বড় বেসুরো মনে হয়েছিল। একটু আহত, একটু বেদনাবোধ করেছিলাম মনে মনে। রমাকে আমি ভালোবাসিনি কিন্তু তবুও ও বিয়ে হয়ে বহু দূরে চলে যাক, তাও চাইনি। চাইতে পারিনি। বললাম, 'বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত কি?'

'ব্যস্ত না হলেও চুপ করে বসে থাকার মতো বয়সও আর ওর নেই।'

'না, না, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবেন না। আগে এম. এ. পাস করুক, তারপর ভেবে দেখা যাবে। এবার রমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রমা, এম. এ. পড়বে তো?'

ও সোজাসুজি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটু বাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ছেলেদের মতো মেয়েরা বিয়ে পাগল হয় না।'

'ওসব কথা আমাকে বলো না। আমি বরযাত্রী পর্যন্ত যাই না।' একটু থেমে ওদের দুজনকে দেখে নিয়ে বললাম, 'বরযাত্রী না গেলেও তোমার বিয়েতে নিশ্চয়ই মাতব্বরি করব।'

'কেউ আপনাকে মাতব্বরি করতে বলছে না।'

সুভাষদার কায়রো বাসের পালা শেষ হলো, দিল্লি ফিরে এলেন। রমার পাত্রের হদিশ এখনও দিতে পারিনি কিন্তু তবুও যে বৌদি দিল্লি এসেই আমার কথা মনে করেছেন, সুভাষদার মতো কুঁড়ে ঘরকুনো লোককে যে ছুটির দিন সকালে বের করতে পেরেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ না হয়ে পারলাম না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে সুভাষদার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। বৌদি সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, একটু ঝগড়া একটু বকাবকি করলেন। ঠিক সেই আগের মতোই ; একটুও পরিবর্তন হয়নি কিন্তু রমা যেন কেমন পাল্টে গেছে। সোজাসুজি আমার দিকে তাকাতে পারল না, দৃষ্টিতে সলজ্জ আবরণ। কথাবার্তা আলাপ-আচরণে একটু সংযত ভাব। সামান্য জড়তা, দ্বিধা। বুঝলাম শরৎ হেমন্ত শেষে বসন্ত সমাগত। অস্বাভাবিক নয়। থার্ড ইয়ারের ছাত্রী।

খাওয়া-দাওয়ার আগে আমি আর সুভাষদা ড্রইংরুমে বসে গল্প করছিলাম। রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বিষয়ের গল্প। 'আচ্ছা সুভাষদা, ইন্ডিয়া সম্পর্কে ইজিপ্টের অ্যাটিচিউড কি একটু বদলেছে?'

'না তা ঠিক নয়, তবে নাসেরের মতো অন্যান্য লীডাররা ঠিক অতটা প্রগ্রেসিভ নয় বলেই মাঝে মাঝে আমরা অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করছি।'

'একজন নেতাকে কেন্দ্র করে কি একটা দেশের প্রতি আমাদের পলিসি ঠিক করা উচিত?'

'সমস্ত মিডল-ইস্ট আর ব্ল্যাক আফ্রিকাতে দেশের চাইতে ব্যক্তিই বড়।'

হঠাৎ রমা ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে একটু বইয়ের দোকানে নিয়ে যাবেন?'

'কি বই কিনবে?'

'আমার কয়েকটা রেফারেন্স বই।'

'এমনি বইয়ের দোকান তো অনেক চিনি কিন্তু তোমাদের রেফারেন্স বই ঐসব দোকানে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।'

'না পাওয়া গেলেও ওরা বলে দেবে নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, তা তো বলবেই।'

'খাওয়া-দাওয়ার পরে নিয়ে যাবেন।'

'খাওয়া-দাওয়ার পর তো দূরের কথা, আজ রাত্রেও আমি বাড়ি ফিরছি কিনা সন্দেহ।'

সুভাষদা বললেন, 'সেই ভালো। তুমি আর আজ বাড়ি যেও না।'

রমা একটু বিরক্ত হয়েই বললো, 'বাড়ি ফিরবেন না বলে কি দু এক ঘণ্টার জন্য বইয়ের দোকানেও যাওয়া যায় না?'

হঠাৎ খেয়াল হলো আজ রবিবার। আজ রবিবার তো সব দোকান আজ বন্ধ।'

'কাল আবার ভুলে যাবেন না।'

আমি হাসি। বলি, 'তোমার হুকুম আমি ভুলব?'

'আমি হুকুম করব আপনাকে? অত সাহস আমার নেই।'

রমা চলে যাচ্ছিল। সুভাষদা ডাক দিলেন, 'একটু দাঁড়া।' এবার আমার দিকে তাকিয়ে সুভাষদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো জিন আছে, একটু খাবে?'

আমি রমার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'আপনার স্ত্রী আর মেয়ে অসন্তুষ্ট না হলে একটু খেতে পারি।'

রমা আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দু' গেলাস জিন দিয়ে বললো, 'অসন্তুষ্ট না হয়েই দিলাম।'

'এ বাড়িতে আমার জন্য কেউ কোনোদিন অসন্তুষ্ট হবে না, তা আমি জানি।'

সত্যিই তাই ; দুপুরবেলায় খেতে বসে ছোলার ডালে নারকেল দেখেই বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার এ দুর্বলতার কথা জানলেন কি করে?'

'সব দুর্বলতার কথা কি আমাকে বলেছ?'

'তেমন কিছু দুর্বলতা তো আমার নেই বৌদি।'

খেতে খেতে অবাক লাগে কবে কোনোদিন কোথায় বৌদিকে বলেছিলাম ছোলার ডালে নারকেল বা মিষ্টি চাটনী খেতে ভালোবাসি, তাও ওঁর মনে আছে। ভোলেননি মাছে বেশি কাঁটা থাকলে খেতে পারি না। আমি খাওয়া-দাওয়ার শেষে খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আমি আজই আমার চাকরটাকে বিদায় করে দেব।'

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'এই রান্না খাবার পর আর ওর রান্না মুখে তুলতে পারব?'

ওঁরা তিনজনেই হাসলেন।

বৌদি বললেন, 'কায়রোতে তোমার দাদার আন্ডারেই শ্রীনিবাসন সেকেন্ড সেক্রেটারি ছিল। হোম লিভ থেকে ফিরে যাবার সময় কয়েকটা নারকেল নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে দুটো নারকেল দিয়েছিল। আমরা দুজনেই বলাবলি করতাম ঐ সময় তুমি যদি একবার হঠাৎ এসে হাজির হও...'

'তাহলে খুব নারকেল খাওয়াতেন! এই তো?'

'খুব না হলেও খাওয়াতাম।'

'সে দুঃখ এবার ঘুচিয়ে নেবেন।'

'ওসব কথা বাদ দাও। তবে এবার সময় পেলেই চলে আসবে।'

'সময় না পেলেও আসব।'

ওঁরা আবার হাসেন। সুভাষদা উঠে গেলেন, 'আমি উঠছি।'

বৌদি বললেন, 'যাও! তোমার মতো বেরসিক লোক না বসে থাকাই ভালো।'

রমা প্রতিবাদ করে, 'তুমি বাবাকে অমন করে বলবে না তো!'

'কি এমন খারাপ কথা বললাম?'

আমি হাসতে হাসতে রমাকে বললাম, 'আমার ব্যক্তিত্বের কাছে তোমার বাবা একটু ম্লান হয়ে যাচ্ছেন বলেই বোধহয়...'

'তা তো বটেই! আপনার মতো ব্রিলিয়ান্ট লোক তো আমরা কোনোদিন দেখিনি!'

'এ বাড়িতে তুমিই বোধহয় আমাকে ঠিক সহ্য করতে পার না, তাই না রমা?'

রমা কিছু বলার আগেই বৌদি বললেন, 'তোমাকে দেখেই তো ও মাঝে মাঝে জার্নালিস্ট হতে চায়।'

পরের দিন বইয়ের দোকানে নিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি জার্নালিস্ট হতে চাও নাকি?'

'হতে চাইলেই কি হতে পারব?'

'কেন হতে পারবে না?'

'সে অনেক অসুবিধে আছে।'

'অনেক অসুবিধা আবার কি?'

'সে আপনি বুঝবেন না।'

'আমি বোধহয় তোমার কোনো ব্যাপারই বুঝব না, তাই না রমা?'

রমা কোনো জবাব দিল না। চুপ করে রইল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাড়িটা কতদূর?'

'দিল্লিতে কোনো কিছুই কাছাকাছি নয়; এমনকি মানুষগুলোও না।'

রমা হাসল। 'অনেক দূর?'

'খানিকটা দূর ঠিকই, তবে ইচ্ছা করলে সে দূরত্ব অতিক্রম করা যায়।'

মোতিবাগ থেকে শান্তি পথ দিয়ে তিন মূর্তি ভবন-সাউথ অ্যাভিনিউ পার হয়ে আস্তে আস্তে কনট প্লেসের কাছে এলাম। যন্তর মন্তরের কাছে গাড়ি পার্ক করে গাড়ি থেকে বেরুতেই রমা বললো, 'কি দারুণ গরম!'

'এই মে-জুন মাস দুটো সত্যি বড় খারাপ।'

'আর এই দুটো মাসই আমাকে এখানে কাটাতে হবে।'

হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি তো মাঝে মাঝে সিনেমা হলে ঢুকে পড়ি।'

'আপনি বুঝি খুব সিনেমা দেখেন?'

'বিশেষ সময় তো পাই না, তবে মাঝে মাঝে দেখি।'

'আপনি কখন অফিস যান?'

'পার্লামেন্ট থাকলে এগারোটার মধ্যে বেরুতে হয়; নয়তো একটা-দেড়টার পর অফিস যাই।'

'কখন ফেরেন?'

'তার কোনো ঠিক নেই।'

'ঠিক নেই মানে রাত্রে আটটা-নটা হয়ে যায়?'

'কাজ না থাকলে আটটা-নটা, থাকলে আরো বেশি রাত হয়।'

'সে কি?'

'সপ্তাহে দু'একদিন সাড়ে এগারোটা-বারোটা হয়ই।'

রমা চমকে ওঠে, 'বলেন কি?'

'আমরা যদি রাত্রে কাজ না করি তাহলে ভোরবেলায় কাগজে সব খবর পাবে কি করে?'

দুটো-তিনটে দোকানে ঘোরাঘুরি করে ওর বইগুলো পাওয়া গেল। আবার হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে ফিরে এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবে?'

'না।'

'জল পিপাসা লাগেনি?'

'আপনার বাড়ি গিয়ে চা খাব।'

'যাবে?'

'যাব না কেন?'

পাঁচ মিনিটে আমার কাকানগরের আস্তানায় এসে হাজির হলাম। রাধাকিষণ দরজা খুলতেই বললাম, 'সকালবেলায় যে বাবুজি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন, তাঁর মেয়ে। রমা।'

রাধাকিষণ হাত জোড় করে নমস্কার করল, 'নমস্তে দিদি!'

'নমস্তে।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রমা বললো, 'তোমার কাছে চা খেতে এলাম।'

'জরুর। আপনারা বাবুজিকে এত ভালোবাসেন আর আমি আপনাকে চা খাওয়াব না?'

রমা তখনও দাঁড়িয়ে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা তোমার বাবুজিকে ভালোবাসি সেকথা তোমাকে কে বললো?'

'বিলাইত-আমেরিকা গেলে আপনারা বাবুজিকে কত যত্ন করেন, সে-সব আমি জানি।'

রমা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বুঝি ওকে সবকিছু বলেন?'

'আর কাকে বলব বল?'

রাধাকিষণ ভিতরে গেল। আমি বললাম, 'বসো।'

'আপনার বাড়িটা দেখব না?'

'সেজন্যে তো অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই।'

আমি ড্রইংরুমে বসলাম। রমা আমার আস্তানা দেখার জন্য ভিতরে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো, 'আপনার টেবিলের উপর আমার একটা জিনিস ছিল। আমি নিয়ে নিলাম।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার টেবিলে তোমার জিনিস?'

'হ্যাঁ।'

'কি ছিল?'

'আপনি জানেন না?'

'কই না তো।'

'আমার একটা চিঠি ছিল। আমি নিয়ে নিলাম।'

হেসে উঠলাম। 'তোমার বাবা মার চিঠি পেলেই তোমাকে একটা চিঠি লিখতাম কিন্তু অধিকাংশ চিঠিই শেষ করতে পারতাম না বলে পোস্ট করা হতো না।'

রমা বসতে বসতে বললো, 'সে তো চিঠি দেখেই বুঝতে পারছি।' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'শেষ করতে পারতেন না কেন?'

'কি লিখব কিছুতেই ভেবে পেতাম না।'

'চমৎকার লোক আপনি।'

'চমৎকার না হলেও একটু অদ্ভুত নিশ্চয়ই।'

রাধাকিষণ চা আর এক প্লেট স্যান্ডউইচ সেন্টার টেবিলে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কিছু আনব?'

রমা বললো, 'না, না, আমি শুধু চা খাব।'

আমি বললাম, 'প্রথম দিন আমার বাড়িতে এসে শুধু চা খেয়ে যেও না।'

'আপনি তো আমাকে আসতে বলেননি ; আমি নিজেই তো এলাম।'

'ঠিক, সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান যে আমার বিশেষ নেই, তা বোধহয় এতদিনে তোমরা বুঝেছ?'

'শুধু সামাজিক কেন, অনেক কাণ্ডজ্ঞানই আপনার নেই।'

ছেলেদের চাইতে মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান অনেক বিষয়েই বেশি হয়। রমা আমার চাইতে বেশ কয়েক বছরের ছোট হলেও হয়তো আমার চাইতে ওর কাণ্ডজ্ঞান বেশি। আমি চুপ করে গেলাম।

'কি হলো? কথা বলছেন না যে?' রমা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'কই কিছু না তো।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমার কথায় রাগ করেছেন।'

'না, না, রাগ করবো কেন?'

তবুও রমা একটু কৈফিয়ত না দিয়ে পারল না, 'আপনার সঙ্গে আমরা বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছি। তাই কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই অনেক সময় অনেক কথা বলি কিন্তু মনে কোনো...'

মাঝ পথেই আমি ওকে বাধা দিলাম, 'তা আমি জানি। খুব ভালো করেই জানি।'

'আমার উপর রাগ করেননি তো?'

'না।'

'ঠিক বলছেন?'

'তোমার উপর বোধহয় আমি কোনোদিনই রাগ করব না।'

গরমের ছুটিটা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। তারপর একদিন রমা বেনারস ফিরে গেল। সুভাষদার কাছে পৌঁছানোর সংবাদ এলো টেলিগ্রামে, রিচড্ সেফলি। কদিন পরে আমার কাছেও একটা চিঠি এলো, ছুটির পর হোস্টেলে ফিরে এসে প্রত্যেকবারই খারাপ লাগে। এবার আরো বেশি খারাপ লাগছে। বিদেশের চাইতে দিল্লিতে বাবা-মাকে আরো আরো অনেক বেশি কাছে পেয়েছি। তাছাড়া আপনার জন্য মে-জুন মাসের দিল্লির রুক্ষতা কখনও অনুভবই করলাম না। কলকাতা যাতায়াতের পথে নিশ্চয়ই বেনারস ঘুরে যাবেন।

শেষে ছোট একটা টিপ্পনী—অসমাপ্ত চিঠিই ডাক বাক্সে ফেলবেন।

ঐ ছোট্ট টিপ্পনীর জন্যই একটা চিঠি লিখে ফেললাম। চিঠি লেখার অভ্যাস আমার নেই, তা তুমি জান। তবুও যা দুটো-একটা চিঠি লিখব, তা কখনই অসমাপ্ত হবে না। টাইপ রাইটার খট্ খট্ করে রিপোর্ট লিখতে লিখতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে কলম ধরতে পারি না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এজন্য অনেকেই আমার উপর অসন্তুষ্ট কিন্তু তোমাদের মতো যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা মানসিক, তারা কখনই আমাকে ভুল বুঝবে না। কলকাতায় যাতায়াতের পথে সব সময় বেনারস যাওয়া সম্ভব না হলেও মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

সুভাষদা আর জয়ন্তী-বৌদির জন্য আমার জীবনধারাটাও বদলে গেল। শনিবার একটু রাত করে গেছি। দরজা খুলেই বৌদি বললেন, 'নিশ্চয়ই কোনো ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে হুইস্কি খেতে গিয়েছিলে?'

বৌদির কথায় আমি হাসি। বলি, 'ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে হুইস্কির জন্য যাই না, যাই কিছু নিউজ পাবার লোভে।'

'ওই ছুতোর নাম করে জার্নালিস্টগুলো শুধু মদ খেতেই যায়।'

বৌদির মুখের সামনে আলতো করে একটা হাত দিয়ে বললাম, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বকাবকি করবেন না। আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন শুনলে কি ভাববে বলুন তো?'

বৌদি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'তোমার একটু বদনাম হওয়াই দরকার।'

ঘরে ঢুকতেই সুভাষদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যদি বৌদির রূপ হয় তাহলে কি হতো ভাবতে পার?'

বৌদি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমরা না থাকলে তোমাদের যে কি দশা হতো তা একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

আমি সুভাষদার পাশে বসে বললাম, 'আমাকে দেখেও তা বুঝতে পারছেন না?'

'তুমি তো হাফ্ ব্যাচেলার!'

'তার মানে?'

'তোমার সঙ্গে কত বৌ-বৌদির কত রকমের ঘনিষ্ঠতা যে...'

আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, 'শুধু একবার প্রেম করে ব্যর্থ হওয়া ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো মেয়ের আবির্ভাব হয়নি।'

বৌদি হাসতে হাসতে ড্রইংরুম থেকে ভিতরে চলে গেলেন।

সুভাষদা বললেন, 'ও তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে সিনেমায় যাবে ভেবেছিল। তুমি দেরি করে আসার জন্য...'

'সে কথা তো আমাকে আগে বলতে হয়।'

খেতে বসে খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, 'জানেন বৌদি, আজ ভীষণ সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু...'

সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বৌদি বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার দাদা কিছু বলেছেন।'

সুভাষদা বললেন, 'আমি তো কিছু বলিনি।'

আমিও বললাম, 'দাদা কি বলবেন?' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'কালকে নিশ্চয়ই যাব।'

'দয়া করে একটু আগে থেকে জানিও।'

দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার জন্য হিন্দী-বাংলা সিনেমা দেখার জন্য বৌদির খুব আগ্রহ। সময় পেলেই আমরা দুজনে সিনেমায় যাই। সুভাষদা যান না। সিনেমায় ওঁর ভীষণ অরুচি। উনি বাড়িতে বসে বসে বই পড়েন অথবা কোনো পার্টিতে যান। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দিয়ে, সিনেমা দেখে, এখানে-ওখানে বেড়িয়ে দিনগুলো হারিয়ে যায়। ফুরিয়ে যায়। ওঁরা ছুটিতে কলকাতা যাবার পথে বেনারস থেকে রমাকে নিয়ে নেন। আমি দিল্লিতেই থাকি। কাজ করি। অফিসের কাজে বাইরে যাই। যাই কলকাতাতেও। দুটো একটা দিন খুব হৈ-চৈ করে আবার ফিরে আসি রাধাকিষণের কাছে।

রমা বি. এ. পাস করে। এম. এ. পড়তে শুরু করে। দিল্লি আসে।

'বাবুজি! বাবুজি!'

চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়েই উত্তর দিই, 'কি হলো?'

'দিদি আয়া হ্যায়।'

'কোনো দিদি এলো রে?'

'রমা দিদি।'

মুখ থেকে চাদর সরিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করি, 'কে এসেছে?'

'রমা দিদি।'

সঙ্গে সঙ্গে রমা ঘরে ঢুকল। 'কটা বাজে জানেন!'

'কটা?'

'পৌনে দশটা!'

'পৌনে দশটা?'

'বিশ্বাস না হয় নিজের ঘড়িটা দেখুন!'

রাধাকিষণ চলে গেল। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘড়ি খুঁজছি। রমা বললো, 'আপনার হাতেই তো ঘড়ি আছে।'

ঘড়িটা দেখেই লজ্জিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

'কোনো স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি?' হাসতে হাসতে রমা প্রশ্ন করল।

'কেন বলো তো?'

'হাতে ঘড়ি রয়েছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছেন,...'

'স্বপ্ন দেখার বয়স কি আর আছে?'

'আর লেকচার দিতে হবে না। এবার উঠুন।'

'কিন্তু তুমি কবে এলে, তাই আগে বল।'

'কাল রাত্রে এসেছি।'

'কই তোমার মা-বাবা তো কিছু জানাননি আমাকে।'

'ওঁরাও ঠিক জানতেন না। রিজার্ভেশন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চারটি মেয়ে একসঙ্গে চলে এলাম।'

'ভালোই করেছ।' বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম, 'একটু বসো। এক্ষুনি আসছি।'

বাথরুম থেকে বেরুতেই রাধাকিষণ চা দিল। রমাকে শুধু চা দেবার জন্য খারাপ লাগল। 'ওকে শুধু চা দিলে কেন?'

রমা বললো, 'আমি খেয়ে এসেছি।'

'তাহলেও সামান্য কিছু তো...'

'এখন কিচ্ছু খাব না।'

'ঠিক তো?'

'তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?'

রাধাকিষণ চলে যেতেই রমা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আমি একটু মোটা হয়েছি, তাই না?'

একবার ভালো করে ওকে দেখলাম। 'মোটা হয়েছ কিনা জানি না, তবে তোমাকে দেখতে আরো ভালো লাগছে।'

'ঐসব আজে-বাজে কথা বললে এক্ষুনি চলে যাব।'

'আজে-বাজে কথা বলছি নাকি?'

'তবে কি?'

'সত্যি বলছি, ইউ লুক ভেরী প্রেটি!'

'থাক। আর আমার রূপের তারিফ করতে হবে না।'

খালি চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বল কেমন আছো?'

'ভালোই আছি।'

'পড়াশুনা কেমন চলছে?'

'মোটামুটি।'

'মোটামুটি কেন?'

'খুব বেশি পড়াশুনা করতে আর ভালো লাগে না।'

'তাহলে কি এবার বিয়ে করতে চাও?'

'হ্যাঁ। বিয়ে করার জন্য তো আমি পাগল হয়ে উঠেছি।'

'খুব অস্বাভাবিক নয়।'

'থাক! ওসব কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'সেই ভালো। এইভাবে যতদিন থাকো, ততই ভালো।'

মাত্র দেড় মাসের ছুটি। তাহোক খুব আনন্দে কাটল দিনগুলো। রমা এলে ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত বেড়ে যায়। বৌদি প্রায়ই কিছু স্পেশাল রান্না করেন আর আমিও তার অংশীদার হই। দুচারদিন পর পর রমাও আমার আস্তানায় আসে।'

'জান রমা, তুমি এলে দিনগুলো বেশ কেটে যায়।'

'তাই তো দিল্লি থেকে গেলেই ভুলে যান।'

'চিঠি লিখি না মানেই কি ভুলে যাই?'

'কলকাতায় যাতায়াতের পথেও তো একবার নামতে পারেন।'

'সব সময় ঠিক সম্ভব হয় না।'

'এই এক বছরের মধ্যে একবারও সম্ভব হলো না?'

'এবার ঠিক যাবো।'

'কথা দিচ্ছেন?'

হঠাৎ ওর হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

আমি তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিতেই ও হাসতে হাসতে বললো, 'আসবেন। খুব খুশী হবো।'

সুভাষদার দিল্লি বাসের মেয়াদ তিন বছর। কোথা দিয়ে কেমন করে যে তিনটি বছর পালিয়ে গেল, তা বুঝতেই পারলাম না। দুঃখ দুর্দিনের রাত্রি শেষ হতে চায় না, অন্ধকার চিরস্থায়ী মনে হয় কিন্তু আনন্দের দিনগুলো, বাসর রাত্রি যেন নিমেষেই ফুরিয়ে যায়। সুভাষদা মস্কো বদলী হলেন। রমা বেনারস থেকে আসতে পারেনি। কয়েক মাস পরেই এম-এ পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়েই মস্কো যাবে। যাবার দিন শুধু বৌদি নয়, সুভাষদাও রমার জন্য একটা ছেলে দেখতে বললেন।

'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

বৌদি বললেন, 'বিয়ে দিতে পারছিলাম না বলেই এম-এ পড়ালাম কিন্তু এবার তো বিয়ে না দিলেই নয়। তাছাড়া ওর রিটায়ার করার টাইমও এসে গেল।'

আমি চুপ করে সব কিছু শুনলাম কিন্তু মনে মনে জানতাম, রমার বিয়ের পাত্র আমি কখনই খুঁজে বের করব না।

সুভাষদা মস্কো রওনা হয়ে যাবার পরই রমাকে একটা চিঠি লিখলাম, 'তোমার বাবা-মাকে মস্কোর প্লেনে চড়িয়ে দেবার পরই খেয়াল হলো তোমার বেনারস বাসের মেয়াদও দীর্ঘ নয়। কয়েক মাস পরেই তোমার ফাইন্যাল পরীক্ষা। তারপর তুমি মস্কো যাবে। তারপর? অনেক কিছু ঘটতে পারে তারপরে। হয়ত তুমি হারিয়েই যাবে। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। হওয়া সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতে আরো কত কি হতে পারে, তাই না? যাই হোক দু একদিনের জন্য বেনারস যাব ভাবছি। তোমার পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি না হলেই যাব। নয়তো তোমার মস্কো যাবার সময় নিশ্চয়ই দেখা হবে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই রমার চিঠি পেলাম, আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। রবিবার ছুটি। সোমবার আমাদের কোনো ক্লাস থাকে না। সুতরাং যে কোনো রবিবার সকালে আসতে পারেন। আমি কী গেস্ট হাউসে আপনার থাকার ব্যবস্থা করব? নাকি হোটেলেই থাকবেন? জানাবেন। আসার আগে হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নিশ্চয়ই একটা টেলিগ্রাম করবেন।

শেষে লিখেছে, আমি হারিয়ে যাব কেন? আপনার সঙ্গে আমাদের কি সেই সম্পর্ক?

আমি বেনারস গেলাম। না গিয়ে পারলাম না কিন্তু কেন গেলাম তা জানি না। আসার দিন স্টেশনে রমাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন এলাম বলো তো রমা?'

'ভালো লাগল না বুঝি?'

'ভালো লাগল বৈকি কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে যে জন্য এসেছিলাম তা বোধহয় হলো না।'

'আমাকে কিছু বলবেন?'

'না। কি আর বলব?' সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কিছু বলবে?'

ট্রেন ছেড়ে দিল। আমার প্রশ্নের জবাব দেবার অবকাশ পেল না রমা।

অদৃষ্টের এমনই যোগাযোগ ও মস্কো যাবার সময় আমি দিল্লিতেই থাকতে পারলাম না। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের স্কলারশিপ নিয়ে এক বছরের জন্য লন্ডন চলে গেলাম।

এই রমার সঙ্গেই দেবব্রতর বিয়ে হলো। কার্ড দেখে প্রথমে বুঝতে পারিনি। ওর ভালো নাম যে রঞ্জনা, তা আমি জানতাম না। তাছাড়া দেবব্রতর এক দিদি খুব ছেলেবেলায় মারা যান। তার নামও রমা ছিল বলে ওরা রঞ্জনা বলেই ডাকেন।

ঢাকুরিয়ায় সুভাষদাদের বাড়ি আছে। তাছাড়া ওঁর বাবা জীবিত বলে কলকাতাতেই বিয়ে হয়। এর কদিন পরেই আমি ফিরে এলাম। বিয়ের পর ডক্টর চৌধুরী দিল্লিতে রিসেপসন দিলেন। ঐ রিসেপসনে গিয়ে বিয়ের গল্প শুনে আমি তাজ্জব।

এম-এ পরীক্ষা দিয়ে রমা মস্কো যাচ্ছিল। অত্যন্ত জরুরী কারণে ডক্টর চৌধুরীও মস্কো যাচ্ছিলেন ঐ একই ফ্লাইটে। পালামের ডিপারচার লাউঞ্জে কেউই কাউকে খেয়াল করেননি। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট। অনেক ভারতীয় যাত্রী। সুতরাং খেয়াল হবার কোনো অবকাশও ছিল না। দিল্লি থেকে সোজা মস্কো, তারপরই লন্ডন। ঠিক সময়ই প্লেন টেক অফ্ করল। কাবুল ওভার-ফ্লাই করে হিন্দুকুশ পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়ই এঞ্জিনে গণ্ডগোল দেখা দিল। মস্কো নয়, তাসখন্দেই প্লেন ল্যান্ড করল। তাসখন্দ এয়ার পোর্টের ট্রানজিটে লাউঞ্জেই রমার সঙ্গে ডক্টর চৌধুরীর প্রথম আলাপ। অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি বসেছিলেন দুজনে। তারপর ডক্টর চৌধুরীই প্রথম আলাপ শুরু করলেন, 'লন্ডন যাচ্ছেন?'

'না, মস্কো।'

'কেন, স্কলারশিপ পেয়ে পড়তে যাচ্ছেন?'

'আমি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, মানে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে বাবা-মার কাছে যাচ্ছি।'

'আপনার বাবা-মা মস্কো থাকেন?'

'থাকেন মানে এখন ওখানেই পোস্টেড।'

দুজনেই ইংরেজিতে কথা বলছেন। কেউই জানেন না কে কোথাকার লোক। ডক্টর চৌধুরী জানতে চাইলেন, 'আপনার বাবা কি আমাদের এম্বাসীতে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবার নামটা জানতে পারি?'

রমা হাসতে হাসতে বললো, 'নিশ্চয়ই। আমার বাবার নাম সুভাষ রায়।'

এবার ডক্টর চৌধুরী খুশীতে চমকে উঠলেন, 'আপনি বাঙালি?'

'আমাকে আপনি বলার দরকার নেই। আমি আপনার চাইতে অনেক ছোট।'

দেবতোষ চৌধুরী খুশী হয়ে বললেন, 'আজকাল আপনি বলাটাই নিরাপদ—কারণ অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই তুমি বলা পছন্দ করে না।'

'বড়দের কাছে ছোট হতে আমার ভালোই লাগে।'

আধুনিক বিমান যত দ্রুত গতিতে দেশ দেশান্তর পার হয়, বিকল হলে তত বেশি সময় নষ্ট করে। অধিকাংশ যাত্রী অধৈর্য হলেও ডক্টর চৌধুরী আর রমা মনের আনন্দে গল্প করেন।

'কি আশ্চর্য! এতক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করছি কিন্তু তোমার নামটাও জানলাম না।'

'আমার নাম রঞ্জনা রায়।'

'বাঃ! বেশ সুন্দর নাম! আমার নাম দেবতোষ চৌধুরী। লোকে বলে ডক্টর চৌধুরী।'

মস্কো এয়ারপোর্টেই সুভাষদা আর বৌদির সঙ্গে ডক্টর চৌধুরীর আলাপ হলো। আলাপ না থাকলেও ডক্টর চৌধুরী সুভাষদার অপরিচিত ছিলেন না। ফার্স্ট সেক্রেটারি পদ্মনাভন ও সোভিয়েট একাডেমী অফ্ সায়েন্সের একজন প্রতিনিধি তাঁকে রিসিভ করতেই এয়ারপোর্টে এসেছেন, তাও জানেন। আলাপ হয়ে খুব খুশী হলেন। এয়ারপোর্ট থেকে বিদায় নেবার আগে ডক্টর চৌধুরী সুভাষদাকে বললেন, 'মিঃ রায়, রঞ্জনা একদিন আমাকে খাওয়াবে বলছে। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'সে তো সৌভাগ্যের কথা।'

মাত্র একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন উনি সুভাষদার অ্যাপার্টমেন্টে এলেন, খেলেন, গল্প করলেন। একদিন রমাকে নিয়ে ক্রেমলিন প্যালেস দেখতে গেলেন। গ্রান্ড ক্রেমলিন প্যালেস, লেনিনের পড়াশুনার ঘর, রেড স্কোয়ার ঘুরতেই ডক্টর চৌধুরী নিজেদের পরিবারের, নিজের, দেবব্রতর অনেক কথা বলেন। 'একটা কথা বলব রঞ্জনা?'

'সেজন্য অনুমতি চাইছেন কেন?'

'কথাটা একটু জরুরী। তাছাড়া তোমার ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত বলেই অনুমতি চাইছিলাম।'

রমা চুপ করে রইল।

'তুমি অনুমতি দিলে দেবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব করতাম তোমার বাবা-মার কাছে।'

রমা নিরুত্তর থেকেছে।

রমা রঞ্জনা হয়ে গেল।

চার

রমার বিয়ে হয়ে একদিক থেকে ভালোই হলো। ওর বাবাকে আমি দাদা বলি, মাকে বৌদি। কিন্তু ওঁদের চাইতে আমি অনেক ছোট, হাজার হোক আমি জার্নালিস্ট। কাজকর্মে কখনও কখনও বিদেশ যাই। আলাপ হয় বহু ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠতাও হয় কয়েকজনের সঙ্গে। সুভাষদাদের সঙ্গেও হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তো ওঁকে আমি কাকাবাবু বা মামাবাবু বলতে পারি না। দাদা বলি। মিসেস জয়ন্তী রায়কে বৌদি বলি। এই রকম অজস্র দাদা-বৌদি আমার আছে। পার্লামেন্টের বহু প্রবীণ সদস্যকেও দাদা বলি। সেন্ট্রাল হলে বসে রসের গল্প করি। অথচ ওঁদের অনেকেরই নাতনীদের

সঙ্গে নিঃসন্দেহে আমি প্রেম করতে পারি।

সুভাষদাদের সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য অতটা না হলেও যথেষ্ট। রমা আমার চাইতে কয়েক বছরের ছোট কিন্তু এমন ছোট নয় যে ও আমাকে কাকু বলতে পারে। আমি এমন বড় নই যে ওর বন্ধু হতে পারি না বা আমাদের দুজনের মনের মধ্যে একই সঙ্গে একটা ছোট্ট মিষ্টি স্বপ্ন দানা বাঁধতে পারে না। বিচ্ছিরি না হলেও বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ছিল। ওর বিয়ে হয়ে অন্তত এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বেঁচেছি। রমাও নিশ্চয়ই স্বস্তি পেয়েছে।

রমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বেনারসে। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পরই বৌদি ওকে চিঠি দিয়েছিলেন। মনে হয় আমার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথাই লিখেছিলেন। বৌদি আমাকেও জানান যে ওকে চিঠি দিয়েছেন। রমার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ থাকলেও দ্বিধা ছিল মনে মনে। তার অনেক কারণ ছিল। তবু গিয়েছিলাম। একবার কলকাতা যাবার পথে বেনারস ঘুরে গেলাম। বেশ লেগেছিল। একটি মিষ্টি স্মৃতির প্রলেপ লেগেছিল আমার মনে।

এরপর মাঝে মাঝেই ওর কথা মনে পড়ত। দু একবার ওকে চিঠি লিখেছি। অতি সাধারণ মামুলি চিঠি। বোধহয় খামে ঠিকানাও টাইপ করেছি কিন্তু ডাক বাক্সে ফেলিনি। ভেবেছি কি দরকার। যে স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে বেঁচে আছি, সেইটুকুই থাক। অম্লান থাক। ঐ পুঁজিটুকু নিয়েই আমার দিন কেটে যাবে। আমি না লিখলেও নববর্ষে রমার একটা ছোট চিঠি এসেছিল। নিছক শুভ কামনা। খামের মধ্যে ঐ নীল প্যাডের পাতায় তিন চার লাইনের চিঠিতে শুভ কামনার চাইতে কি যেন একটু বেশি ছিল। আমি জবাব দিলাম পোস্টকার্ডে তোমার শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ।

বেনারসের পর রমার সঙ্গে ভালোভাবে আবার আলাপ হলো কায়রোতে। ওদের বাড়িতে মাত্র দুদিন ছিলাম। আমাকে ভালোভাবে খাওয়াবার জন্য বৌদি এমন মেতে উঠলেন যে কিচেন থেকে লিভিংরুম-এ এসে গল্প করার সময় পর্যন্ত ছিল না। আমি কিচেনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৌদির সঙ্গে গল্প করি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কয়েকটা ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে সামান্য কিছু কেনাকাটার ছিল বলে প্রথমবার বেরুবার সময় বৌদিই বললেন, রমা তুই বরং ওর সঙ্গে যা। রমার সঙ্গেই বেরুলাম। প্রথমেই কাসর এল নীল স্ট্রিটে আমেরিকান একস্‌প্রেসে গিয়ে ট্রাভেলার্স চেকগুলো ভাঙালাম। ব্যাঙ্ক থেকে বেরুবার সময়, রমা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কায়রোয় এই প্রথম এলেন?'

'না, এর আগেও দু'বার এসেছি।'

'তাহলে তো আপনিই আমার গাইড হতে পারেন।'

একটু হাসলাম, 'না, অতটা চিনি না। বড় হোটেলে থেকে ট্যাকসিতে ঘুরলে কোনো কালেই কোনো শহর চেনা যায় না।'

'তা ঠিক।'

'তুমি পিরামিড-টিরামিড সব কিছু দেখেছ?'

'হ্যাঁ। দেখেছি।'

'কায়রো কেমন লাগছে?'

'ভালোই। বিশেষ করে নাইলের সাইডটা সত্যি ওয়ান্ডারফুল।'

পরের দিন আমি, বৌদি আর রমা সিনেমা দেখলাম। বোধহয় কায়রো প্যালেসে। আমার দিন আসার ফ্লাইট ছিল অনেক রাত্রে। বৌদির অনুরোধে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া করেই খানিকক্ষণ ঘুমুতে হলো। সেই সেদিন বিকেলবেলায় রমার সঙ্গে আবার একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কায়রো-টাওয়ারে গেলাম। কায়রো-টাওয়ারে বসলে মনে হয় মহাশূন্যে ঘুরছি। ভারি ভালো লাগে। মজা লাগে। একটু রোমাঞ্চ উত্তেজনাও। সমস্ত কায়রো শহরটা, নাইল নদী,

পিরামিড, আরো কত কি দেখা যায়।

'বাবা-মা তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর তুমি বুঝি আমার নিন্দা করো?'

'কার কাছে আপনার প্রশংসা বা নিন্দা করব বলুন?'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কেন? মনে মনে?'

রমা যেন একটু লজ্জা পেল।

ট্যাকসিতে বাড়ি ফেরার পথে ও জিজ্ঞাসা করল, 'কবে বেনারস আসছেন?'

'ঠিক নেই।'

'কলকাতায় তো মাঝে মাঝেই যান?'

'তা যাই।'

'তবে?'

'তবে কি বেনারসে নামব?' একটু হাসলাম, 'তোমার হোস্টেলে গিয়ে দেখা করতে ভীষণ অস্বস্তি লাগে।'

'কেন?'

একটু ভাবলাম, 'জানি না কে কি ভাবব।'

রমাও হাসল। বললো, 'মনে পাপ না থাকলে অস্বস্তি করার তো কথা নয়।'

মুহূর্তের জন্য ভেবে বললাম, 'মনে মনে কে পাপী নয়? তুমি না?'

রমা আর কথা বলেনি অনেকক্ষণ। বাড়ির কাছাকাছি এলে বললো, যাই হোক কলকাতায় যাতায়াতের পথে বেনারস নামবেন।'

'নামব?'

'হ্যাঁ, নামবেন।'

'হোস্টেলে গিয়ে দেখা করতে পারব না।'

'বেশ। আগের থেকে খবর দেবেন। আমি গিয়ে দেখা করব।'

পরে বেনারসে রমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম। যেতে হয়েছিল। ও তখন এম-এ পড়ে। সুভাষদারা মস্কোয়। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে গণ্ডগোলের খবর পেয়েই সুভাষদা আমাকে টেলিগ্রাম পাঠালেন রমাকে দেখে খবর দেবার জন্য। আমি পৌঁছবার আগেই গণ্ডগোল বন্ধ হলেও তখনও পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। ক্যাম্পাসে ঢুকতে, বেরুতে পাস লাগে। রমা আমাকে দেখে অবাক, 'আপনি হঠাৎ?'

'আগে বল তুমি কেমন আছ?'

'ও হাসতে হাসতে বললো, 'কেন? দেখে কি মনে হচ্ছে খারাপ আছি?'

'দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে ভেবেছিলাম হয় হাসপাতালে নয়তো পুলিশ লক-আপে তোমাকে দেখতে পাব।'

'তাহলে তো আপনার আশা ভঙ্গ করলাম।'

'নিঃসন্দেহে আশাভঙ্গ হলো কিন্তু সেজন্য তোমার বাবা-মা অত্যন্ত সুখী হবেন।' একটু থেমে একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে সুভাষদার টেলিগ্রামটা ওকে দিলাম।

টেলিগ্রামটা পড়েই ও চমকে উঠল, 'সে কি। বাবা আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন?'

'পাঠাবেন না? তোমার যখন ছেলেমেয়ে হবে তখন বুঝবে...'

রমা হাসল। আমাকে একবার ভালো করে দেখল। 'আপনি জার্নালিস্ট বলে বড্ড পাকা পাকা কথা বলেন।'

'হাজার হোক আমি তোমার বাবা-মার বন্ধু। এসব কথা বলার অধিকার আমার আছে বৈকি।'

হঠাৎ রমা বললো, 'বাবা-মার বন্ধু হয়েই তো আপনি আমাকে মুশকিলে ফেলেছেন।'

'তার মানে?'

রমা কিছুতেই মনের কথা খুলে বললো না। অনেক অনুরোধ করলাম। না, তবুও না। আজ পর্যন্ত রমা আমাকে সে কথা বলেনি। মনে হয় আর কোনোদিনই বলবে না। কোনো বাছ-বিচার না করেই মানুষের রোগ হয়। ধনী-দরিদ্র, ছেলে-বুড়ো, শহুরে বাবু, গ্রামের চাষি। সবার স্বপ্ন দেখার মধ্যেও কোনো বাছবিচার নেই। সবাই দেখতে পারে। কোনো বাধা নেই। রমা কোনো বেহিসেবী স্বপ্ন দেখেনি তো? জানি না। কোনো গুণ না থাকলেও প্রাণ চঞ্চল কাঠবেড়ালীকে সবার ভালো লাগে। রমার ভালো লাগেনি তো? রমা রঞ্জনা হলো। আমি খুব খুশী। নিশ্চিন্ত। নানা কারণে মনে যে স্মৃতির পলিমাটি পড়ে আছে, তার ওপর অনেক বেদনা-বিধুর স্বপ্ন জন্ম নিয়েছে। কোনো মানুষই তো শুধু দায়িত্ব-কর্তব্য, খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকে না। আমিও না। মনের মধ্যে কিছু স্বপ্ন সবারই জমা থাকে। আমারও আছে। বাইরে আমার যত দৈন্যই থাক, মনে মনে আমি সম্রাট। কোনো কিছুর বিনিময়েই সে সাম্রাজ্য বিলিয়ে দেওয়া যায় না।

যুক্তি, তর্ক, সামাজিকবোধ দিয়ে নিজেকে অনেক সংযত করলেও একটা বিষণ্ণ করুণ সুর মাঝে মাঝেই নিজের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলাম। সুভাষদাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার আগের মতো দিনগুলো কাটাচ্ছিলাম। সারাদিন সংবাদ সংগ্রহের তাগিদে ঘুরে বেড়াই, টাইপরাইটার খট্‌খট করি, টেলিপ্রিন্টার-টেলেক্স অপারেটরকে গছিয়ে দিয়েই চলে যাই চাণক্যপুরীর কোনো না কোনো ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে। রাত নটা-দশটা বা এগারোটা-বারোটায় বাড়ি ফিরি। রাধাকিষণের সেবা উপভোগ করে শুয়ে পড়ি। কোনোদিন কোনো কারণে কোনো পার্টিতে না গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরি। চা-কফি খেয়ে লরেন্স ডুরেলের ডিপ্লোম্যাটিক জীবনের পটভূমিকায় লেখা 'স্পিরিট দ্য কোর' বা 'স্টিফ আপার লিপ' নিয়ে মজার মজার ঘটনাগুলো আবার পড়ি। কখনও বা শরৎচন্দ্রকেই পড়তে শুরু করি নতুন করে। বেশি ক্লান্ত থাকলে পড়ি না, পড়তে ইচ্ছা করে না। রাধাকিষণের সঙ্গেই গল্প করি।

'হ্যাঁরে, একবার তোর বৌ-ছেলেদের দিল্লি দেখাবি না?'

'দিল তো করে মাগার...'

'মাগার কি হলো?'

'অনেক খরচা সাব।'

'তুই তো শুধু ট্রেন ভাড়া দিয়ে আনবি। থাকা-খাওয়ার তো খরচ লাগবে না।'

রাধাকিষণ একটু কাচুমাচু করে বললো, 'তাছাড়া দিল্লির মতো ইতনা বড় শহরে আসতে বিবির খুব ডর।'

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় কিসের?'

'ওরা তো এত ভালো কোঠি, মোটর গাড়ি, টেলিফোন, ফ্রিজ, রেডিও—কিছুই দেখেনি...'

'তাহলে একবার আমিই তোর দেশে যাব।'

'গেলে তো সবাই খুব খুশী হবে মাগার আপনি আমাদের বাড়িতে থাকতে পারবেন না।'

'আমি কি কোটিপতি মহারাজা যে গ্রামে গিয়ে থাকতে পারব না?'

রাধাকিষণের কাজ থাকে। বেশিক্ষণ গল্প করতে পারে না। চলে যায়। আমি একা বসে থাকি। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রমার কথা মনে হয়। অনেক কথা। বহু ছোটখাট ঘটনা।

প্রথমবার বেনারস গেছি ওর সঙ্গে দেখা করতে। হাজার হোক প্রথম দেখা, প্রথম আলাপ। প্রথমে একটু জড়তা, দ্বিধা থাকবেই। আমারও ছিল, ওরও ছিল। সেই দ্বিধা আর জড়তা যখন চলে গেল, তখন রমা হাসতে হাসতে বললো, 'আপনি আসার আগে আপনার সম্পর্কে দারুণ দুশ্চিন্তা ছিল।'

'দুশ্চিন্তা?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'মার চিঠি পড়ে আর আপনার ওয়াশিংটনের ছবিগুলো দেখে মনে মনে আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা করেছিলাম কিন্তু ভয় ছিল যদি আমার ধারণা ঠিক না হয়? যদি আপনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির, খুব সিরিয়াস মানুষ হন?...'

'আরো কিছু ভেবেছিলে নাকি?' আমি হাসতে হাসতে জানতে চাই।

'আমি এখানে একলা একলা থাকি বলে বাবা-মার খুব চিন্তা হয়। অনেক সময়ই, অনেককে আমার খোঁজ-খবর নিতে পাঠান কিন্তু অধিকাংশ লোককেই আমার ভালো লাগে না।'

ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি, আমাকে ভালো লেগেছে? কিন্তু পারলাম না। জানতে চাইলাম, 'আমার সঙ্গে আলাপ করে এখন কি মনে হচ্ছে?'

'আই অ্যাম নট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড।'

আমার সম্পর্কে ওর কাছ থেকে আরো কিছু শোনার আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে?'

'তার মানে আপনি আমাকে হতাশ করেননি।'

পরের দিন রমাকে নিয়ে টাঙ্গায় চড়ে সারনাথ গেলাম। ঝাঁকুনি সামলাতে গিয়ে দু একবার ও আমার হাতটা চেপে ধরেছে। শুধু প্রয়োজনে নাকি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছাও ছিল, তা বুঝতে পারিনি। তবে ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে সাবলীলভাবে মেশার জন্য। সারনাথে ধর্মরাজিকা স্তূপের পাশে দুজনে পাশাপাশি বসে অনেকক্ষণ অনেক গল্প করলাম। শেষের দিকে হঠাৎ বললো, 'আপনি আসার জন্য দুটো দিন বেশ কেটে গেল। রোজ কলেজ আর হোস্টেল লাইফ বড় একঘেয়ে লাগে।'

'কোথাও বেড়াতে যাও না?'

'কোথায় যাব?'

'দুচার দিনের ছুটিতে আশে-পাশে কোথাও তোমরা বেড়াতে যাও না?'

'একে হিন্দু ইউনিভার্সিটি, তার উপর আমরা মেয়ে। অত ঘুরাঘুরির সুযোগ এখানে নেই।' একটু থেমে আবার বললো, 'কাছাকাছি যাদের বাড়ি বা আত্মীয়স্বজন আছে তারা অবশ্য দুচার দিনের ছুটিতেও অনেক সময় ঘুরে আসে কিন্তু কলকাতায় দাদু-দিদা ছাড়া আমার তো কেউ কাছাকাছি থাকে না।'

'কিন্তু তোমার তো এ সমস্যার সমাধান হওয়া মুশকিল।'

'আপনি মাঝে মাঝে আসবেন।'

'মাঝে মাঝেই কি আসা সম্ভব?'

'আপনি তো বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়েন নি যে দু এক দিনের জন্যও বেরুতে পারবেন না!'

'বিয়ে না করলেই বুঝি ইচ্ছামতো আসা যায়?'

'নিশ্চয়ই যায়।'

আমি মজা করে বললাম, 'তাহলে তো তুমিও মাঝে মাঝে দিল্লি আসতে পার।'

'আমি তো মেয়ে। তাছাড়া হোস্টেল থেকে আমাকে ছাড়বে নাকি?' এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি যখন ছুটিতে বাবা-মার কাছে যাব তখন এসে দেখবেন কত ঘুরতে পারি।'

ওর প্রস্তাব শুনে হাসি পায়। বলি, 'তুমি ছুটিতে কায়রো-লন্ডন-মস্কো-ওয়াশিংটন যেতে পার বলে কি আমিও পারব?'

'আমি বলছিলাম যদি আসেন...'

'ঐ ইফস্ অ্যান্ড বাটস্‌গুলোই তো লাইফের সব চাইতে বড় সমস্যা।'

তারপর রমা বলেছিল, 'বাবা দিল্লিতে এলে দেখবেন আপনাকে কি বিরক্তি করি।'

হঠাৎ একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ হতে পারে, ঘনিষ্ঠতা হতে পারে, ভালোবাসা হতে পারে কিন্তু কোনো কারণেই মুহূর্তের মধ্যে সেই পরিচিত, ভালোবাসার পাত্রপাত্রীকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। আমি অনেকবার অনেক রকমভাবে চেষ্টা করেও রমার ঐ বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানা ভুলতে পারছিলাম না। পর পর কদিন নাইট শো'তে সিনেমা গেলাম। সিনেমা হলে ঢুকলেই নিউজ রীল দেখতে হয়। দেখতে হলো। আরো অনেক কিছুর সঙ্গে বুদ্ধগয়া আর সারনাথে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসবও দেখাল। ভুলতে গিয়ে আবার সবকিছু নতুন করে মনে পড়ল।

'আপনি তো জার্নালিস্ট। একদিন না একদিন কোনো না কোনো কারণে আপনাকে সারনাথে আসতেই হবে কিন্তু তখন কি মনে পড়বে আমার সঙ্গে একটা দিন কাটিয়েছিলেন?'

ঐ নিউজ রীলের জন্য অর্ধেক সিনেমাটাই মন দিয়ে দেখতে পারলাম না।

'বেনারসের মতো দিল্লিতেও যদি গঙ্গা থাকত তাহলে বেশ নৌকা চড়ে বেড়াতে পারতাম, তাই না?'

'কেন, গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে তোমার ভালো লাগে না?'

'লাগে কিন্তু নৌকা যখন মাঝ গঙ্গায় টলমল করে, তখন ভয়ও লাগে, মজাও লাগে।'

নৌকা যখন বেশি দুলতে শুরু করত তখনই রমা দু'হাত দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরত। জিজ্ঞাসা করতাম, 'নৌকা ঘুরিয়ে নিতে বলব?'

'না, না, ঘুরিয়ে নেবে কেন?'

'তুমি ভয় পাচ্ছ যে!'

'একটু একটু ভয় পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আপনি তো আছেন।'

রাধাকিষণ খেতে ডাক দেয়। চটিটায় পা দিতে গেলেই আবার মনে পড়ে কায়রোতে রমাই পছন্দ করেছিল, এইটাই নিন। খুব সুন্দর মানাবে আপনাকে।'

'সুন্দর চটি পরলেই কি আমি সুন্দর হবো?'

'আপনাকে সুন্দর দেখতে বলে এত অহঙ্কার কেন?'

'তোমার কাছে আমি রূপের অহংকার করব?'

'মেয়েদের সৌন্দর্যের সঙ্গে পুরুষের সৌন্দর্যের তুলনা করার কোনো মানে হয় না।'

রমার কথা কেন এত মনে হয় তা জানি না। বুঝতে পারি না। কিন্তু হয়। হবেই। মাঝে মাঝেই হয়। বোধহয় মনের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করি। বোধহয় কেন? নিশ্চয়ই একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। মনে মনে বেদনাবোধ করি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে দূরের অপরিচিত ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি।

তার চাইতে বড় কথা দেবব্রত চৌধুরীর সঙ্গে ওর বিয়ে হলো। কোনো না কোনো ভালো ছেলের

সঙ্গেই রঞ্জনার বিয়ে হতো কিন্তু ভালোরও তো জাত আছে। দেবব্রত শুধু একটা ভালো ছেলে নয়, একটা স্বপ্ন, একটা সাধনা, একটা বিরাট সম্ভাবনা। ডক্টর চৌধুরীর রিসেপসনে সুভাষদাকে সেই কথাই বললাম।

'একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি আসছি।' সুভাষদা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেও একটু পরেই বৌদিকে নিয়ে ফিরে এলেন। বৌদিকে বললেন, 'শোন শোন ও কি বলছে।'

বৌদি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলছ?'

এবার আমি বললাম, 'সুভাষদাকে বলছিলাম দেবব্রতর মতো ছেলে হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে সুভাষদা বললেন, 'না না, তুমি যে কথাগুলো আমাকে বললে, ঠিক সেই কথাগুলোই ওকে বলো।'

'বলছিলাম, দেবব্রত ইজ এ পিস অফ ড্রিম, একটা সাধনা, একটা বিরাট সম্ভাবনা।'

বৌদি চট করে একবার সুভাষদার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন, 'দেবুকে দেখে তো খুবই ভালো মনে হয়।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'গিল্টি সোনার গহনা দেখতেও তো ভালো লাগে কিন্তু দেবু পাকা সোনা।'

আনন্দে খুশীতে ওঁরা নীরব হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'সত্যি বলছি বৌদি, এমন ভালো ছেলে আমি খুব কম দেখেছি।'

হাজার হোক একটি মাত্র সন্তান। রমাকে ওরা অত্যন্ত বেশি ভালোবাসেন। সারা জীবন ফরেন সার্ভিসে কাটিয়েও সুভাষদা ওকে নিছক সুন্দর একটা বাঙালি মেয়ে তৈরি করেছেন। একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে থাকতে অত্যন্ত কষ্ট হলেও বেনারসে রেখে পড়িয়েছেন। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ওঁরা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। আমার কথা শুনে ওঁরা দুজনেই শুধু খুশী নন, নিশ্চিন্ত হলেন।

দেবব্রত পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের তিনজনকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। আমি ওকে বললাম, 'আপনাকে দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।'

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'ভালো স্ত্রী অনেকেই পায়, কিন্তু ভালো শ্বশুর-শাশুড়ি পাওয়া—সত্যি ভাগ্যের দরকার।'

দেবব্রত জবাব দেবার আগেই বৌদি বললেন, 'না না। তোমার মতো জামাই পেয়েছি বলে আমরাই ভাগ্যবান।'

দেবব্রত বললো, 'না মা, ওকথা বলবেন না।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'দু মিনিট আগেই বৌদি বলছিলেন জামাইটা ঠিক মনের মতো হলো না।'

সত্যি সত্যি ডান হাতটা তুলে বৌদি বললেন, 'একটা চড় খাবে।'

দেবব্রত হাসল, 'মা আপনাকেও মারবেন না, আমারও নিন্দা করবেন না।'

দেবব্রত আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

'আচ্ছা বৌদি, আজকালকার কোনো ছেলে এমন সুন্দর করে মা ডাকবে?'

'সত্যি বলছি ওর মা ডাকটা শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে।'

সুভাষদা বললেন, 'ওর মা ডাক শুনেই বোঝা যায় হাউ ইনোসেন্ট হি ইজ।'

হাজার হোক ডক্টর দেবতোষ চৌধুরীর ভাইয়ের বিয়ে। প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার না এলেও অনেক ভি-আই-পি এসেছিলেন। এসেছিলেন অনেক গণ্যমান্য-বরেণ্য অতিথি। আস্তে আস্তে সবাই চলে গেলেন। প্যান্ডেল ফাঁকা হলো। মোটর গাড়ির হর্নের আওয়াজ বন্ধ হলো। ভাঁটা পড়ল

ক্যাটারারদের কর্ম-চাঞ্চল্যে। ডক্টর চৌধুরী, দেবব্রত, সুভাষদা, বৌদির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ভিতরের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'রঞ্জনা, আমি যাচ্ছি।'

রমা হাসল, 'আপনিও রঞ্জনা বলছেন?'

'রমাই তো রঞ্জিতা হয়ে রঞ্জনা হলো।'

ও হাসল।

'আমি যাচ্ছি।'

'এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'তাড়াতাড়ি কোথায়? নটা বাজে।'

'তাতে কি হলো?'

'সাড়ে পাঁচটায় এসেছি। এখনও যাব না?'

রিসেপসনের সময় ছিল ছটা থেকে সাড়ে সাতটা। আটটা পর্যন্ত অনেকেই ছিলেন। রঞ্জনা তাই কিছু বলতে পারল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় দেবব্রত এলো। বললাম, 'টেলিফোন করবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্যান্ডেল পার হয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাবার সময়ই দেবব্রত এসে হাজির। 'আপনি কিছু খেলেন না?'

আমি ওঁর কাঁধে একটা হাত রেখে বললাম, 'খেয়েছি।'

'আপনাকে তো কিছু খেতে আমি দেখিনি।'

'আমার যা খাবার আমি ঠিকই খেয়েছি।'

'না না, আপনি আমাদের সঙ্গে খেয়ে যান।'

'সত্যি বলছি আমি খেয়েছি, এখন আর কিছু খাব না। আমি চলি।'

'রঞ্জনা বলছিল...'

ওকে কথাটা বলতে না দিয়েই আমি বললাম, 'ওকে আপনি একটু বুঝিয়ে বললেই হবে। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

আমি গাড়ির দিকে এগুতেই দেবব্রত বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

গাড়িতে স্টার্ট দিলাম কিন্তু ক্যাটারারের একটা টেম্পো সামনে থাকায় এগুতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেবব্রত এসে হাজির, 'আপনাকে রঞ্জনা একটু ডাকছে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামলাম। প্যান্ডেল পার হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। লিভিংরুমে বসে ডক্টর চৌধুরী সুভাষদাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমাকে ওঁরা দেখতে পেলেন না। আমি আরো এগিয়ে গেলাম।

'কি ব্যাপার? তুমি আমাকে ডেকেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।'

'কফি-টফি অনেক কিছু খেয়েছি। এখন আর কিছু খাব না।'

দেবব্রত আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল কিন্তু প্যান্ডেলের ওদিক থেকে কে যেন ডাকতেই চলে গেল।

'খেয়ে যান। আমি খুব খুশী হবো।'

মনে মনে বললাম, তোমাকে খুশী করার দিন শেষ। কি হবে তোমাকে খুশী করে। আমি তোমার এই ছোট অনুরোধ না রাখলেও খুশীর বন্যায় তুমি ভেসে যাবে। ভীত সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো যত সংশয়ই তোমার মধ্যে এখন থাক, সব দূর হয়ে যাবে। আসন্ন কালবৈশাখীতে তৃণখণ্ডের মতো আমাকে খুশী করার প্রবৃত্তি, মন উড়িয়ে নেবে।

'কি হলো? কথা বলছেন না যে!'

আমি একবার ওর দিকে চাইলাম, 'কাল ভোর সাড়ে ছটায় আমার ফ্লাইট, তা জান তো?'

'জানি।'

'চারটের সময় উঠতে হবে।'

'হোক। আপনি না খেয়ে যেতে পারবেন না।'

'পারব না?'

'না।'

আমি হাসলাম।

'হাসছেন কেন? বিয়ে হয়ে গেল বলে কি পর হয়ে গেলাম ভাবছেন?'

'আমি কিছুই ভাবছি না।'

'বিয়ে হোক আর যাই হোক, আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে।'

এই পৃথিবীতে মানুষ কত কথা বলে। শৈশব থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। প্রয়োজনের কথা, ইচ্ছার কথা। কখনও কখনও মনের কথাও মানুষ বলে। কিন্তু কম। খুব কম। মানুষ প্রকাশ্যে অন্যের অবগতির জন্য যত কথা বলে তার চাইতে অনেক অনেক বেশি কথা বলে মনে মনে। আপন মনে। যে বক্তা, সেই শ্রোতা। কেন জানি না, সেদিন রাত্রে আমার মনে হলো, রমা, রঞ্জনা মনে মনে অনেক কথাই বললো আমাকে। আমি শুনতে পেলাম না কিন্তু কেমন করে যেন অনুভব করলাম। মনে মনে, হৃদয় দিয়ে। ওর মুখের ভাষা, চোখের ইঙ্গিত দেখে।

সপ্তাহখানেক পরে সুভাষদা আর বৌদি মস্কো ফিরে গেলেন। ডক্টর চৌধুরী, দেবব্রত, রঞ্জনা ও সুভাষদার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। আমিও ছিলাম। অনেক কথা, অনেক চোখের জল পড়ল। আমি রঞ্জনাকে বললাম, 'কাঁদছ কেন? হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে এম-এ পাস করে এবার দিল্লিতে ডক্টরেট পড়তে এসেছ আর রিসার্চ প্রজেক্ট হচ্ছে বাঙ্গালোরে...'

কেউ কেউ হাসলেন। রঞ্জনা আমাকে বললো, 'আপনি চুপ করুন তো।'

কিছুক্ষণ পরে সুভাষদার প্লেন ছাড়ল। আমরা সবাই আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম কয়েক মিনিট। তারপর আস্তে আস্তে রওনা হলাম বাড়ির দিকে। ডক্টর চৌধুরী আর দেবব্রত দুজনেই ওদের ওখানে যেতে অনুরোধ করলেন। বললাম, 'সময় পেলেই আসব।'

সময় পেয়েছি অনেক দিন অনেক সময়। আমি যাইনি। দেবব্রত লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছে। হয়তো ঘুরবে ফিরবে বেড়াবে। দিল্লিতে, দিল্লির বাইরে। হয়তো সিমলা পাহাড়ে বা আরো দূরে ডাল লেকে।

অথবা গুলমার্গের নিশ্চিন্ত প্রশান্ত পরিবেশে। কত নামকরা লোক ডক্টর চৌধুরীর বন্ধু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। দেবব্রত আর রঞ্জনাকে নিয়ে তাঁদের কাছে যাবেন। তাঁরাও আসবেন। এইসব নানা কিছু চিন্তা করে আমি যাইনি। আরো একটা কারণ ছিল। রঞ্জনা এখন শুধু সুভাষদার মেয়ে নয়, ডক্টর চৌধুরীর ভ্রাতৃবধূ, দেবব্রতর স্ত্রী। আমি সাংবাদিক। বহু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। অনেকে খাতিরও করেন। কেউ কেউ ভালোবাসেন। কিন্তু ওদের মতো সামাজিক মর্যাদা আমার নেই। হবে না। চাঁদের আলোর মতন সাংবাদিকদেরও নিজস্ব কোনো আলো নেই, পরের, ভি-আই-পি'দের সূর্য-কিরণেই উদ্ভাসিত। ছোটখাট সূক্ষ্ম আত্মসম্মানবোধ, সামাজিক কারণে আমি যাইনি। মস্কো থেকে বৌদির চিঠি এসেছে। রঞ্জনার খবর নিয়ে জানাতে বলেছেন। আমি রঞ্জনার খবর নিইনি, বৌদির চিঠিরও জবাব দিইনি। ভেবেছি কি দরকার বেশি উৎসাহী হবার। যতটুকু ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই যথেষ্ট। আরো ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া মানুষের মতো ঘনিষ্ঠতম, হৃদ্যতা ভালোবাসা বা তিক্ততারও একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। মেয়াদ আছে। এই সংসারে, এই মাটির পৃথিবীতে কোনো কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়, চিরদিনের নয়। নদীর মতো মানুষের জীবনেও জোয়ার আসে, ভরিয়ে দেয় মন-প্রাণ, দূর করে অনেক দৈন্য কিন্তু তার স্থায়িত্ব কতটুকু? ভাঁটার টানে আবার সবকিছু চলে যায়। ফিরিয়ে দিতে হয়। তা না হলে হিসাবের খাতায় মিল হবে কি করে? শুধু আসবে, আমদানি হবে, কিছুই ফিরে যাবে না, রফতানি হবে না? তাই কি কখনও হয়?

প্রেসিডেন্টের ট্যুর কভার করতে গিয়ে সুভাষদা, জয়ন্তী বৌদির সঙ্গে একটু বেশি হৃদ্যতা হয়ে গেছে। রমার সঙ্গে একটু অদ্ভুত ধরনের বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সামাজিক অনুশাসন বা নিজেদের কোনো দৈন্য বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেও অনেক কাছে এসেছি দুজনে।

ডাইনিং টেবিলে আমার সামনের দিকে বসে রমা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনি তো অনেকবার বাইরে গিয়েছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ গিয়েছি।'

'আমাদের অনেক ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার আলাপ হয়েছে বা আছে?'

'সে তো খুব স্বাভাবিক।'

'অনেকের সঙ্গেই কি আপনার ঘনিষ্ঠতা?'

'অনেকের সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠতা হয়?'

'তাহলে বাবার সঙ্গে এত ভাব হলো কেন?'

'বোধহয় উই লাইকড ইচ আদার।'

'আর মার সঙ্গে?'

'ঐ একই কারণে।'

'আমার সঙ্গে?'

'তোমার সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠতা হলো কোথায়?'

'পারহ্যাপস ইউ আর রাইট। মেলামেশা করলেও ঠিক ঘনিষ্ঠ হতে আপনি চান না, তাই না?'

'আমি কি চাই, তা তো তুমি বলবে।'

রমা হাসতে হাসতে বললো, 'আপনি শুধু আবির দিয়ে হোলি খেলতে চান, রঙ মাখতে চান না।'

শুধু আবির দিয়ে হোলি খেলেছি নাকি রঙও মেখেছি। তা ঠিক বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় রঙও মেখেছি। আবার কখনও কখনও মনে হয় হোলিই খেলিনি। রমা কি হোলি খেলেছিল? রঙ মেখেছিল সর্বাঙ্গে? নাকি শুধু মুখেই একটু আবির মেখেছিল?

এসব প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না, নিতেও পারব না। অনুত্তরই থেকে যাবে। তবু মনের মধ্যে এসব প্রশ্ন উঁকি দেয়। বেশিদিন চেপে রাখতে পারি না। একটা অস্বস্তি, জ্বালা বোধ করি মনের মধ্যে। মনে হয় রমাকে একবার কাছে পেলেও বোধহয় একটু ভালো লাগত। শান্তি পেতাম। অনেকবার ভেবেছি যাই, ওদের খোঁজ করি, দেখি ওরা আছে কিনা। থাকলে একটু কথা বলব, গল্প করব। একটু হাসব। দেখব ওর হাসি, সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানা...কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাইনি, যেতে পারিনি।

দিন পনের পর সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে দেখি দেবব্রত আর রঞ্জনা বাড়ির সামনে গাড়িতে বসে আছে। আমাকে দেখেই ওরা গাড়ি থেকে নামল। দুজনকেই একবার দেখে নিয়ে দেবব্রতকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন বুঝি?'

'বেশিক্ষণ নয়, বড় জোর মিনিট দশেক।'

বুঝলাম, অনুমান করলাম তারও বেশি সময় অপেক্ষা করছে কিন্তু খেয়াল নেই। নতুন বিয়ের পর সময় যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। ঘড়ির কাঁটা আর মনের কাঁটা একই গতিতে ঘোরে না।

'আই অ্যাম রিয়েলি ভেরী সরি!'

দেবব্রত বললো, 'এর জন্য দুঃখ করার কি আছে?'

রঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার চাকরটা কোথায়?'

'ছুটিতে।'

তিনজনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। রঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে?'

তালা খুলতে খুলতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দেখে কি মনে হচ্ছে অনশন করছি?'

'এই বুঝি আমার প্রশ্নের জবাব হলো?'

দরজা খুলে আলো-পাখার সুইচ অন করলাম। জানালাগুলো খুলে দিলাম। 'এক মিনিট।'

আমি কিচেনে গিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে ফ্রিজ আর কাপবোর্ড খুলে দেখছিলাম ওদের খেতে দেবার কিছু আছে নাকি। একটাও ডিম পেলাম না। পেলাম শুধু কিছু নাটস আর একটা কেকের অর্ধেক। একটা প্লেটে নাটসগুলো ঢালছি এমন সময় পিছন থেকে রঞ্জনার কথা শুনে চমকে উঠলাম, 'আপনি এসব কি করছেন?'

'বাপরে বাপ! এমন করে কেউ চমকে দেয়?'

'আমাদের বসিয়ে আপনি এসব কি করছেন?'

'বিশেষ কিছুই না, শুধু চা।'

'কোনো দরকার ছিল না।'

'তোমাদের দরকার না থাকলেও আমার মর্যাদা আর মানসিক শান্তির জন্য দরকার আছে।'

রঞ্জনা এবার বললো, 'চা চিনি দুধ কই?'

আমি কোনো কথা না বলে সব কিছু এগিয়ে দিতেই ও বললো, 'আপনি যান, আমি নিয়ে আসছি।'

আমি দেবব্রতর কাছে এসে বসলাম। 'কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, নৈনিতাল গিয়েছিলাম' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটু কৈফিয়ত দিল, 'যেতে চাইনি কিন্তু দাদা

জোর করে পাঠালেন।'

'ভালোই করেছেন। নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবার জন্য এই সময় একটু বাইরে যাওয়া ভালো।'

রঞ্জনা চা, নাটস কেক নিয়ে এলো। আমাদের দিল। ও নিজেও নিল।

একটু লজ্জিত হয়েই বললাম, 'প্রথম দিন আপনারা এলেন অথচ কিছুই অফার করতে পারলাম না বলে...'

দেবব্রত বললো, 'এখন আবার কি অফার করবেন?'

রঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি হঠাৎ এত ফর্ম্যাল হয়ে গিয়েছেন কেন বলুন তো?'

'বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ও দেবব্রতবাবুর একটা নতুন মর্যাদা হয়েছে আমি তার অমর্যাদা করতে পারি না।'

আমার কথায় ওরা দুজনেই হাসল।

চা খেতে খেতে নানা কথা হলো।

রঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বাবা-মার চিঠি পেয়েছ?'

'পৌঁছোনোর সংবাদের টেলিগ্রাম ছাড়া মার দুটো বাবার একটা চিঠি এসেছে।'

'তুমি চিঠি দিয়েছ?'

'দিয়েছি। আপনি ওঁদের কোনো চিঠি পাননি?'

'তোমার মার একটা চিঠি পেয়েছি।'

'জবাব দিয়েছেন?'

'না, এখনও দিইনি। দু একদিনের মধ্যেই দেব।'

এবার দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রঞ্জনাকে আপনার দাদার ভালো লাগছে তো?'

'দাদা তো ওর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।'

'তাই নাকি?'

'ওরও দাদাকে খুব ভালো লেগেছে।'

'ভালো। খুব ভালো। অমন দাদাকে ভালো না লাগার তো কোনো কারণ নেই।'

এবার রঞ্জনা বললো, 'সত্যি দাদার মতো মানুষ হয় না। বি-এইচ-ইউতে অনেক পণ্ডিত মানুষ দেখেছি কিন্তু দাদার মধ্যে পাণ্ডিত্য আর হিউম্যান কোয়ালিটিজ সমান।'

আমি সমর্থন জানালাম, 'ঠিক বলেছ। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে দেবব্রতকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রঞ্জনাকে আপনার ভালো লেগেছে তো?'

এক মুহূর্তের জন্য দেবব্রত একটু ভাবল। 'আমার মনে হয় আমার চাইতে আরো ভালো আরো কোয়ালিফায়েড ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।'

এবার রঞ্জনার দিকে ফিরে বললাম, 'কি রঞ্জনা, তোমারও কি ধারণা আরো ভালো মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল?'

রঞ্জনা একবার দেবব্রতর চোখে চোখ রেখেই ঘুরিয়ে নিল। 'হলে নিশ্চয়ই আরো খুশী হতো আরো সুখী হতো।'

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর হঠাৎ ও জিজ্ঞাসা করল, 'রাত্রে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

'রাত্রে বিশেষ কিছু খাব না।'

'কেন? চাকর নেই বলে?'

'ঠিক তা নয়। দুপুরে খুব বেশি খেয়েছি।'

রঞ্জনা একটু হাসল। 'ঘরে চাল-ডাল তরি-তরকারি নেই?'

'ব্যাচেলার বলে কি সংসার করি না? সব কিছু আছে।' বেশ গর্বের সঙ্গেই জানালাম।

'কোথায় আছে দেখিয়ে দিন তো। বলেই ও উঠে দাঁড়াল। দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি দাদার ওষুধটা কিনে আনো। এর মধ্যে আমার এদিকের কাজ হয়ে যাবে।'

দেবব্রতও সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'রঞ্জনা, তুমি কি বিয়ের পর সন্ন্যাসিনী হয়েছ?'

ওরা দুজনেই হাসল। রঞ্জনা বললো, 'আপনার জন্য দুটো ডালভাত রান্না করলেই যদি সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় তাহলে আমি রাজি।'

'আমার উপকার না করে বাড়ি যাও। ডক্টর চৌধুরী নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চিন্তা করছেন।'

দেবব্রত বললো, 'দাদা এখানে নেই। কাল সকালে ফিরবেন।'

আমি আরো কয়েকবার বললাম কিন্তু ফল হলো না। দেবব্রত আমার কথা শুনল না। স্ত্রীর কথা শুনে ওষুধ আনতে গেল। দেবব্রত বেরিয়ে যেতেই বললাম, 'ঠিক করলে না রঞ্জনা।'

'কেন?'

'হাজার হোক আমি ব্যাচেলার। তার উপর বয়সটা খুব বেশি নয়, আমার জন্য তোমার এতটা ব্যগ্রতা না দেখানই ভালো হতো।'

রঞ্জনা একটু জোরেই হাসল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললো, 'কে আপনাকে ব্যাচেলার থাকতে বলেছে?'

'আমার কথা ছাড়ো। তবে ভবিষ্যতে এমন উৎসাহ দেখিও না।'

'কেন?'

'হয়তো তোমার ক্ষতি হতে পারে।'

রঞ্জনা হাসল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন কিচেনে চলুন তো।'

কি করব? বাধ্য হয়ে ওকে সব কিছু দেখিয়ে দিলাম। সামান্য সাহায্য করলাম। দুটি ওভেনে একসঙ্গে রান্না শুরু হলো।

'ফ্রিজ রয়েছে অথচ মাছ, মাংস, ডিম কিছুই রাখেন না কেন?'

'তুমি আসবে জানলে নিশ্চয়ই রাখতাম।'

'এবার থেকে রাখবেন।'

'তুমি এসে রান্না করে দেবে?'

'রোজ না হলেও মাঝে মাঝে এসে করব বৈকি।'

'তা না হলে নাটক জমবে কেন?'

রঞ্জনা হাসল।

একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেবব্রতর ছুটি কতদিন আছে?'

'আর এক সপ্তাহ।'

'তুমি ওঁর সঙ্গেই ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি তবে মাঝে মাঝেই আমি দিল্লি আসব।'

'কেন?'

'দাদার জন্য।' তরকারি নামিয়ে একবার আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসির রেখা

ঠোঁটের পাশে লুকিয়ে বললো, 'তাছাড়া আপনিও তো এখানেই আছেন।'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি এখানে আছি বলেই তো এতদিন নৈনিতালে কাটিয়ে এলে।'

রমার মুখের চেহারাটাই পাল্টে গেল। আমার দিকে তাকাতেই ভয়ে আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। তারপর বললো, 'আমি বলেই নৈনিতালের লেকের জলে সবকিছু ডুবিয়ে দিতে পারিনি।'

'তা আমি জানি।'

'তাহলে এসব কথা আর কোনোদিন বলবেন না।'

'তুমি মাঝে মাঝে আসবে তো?'

'বোধহয় আপনি না চাইলেও আমাকে আসতে হবে।'

রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসলাম। একটু পরেই দেবব্রত এলো।

'ওষুধ পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ পেয়েছি।'

'কবে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছেন?'

'এইত শুক্রবারে।'

'আবার কবে দিল্লি আসছেন?'

'আমি আর এর মধ্যে আসছি না। ও আসবে।'

রঞ্জনা এলো।

আমি দেবব্রতকে বললাম, 'আপনার স্ত্রীর পরোপকার করার বাতিকটা একটু কন্ট্রোল করবেন।'

দেবব্রত বললো, 'আপনার জন্য সামান্য একটু রান্না করল বলে...'

ওর কথার মাঝখানেই রঞ্জনা বললো, 'খুব অন্যায় করেছি। এর পরদিন মাছ মাংস রান্না করে আজকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাব।'

'আমি মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

ওরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

পাঁচ

ভগবানে বিশ্বাস বা ভক্তি থাকুক বা নাই থাকুক পূজার প্যান্ডেলে দেবী মূর্তি দেখতে বেশ লাগে। একটু আনন্দের ছোঁয়া, একটু পূর্ণতার স্পর্শ নতুনত্বের স্বাদ সবাই পায়। বসন্ত দূরে থাক, কাছে থাক, মনে মনে রঙ লাগে। তারপর হঠাৎ যখন প্যান্ডেলটা খালি হয়, দেবীর বেদী শূন্য তখন বিষণ্ণতার করুণ সুর মনের মধ্যে বেজে ওঠে।

দেবব্রত আর রঞ্জনা ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবার সপ্তাহখানেক পরে ডক্টর চৌধুরী আমাকে ঠিক এই কথাগুলোই বলছিলেন।

সকালবেলাতেই ওঁর টেলিফোন এলো, আমি দেবতোষ চৌধুরী কথা বলছি।

'বলুন, কেমন আছেন?'

'আছি ভালোই তবে মনটা বিশেষ সুবিধের নয়।'

'কেন, কি হলো?'

'দেবু আর রঞ্জনা চলে যাবার পর কোনো কাজেই ঠিক মন দিতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'বাড়ির নতুন বউ চলে গেলে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।'

'আজ সন্ধ্যার দিকে আপনি আসবেন?'

'আজ?'

'হ্যাঁ আজই। একটু গল্পগুজব করে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।'

ডক্টর চৌধুরীর ব্যগ্রতার জন্য গিয়েছিলাম, না যেয়ে পারিনি। অনেক গল্প হলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

'তাসখন্দ এয়ারপোর্টে ওকে দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। কথাবার্তা বলার পর আরো ভালো লাগল।'

আমি ডক্টর চৌধুরীকে সমর্থন জানাই, রঞ্জনা ভালো লাগার মতোই মেয়ে।

'আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা আর আধুনিকতার যত বেশি প্রসার হচ্ছে, মাধুর্য তত বেশি হারাচ্ছে, কিন্তু রঞ্জনা রিয়েলি একটা একসেপসন।'

'তা ঠিক।'

'এই কদিনের মধ্যেই ও যে কি ভাবে আমাদের আপন করে নিয়েছে তা কি বলব।'

সন্ধ্যার পর পরই অফিস থেকে সোজা গিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম গিয়েই এক কাপ চা পাব কিন্তু ডক্টর চৌধুরী আমাদের রমা, ওদের রঞ্জনার প্রশংসায় এমনই ভেসে গেলেন যে চাকরটাকে চা দেবার কথা বলতেও পারলেন না।

'হাজার হোক সুভাষবাবু একজন সিনিয়র ডিপ্লোম্যাট। তাঁর একমাত্র সন্তান নিশ্চয়ই খুব আদরে মানুষ হয়েছে কিন্তু তবুও এই মেয়েটি কিভাবে এত কাজের হলো, ভাবতে অবাক লাগে।'

'অনেক দিন হোস্টেলে কাটিয়েছে তো!'

'হোস্টেলে থেকে তো ছেলেমেয়েরা আরো বেশি আরামপ্রিয় হয়। এক কাপ চা পর্যন্ত তৈরি করে খেতে হয় না।'

'তা ঠিক।'

'সুভাষবাবু যদি এখানেই বরাবর থাকতেন তাহলে ছুটিতে বাড়ি এসেও রঞ্জনাকে সংসারের কিছু কাজকর্ম করতে হতো বা ছোট ভাইবোন থাকলে নিশ্চয়ই কিছু দায়দায়িত্ব নিতে হতো কিন্তু এর তো সে সব কিছুই করতে হয়নি...'

আমি আবার সমর্থন জানাই ডক্টর চৌধুরীকে, 'না, সেসব ঝামেলা ওকে কোনোদিনই সহ্য করতে হয়নি।'

'ইনস্‌পাইট অব দ্যাট ও সংসারের সব রকম কাজ করতে পারে আর ছোটখাট খুঁটিনাটি কোনো কিছুই ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না।'

'নো ডাউট সী ইজ এ নাইস গার্ল।'

আমার মন্তব্য ওর কানেই পৌঁছল না। 'উড ইউ বিলিভ ইট ইফ আই সে যে ও রোজ আমার দুটো ফাউন্টেন পেনে কালি ভরে দিতে পর্যন্ত ভুলে যায় না।'

খাওয়ার সময়ও অনেক কথা হলো। শেষে বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো রঞ্জনা বা ওর বাবা-মার খুব ঘনিষ্ঠতা। সুতরাং ইউ আর অলসো পার্ট অব আওয়ার বিগার ফ্যামিলী।'

আমি হাসলাম।

'না, না, হাসি নয়। আপনি নিয়মিত আসবেন। না এলে দুঃখ পাব।'

'আসব।'

'রেগুলার আসবেন আর এখানে এলেই খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন।'

'আসব ঠিকই তবে সব সময় খাওয়া-দাওয়া করা বোধহয় সম্ভব হবে না।'

ডক্টর চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানালেন, 'সম্ভব হবে না কেন? আপনি তো এখানে একাই থাকেন?'

'একাই থাকি তবে চাকর আছে।'

উনি যেন আমার কথাটা শুনতেই পেলেন না, 'এইতো সেদিন রঞ্জনা বলছিল ও রান্না না করলে আপনার খাওয়াই হতো না।'

ডক্টর চৌধুরী বললেও নানারকম কাজকর্মের ঝামেলায় ওঁর ওখানে যেতে পারলাম না অনেকদিন। এর মধ্যে দু তিনদিন ওঁকে টেলিফোন করেছি। পাইনি। প্ল্যানিং কমিশনের অ্যাডভাইসার বলে ওঁকে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। মাস তিনেক পরে হঠাৎ রঞ্জনার একটা চিঠি পেলাম, তিন তারিখে আমরা দুজনেই মাদ্রাজ যাচ্ছি। একদিন ওখানে থাকব। তারপর পাঁচই ডিল্যুক্স এক্সপ্রেসে আমি দিল্লি রওনা হচ্ছি। মাসখানেক দাদার কাছে থাকব। আপনি নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবেন।

সাত তারিখ সকালে দু তিনবার নয়া দিল্লি স্টেশনে ফোন করে মাদ্রাজ ডিল্যুক্সের খবর নিলাম। ভাবলাম স্টেশনে যাই কিন্তু গেলাম না। মনে হলো রঞ্জনা সম্পর্কে আমার অতটা উৎসাহ বা আগ্রহ থাকা ঠিক নয়। অন্যায়। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে বেরুবার সময় রাধাকিষণকে বললাম, 'কেউ আমার খোঁজ করলে বলো আমি এখানে ছিলাম না। আজ দুপুরেই এসেছি।'

'জী সাব।'

'যদি খুব দরকারি টেলিফোন আসে তাহলে অফিসে টেলিফোন করতে বলো।'

কোনো কারণ নেই, যুক্তি নেই, দাবি নেই কিন্তু তবুও একটা প্রত্যাশায় সারাটা দিন কাটালাম। সন্ধ্যা, রাত্রিও। এলো না। কয়েকবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরাতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছি। করিনি। পরের দিন সকালে মার্শাল টিটো দিল্লি এলেন। সারাটা দিন আমি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটালাম। যুগোশ্লাভ অ্যাম্বাসেডরের রিসেপসন অ্যাটেন্ড করে, নিউজ ডেস-প্যাচ করে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হলো। তার পরের দিনও ব্যস্ত রইলাম। তবে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডক্টর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলো কিন্তু কোনো কথা হলো না। প্ল্যানিং মিনিস্টার, প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বার ও অ্যাডভাইসাররা প্রেসিডেন্ট টিটোর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। তখন ডক্টর চৌধুরীর কথা বলার অবকাশ ছিল না। আমাকে দেখে শুধু একটু হাসলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে চা খাচ্ছি এমন সময় টেলিফোন এলো। আমি 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে রঞ্জনার গলা শুনতে পেলাম 'আপনার কি ব্যাপার বলুন তো?'

'কেন কি হলো?'

'আমার চিঠি পাননি?'

'পেয়েছি।'

'তবে কি?'

'একটা টেলিফোনও করলেন না?'

'কি দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটছে তা তুমি ভাবতে পারবে না।'

'তাই বলে একবার টেলিফোনও করা যায় না?'

'ওসব কথা ছাড়ো। তুমি কেমন আছ?'

'ভালোই ; তবে একলা একলা হাঁপিয়ে উঠছি।'

'কেন? দাদা বাড়ি নেই?'

'না। টিটো এসেছেন বলে কদিনই খুব ব্যস্ত।'

'আজই ওঁর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেখা হলো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু বললেন?'

'না। কথা বলার সময় ছিল না। দেবব্রতর কি খবর?'

'ভালোই।'

'ব্যাঙ্গালোরে কেমন লাগছে?'

'ওখানেও তো সারাদিন একলা কাটাতে হয়।'

আমি হাসলাম, 'তুমি কি আশা করেছিলে বিয়ের পর স্বামী তোমার কাছে সারাদিন কাটাবে?'

'আমি বুঝি তাই বললাম?'

'আমি তো সেই রকমই বুঝলাম।'

'আপনি সারা জীবনই আমাকে ভুল বুঝবেন।' ওর গলার স্বরটা একটু অন্য রকম মনে হলো। বোধহয় কথাটা শুনতে ভালোই লাগল, 'কি বললে রঞ্জনা?'

'কিছু না।'

'বল না কি বললে?'

'বললাম আপনি সব সময়ই আমাকে ভুল বোঝেন।'

'তার মানে? কবে আবার তোমাকে ভুল বুঝলাম?'

'যাক গে ওসব কথা। আপনি কেমন আছেন?'

'যেমন ছিলাম তেমনি আছি।'

'খাওয়া হয়েছে?'

'না। এক্ষুনি বাড়ি এলাম।'

'স্নান করেছেন?'

'তোমার টেলিফোন আসার এক মিনিট আগেই এসেছি।'

'তাহলে আর আপনাকে বিরক্ত করব না।'

'না, না, বিরক্ত হবার কি আছে! বরং এতদিন পরে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালোই লাগছে।'

'বাজে বকবেন না। কথা বলতে ভালো লাগলে আপনিই আগে টেলিফোন করতেন।'

'ভালো না লাগলে কেউ এতক্ষণ ধরে কথা বলে?'

'সত্যি আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। স্নান করতে যান।'

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই!'

'না থাক। আপনি এবার স্নান করে কিছু খাওয়া-দাওয়া করুন। কাল আবার কথা হবে।'

রঞ্জনা টেলিফোন ছেড়ে দিল। আমিও আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম কিন্তু স্নান করতে গেলাম না। বসে রইলাম। ভাবছিলাম রঞ্জনার কথা। আমার সম্পর্কে ওর মনের মধ্যে একটু অভিমান জমা আছে বুঝতে পারি, কিন্তু কেন? আমি কি অন্যায় করেছি? ভুল করেছি? ওর মনে কি কোনো দুঃখ, আঘাত দিয়েছি? কোনো প্রত্যাশা পূর্ণ করিনি? অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম কিন্তু কিছুতেই কোনো কূল-কিনারা পেলাম না।

রঞ্জনা যখন রমা ছিল তখনকার সমস্ত স্মৃতির খাতা খুলে হিসাব করতে বসলাম। সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের নয় কিন্তু লেনদেন যথেষ্ট হয়েছে। যখন তখন সব জমা-খরচের কথা মনে পড়ে না। মনে

পড়তে পারে না। তবু চুপ করে বসে বসে মনে করার চেষ্টা করলাম। প্রথম থেকেই খুব সহজভাবে আমরা মিশেছি। পোড়া গরু সিঁদুর মেঘ দেখলে ভয় পায়। আমিও পেতাম বলে কোনো মেয়ের সঙ্গেই প্রাণ খুলে মিশতে পারিনি, পারব না কিন্তু ওর সঙ্গে মিশেছি। প্রাণ খুলে মিশেছি। ভালো লেগেছে। মনের অনেক ছোটখাট ক্ষত ঠিক হয়ে গেছে ওর সান্নিধ্যে, সংস্পর্শে। আরো কিছুদিন ওকে কাছে পেলে সব ক্ষত সেরে যেতো কিনা বলতে পারব না। তবে সম্ভাবনা ছিল না, একথা জোর করে বলার ক্ষমতা আমার নেই। হাজার হোক আমি রক্ত-মাংসের মানুষ, আমার হৃৎপিণ্ড ওঠা-নামা করে, সৌন্দর্য দেখতে ভালো লাগে, প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আনন্দ পাই। পাথরের মতো আমি জড় পদার্থ হলে এসব অনুভূতি আমার থাকত না। রমার মতো শত সহস্রজনের সারা জীবনের সাধনাতেও আমার কোনো পরিবর্তন হতো না।

আমি জানি না রমার জন্য আমার কি পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু একথা ঠিক ওর অভাব অনুভব করি। ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই ওর উপর কিছু দাবি করার স্বাধীনতা আমার হয়। এ অধিকার আমি অর্জন করেছিলাম নাকি ও স্বেচ্ছায় আমাকে দিয়েছিল তা মনে নেই। বলতে পারব না।

'হ্যালো!'

'কি ব্যাপার? এই সাত সকালে টেলিফোন করছ?' টেলিফোনে আমার গলা শুনেই জয়ন্তী বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ রমাকে আমার সংসার সামলাতে হবে।'

'তোমার আবার সংসার?'

'হঠাৎ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এলে সংসার না করে কি উপায় আছে?'

'কেউ এসেছেন নাকি?'

'আমার দিদির কলেজ জীবনের দুই বান্ধবী আজ বিকেলের দিকে আগ্রা থেকে আসছেন কিন্তু এদিকে রাধা গিন্নী জ্বরে বেহুঁশ।...'

'একটু ধর। রমাকে ডেকে দিচ্ছি।'

রমা টেলিফোন তুলেই বললো, 'কি ব্যাপার? এত সকালে আমাকে মনে পড়ল?'

'সব সময়ই তোমাকে মনে পড়ে কিন্তু জানাই না।'

'বাজে বকবেন না। বলুন কি ব্যাপার।'

'আজ বিকেলের দিকে আমার দিদির দুই বান্ধবী আগ্রা থেকে আসছেন। কাল ভোরের বাসেই সিমলা চলে যাবেন। কিন্তু কাল থেকে রাধাকিষণের ভীষণ জ্বর।...'

'আমি আসব?'

'সেইজন্যেই তোমাকে টেলিফোন করছি।'

'আপনি এসে নিয়ে যাবেন নাকি বাবাকে বলব?'

'তুমি কতক্ষণে রেডি হবে বল ; আমিই তোমাকে নিয়ে আসব।'

'আটটা নাগাদ আসুন।'

'ঠিক আছে।'

আমি গাড়ি থেকে নামতেই সুভাষদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দিদির দুই বন্ধু আসছেন?'

আমি গাড়ি লক্ করতে করতে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ওরা তো আমার এখানেও থাকতে পারেন।'

'আমার ওখানে থাকার তো কোনো অসুবিধে নেই, শুধু রাধাকিষণের জ্বর হয়েই মুশকিল

বাধিয়েছে।'

'রমা যখন যাচ্ছে তখন ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।'

'তা জানি।'

রমা তৈরিই ছিল। আমি এক কাপ চা খেয়েই ওকে নিয়ে রওনা হলাম। রওনা হবার আগে সুভাষদা আর বৌদিকে বললাম, 'রমার ফিরতে রাত হলে চিন্তা করবেন না ওদের খাওয়া-দাওয়া হবার পরই আমি ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

বৌদি বললেন, 'তোমার অসুবিধে হলে টেলিফোন করো, ওকে পাঠিয়ে দেব।'

'না, না, দাদাকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

গাড়ি স্টার্ট করে শান্তি পথ ধরতেই বললাম, এই পথেই বাজার করে নিয়ে যাই, কি বল।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

'মাছ না মাংস কিনব বল তো।'

'ওঁরা কি পছন্দ করবেন তা আমি কি করে বলি বলুন।'

'দু'রকম মাছ কেনার চাইতে মাছ-মাংস দুইই কেনা ভালো, তাই না?'

'তা তো বটেই।'

একটু পরে রমা জিজ্ঞাসা করল, 'যাঁরা আসছেন তাঁরা আপনার দিদির সঙ্গে পড়তেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে খুব আসা-যাওয়া ছিল।'

'খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকলে নিশ্চয়ই আপনার এখানে উঠতেন না।'

'এক কালে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল তবে ইদানীং বেশ কয়েক বছর দেখাশুনা নেই।'

'দুই বন্ধুই শুধু আসছেন?'

'ওঁরা কেউই বিয়ে করেননি...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া দুজনেই একই কলেজে লেকচারার।'

'তাই দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছেন।'

'ওঁরা খুব ঘুরে বেড়ান।'

'খুব স্বাভাবিক। সংসার-ধর্ম না করলে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে।'

'আমিও তো বিয়ে করিনি ; আমি কি নিয়ে আছি?' প্রশ্ন করেই রমার দিকে তাকালাম।

'আপনার বিয়ে করার সময় তো চলে যায়নি।'

'চলে যায়নি?'

'না।'

দেড়টা-দুটোর মধ্যে সমস্ত রান্না শেষ করার পর আমি আর রমা একসঙ্গে খেতে বসলাম। খেতে খেতে ও জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যদি এখন দিল্লিতে না থাকতাম তাহলে কাকে দিয়ে রান্না-বান্না করাতেন?

আমি হাসলাম। বললাম, 'ভয় নেই। অন্য কোনো সুন্দরী যুবতী এখানে আসে না, আনিও না।

রমা আর কোনো কথা বলল না। চুপ করে রইল।

আমি বললাম, 'তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই এভাবে বিরক্ত করার অধিকার আমি পাইনি।'

মুখ নিচু করেই বললো, 'আমিও আর কারুর হুকুম তামিল করি না।'

'তা আমি জানি।'

কিন্তু এ অধিকার আমি কেমন করে পেলাম? রমা দিল কেন? রমাই বা কোনো অধিকারে আমাকে টেলিফোন করে বলতো, ওয়েস্ট নগর থেকে আমার দুই বন্ধু দুপুরে আমাদের এখানে আসবে, খাবে। তারপর আমরা তিনজনে প্লাজায় সিনেমা দেখব। আপনাকে ওদের পৌঁছে দিতে হবে।

'আমার সঙ্গে দুটি সুন্দরী মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?'

'ছেড়ে দিলেও আপনার দ্বারা কিছু হবে না, তা আমি জানি।'

'জান?'

'নিশ্চয়ই জানি। তবে আজ তো আমিও সঙ্গে থাকব। সিনেমা দেখে আমি কি একলা বাড়ি ফিরব?'

'আমি শুধু ড্রাইভারী করব নাকি আমারও একটা টিকিট কাটবে?'

'ওদের সঙ্গে আপনার সিনেমায় যেতে হবে না। পরে আমি আর আপনি একদিন দেখব।'

সিনেমায় অনেকবারই আমরা গেছি। অনেক সময় জয়ন্তী বৌদি আমাদের সঙ্গে গিয়েছেন। সিনেমা দেখে বেরুবার সময় গাড়ির লক্ খুলতে গেলেই ও বলতো, 'এখনই বাড়ি যাবেন? একটু কফি-টফি খাওয়াবেন না?'

জয়ন্তী বৌদি আমাদের সঙ্গে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, 'ও সিনেমা দেখাল, আবার কফি খাওয়াবে কেন? বরং আমিই...'

'তুমি ক্ষেপেছ মা? উনি থাকতে তোমার পয়সায় কফি খাব?'

আমি হাসি। জিজ্ঞাসা করি, 'এই রকম হ্যাংলামি করে কফি খেতে তোমার লজ্জা করে না?'

ঠোঁট উল্টে, মাথা নাড়তে নাড়তে রমা বলতো, 'আপনার কাছে চাইতে আবার লজ্জা কিসের?'

প্রত্যেক মাসেই সুভাষদা বাড়িতে দুটো-একটা পার্টি দিতেন।

প্রায় সব পার্টিতে আমি যেতাম। রমা দিল্লিতে থাকলে আমাকে সকালের দিকে টেলিফোন করে বলতো, 'আজ আপনি সেই সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে আসবেন তো?'

ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসব কেন? বরযাত্রী যাব নাকি?

'ইয়ার্কি না, সত্যি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসবেন।'

'কেন?'

'বাবাদের ফরেন সার্ভিসের দুই বাঙালি সাহেব আসবেন...—'

'তাতে কি হলো?'

'ওদের সাহেবীয়ানা দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। তাইতো ওরা এলেই বাবাকে ধুতি-পাঞ্জাবি আর মাকে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরাই।'

'আর তুমি?'

'আর আমিও খুব সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরি।'

'সত্যি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসব?'

'অব কোর্স!'

বসে বসে আরো কত কি মনে পড়ল। এতকাল অনেকগুলো টুকরো টুকরো ঘটনা একসঙ্গে দেখতে গিয়ে, বিচার করে মনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে ও হয়তো সত্যই আমাকে ভালোবাসত, আমাকে চাইত, আমাকে নিয়ে আগামী দিনের মিষ্টি-মধুর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এতো আমার শুধু সন্দেহ। অনুমান। আবছা ধারণা। ও কি প্রত্যাশা করেছিল আমি নিজেই এগিয়ে যাব?

অনুরোধ করব বা দাবি করব, রমা, তুমি আমার। আর কাউকে বিলিয়ে দিও না, দেবে না।

রাধাকিষণের তাগিদে আর বসে বসে ভাবতে পারলাম না। উঠে পড়লাম।

পরের দিন সকালেই প্রেসিডেন্ট টিটো চলে গেলেন। কাজকর্ম শেষ করে দুপুরের দিকেই আমি বাড়ি এলাম। খেলাম। মুলকরাজ আনন্দের 'কুলি' পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লাম। কদিন খুব পরিশ্রম গেছে বলে রাধাকিষণ আমাকে ডাকেনি, চাও দেয়নি। ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যা ঘুরে যাবার পর। তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। চা খেতে খেতে রাধাকিষণকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ বেলায় কি রান্না করছ?'

'এ বেলায় রান্না করিনি।'

বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

'তিন মূর্তি লেনের মেমসাব টেলিফোন করে বললেন, আপনি ওখানে খানা খাবেন...'

'তোমাকে বললেই আমি খেতে যাব?'

'উনি দু'বার টেলিফোন করেছেন...'

'আমাকে ডাকলে না কেন?'

'আমি ডাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঘুম ভাঙাতে মানা করলেন।'

আমি বিছানার উপরেই চুপ করে বসে রইলাম। রাধাকিষণও পাশে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে ও জিজ্ঞাসা করল, 'সাব খানা বানাব?'

ওর কথার সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললাম, 'ও ঘর থেকে টেলিফোনটা নিয়ে এসো।'

রাধাকিষণ টেলিফোন আনতেই ডায়াল ঘুরালাম। ডক্টর চৌধুরী বা রঞ্জনা নয় ওদের চাকরই টেলিফোনটা ধরল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাব হ্যায়?'

'হ্যায় মাগার বাথরুম গ্যয়া।'

'নায়া মেমসাহেব কাঁহা?'

'আপ হোল্ড কিজিয়ে।'

দু'এক মিনিট পরে রঞ্জনা টেলিফোন ধরতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি টেলিফোন করেছিলে?'

'একবার নয় দুবার?'

'কি ব্যাপার?'

'আজ রাত্রে আপনি আমাদের এখানে খাবেন।'

'হঠাৎ কি ব্যাপার?'

'কি আবার ব্যাপার?' আমি এসেছি, তাই দাদা বললেন আপনাকে যেন আজ রাত্রে খেতে বলি।'

'কিন্তু।'

'ওসব কিন্তু ছাড়ুন। এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চলে আসুন।'

শুধু সেদিন রাত্রে নয় পাঁচ-সাত দিন পর পরই ওদের ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যেতাম। যেতেই হতো। রঞ্জনা তো বলতই, তাছাড়া ডক্টর চৌধুরী নিজেও অনুরোধ করতেন, 'আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবেন।'

আমি একটু সঙ্কোচ বোধ করতাম, 'এইতো সেদিন গিয়ে খেয়ে এলাম। আজ আবার...'

'আপনি মশাই বড় লাজুক। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে ব্যাচেলারের লজ্জা করলে চলে?'

আমি একটু হাসলাম, 'লজ্জার কিছু নয় তবে।'

'ওসব তবে টবে ছাড়ুন। সাতটার মধ্যে নিশ্চয়ই আসছেন।'

'আচ্ছা।'

আমাকে যেতেই হতো, না গিয়ে পারতাম না। আর ওখানে যাওয়া মানেই রঞ্জনার প্রশংসা শোনা।

ডক্টর চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, 'রঞ্জনা কি ডেঞ্জারাস মেয়ে তা আপনি জানেন?'

আমি হাসি।

'আমার মতো ঘুম কাতুরে লোককে পর্যন্ত ও ভোর পাঁচটায় উঠিয়ে দেয়।'

'কেন?'

'মর্নিং ওয়াক করতে পাঠায়।'

আমি বলি, 'মর্নিং ওয়াক করা সত্যি ভালো।'

'ভালো তো বুঝি কিন্তু আপনি করেন?'

দুকাপ কফি নিয়ে রঞ্জনা ড্রইংরুমে ঢুকেই বললো, 'কি দাদা! আমার প্রশংসা করতে শুরু করেছেন?'

ডক্টর চৌধুরী ডান হাত বাড়িয়ে কফির পেয়ালা নিতে নিতে বললেন, 'প্রশংসা নয়, নিন্দা করছি। সারা জীবনে যে সাড়ে সাতটা-আটটার আগে ঘুম থেকে ওঠেনি, আর তাকে তুমি পাঁচটার সময় 'মর্নিং ওয়াক'এ পাঠাচ্ছ আর আমি তোমার নিন্দা করব না?'

রঞ্জনা গম্ভীর গলায় বললো, 'দাদা ডোন্ট ফরগেট ইউ আর অ্যাবোভ ফিফটি।'

রঞ্জনা চলে যেতেই ডক্টর চৌধুরী আবার প্রশংসা করতে শুরু করেন, 'মেয়েটা এসে আমার লাইফের প্যাটার্নই পাল্টে দিয়েছে।'

..রঞ্জনার ঘরেই টাইম পিস থাকে। অ্যালার্ম বাজলেই ও উঠে ডক্টর চৌধুরীর ঘরে যায়। দু একবার পাশে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়, 'দাদা! দাদা।'

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আবার ডাকে, 'দাদা। উঠুন। পাঁচটা বাজে।'

তবুও ঘুম ভাঙে না ডক্টর চৌধুরীর। রঞ্জনা আরো একটু এগিয়ে যায়, একটু ঝুঁকে পড়ে ওঁর মাথায় হাত দিতে দিতে ডাকে, 'দাদা, উঠবেন না? অনেকক্ষণ অ্যালার্ম বেজে গেছে।'

ডক্টর চৌধুরী একবার এক মুহূর্তের জন্য চোখ মেলেই চমকে ওঠেন, 'অ্যালার্ম বেজে গেছে?'

'হ্যাঁ দাদা।'

ডক্টর চৌধুরী একটু পাশ ফিরে শুতে শুতেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি অনেকক্ষণ ডাকছ?'

'না, বেশিক্ষণ না।'

উনি ওপাশ ফিরে আবার একটু ঘুমুতে চেষ্টা করেন কিন্তু রঞ্জনা ওঁর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার ডাকে, 'দাদা, আর দেরি করবেন না।'

একে রঞ্জনার ডাকাডাকি তার উপর চোখের উপর এমন আলো পড়ে যে ওঁকে উঠতেই হয়। উনি বাথরুমে ঢুকলেই রঞ্জনা আবার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমোয়। ডক্টর চৌধুরী বেরুবার সময় চাকরকে ডেকে দেন। ও দরজা বন্ধ করে দিয়েই দিনের কাজ শুরু করে। সাড়ে ছটা-পৌনে সাতটায় উনি মর্নিং ওয়াক করে ফিরে এসেই আবার বাথরুমে যান। স্নান সেরে বেরুতে না বেরুতেই চা হয়। রঞ্জনাও উঠে পড়ে।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দুজনের গল্প হয়।

চৌধুরী বাড়ির গল্প, দেবব্রতর ছেলেবেলার গল্প, দিল্লির গল্প। কখনও কখনও বেনারসের গল্প, ওয়াশিংটনের গল্প, কায়রো মস্কোর গল্প।

'আচ্ছা দাদা, আপনার এখানে বড় দাদুর ছবি দেখি, কিন্তু আপনার নিজের দাদুর কোনো ছবি তো দেখি না।'

'আমার দাদু বিশেষ সুবিধার লোক ছিলেন না। আমার দাদুর চাইতে বড় দাদুই আমাকে বেশি ভালোবাসতেন, আমিও ওঁকেই বেশি ভালোবাসতাম...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া ওঁর জন্যই আমি একটু লেখাপড়া শিখতে পেরেছি। আমার নিজের দাদুর কাছে থাকলে আমার কিছুই হতো না।'

'লেখাপড়ার প্রতি বুঝি ওঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'আপনারা আর আহিরীটোলায় যান না?'

'আমি দু তিনবার গিয়েছি। একবার কি দুবার দেবুকেও নিয়ে গেছি।'

'ওসব সম্পত্তি তো আপনাদেরই?'

'ঠিক জানি না। আমার মনে হয় দাদু সব কিছু বেচে দেন।'

'এখন ওখানে কারা থাকে?'

'খুব দূরসম্পর্কের কিছু আত্মীয় আর কিছু ভাড়াটে।'

ডক্টর চৌধুরী যখন দেবব্রতর ছেলেবেলার গল্প করেন তখনই ভারি মজা হয়!

'তখনও আমরা সিমলায়। দেবু খুব ছোট। বড় জোর পাঁচ-ছ বছরের হবে। পাশের বাড়ির একটা পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল। কিছুকাল পরে ওরা সিমলা থেকে চলে গেলে দেবুর কি কান্না।...'

'কেন?'

ডক্টর চৌধুরী হাসেন, 'কেন আবার? ও ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে পাগল।'

রঞ্জনাও হাসে। বলে, 'ঐ রকম একটা পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলেই ভালো হতো।'

ডক্টর চৌধুরী হাসতে হাসতে একটু আনমনা হয়ে কি যেন ভাবেন। আমাদের আহিরীটোলার বাড়িতে এক বুড়ি থাকতেন। আমি তাঁকে বুড়ি পিসিমা বলে ডাকতাম। প্রথম যখন দেবুকে নিয়ে আহিরীটোলার বাড়িতে যাই উনি ওকে দেখে বলেছিলেন ওর সুন্দরী শিক্ষিতা ও বিদেশিনীর সঙ্গে বিয়ে হবে।'

রঞ্জনা বললো, 'কই বিদেশিনীর সঙ্গে তো বিয়ে হলো না?'

'জ্যোতিষ আমি বিশ্বাস না করলেও মাঝে মাঝে বুড়ি পিসিমার কথাটা মনে হতো। বিশেষ করে ওকে লন্ডনে পাঠাবার পর একটু বেশি মনে হতো...'

রঞ্জনা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে, 'আপনার ভাই ওখানে কাউকে বিয়ে করে রেখে আসেনি তো?'

ডক্টর চৌধুরী বেশ গর্বের সঙ্গেই জবাব দেন, 'ভুলে যেও না ও দেবব্রত চৌধুরী।'

একটু নীরবতা।

'জান রঞ্জনা, বুড়ি পিসিমা ঠিকই বলেছিলেন। একদিক দিয়ে তুমিও তো বিদেশিনী।'

'আমি বিদেশিনী হবো কেন?'

'যখন তোমার বিয়ে হলো তখন তো তুমি মস্কোর বাসিন্দা।'

রঞ্জনা চুপ করে থাকে।

শুনেছি আমাকে নিয়েও আলোচনা হতো। কোনো না কোনো প্রসঙ্গে হয়তো আমার কথা উঠত। 'আচ্ছা রঞ্জনা, রিপোর্টার সাহেবের সঙ্গে তোমাদের আলাপ কি অনেক দিনের?'

'উনি যখন ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আমেরিকায় যান তখনই বাবা-মার সঙ্গে ওঁর প্রথম আলাপ।'

'তাহলে তো খুব বেশি দিনের আলাপ নয়।'

'না, খুব বেশি দিনের না হলেও খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে বাবা-মার সঙ্গে।'

'তোমার বাবা-মা ওঁকে খুব ভালোবাসেন।'

'উনিও বাবা-মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।'

কোনো কোনো দিন আলোচনা আরো এগিয়ে যায়।

'রিপোর্টার সাহেব আর দেবুর মধ্যেও দারুণ ভাব তা জান?'

রঞ্জনা একটু হাসে, 'জানি।'

'লন্ডনে দেবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হবার পর আমার কাছে ওর খুব প্রশংসা করেছিলেন। তুমি তো জান যে কেউ দেবুর প্রশংসা করুক তাকে আমার ভালো লাগে।'

'এটা ঠিক বললেন না দাদা।'

'কেন?'

'আপনার ভাইয়ের প্রশংসা করলেই ভালো আর প্রশংসা না করলেই ভালো নয়?'

'আমি ঠিক তা বলিনি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হলো উনি আপনার ভাইয়ের প্রশংসা করেছিলেন বলেই ওকে আপনার ভালো লেগেছে।'

ডক্টর চৌধুরী একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোককে এমনি আমার ভালো লেগেছে। দেখতে-শুনতে আলাপে-ব্যবহারে বেশ সুন্দর তবে...'

'তবে ভাইয়ের প্রশংসা করায় আরো ভালো লেগেছে তাই তো।'

ডক্টর হাসতে হাসতে বললেন, 'তা ঠিক।'

'এরপর আপনার ভাইয়ের সঙ্গে যদি আমার কোনোদিন একটু মতবিরোধ বা তর্ক হয় তাহলেই তো আপনি বলবেন, 'রঞ্জনা মেয়েটা ভালো না।'

'না না, তা বলব কেন? তবে তোমাদের মধ্যে তর্ক-ঝগড়া হবেই না।'

সংসারের অভিজ্ঞতা প্রায় না থাকলেও রঞ্জনা ওঁর কথায় হাসল। 'দাদা, আপনি চিরকাল ল্যাবরেটারিতে কাটিয়ে মানুষকে বড় সহজ সরল মনে করেন।'

পরে টেলিফোনে ও আমাকে সব কথা জানাত। আমি শুনে হাসতাম।

ডক্টর চৌধুরী আগে সকালে কিছুই খেতেন না। এখনও বিশেষ কিছু খান না। রঞ্জনার অনুরোধে সামান্য একটু ফল খান। সাড়ে নটাতেই ভাত খেয়ে প্ল্যানিং কমিশনে চলে যান। বিকেলের দিকে এক কাপ চা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে রঞ্জনার চাপে কিছু খেতেই হয় কিন্তু অধিকাংশ দিনই দেরি করে ফেরেন। সাতটা-সাড়ে সাতটা-আটটা বেজে যায়। মিটিং কনফারেন্স ডেলিগেশনের ঝামেলা থাকলে আরো রাত হয়। অফিস থেকে মাঝে মাঝে বাড়িতে টেলিফোন করে রঞ্জনার খবর নেন। কাজের চাপ বেশি থাকলে তাও ভুলে যান। রঞ্জনা অবশ্য রোজই দু তিনবার ফোন করে বলে, 'দাদা, বাবার চিঠি এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনারও চিঠি আছে।'

'ওরা কেমন আছেন?'

'ভালোই, তবে আপনাকে একবার যেতে লিখেছেন।'

ডক্টর চৌধুরী হাসেন 'মস্কো যদি বিহার মধ্যপ্রদেশের মধ্যে হতো তাহলে হয়তো একবার চেষ্টা

করতাম, কিন্তু...'

'কেন আপনি কি মস্কো যেতে পারেন না?'

'সরকার পাঠালেই যেতে পারি।'

'বাবার তো রিটায়ার করার টাইম হয়ে এলো।'

'সে এখনও অনেক দেরি।'

তিন মূর্তি লেন থেকে বাজার অনেক দূরে। সময় কাটাবার জন্য রঞ্জনা আরো দূরের মার্কেটে যায়। কোনোদিন আই-এন-এ মার্কেট, কোনোদিন গোল মার্কেট। বেশ খানিকটা সময় লাগে, কিন্তু তবু সারাটা দিন কাটতে চায় না। পারে না। অসহ্য মনে হয়। বরাবর হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে একলা থাকার অভ্যাস নেই।

'হ্যালো, আমি রঞ্জনা।'

'বলো কেমন আছো?'

'একবার টেলিফোনও করেন না কেন বলুন তো?'

'হঠাৎ টেলিফোন করেই টপ্পা-ঠুংরী গাইতে শুরু করলে কেন?'

'সব সময়ই আপনার ঠাট্টা। সত্যি বলুন তো আপনি টেলিফোন করেন না কেন?'

'কে টেলিফোন করল তাতে কি আসে যায়? কথা তো হচ্ছে রেগুলারই।'

'টেলিফোন করলে কথা না বলে কি করবেন? বাধ্য হয়েই বলতে হয়।'

'তোমার মেজাজটা খারাপ কেন বলো তো?'

'মেজাজটা খারাপ হবে কেন। তবে সারাটা দিন একলা থাকতে বিশ্রী লাগে।'

'আমি কি করতে পারি বল?'

'কি আবার করবেন?'

'তবে আর এসব কথা বলে লাভ কি?'

'ঠিক আছে বলব না।' ঝপাং করে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল রঞ্জনা।

মনে হলো একবার টেলিফোন করি, কিন্তু করলাম না। কিছুক্ষণ পরে মাথায় একটু দুষ্টু বুদ্ধি এলো। ডক্টর চৌধুরীকে প্ল্যানিং কমিশনে টেলিফোন করলাম, 'কেমন আছেন?'

'ভালোই। আপনার খবর ভালো তো?'

'আমার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই।'

স্নেহপ্রবণ ডক্টর চৌধুরী একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'কেন, কি হলো? জ্বর নাকি?'

'জ্বর হয়নি। গাড়ির দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ডান পায়ে দারুণ লেগেছে...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। একেবারে শয্যাশায়ী।'

'তাহলে তো খুবই মুশকিল।'

'চাকরটা না থাকায় আরো বিপদে পড়েছি।'

'সেকি? খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে?'

'সুন্দর নগর মার্কেটের একটা দোকানে টেলিফোন করলে ওরা কিছু পাঠিয়ে দেয়।'

'মাই গড! ইউ আর রিয়েলি ইন ট্রাবল!'

'রঞ্জনা ভালো আছে?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছে, কিন্তু আপনিই তো ভাবিয়ে তুললেন।'

'আপনি চিন্তা করবেন না। দুএকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

রাধাকিষণ দুদিনের ছুটি নিয়ে গড়মুক্তেশ্বরের মেলা দেখতে গেছে। আজই ভোরে গেছে। পরশু সন্ধ্যার পর ফিরবে। সকালে ডিম-রুটি খেয়ে অফিসে গিয়েছিলাম, আবার বিকেলে খাবো। ফরেন অফিসের ব্রিফিং আছে। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া করে একটা ঘুম দেব ভাবছিলাম, কিন্তু বাড়ি ফিরে রাধাকিষণকে না দেখতে পেয়েই মেজাজ বিগড়ে গেল। তারপর রঞ্জনার টেলিফোন। প্রথমে ভেবেছিলাম রাত্রে খেতে বলবে। নেমন্তন্ন তো করলই না উপরন্তু রাগ করে কথাবার্তা বললো। হঠাৎ বাতিক চাপল ওর হাতের রান্না খেতেই হবে। সেই জন্যই ডক্টর চৌধুরীকে টেলিফোন করে ঐসব মিথ্যে কথা বললাম। আশা করেছিলাম উনি সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনাকে টেলিফোন করবেন। আর তারপরই আমার টেলিফোন বেজে উঠবে।

পাঁচ, দশ, পনের মিনিট। আধঘণ্টা। একঘণ্টাও পার হয়ে গেল। কিন্তু আমার টেলিফোন বেজে উঠল না। আরো আধঘন্টা হয়ে গেল তবু টেলিফোন এলো না। হঠাৎ কলিং বেল বাজতেই চমকে উঠলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই পিয়ন এসেছে কোনো রেজিস্টার্ড বুক-পোস্ট ডেলিভেরী দিতে। দরজা খুলে দেখি রঞ্জনা। মিটমিট করে হাসছে। হাতে টিফিন কেরিয়ার।

'এসো।' আমারও হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে হাসি চেপে স্বাভাবিকভাবে ওকে ডাকলাম।

ও ধীর পদক্ষেপে ড্রইংরুমে ঢুকে সেন্টার টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ার রেখে একটা সোফায় বসল। মিটমিট করে হাসতে হাসতেই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে কোনো কথা নেই।

'অমন করে কি দেখছ?'

ঠিক একই রকম ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে বললো, 'দেখে মনেই হয় না ভিতরে ভিতরে এত দুষ্টু বুদ্ধি।'

ন্যাকামি করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? আমি কি করেছি?'

ও মাথা দোলাতে দোলাতে বললো, 'কিচ্ছু না।'

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, 'টিফিন কেরিয়ার খালি না ভর্তি?'

'রাধাকিষণ কোথায়?'

'ছুটিতে।'

'আবার ছুটিতে?'

'দুদিনের জন্য গড়মুক্তেশ্বরের মেলা দেখতে গেছে।'

'কবে গেছে?'

'আজই ভোরে।'

'তাহলে খাওয়া হয়নি?'

'খাওয়া হয়নি বলেই গাড়ির দরজায় পাটা এমন বিচ্ছিরিভাবে জখম হলো।'

ও টিফিন কেরিয়ারটা হাতে ভিতরের দিকে যেতে যেতে আপন মনে বললো, 'এই না হলে জার্নালিস্ট।'

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

একটু পরে ডাইনিং টেবিলে খাবার-দাবার সাজিয়ে রঞ্জনা ডাকল, 'আসুন!'

ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি খেয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি বলছ?'

'আপনার মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে বলার মতো ক্ষমতা আমার নেই।'

'তুমি রাগ করেছ?'

'ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

বসলাম। ভাতে হাত দিতেই অবাক হলাম, 'ভাত তো দারুণ গরম, তুমি কি এক্ষুনি রান্না করে নিয়ে এলে?'

'আমি রান্না করিনি। রান্না করিয়ে নিয়ে এলাম।'

'এত গরম ভাত আনার কি দরকার ছিল?'

'আমি জানি আপনি ঠাণ্ডা ভাত খেতে পারেন না।'

'কিন্তু...'

'খেয়ে নিন তো! আর বকবক করতে হবে না।'

আমি আর একটি কথা না বলে মুখ বুজে খেয়ে নিলাম। ডাইনিং টেবিলে বসেই মুখ নিচু করে বললাম, 'তোমাকে কষ্ট দিলাম ঠিকই, কিন্তু খুব ভালো লাগল।'

'এভাবে কতদিন চলবে?'

'তুমি যতদিন চালাবে।'

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে রঞ্জনা উঠল, 'যাচ্ছি। রাত্রে ড্রাইভারকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেব।'

আমি হাসলাম, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

রঞ্জনা হাসতে হাসতে বললো, 'পায়ের ব্যথা না সারা পর্যন্ত তো দেখাশুনা করতে হবে।'

'অনেক হয়েছে। আর না।'

'দাদার হুকুম।'

ছয়

ভালোবাসার অনেক জ্বালা, অনেক ঝঞ্ঝাট। যাদের ভালোবাসা যায়, তাহা হাসলে হাসতে ইচ্ছা করে, দুঃখ পেলে নিজের মনটাও পীড়িত হয়। হবেই। সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়বেই। এর থেকে নিস্তার নেই, মুক্তি নেই। একদিন আমি সব কিছু পেয়েছিলাম, পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়েছিল আমার মন। তারপর সব হারিয়েছি। নতুন করে পরিপূর্ণ হবার সাধ নেই। সাধ্যও নেই। তাছাড়া প্রয়োজনও নেই।

বেশ আছি আমি। দিনগুলো বেশ কেটে যায়। রাজনীতি দলাদলি মারামারি কাটাকাটি। কিছু শুনি, কিছু দেখি, লোকে কিছু বলে যায়। টাইপ রাইটার খট্‌খট্ করি।

টেলেক্স টেলিপ্রিন্টারে চলে যায় অফিসে। পরের দিন কাগজে ছাপা হয় ফ্রম আওয়ার পলিটিক্যাল করসপন্ডেন্ট। আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ ককটেল—ডিনারে সন্ধ্যা, রাত্রিও কেটে যায় বেশ। এছাড়াও আছে বন্ধুবান্ধব, পরিচিতের দল। আর আছে রাধাকিষণ। সব মিলিয়ে বেশ আছি। সুখেই আছি। সুভাষদা-বৌদি দেবু-রঞ্জনার মতো কিছু লোকের জন্যই আমার ঝামেলা। আমি একা হয়েও একলা থাকি না। এদের কথা ভাবি। ভাবতে ইচ্ছা করে, ভালো লাগে। এদের দেখতে ইচ্ছা করে, এদের সঙ্গে কথা বলতে মন চায়। আরো কত কি! মনের ইচ্ছা, প্রাণের ব্যাকুলতাকে সংযত করা বড় কঠিন। কষ্টকর। অনেক সময় দুঃসাধ্যও বটে।

রঞ্জনা দিল্লি আসে, ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যায়। দুতিন মাস অন্তরই আসা-যাওয়া। এর মধ্যে দেবুও এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিল। ঠিক বেড়াতে নয়, কাজে। পঞ্চশীল কলোনীতে ডক্টর চৌধুরী নিজের বাড়ি তৈরি করছেন। ঐ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করার জন্যই দেবু ছুটি নিয়ে দিল্লি এসেছিল।

দেবু আর রঞ্জনা আসার পরদিনই ভিত পূজা হলো। দেবু বার বার করে আমাকে যেতে বলেছিল। গিয়েছিলাম। পুজো শেষ হবার পর আর্কিটেকটের কাছ থেকে প্ল্যানের নীল কাগজখানা নিয়ে ডক্টর চৌধুরী আমাকে বাড়ির প্ল্যান বুঝাতে শুরু করলেন, এই হচ্ছে সামনের বারান্দা। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেই ছোট্ট একটা সিটিং রুম। ড্রইংরুম হবে এল শেপের। আঙুল দিয়ে দেখালেন এই এল শেপের সাইডে হবে ডাইনিং স্পেস। তবে এখানে আমি ডিনার ওয়াগন ফিট করব না।...'

আমি বললাম, 'খুব ভালো। বাইরের লোককে কিছু ক্রকারিজ দেখাবার কোনো মানে হয় না।'

'দ্যাটস রাইট। সিটিংরুম আর ড্রইংরুমের মাঝখানে যে দরজা দেখছেন...'

'হ্যাঁ।'

'ঐ দরজার সামনেই একটা বড় ল্যান্ডিং থাকবে আর ল্যান্ডিং-এর এক পাশ দিয়ে দোতলার সিঁড়ি।'

'আই সী।'

'ল্যান্ডিং পার হলেই ডান দিকে কিচেন-প্যান্ট্রি-স্টোর। আর বাঁ দিকে পর পর দুটো বেড রুম। দুটোর সাইজ আঠারো বাই কুড়ি। দুটোর সঙ্গেই অ্যাটাচড্ বাথ অ্যান্ড টয়লেট।...'

আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই দুটো বেডরুমই বুঝি আপনাদের দু ভাইয়ের?'

ডক্টর চৌধুরী হাসতে হাসতে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে? রঞ্জনা আর ওর ছেলেমেয়েরা আমাকে এত কাছে থাকতে দেবে? আমি থাকব উপরের একটা ঘরে।'

আমি হাসলাম।

'এর একটা ঘরে রঞ্জনারা, অন্যটায় আমার ফিউচার গার্ডিয়ানরা থাকবে।...'

আমি না হেসে পারলাম না।

'এটা হচ্ছে ওপেন প্লেস। এর পর এটা স্টাডি। জ্যেঠু এখানে পড়াশুনা করবে আর একেবারে কোণায় হচ্ছে একটা গেস্ট রুম। প্ল্যানটা কেমন লাগল বলুন?'

'খুব ভালো, কিন্তু আপনার কি ব্যবস্থা হবে?'

'ঐ তো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই দুটো ঘর। একটায় পড়াশুনা করব আর অন্যটায় শোব।'

প্ল্যানের কাগজটার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম 'এখানে কি হবে?'

'ও। গ্যারাজ আর সারভেন্টস কোয়ার্টার।'

দেবু আমার পাশেই ছিল। আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, 'রঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করুন তো আমি কি গ্যারাজের ওপরেই থাকব?'

আমি হাসলাম, 'এ দুশ্চিন্তার কারণ?'

ও আবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'দাদার বাড়ি হলে তো ভয় ছিল না। বাড়ির মালিক তো রঞ্জনা হচ্ছে।'

আমাদের দুজনকে এমন ফিসফিস করে কথা বলতে দেখে রঞ্জনা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

হঠাৎ ডক্টর চৌধুরী একটু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জানেন তো রিপোর্টার সাহেব, এ বাড়ির নাম কি হবে?'

'কই না তো।'

'বাড়ির নাম হবে রঞ্জনা।'

হাজার হোক খবরের কাগজের রিপোর্টার। কিছু কিছু মিনিস্টার আর এম-পির সঙ্গে এত আজে-বাজে আড্ডা দিই আর ইয়ার্কি করি যে মাঝে মাঝে যেখানে-সেখানে বেফাঁস কথা বলে ফেলি।

বাড়ির নাম রঞ্জনা হবে শুনেই হঠাৎ বলে ফেললাম, 'আপনার মতো ভাশুর পেলে বোধ হয় অনেক হিন্দু বিধবাও আবার বিয়ে করতে রাজি হবে।'

কথাটা জিব ফসকে বেরিয়ে যেতেই খারাপ লাগল, কিন্তু ওঁরা তিনজনেই হাসলেন দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

বাড়ি তৈরির জন্য দেবু সারাদিনই ব্যস্ত থাকত। সন্ধ্যার পর হয় দাদার সঙ্গে সারাদিনের কাজকর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলতো, নয়তো ক্লান্তিতে শুয়েই পড়ত। কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধুর দাদা-বৌদি দিল্লি বেড়াতে এসে আমার কাছেই ছিলেন। ওঁদের কুতুব মিনার দেখিয়ে ফেরার পথে পঞ্চশীল কলোনীতে গিয়েছিলাম। রঞ্জনা আর দেবু দুজনেই ছিল। ঐ একমাসের মধ্যে দেবুরা একদিন আমার এখানে এসেছিল। আমিও বোধহয় দুদিন খেতে গিয়েছি।

এর মাস দুয়েক পরে রঞ্জনা যখন আবার এলো তখন আমি এখানে নেই। আসাম গেছি। ফেরার পথে কলকাতা। ভেবেছিলাম দু-তিন দিন থাকব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়লাম ন'দিন পর। ফিরে এসেই রাধাকিষণের কাছে শুনলাম তিন মূর্তি লেনের মেমসাব অনেক দিন দিল্লিতে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেমসাহেব কি টেলিফোন করেছিলেন?'

'টেলিফোন তো হরদমই করেন। দুদিন এসেও ছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'জী হাঁ। বড় চৌধুরী সাহেবও দুদিন টেলিফোন করেছিলেন।'

ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে এগারটা বাজে। তাহলে খুব বেশি বেলা হয়নি। 'রাধাকিষণ, আমি বাথরুমে যাচ্ছি। তুমি তিন মূর্তি লেনের মেমসাহেবকে বলে দাও আমি ওখানে খেতে যাচ্ছি।'

'আমি তাহলে খানা বানাব না?'

'না।'

বেরুতে বেরুতে সাড়ে বারোটা হয়ে গেল। তারপর গ্যারেজে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়ে দেখলাম ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে। তখন আর কি করব! ট্যাকসি নিয়েই চলে গেলাম।

রঞ্জনা আমাকে দেখেই মন্তব্য করল, 'তাহলে ফিরেছেন দেখছি।'

'ফিরব না তো কোথায় যাবো?'

'কোথায় যান, কোথায় থাকেন, তা আপনিই জানেন।'

'তার মানে?'

কথা বলতে বলতেই ড্রইংরুমে ঢুকলাম। রঞ্জনা বললো, সত্যি বেশ আছেন আপনি। কোনো চিন্তা-ভাবনা দায়-দায়িত্ব নেই! যা ইচ্ছে তাই করছেন।'

'কোথায় যা ইচ্ছে তাই করছি? কাজে আসাম গিয়েছিলাম আর ফেরার পথে কদিন কলকাতায় ছিলাম।'

রঞ্জনা কিছু বলার আগেই আমি আবার বললাম, 'আমি খেতে এসেছি।'

'আমি জানি।' রঞ্জনা একবার আমাকে দেখে বললো, 'আপনার মতো জার্নালিস্টদের সংসার-ধর্ম না করাই ভালো।'

'সেই জন্যই তো করিনি।'

'না করে খুব ভালো করেছেন, কিন্তু আমি আপনার মতো কোনো জার্নালিস্টের হাতে পড়লে তো মরেই যেতাম।'

ওর কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। 'কি আজে-বাজে কথা বলছ?'

রঞ্জনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'যাই খাওয়ার ব্যবস্থা করি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠলাম। রঞ্জনাও বাইরে বেরিয়ে এলো। চারপাশ তাকিয়ে আমার গাড়ি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি কোথায় রেখেছেন?'

'গাড়ি আনিনি।'

'কেন?'

'স্টার্ট নিতে গিয়ে দেখি ব্যাটারি ডাউন হয়ে গিয়েছে।'

খবরটা শুনে ও যেন খুশীই হলো, 'মাসের পর মাস গাড়ি পড়ে থাকলে ব্যাটারীর কি দোষ?'

আমি কি বলব? শুধু হাসলাম।

'তাহলে কিসে এলেন?'

'কেন ট্যাক্সিতে।'

'এখন কি ট্যাক্সি করেই ফেরত যাবেন?'

'তবে আর কিসে যাব?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি দাদাকে ফোন করে গাড়ি আনিয়ে নিচ্ছি।'

'কোনো দরকার নেই...'

ও আমার কথা না শুনেই বাড়ির মধ্যে চলে গেল। আমি ঐখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দু-তিন মিনিট পরেই রঞ্জনা বেরিয়ে এলো। 'একটু বসুন। এক্ষুনি গাড়ি আসছে।'

আমি ওর পিছন পিছন ড্রইংরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'কোনো দরকার ছিল না রঞ্জনা।'

'আপনি চুপ করুন।'

'চুপ করছি কিন্তু ডক্টর চৌধুরী কি ভাববেন বলতো?'

'দাদার কাছে কিছু চাইলে উনি বরং খুশী হন, তা জানেন?'

গাড়ির হর্ন শুনতেই রঞ্জনা উঠে দাঁড়াল। 'চলুন, আপনাকে ছেড়ে আসি।'

'তুমিও যাবে?'

'কেন? কোনো আপত্তি আছে?

'আমি একা বলে কি মানুষের সাহচর্য পছন্দ করি না?'

'তার মানে?'

'চলুন, চলুন।' বলতে বলতেই বেরিয়ে গেল। চাকরটাকে বললো, 'আমি একটু বেরুচ্ছি।'

গাড়িতে উঠেই রঞ্জনা জানতে চাইল, 'অফিস না বাড়ি যাবেন?'

'কাল থেকে অফিস যাবো।'

রঞ্জনা ড্রাইভারকে বললো, 'সাব কা কোঠী চলো।'

গাড়িতে যেতে যেতেই আমি বললাম, রঞ্জনা, আমি তোমার কথাবার্তা ঠিক বুঝি না।'

ও একটু হাসল, 'সহজ সরল কথাবার্তা আপনি বুঝতে পারেন না, তা আমি জানি।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম। বেশ কয়েক মিনিট পরে দৃষ্টিটা হঠাৎ গুটিয়ে ভিতরে আনতেই দেখি ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখে ওর চোখ পড়তেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছিলেন?'

আমি উত্তর দেবার আগেই আমার বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। দুজনেই নামলাম। বেল বাজাতেই রাধাকিষণ দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে বললাম, 'বসো।'

রঞ্জনা বসেই জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কথার জবাব দিলেন না?'

'কোনো কথার?'

'গাড়িতে আসতে আসতে কি ভাবছিলেন?'

'সত্যি বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিছু মনে করবে না তো?'

'না'।

'তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

রঞ্জনা একটু হেসে উঠল, 'এই প্রথম বোধহয় আমার কথা ভাবলেন?'

'এর আগেও ভেবেছি।'

'সত্যি ভেবেছেন?'

'ভাবব না কেন বল? তোমাদের সবার সঙ্গে যখন আমার এত হৃদ্যতা, তখন তোমার কথা ভাবব না কেন?'

'আগে জানতে পারলে আমার একটু উপকার হতো।'

'উপকার হতো মানে?'

'যখন জানাননি তখন ওসব কথা ছাড়ুন।'

আমি আর কোনো কথা না বলে একটা সিগারেট ধরালাম।

রঞ্জনা হাসতে হাসতে বললো, 'সিগারেটের গন্ধ আমার খুব ভালো লাগে।'

আমি হাসলাম, 'তাই নাকি?'

'সত্যি। দারুণ ভালো লাগে।'

'দেবু সিগারেট খায়?'

'ও আবার সিগারেট খাবে?'

'তার মানে?'

'অত গুড বয় কখনো সিগারেট খায়?'

'তোমার ভালো লাগে জানলে নিশ্চয়ই খাবে।'

'আপনি তাহলে ওকে চেনেননি।'

আমি আবার চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলাম। রঞ্জনাও একটু চুপ করে রইল। তারপর হাসতে হাসতে বললো, 'হোস্টেলে থাকার সময় আমরা কয়েকজন মেয়ে মাঝে মাঝেই সিগারেট খেতাম।'

আমি হাসলাম, 'সত্যি?'

'সত্যি নয়তো মিথ্যে বলছি? একটা সিগারেট দিন, খেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।' ও যেন মজা করে বললো।

আমি হাসতে হাসতেই ওকে একটা সিগারেট অফার করলাম। ও সিগারেটটা হাতে নিয়ে বললো, 'এ ঘরে না, ভিতরের ঘরে চলুন।'

'কেন?'

'হঠাৎ যদি রাধাকিষণ এসে পড়ে তাহলে...'

'চলো।'

দুটি বেডরুমের একটিতে আমি পড়াশুনা কাজকর্ম করি, অন্যটায় শুই। স্টাডিতেই ঢুকলাম। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসো'

রঞ্জনা বসল।

আমি লাইটার জ্বেলে ওর মুখের সামনে ধরতেই ও একটানে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। পর পর

কয়েকটা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'অনেক কাল পরে সিগারেট খেতে বেশ লাগছে।'

আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'হোস্টেল ওয়ার্ডেন মাঝে মাঝে হঠাৎ আমাদের রুমে এলে কি কাণ্ডটাই হতো!...'

'কি হতো?'

'চারজন মেয়ের কেউ না কেউ সিগারেট খেতই। তাছাড়া সবার টেবিলেই সিগারেট-দেশলাই পড়ে থাকত।'

'তাই নাকি?'

'হোস্টেলে থাকার যে কি আনন্দ সে আপনি কি বুঝবেন?'

আমি হাসলাম।

'আপনাকে নিয়েই কি হোস্টেলে কম মজা হতো?'

চমকে উঠলাম, 'আমাকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে। আপনার জন্য আমাকে সবাই জার্নালিস্ট বলত...'

'সে কি?'

'এম. এ. পরীক্ষা দেবার পরই আমার বিয়ে হয়ে গেল, নয়তো আমি ঠিক জার্নালিজম করতাম।'

'রিয়েলি?'

'সত্যি বলছি জার্নালিজম আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে।'

'ফরেন সার্ভিসের চাইতেও?'

'অব কোর্স। ফরেন সার্ভিসের সবাই বড় চালিয়াত হয়।'

'জার্নালিস্টরা হয় না?'

সিগারেটটা শেষ হয়ে যেতেই অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল রঞ্জনা। বললো, 'ওসব বাদ দিন। ভাবতে গেলেও মন-মেজাজ খারাপ হয়।'

'মন-মেজাজ খারাপ হবে কেন?'

'যাই হোক আপনি সত্যি একটা বিচিত্র মানুষ। আর যাই থাক মন বলে কোনো পদার্থ আপনার নেই।'

আমি আর পারলাম না। চেয়ারটা টেনে ওর খুব কাছে গিয়ে বললাম, 'আমার দিকে তাকাও।'

ও আমার চোখের পর দৃষ্টিটা আনতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার মনের কথাটা খুলে বলবে?'

রঞ্জনা বেশ জোরেই হেসে উঠল, 'এই পৃথিবীতে কোনো মানুষটা মনের কথা খুলে বলে বলুন তো? তাছাড়া আপনাকে বলে আমার লাভ?'

'লাভ-লোকসানের কথা আমি জানি না। তবে তোমার কথা শুনে বেশ বুঝতে পারি তোমার যেন কি একটা গোলমাল হয়ে গেছে।'

'তাতে তো আপনার কোনো ক্ষতি হয়নি।'

'তোমার হয়েছে?'

'হলে কি আপনি ক্ষতিপূরণ দেবেন?' ও আমার প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করতে করতে বললো, 'আপনার সে ক্ষমতা নেই।'

'কি এমন ক্ষতি তোমার হলো যে আমি ক্ষতিপূরণ করতে পারব না?'

আপন মনে সিগারেট ধরাল, 'আমি সিগারেট খাচ্ছি বলে রাগ করছেন?'

'না।'

'রাগ না করলেও মনে মনে নিশ্চয়ই খারাপ ভাবছেন?'

'শখ করে সিগারেট খাচ্ছ, খারাপ ভাবব কেন?'

খুব জোরে সিগারেটে টান দিয়ে রঞ্জনা একটু মুচকি হাসল, 'আমি জানি আপনি আমাকে ভালোবাসেন।'

'নিশ্চয়ই ভালোবাসি। তুমি সুভাষদার মেয়ে। তোমাকে ভালোবাসব না?'

'আঃ! এর মধ্যে আবার বাবা-মাকে টানছেন কেন?'

আমি চুপ করে রইলাম।

রঞ্জনা নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বললো, কোনোদিন মুখ ফুটে আমার একথা বলতে হবে ভাবিনি, কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না...'

রঞ্জনা হঠাৎ থামল।

আমি চুপ করে রইলাম। দু এক মিনিট পরে মুখ ঘুরিয়ে দেখি ওর চোখে জল। 'কাঁদছ কেন রঞ্জনা? কি হয়েছে তোমার?'

রঞ্জনা বিদ্যুৎ বেগে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলেই ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললো, 'চলি।'

'রঞ্জনা। শোন!'

আমি ওর পিছন পিছন যেতে যেতে আবার ডাকলাম, 'একটা কথা শুনে যাও রঞ্জনা। এক মিনিট...'

ও দাঁড়াল না। গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে বললো, 'সাহাব কা দপ্তর চলো।'

রঞ্জনা আমার দিকে একবারও তাকাল না। ড্রাইভার হাত তুলে আমাকে একটা সেলাম দিয়েই গাড়ি স্টার্ট করল। রঞ্জনা চলে গেল। আমি ঐখানেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নড়তে পারলাম না। হঠাৎ আমার সব কিছু অসহ্য মনে হলো। এক মিনিটের জন্য আর দিল্লি থাকতে মন চাইল না।

তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে এসেই নিউজ এডিটরকে একটা ফনোগ্রাম পাঠালাম, গোয়িং আউট অফ ডেলহি ফর অ্যান ইন্টারেস্টিং নিউজ।

এবার রাধাকিষণকে ডেকে বললাম, 'আমি খুব জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি।'

'ফিন বাইরে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কব?'

'আজ।'

রাধাকিষণ অনেক কাল ধরে আমার কাছে কাজ করছে। আমাকে ও ভালোভাবেই চেনে, জানে। বুঝল কিছু একটা অঘটন ঘটেছে, কিন্তু হাজার হোক আমি মনিব, ও আমার ভৃত্য। একটি প্রশ্নও করল না।

সন্ধ্যার পর আমি একটা অ্যাটাচিতে কয়েকটা জামা-কাপড় ভরে নিয়েই দিল্লি জংশন স্টেশনে রওনা হলাম। রিজার্ভেশন পেলাম না। তবু মুসৌরী এক্সপ্রেসে চড়ে ডেরাডুন গেলাম। পরের দিনই মুসৌরী।

দিল্লি থেকে পালিয়ে এলাম ঠিকই, কিন্তু মন? তার কাছ থেকে কোথায় পালাব। হকম্যানস গ্রান্ড-এ থেকেও ভালো লাগছিল না। দুটো দিন ঘর থেকেই বেরুলাম না। তার পরদিন আর পারলাম না। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে টিকিটের খোঁজ করলাম। সেদিনকার টিকিট ছিল না। পরের দিনের একটা

টিকিট কিনে হোটেলে ফিরে এলাম।

চারদিন পর দিল্লি ফিরলাম। বাড়িতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাধাকিষণ আমার হাতে একটা খাম দিল, তিন মূর্তি লেনের মেমসাব দুদিন এসে আপনাকে না পেয়ে এই চিঠি দিয়ে গেছেন।

বিচিত্র চিঠি। কোনো কিছু বলে সম্বোধন নেই। '...আপনাকে এই প্রথম চিঠি লিখছি অথচ কিছু বলে সম্বোধন করতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন। তা ছাড়া কি বলে সম্বোধন করব? যা বলে সম্বোধন করতে মন চায় তা তো সম্ভব নয়।

'প্রথমবার আপনি যখন বেনারসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তখনই আপনাকে ভালো লেগেছিল। আপনার মুখের হাসি, উদার দুটো চোখ, প্রাণ-প্রাচুর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আপনি চলে যাবার পরমুহূর্ত থেকেই আবার আপনার আসার প্রতীক্ষায় থেকেছি। বার বার লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার ওয়াশিংটনের ফটোগুলো দেখেছি আর ছোট-ছোট টুকরো-টুকরো কাগজে আপনাকে চিঠি লিখেছি। সেসব চিঠি কোনোদিন আপনাকে পাঠাইনি। পাঠাতে পারিনি। সাহস হয়নি।

আস্তে আস্তে আপনাকে যত দেখেছি তত বেশি ভালো লেগেছে আর নিত্য নতুন স্বপ্ন দেখেছি মনে মনে। দেখব না কেন? আপনি যেভাবে আমার সঙ্গে মিশেছেন, যেভাবে দিনে দিনে, ধাপে ধাপে আমার কাছে এগিয়ে এসেছেন, আমাকে আপন-জ্ঞানে কাছে নিয়েছেন, ভালোবাসার আভাস-ইঙ্গিত-প্রমাণ দিয়েছেন, তাতে স্বপ্ন দেখা অন্যায় মনে হয়নি। বরং স্বাভাবিক মনে হয়েছে। মনে হয়েছে আপনাকে ভালোবাসার, আপনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার অধিকার আপনি আমাকে দিয়েছেন।

তারপর একদিন হোস্টেলের মেয়েদের কাছে ধরা পড়লাম। হাজার হোক এক ঘরে থাকি, একসঙ্গে লেখাপড়া করি, সিনেমা দেখি। বেড়াতে যাই। কতদিন আর ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব? ওরা কি দারুণ ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত তা আপনি ভাবতে পারবেন না। হোস্টেলে তো কোনোদিন থাকেননি, তাই ভাবতে পারবেন না মেয়েদের ভালোবাসার কথা, প্রেমের কাহিনি ফাঁস হয়ে গেলে কি কাণ্ড হয়। আমি যখন ফিফথ্ ইয়ারে উঠি তখন আপনার বয়সীই একজন বাঙালি লেকচারার আমার প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়েছেন বলে হোস্টেলের গোয়েন্দা বিভাগে খবর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর কাছে বেনামী চিঠি চলে গেল, আপনার চাইতে অনেক সুন্দর, ব্রিলিয়ান্ট এক জার্নালিস্টের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে বলে ঠিক হয়ে গেছে। সুতরাং মন দিয়ে অধ্যাপনা করুন আর রবিবারের আনন্দবাজার-যুগান্তরে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়ুন।

'চিঠিতে কি সব কথা জানান যায়? তাছাড়া দুই ভাইকে ফাঁকি দিয়ে এই চিঠি কি ভাবে লিখছি তা আপনি ভাবতে পারবেন না। অনেক কষ্ট করে এই চিঠি লিখছি। না লিখে পারছি না। আপনি যে কি তা আমি ভেবে পাই না। রাজনীতির এত গোপন খবর জোগাড় করেন অথচ প্রকাশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট, উন্মুক্ত আমার ভালোবাসা আপনি বুঝতে পারলেন না? ভালো না বাসলে কোনো মেয়ে এভাবে একজন ব্যাচেলারের সঙ্গে মিশতে পারে? সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে একা একা তাকে সাহচর্য দিতে পারে? শুধু দেহটাই আপনাকে দিইনি, কিন্তু তাছাড়া আর কি দিই নি? সেবা, যত্ন, ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা—সব কিছুই তো দিয়েছি। আনন্দে, হাসি মুখে দিয়েছি। আর যদি দাবি করতে পারতেন তাহলে হয়তো এই দেহটাকেও না দিয়ে পারতাম না। আপনার মধ্যে অনেক দ্বিধা, জড়তা, সঙ্কোচ থাকলেও আমার মধ্যে ছিল না। একবার নয়, বহুবার তো সুযোগ পেয়েছেন। কতদিন শুধু আমি আর আপনি আপনার পড়ার ঘরে, শোবার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি বলুন তো। রাধাকিষণ তো সেই পিছনের দিকে নিজের কোয়ার্টারে ঘুমুতো। একবার দাবি করেই দেখতে পারতেন ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণা হই কিনা। যে মেয়ে প্রাণ-মন উৎসর্গ করতে পারে, ভালোবাসার জন্য লোকলজ্জা, সামাজিক অনুশাসন উপেক্ষা করতে পারে,

তার পক্ষে প্রাণের মানুষের কাছে দেহটাকে বিলিয়ে দেওয়া কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। ভালোবাসার খেসারত দিতে গিয়ে শুধু মেয়েরাই সমাজের কাছে কলঙ্কিনী হয়, ছেলেরা নয়। কখনই নয়। ভালোবাসার বিনিময়ে দুর্নাম সহ্য করার সাহস বা ক্ষমতা আপনাদের হয় না। হবে না।

'আমি ভেবে পাই না আপনি কি? পশু? নাকি দেবতা? হয় আপনার মধ্যে শৌর্য, বীর্য, ভালোবাসার ক্ষমতা, মন কিছুই আপনার নেই ; নয়তো আপনি এমন কোনো মেয়ের দেখা পেয়েছেন, ভালোবাসা পেয়েছেন, নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছেন, যার কাছে আমি অতি সাধারণ। অতি নগণ্য। হয়তো তুচ্ছ বা ঘৃণ্য। কোনোটা ঠিক বলুন তো? বলতে পারেন কেন আপনি আমাকে এভাবে উপেক্ষা করেছেন? এভাবে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন? কোনো অধিকারে সারা জীবনের জন্য আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন?'

'থাক গে। ভেবেছিলাম আর আপনার এখানে আসব না, কিন্তু না এসে পারলাম না। দুদিন এলাম দেখা হলো না। শুনলাম আপনি হঠাৎ জরুরি কাজে বাইরে গেছেন। কাজটা যে কত জরুরি তা আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝেছি। আমার জন্যই আপনার এই দুর্ভোগ। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাচ্ছি। দাদার জন্য দিল্লিতে আমার আসতেই হবে। তবে কথা দিচ্ছি আপনাকে আর বিরক্ত করব না।'

চিঠিটা পড়ে তো অবাক হলামই, তবে আরো বেশি অবাক হলাম নিচের লেখাটুকু দেখে—মিসেস দেবব্রত চৌধুরী।

তারপর কত কি হলো! ডক্টর চৌধুরীর বাড়ির গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ এলো। দেবু নিজেই এসেছিল। 'দাদা বার বার বলে দিয়েছেন আপনাকে আসার জন্য।'

আমি খুব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছি, 'আসব তো নিশ্চয়ই ; তবে খবরের কাগজের কাজ করি তো! কখন যে কোনো কাজে আটকে যাই কিচ্ছু ঠিক নেই।'

দেবু হাসতে হাসতে বলেছে, 'তাছাড়া বাড়িটা তো আপনাদেরই রঞ্জনার। সুতরাং না এলে চলবে না।'

'অত করে বলার দরকার নেই। যদি খুব জরুরী কোনো কাজে আটকে না যাই তাহলে আসবই।'

আমি যাইনি। যেতে পারিনি। রমার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার হয়নি। দেবু যখন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল তখনই জানতাম যাব না। কিছুতেই যাব না কিন্তু বলতে পারিনি। কি বলব? বলব, দেবুবাবু, আপনার স্ত্রী রমা আমাকে ভালোবাসত। এখনও ভালোবাসে। একদিন সে আমাকে সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারত। ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে আমার কাছে এসেছে, কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারিনি। ওকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। একেবারেই কিছু দিইনি। ভালোবেসে প্রত্যাখ্যাত হবার মতো অপমান আর নেই। এর চাইতে বড় ব্যর্থতা, পরাজয়, মেয়েদের জীবনে আসতে পারে না। আমার কাছে রমা এই অপমানে অপমানিতা হয়েছে। ওর কাছে মুখ দেখাব কি করে? কোনো সাহসে? প্রেমে প্রত্যাখ্যাত মেয়ে আহত কেউটে বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চাইতেও ভয়ঙ্কর। মারাত্মক। আমি আপনাদের এই আনন্দের দিনে যেতে পারব না দেবুবাবু। আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি শিক্ষিত। ভদ্রলোক। ভদ্রসমাজে বিচরণ করি। তাই মনের কথা বলি না। বলার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহস আমার নেই। অভ্যাস নেই। বরং মনের কথা চেপে রেখে বানিয়ে বানিয়ে মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যা কথা বলতে ওস্তাদ। তাই দেবুবাবুকে এসব কিছুই বলিনি। আমি ওর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। উনি ভেবেছেন আমি নিশ্চয়ই যাব। এমন আনন্দের দিনে আমি ওঁদের পাশে দাঁড়াব না?

তাই কি কখনও হয়?

সুভাষদা মস্কো থেকে ফিরে এলেন। আগেই চিঠি পেয়েছিলাম কিন্তু তবুও এয়ারপোর্টে যাইনি।

যে কারণে দেবুদের গৃহপ্রবেশের দিন যায়নি, ঐ একই কারণে পালাম যাইনি। কিন্তু পালামে গিয়ে ওঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য মনটা সত্যি বড় ব্যাকুল হয়েছিল। সুভাষদার সংসারে যে মর্যাদা, ভালোবাসা পেয়েছি তার তুলনা হয় না। কত মানুষের সঙ্গেই তো আলাপ হয় কিন্তু কজন এভাবে আমাকে আপন করে নিয়েছেন? একজন অপরিচিত সাংবাদিকের কাছে এভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারেন? খুব কম। প্রায় দুর্লভ। আমার জীবনের অনেক দৈন্য, অভাব, অপূর্ণতা এঁরা ভরিয়ে দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার ঋণ অশেষ। সীমাহীন। কল্পনাতীত। মাতৃ ঋণ যদি শোধ করা না যায় তাহলে এঁদের ভালোবাসার ঋণই বা শোধ করা যাবে কি ভাবে? স্নেহ-ভালোবাসার ঋণ কখনই শোধ করা যায় না। আমি ওঁদের ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারব না। চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হব। তাই শুধু কৃতজ্ঞতার বোঝা বহন করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর ওঁরা যতবার দিল্লি দিয়ে আসা-যাওয়া করেছেন, প্রত্যেকবার আমি উপস্থিত থেকেছি। শত কাজের মধ্যেও না যাবার কোনো কারণ হয়নি। হবে কেন? আমি যখন আমেরিকা থেকে ফিরি তখন সুভাষদা আর বৌদি ওঁদের গাড়িতে আমাকে নিউইয়র্ক পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমার মতো একজন সাধারণ সাংবাদিকদের জন্য অন্য কোনো ভারতীয় ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রী এত কষ্ট করবেন? কেউ না। শত শত ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে আমার আলাপ, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা। বিদেশে কত অলস সন্ধ্যা এঁদের সঙ্গে কাটাই। আড্ডা দিই, সিনেমা-থিয়েটারে যাই, লাঞ্চ-ডিনার খাই, হুইস্কির বোতল শেষ করি, কিন্তু সুভাষদা-জয়ন্তী বৌদির মতো কেউ স্বেচ্ছায় হাসি মুখে আমাকে বিদায় জানাতে আসেন না এয়ারপোর্টে। আমি আশা করি না। আশা করা অন্যায়। সেই সুভাষদা আর জয়ন্তী বৌদি আসছেন কিন্তু গেলাম না। ভাবলেও অবাক লাগে। সুভাষদা রিটায়ার করে ফিরছেন। আর কোনোদিন পালাম এয়ারপোর্ট দিয়ে আসা-যাওয়া করবেন না। তিন-চার বছর পর পর স্বদেশ-বিদেশের মধ্যে আর খেয়া পারাপার করবেন না। অন্যবার কোনো কারণে এয়ারপোর্টে না গেলেও হয়তো কিছু মনে করতেন না। ভাবতেন, বুঝতেন আমি কোনো কাজে আটকে পড়েছি, কিন্তু এবার মনে মনে একটু আহত নিশ্চয়ই হবেন। হয়তো ভাববেন রিটায়ার করেছেন বলে আমি আর ওঁদের গুরুত্ব বা মর্যাদা দিচ্ছি না। হয়তো মনে করবেন আমি ওঁদের উপেক্ষা করলাম। আমি পাল্টে গেছি। আমি আর ওঁদের চাই না। আমার জীবনে ওঁদের ভূমিকা শেষ। জানি না আরো কত কি ভাববেন। এসব ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। অন্যায় নয়। আমি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু বিবেক? বিবেকের কাছে তো আমাকে জবাবদিহি করতেই হবে। কি বলব বিবেককে? বলব, আমি ভীরু কাপুরুষ, আমি অকৃতজ্ঞ? বলব, আমি রমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো মনের জোর, চরিত্রের দৃঢ়তা হারিয়েছি? তাই কি কখনও হয়? ওঁরা এয়ারপোর্টে নেমে নিশ্চয়ই আমার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবেন না। যে বলতে পারে সে তো আমার নামও উচ্চারণ করবে না।

টেলিফোনেই সুভাষদাকে বললাম, 'এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না বলে নিশ্চয়ই রাগ করেছেন?'

'রাগ করব কেন? তবে আশা করেছিলাম তুমি থাকবেই।'

'নিশ্চয়ই আশা করবেন। আপনারা আমাকে এতো ভালোবাসেন আর এইটুকু আশা করবেন না?'

'একবার ভাবলাম হয়তো চিঠি পাওনি, কিন্তু যাদের চিঠি দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে শুধু

তোমাকেই দেখতে না পেয়ে মনে হলো চিঠি ঠিকই পেয়েছ।'

'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে চিঠি পাঠিয়েছেন। না পাবার তো কোনো কারণ নেই।'

'তোমার বৌদি অবশ্য বলছিলেন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কাজে আটকে গিয়েছে।'

'বৌদির ফিফথ্ সেন্স রিয়েলি খুব স্ট্রং।'

'তা ঠিক। আমি অনেকবার তার প্রমাণ পেয়েছি।'

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বৌদি পাশে আছেন?'

'না।'

'আপনার কথাগুলো বৌদি শুনলে খুব খুশী হতেন।'

'কথাগুলো শুনলে বলতো, আমি ওকে শোনাবার জন্যই প্রশংসা করছি।'

'বৌদি কি কোনো কাজ করছেন?'

'কাজ আবার কি করবে? নিশ্চয়ই ভিতরের ঘরে বসে রমার সঙ্গে গল্প করছে।'

'দেবু এখানে আছে নাকি?'

'না, ও তো এখানে নেই। গৃহপ্রবেশের পর পরই ব্যাঙ্গালোরে চলে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'ও চলে গেছে, তুমি জানতে না?'

'না।'

সুভাষদা একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবু যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করেনি?'

'না। বোধহয় সময় পায়নি।'

'সময় পায়নি একটা কোনো কথাই নয়। এখান থেকে তোমার ওখানে ঘুরে আসতে কতক্ষণ আর সময় লাগে?'

'নিশ্চয়ই এমন কোনো কাজে জড়িয়ে পড়েছিল যে...'

একই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলাম বলে সুভাষদা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এর মধ্যে ওদের এখানে এসেছিলে নাকি?'

'না দাদা, আমিও আর যেয়ে উঠতে পারিনি।'

সুভাষদা ডিপ্লোম্যাট। কূটনীতিবিদ। বেশি কথা না বললেও অনেক কথা বুঝতে পারেন। অনুমান করতে পারেন। তাই বোধহয় ঐ বিষয়ে আর কিছু জানতে চাইলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বৌদির সঙ্গে কথা বলবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'একটু ধরো, ডেকে দিচ্ছি।'

একটু পরেই বৌদি টেলিফোন তুলে নিলেন। অনেক কাল পরে টেলিফোনে বৌদির গলা শুনেই চমকে উঠলাম। ঠিক রমার মতো শোনাল। বললেন, 'তোমার দাদার কাছে শুনলাম কাজে আটকে পড়েছিলে বলে এয়ারপোর্টে আসতে পারনি।'

'এমন কাজের চাপ পড়েছে যে কি বলব?'

'শুনলাম এই নতুন বাড়িও তুমি দেখতে আসনি।'

'আমার এক কলিগ চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় একা আমার উপর সব কাজের চাপ পড়েছে...'

'আমি তোমার দাদাকেও ঠিক এই কথাই বলছিলাম...'

'যাই হোক টেলিফোনেই একটা অনুরোধ করব। রাখবেন তো?'

'তোমার অনুরোধ রাখব না? বল কি ব্যাপার।'

'কাল আপনারা দুজনে আমার এখানে খাবেন।'

'কখন?'

'দিনে অথবা রাত্রে। যখন আপনাদের সুবিধে।'

'আমাদের আবার অসুবিধে কি? দুপুর বেলাতেই আসব।'

'খুব ভালো।'

ওঁরা যখনই দিল্লি এসেছেন তখনই দু'এক বেলা আমার বাসায় থেকেছেন, খেয়েছেন। তবে শুধু ওঁরা দুজনে কখনই আসেননি। এসেছেন দেবুকে নিয়ে, রমাকে নিয়ে। দেবু দিল্লিতে না থাকলে রমাকে নিয়েই এসেছেন। কি দারুণ আনন্দে যে সময়টা কেটে যেতো তা ভাবলে অবাক লাগে। একবার সুভাষদা আগের দিন রাত্রেই আমার এখানে চলে এলেন। এসেই বললেন, 'রাত্রেই তোমার এখানে চলে এলাম।'

খুব খুশী হয়েই বললাম, 'খুব ভালো করেছেন, কিন্তু বৌদি কোথায়?'

তোমার বৌদি বা রমা আসেনি। আমি একলাই চলে এলাম।'

'ওঁদের নিয়ে এলেন না কেন?'

'ওরা এলে কি আমরা ঘুমুতে পারতাম? ঘুমুবার জন্যই তো তোমার এখানে চলে এলাম।'

'ওঁরা সকালেই আসবে তো?'

'কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

'তার মানে? অন্য কোনো প্রোগ্রাম আছে নাকি?'

'প্রোগ্রাম আবার কি থাকবে?...'

'তাহলে আসার ঠিক নেই মানে?'

'একবার শুনছিলাম ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই চলে আসবে। তারপর একবার শুনলাম লাইক রিয়েল গেস্টস ঠিক একটায় আসবে...'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'একটার সময় এলে আমি বাড়িতে ঢুকতে দেব নাকি?'

'ওদের ঢুকতে দেবে কি না দেবে, সে তুমিই জান, আমাকে তো বিরক্ত করবে না?'

সুভাষদা আমার ঘরে ঘুমুচ্ছেন। আমি আমার স্ট্যাডিতে ডিভানের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ কানের কাছে খুব মিহি মিষ্টি ডাক শুনলাম, 'উঠবেন না? চা নিয়ে এসেছি।'

দু'তিনবার। ঘুম ভেঙে গেলেও ঘোর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। ভাবলাম বোধহয় স্বপ্ন দেখছি।

'উঠুন। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।'

চাদর সরিয়ে দেখি রমা।

'তুমি?'

'হ্যাঁ আমি।'

'কখন এলে?'

'অনেকক্ষণ।'

'বৌদি কোথায়?'

'বাথরুমে।'

'তুমি চা নিয়ে এলে যে?'

'ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ দেখতে নেই বুঝি?

'না। অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।'

'তার মানে?'

'তার মানে এর পর আর অন্যের মুখ দেখলে সহ্য করতে পারব না।'

'আপনার অভ্যাস খারাপ করার ক্ষমতা আমার নেই।'

কথার মোড় ঘোরালাম, 'তোমার বাবাকে চা দিয়েছ?'

'এত ভোরে বাবাকে চা দেব?'

'কেন? কটা বাজে?'

'সাড়ে ছ'টা।'

'সাড়ে ছটা।' আমি আঁতকে উঠি। 'তাহলে তোমরা কখন এসেছ?'

'আধ ঘণ্টা আগে।'

'রাত্রে কি ঘুমোওনি?'

'আপনার জন্য কি ঘুমুবার উপায় আছে?'

'আমার জন্য ঘুমুতে পার না?'

'না।'

'তার মানে?'

'সব কথার মানে বলতে পারব না। নিন উঠুন। চা খেয়ে নিন।'

বৌদি বাথরুম থেকে বেরুবার পর বললাম, 'স্বামীর জন্য যদি এভাবে ভোরবেলায় ছুটে আসেন তাহলে মেয়ে-জামাই কি শিখবে বলুন তো?'

বৌদি হাসতে হাসতে বললেন, 'ওদের যা কিছু শেখাবার তা তুমি যথেষ্ট শেখাতে পারবে। আমাকে কিছু শেখাতে হবে না।'

রাধাকিষণকে নিয়ে বৌদি বাজারে গেলেন। কিছুতেই আমাকে যেতে দিলেন না। রমা বললো, 'মা যখন এসেছেন তখন সংসারের ব্যাপারে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

আমি বললাম, 'উনি কদিনের জন্য বেড়াতে এসেও সংসারের ঝামেলা সহ্য করবেন? আমাকে যদি দায়িত্ব দিতে না চাও তাহলে তুমি তো নিতে পারতে।'

ও স্পষ্ট বললো, 'আমি টেম্পোরারী দায়িত্ব নিই না।'

আমি আর সুভাষদা বসে বসে শুধু পলিটিক্স আলোচনা করেছি, চা-কফি খেয়েছি, সিগারেট টেনেছি। মাঝে মাঝে কিচেনের কাছে গিয়ে বলেছি, ইফ দেয়ার ইজ এনি ডিফিকাল্টি লেট মী নো।

টিপ্পনী কাটার সুযোগ রমা ছাড়ে না, 'আমার উপর মাতব্বরী করেন বলে কি মার উপরেও মাতব্বরী করবেন?'

'তোমার উপর আমি মাতব্বরী করব? এত সাহস আমার নেই!'

জয়ন্তী বৌদি হাসেন।

সুভাষদা একা ঘরে বসে থাকতে পারেন না। হেলতে দুলতে কিচেনের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাজার-টাজার যেতে হবে নাকি?'

জয়ন্তী বৌদি হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন' কি দায়িত্বশীল লোক দেখেছ! পৌনে বারোটার সময় বাজার যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করছেন।'

আমি বললাম, 'বৌদি, একে বলে সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স। বাই চান্স যদি আপনি কিছু ভুলে যান...'

'তুমি, চুপ করো তো। তোমাকে আর ওর মোসাহেবী করতে হবে না!'

'সারপ্রাইজিং! সবাই বলে আমি আপনার আর রমার মোসাহেবী করি।'

রমা রেগে যায়, 'এইসব বাজে কথা বললে কিন্তু ভালো হবে না।'

'যে কথাই বলি না কেন, তুমি আমার ভালো করবে না। সুতরাং ও ভয়ে কম্পিত নয় জার্নালিস্টের হৃদয়!'

সুভাষদা হাসতে হাসতে ড্রইংরুমে চলে গেলেন। বৌদিও রান্নায় মন দিলেন। রমা বললো, 'জার্নালিস্টদের হৃদয় থাকে নাকি?'

একবার সুভাষদা ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে জরুরি পরামর্শের জন্য কায়রো থেকে কয়েক দিনের জন্য দিল্লি এলেন। রমা তখন বেনারসে, কিন্তু কিছুতেই সুভাষদার পক্ষে বেনারস যাওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ কায়রো থেকে দিল্লি এসেও মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে না, তাও হয় না। আমার কাছে সুভাষদার টেলিগ্রাম এলো, রিচিং মনডে আর্লি মর্নিং ফর আর্জেন্ট কনশালটেশন। রমা রিচিং সানডে অর মনডে বাই এয়ার। সুভাষদার টেলিগ্রাম এলো শুক্রবার সকালে। শনিবার দুপুরে অফিস বেরুবার সময় রমার টেলিগ্রাম এলো, রিচিং মনডে ভায়া লখনৌ অ্যাটেন্ড পালাম।

সুভাষদা আর রমা পাঁচদিন আমার কাছেই ছিলেন। তিনজনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবার পর সাড়ে ন'টায় সুভাষদা সাউথ ব্লক যেতেন। একটা দেড়টা-দুটোয় লাঞ্চে এসে আবার তিনটের মধ্যে *ফিরে যেতেন। তারপর ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছ'টা-সাতটা হয়ে যেতো। রোজ রাত্রে আমরা* তিনজনে বাইরে খেতাম। একদিন নাইট শো'তে সিনেমাও দেখেছিলাম। তারপর একই দিনে ওঁরা দুজনে পালাম থেকে চলে গেলেন।

ওই একবারই রমা আমার বাড়িতে থেকেছে। রাধাকিষণ সংসার চালাতো। আমি অফিসে গিয়ে বুড়ি ছুঁয়েই চলে এসেছি। থাকলেও এক ঘণ্টার বেশি কোনোদিন থাকিনি। বাকি সময় বাড়িতে বসে বসে রমার সঙ্গে গল্প করেছি, আড্ডা দিয়েছি।

'আমরা এসে আপনার কাজের খুব ক্ষতি করছি, তাই না?' খবরের কাগজ পড়তে পড়তে নামিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'জীবনে কিছু ক্ষতি স্বীকার না করলে তো লাভও করা যায় না।'

'এ ক্ষতির বিনিময়ে কি আর লাভ করছেন?'

আমি সিগারেট ধরিয়েই বললাম, 'এভাবে তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে পারছি, এটাই কি কম লাভ?'

'আমাকে খুশী করার জন্য এসব কথা বলে কি লাভ?'

'তোমাকে খুশী করার জন্য তো বলছি না। বলছি আমার মনের কথা।'

রমা আবার একটু হাসল, বললো, 'যাই বলুন, আপনার কথা ভাবলে আমার অবাক লাগে।'

'কেন?'

'হঠাৎ কিভাবে আলাপ হলো, ঘনিষ্ঠতা হলো ভাবলে অবাক লাগে।'

'আমিও মাঝে মাঝে এই একই কথা ভাবি। কত ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গেই তো আলাপ, কিন্তু কেউ কি তাদের এমন সুন্দরী মেয়েকে আমার হেপাজতে রাখবে?'

'কেউ বুঝি আপনাকে বিশ্বাস করেন না?'

'তুমিও দেখছি ডিপ্লোম্যাটদের মতো কথা ঘোরাতে ওস্তাদ হয়েছ।'

—

সেই আমি রমাকে আসতে বললাম না। বলতে পারলাম না। শুধু সুভাষদা আর বৌদিই এলেন। রাধাকিষণ অনেক কিছু রান্না করেছিল। অনেক গল্পগুজব করলাম ওঁদের দুজনের সঙ্গে, কিন্তু

কিছুতেই সেই আগের মতো আনন্দ পেলাম না। হলো না। অনেক সহজ সরল করে মেলামেশা করলেও মনে মনে সব সময় একটু অস্বস্তিবোধ না করে পারলাম না। বিকেলের দিকে যাবার সময় সুভাষদা শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে আর পারলেন না, ডক্টর চৌধুরী বা দেবু বা রমা কি তোমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, 'না না, ওঁরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন কেন?'

'তাহলে তুমি কি কোনো ব্যাপারে দুঃখ পেয়েছ?'

'সে রকম কিছু তো ঘটেনি।'

'যাই বল ভাই কিছু একটা ঘটেছে।'

'কিছুই ঘটেনি। তবে আপনাদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা আছে তা তো ওঁদের সঙ্গে হতে পারে না, হবে না।'

'দ্যাটস্ ট্রু বাট...'

ডক্টর চৌধুরী ইজ রেয়েলি সামবডি অব ডেলহি। আমার মতো জার্নালিস্টের পক্ষে ওখানে খুব বেশি যাতায়াত করা ঠিক নয়। তাছাড়া আমার এক কলিগ চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় আমার উপর ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে। সত্য কথাটা চাপার জন্য গড় গড় করে অনেক কথা বললাম।

বৌদি চুপ করে আমাদের কথা শুনলেন, একটি কথাও বললেন না। ট্যাক্সিতে চড়বার আগে শুধু বললেন, 'রমা যদি কোনো অন্যায় করে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দিও।'

'না, না, বৌদি, রমা কিছু অন্যায় করেনি।'

'করা উচিত নয়, কিন্তু করতেও তো পারে। ভুল করেও মানুষ অন্যায় করে।'

'না, না, ও কিছুই করেনি।'

সুভাষদা আর বৌদি দশদিন দিল্লি ছিলেন। একদিন ডক্টর চৌধুরী আমাকে নেমন্তন্নও করেছিলেন। পাছে ওঁরা আমাকে সন্দেহ করেন, একদিনের জন্য আগ্রা চলে গিয়েছি। আমি রঞ্জনাকে বিরক্ত করিনি।

সাত

সেন্ট্রাল লাইনের টিউবে চড়তে না চড়তেই অক্সফোর্ড সার্কাসে নেমে পড়লাম। দু মিনিটের মধ্যেই বেকারলু লাইনের গাড়ি এলো। ভীষণ ভিড় তবু উঠে পড়লাম। কিছু দেখতে না পেলেও গাড়ি থামতেই বুঝলাম পিকাডিলি সার্কাস। তারপর ট্রাফালগার স্কোয়ার। চারিং ক্রশ। নেমে পড়লাম। স্ট্রান্ড দিয়ে হাঁটছি। কত দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ আমার এপাশ-ওপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কত সুন্দরী। কত হট প্যান্টস্। কিচ্ছু দেখতে পেলাম না। চোখের সামনে শুধু রঞ্জনার ছবিটাই ভেসে উঠলো।

সারাদিন খুব ঘুরেছি। হোটেলে এসেই হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের ঘণ্টায়। রিসেপসনের টেলিফোন, 'স্যার মিঃ চাউডারী ইজ হিয়ার।

আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলেই উঠলাম। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই দেবু এলো। 'আসুন আসুন।'

দেবু আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, আপনাকে বোধহয় ডিসটার্ব করলাম, তাই না?'

'ডিসটার্ব করবেন কেন? আমিই তো আপনাকে আসতে বলেছি।'

দেবু বলল। 'আপনার দরজায় কয়েকবার নক করে কোনো রেসপন্স না পেয়ে রিসেপসন থেকে

টেলিফোন করলাম।'

'সারাদিন ঘুরাঘুরি করে এত টায়ার্ড হয়েছিলাম যে ঘরে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলাম।'

দেবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে বরং আপনি রেস্ট নিন, আমি কাল আসব।'

আমি দেবুর কাঁধে হাত দিয়ে বসিয়ে দিলাম, 'বসুন বসুন।' হাতের ঘড়িটা দেখে বললাম, 'প্রায় দু' ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। আর রেস্ট নেবার দরকার নেই।'

জুতার ফিরে খুলতে খুলতে বললাম, 'ঠিক পনেরো বছর আগে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'সেকেন্ড টাইম যখন লন্ডনে এলাম তখন আপনার ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে...'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ও বললো, 'আমরা দুজনে ডুরি লেন থিয়েটারে 'মাই ফেয়ার লেডী' দেখেছিলাম...'

'লীডস যাওয়ার কথা মনে আছে?'

'সেই ডক্টর ঘোষের নতুন অস্টিনে চড়ে গিয়েছিলাম। মনে থাকবে না?'

'আর ওয়াই-এম-সি-এ'তে একদল আলজেরিয়ান ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে...'

হাসতে হাসতে দেবব্রত বললো, 'সত্যি অমন পাগলের মতো সারারাত ডান্স কোনোদিন করিনি।'

'তবে ছেলেগুলো সত্যি খুব ভদ্র ছিল।'

'নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। তবে মোস্ট ইন্টারেস্টিং ছিল সেই রোমান্টিক ফ্রেঞ্চ ফটোগ্রাফার ছেলেটি।'

'দ্যাটস্ রাইট! তাহলে দেখছি আপনার সব কিছু মনে আছে।'

'সব কিছুই যে মনে থাকে সেইটাই তো বিপদ।'

'বিপদ কেন?'

দেবু একটু শুকনো হাসি হাসল, 'সব কিছু ভুলে গেলেই ভালো হতো।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কি ব্যাপার? মানের মধ্যে কিছু অভিমান জমা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?'

'আপনি জামা-কাপড় চেঞ্জ করে নিন। তারপর কথা হবে।

জামা-কাপড় পাল্টে একটু বাথরুম থেকে ঘুরে এসেই দেবুর সামনের সোফায় বসলাম। প্রস্তাব করলাম, 'সুড উই হ্যাভ সাম হুইস্কি?'

দেবু সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা হোয়াইট হর্সের বোতল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'উইথ কাইন্ডেস্ট রিগার্ডস!'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'একি। আপনি আনলেন কেন?'

'ক্ষতি কি? এখন তো আমি ছাত্র নেই, চাকুরি করছি!'

'তাহলেও আপনার আনা ঠিক হয়নি।'

'কেন?'

'আমি আপনাকে আসতে বলেছি, খেতে বলেছি, সো ইট ইজ মাই ডিউটি টু এন্টারটেন ইউ।'

'আমার সঙ্গে ফর্মালিটি করার দরকার নেই। এর আগে যতবার আপনার এখানে এসেছি প্রত্যেকবারই আপনি আমাকে যথেষ্ট এন্টারটেন করেছেন। এবাঁর না করলেও অন্যায় হবে না।'

'হবে না?'

'অফ কোর্স নট!'

শেষ পর্যন্ত বোতল খুলে দুটো গেলাসে ঢেলে শুরু হলো, চিয়ার্স।

'চিয়ার্স।'

শুরু হলো কথাবার্তাও। হুইস্কির গেলাসটা নামিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এখানে চাকরি নিলেন কবে।

'দু বছর হয়ে গেল।'

'হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরের চাকরি ছাড়লেন? ওখানে তো ভালোই ছিলেন।'

'শুধু ব্যাঙ্গালোরের চাকরি নয়, সব কিছুই ছেড়ে দিলাম।'

'তার মানে?' গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েও নামিয়ে নিলাম।

'তার মানে সত্যিই সব কিছু ছেড়ে এসেছি। আই মীন স্ত্রী-পুত্র, ঘর বাড়ি দেশ—সব কিছু।'

'কি আজে-বাজে কথা বলছেন?' একটু শাসন করার সুরেই বললাম।

'এখন তো হাফ পেগ হুইস্কিও পেটে যায়নি। আজে-বাজে কথা বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? তাছাড়া এখন এই পুরো বোতল হুইস্কি খেলেও আমি মাতাল হবো না।'

'আপনি কি আজকাল খুব ড্রিঙ্ক করেন?'

'খুব করি কিনা জানি না, তবে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ড্রিঙ্ক করি।'

'এত ড্রিঙ্ক করে টাকা পয়সা নষ্ট করছেন কেন? রোজ ড্রিঙ্ক করবেন না।'

'মানি ইজ নো প্রবলেম...'

'কেন?'

'একটু লেখাপড়া শিখেছি বলে বেশ ভালোই রোজগার করি। এর সিকি ভাগ আয় করে লোকে সংসার চালিয়েও বাড়ি-গাড়ি করছে।'

'আপনি গাড়ি কেনেননি?'

আমার গেলাসের অর্ধেকও শেষ হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে ওর ড্রিঙ্ক শেষ। নিজেই আবার গেলাস ভরে নিলো। তারপর এক চুমুক দিয়ে বললো, 'ওসব ঝামেলায় আমি আর নেই। একবার স্ত্রী-পুত্রকে যখন চিরকালের মতো ছাড়তে পেরেছি তখন...'

কথাগুলো শুনতে ভারি খারাপ লাগল। বললাম, 'আবার আজে-বাজে কথা বলছেন।'

'সত্যিই বাজে কথা বলছি না। অন্তত আপনাকে নিশ্চয়ই বাজে কথা বলব না।'

'আমি তো তাই আশা করি।'

'দাদা মারা গিয়েছেন জানেন তো?'

'উনি তো ব্যাঙ্গালোরেই মারা যান?'

'হ্যাঁ।'

'সব কাগজেই তো সে খবর ছাপা হয়েছিল।'

'আমার শাশুড়িও মারা গিয়েছেন...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ইন ফ্যাকট দাদা মারা যাবার ঠিক মাস খানেক আগেই উনি মারা যান!'

'কি হয়েছিল জয়ন্তী বৌদির?'

'ক্যান্সার। ধরা পড়ল একেবারে লাস্ট স্টেজে।'

বৌদির মৃত্যুর খবরটা শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ল ওয়াশিংটনের কথা, কায়রোর কথা। আরো কত কি! বড় ভালোবাসতেন আমাকে।

পৃথিবীর সব মানুষ ভালোবাসা চায়, কিন্তু খুব কম, মুষ্টিমেয় মানুষই ভালোবাসতে পারে। মানুষের সব চাইতে বড় সম্পদ প্রেম ভালোবাসা। সেই প্রেম, সেই ভালোবাসা, মনের সব চাইতে বড় ঐশ্বর্য অপরিচিত মানুষকে তো দূরের কথা নিজের প্রিয়জনদেরও সবাই বিলিয়ে দিতে পারি না আমরা। বৌদি পারতেন। অনায়াসে পারতেন। মানুষকে ভালোবাসতে জয়ন্তী বৌদির কার্পণ্য ছিল না। আমেরিকা থেকে চলে আসার দিন নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে ওঁকে বললাম, 'লোকে এখানে এসে কত কি জিনিস সওদা করে, কিন্তু আমার মতো বিনা পয়সায় এমন সওদা করে নিয়ে যেতে পারে কজন?'

'কি আবার সওদা করলে? কিছুই তো কিনলে না।'

'আপনাদের ভালোবাসার যে সওদা করে নিয়ে যাচ্ছি তার চাইতে...'

'ভালোবাসতে জানলে ভালোবাসা পাওয়া যায় ভাই। তুমি ভালো না বাসলে কি আমরা ভালোবাসতাম?'

আমি তর্ক করলাম না। সময় ছিল না, কিন্তু আসলে উনি ঠিক উল্টো কথাটাই বললেন। ভাদ্দরের অন্ধকার আকাশে সামান্য একটু বিদ্যুৎ চমকের মতো তর্জন গর্জন, কিন্তু কতটুকু তার আলো? কতক্ষণই বা তার মেয়াদ। আর সূর্য? অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে সে মহাতপস্বী সাধকের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়, পৃথিবীর দশ দিকে নিজের সবটুকু আলো ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু তার কোনো তর্জন-গর্জন নেই। সুভাষদা আর জয়ন্তী বৌদি ভালোবাসার মাধুর্য আপন চারিত্রিক মহিমায় আমাকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

কায়রো থেকে আসার আগে বৌদির কাছে একটা ফটো চাইলাম।

'আমার ছবি নিয়ে কি করবে ভাই?'

'কি আর করব? আমার কাছে থাকবে। মাঝে মাঝে দেখব, কথা বলব।'

'আমার আলাদা ছবি রাখতে হবে না। ছবি দেখে জোর করে আমাকে মনে করতে হবে না। যদি এমনি আমাকে মনে রাখতে না পার, তাহলে মনে রেখো না।'

অনেকবার অনুরোধ করলাম, কিন্তু কিছুতেই উনি ওঁর একটা ছবি দিলেন না। সেদিন ঠিক খুশী হইনি। পরে বুঝেছিলাম সত্যি ওঁর ফটো রাখার দরকার নেই, ওঁর সান্নিধ্য যারা পেয়েছে তাদের কাছে ওঁর স্মৃতি অম্লান রইবেই।

বড় অপরাধী মনে হলো নিজেকে। ওঁরা কলকাতা চলে যাবার পর কতবার কলকাতা গেছি, কিন্তু একবারও দেখা করিনি। সাহস হয়নি। ভয় করেছে যদি কথায় কথায় বেরিয়ে যায় রমা আমাকে...

পারিনি। কিছুতেই পারিনি। প্রত্যেকবার ফেরার পথে মনে হয়েছে অন্তত একবার কয়েক মিনিটের জন্য অবশ্যই যাওয়া উচিত ছিল। ভীষণ অন্যায় হয়েছে। এর পরের বার কলকাতায় গিয়ে নিশ্চয়ই দেখা করব। পরের বার গিয়েও পারিনি। হেরে গেছি।

'বৌদি মারা গেলেন আর সুভাষদা আমাকে একটা খবর দিলেন না?' নিজেই যেন নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

দেবব্রত বললো, 'উনি এত বেশি আঘাত পেয়েছেন যে, চিঠিপত্র লেখা তো দূরের কথা, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না।"

আমি চুপ করে বসে রইলাম। একটা কথা বলতেও মন চাইল না। সুভাষদা আর বৌদির চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ওর কথায় চমক ভাঙল, 'রঞ্জনার ছেলে হয়েছে, জানেন তো?'

'কই না তো!'

'এই তো একটু আগেই বললাম স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসেছি, শোনেননি?'

'স্ত্রীকে ছেড়ে এসেছেন শুনেই মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। ইন এনি কেস, কনগ্রাচুলেশনস।'

'আমাকে নয়, রঞ্জনাকে কনগ্রাচুলেট করবেন।'

'ওর সঙ্গে দেখা হলে ওকে কনগ্রাচুলেট করব। এখন তো আপনাকেই করি। ইউ আর দ্য প্রাউড ফাদার...'

দেবব্রতর সুন্দর মুখখানা যেন হঠাৎ শুকিয়ে পাংশু বর্ণ হয়ে গেল মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'আই অ্যাম নট...'

আমার পিঠের উপর যেন একটা চাবুকের বাড়ি পড়ল। হুইস্কির গেলাসটা খুব জোরে সেন্টার টেবিলে রেখে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'হোয়াট?'

ধীর, স্থির, শান্ত দেবব্রত আবার মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'আমি ঐ ছেলের বাবা না।'

টেবিল চাপড়ে আমি পাগলের মতো চিৎকার করে বললাম, 'স্টপ টকিং ননসেন্স।'

আমার চিৎকারে দেবব্রত একটু থতমত খেয়ে মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না। বেশিক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। দৃষ্টিটা আবার ঘুরিয়ে আনতেই দেখি দেবব্রতর দুটো চোখ জলে ভরে গেছে। 'বিশ্বাস করুন দাদা, আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলছি না, ভগবানের নামে মা কালীর নামে শপথ করে বলছি ও ছেলে আমার নয়।'

'কিন্তু দেবুবাবু, রঞ্জনা তো এমন কাজ করতে পারে না। আমি তা ওকে খুব ভালোভাবে চিনি।'

'আমি জানি রঞ্জনা ভালো। রঞ্জনা আমাকে ভালোবাসে। তবে একথাও জানি ও ছেলের জন্মদাতা আমি না।'

আমি স্বীকার করতে পারলাম না, 'এ হতে পারে না, এ অসম্ভব।'

'এই পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'তা ঠিক! তবুও...'

'আমার দাদা ডক্টর দেবতোষ চৌধুরীই ঐ ছেলের...'

'আঃ। দেবুবাবু। আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?'

দেবু উন্মাদ না হলেও প্রায় পাগলের মতো হেসে উঠল, 'হইনি। হলে ভালোই হতো।'

বেশ রেগে আমি ওকে বললাম, 'গেট রিড অব অল দিজ ডার্টি আইডিয়াস।'

'আই উইস, আই কুড, কিন্তু যা বলছি তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। রঞ্জনা নিজেও স্বীকার করেছে।'

'বলেন কি?'

'হ্যাঁ। ও স্বীকার করেছে।'

দুজনেই গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি খেয়ে গেলাম। কিন্তু একটি কথা বললাম না কেউই। অনেকক্ষণ। বোধহয় ঘণ্টাখানেক। বা তারও বেশি।'

'আমার বড় দাদু ডাঃ জনার্দন চৌধুরীর কথা আপনার মনে আছে?'

'যিনি কাপুরতলার মহারাজার...'

'দ্যাটস রাইট। হি ওয়াজ এ গ্রেট ম্যান। কিন্তু আমার নিজের দাদু গদাধর চৌধুরী এক নম্বরের স্কাউন্ড্রেল ছিলেন। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সিমলার এক পাহাড়ি মেয়েকে নিয়ে ঘর করতেন।'

আমি চুপ করে শুনছি। তখনকার দিনে অনেক বাঙালিবাবুই এ কাজ করতেন। শুনে অবাক হলাম না।

'আমরা ওঁর ঐ রক্ষিতারই বংশধর।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার বাবাকে বড় দাদুই মানুষ করেন এবং তিনি নিছক একজন ভদ্রলোক ছিলেন। বড় দাদুই আমার বাবার বিয়ে দেন এবং আমরা হই।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'আর কি শুনব আপনার কাছে?'

'দাদুর এসব কথা কাউকে বলি না। ভেবেছিলাম বলার দরকার হবে না। কিন্তু দাদার কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে রক্তের ধারা পাল্টান বড় কঠিন। বোধহয় অসম্ভব।'

'জানি না।'

'আমার এক কাকা—আই মীন ওই পাহাড়ি মেয়েটির ছোট ছেলে—দিল্লিতে আন্ডার সেক্রেটারি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাদের অনেক পরিচিত লোক এমনি পাহাড়ি মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে করতে...'

'থাক, আর দরকার নেই। রঞ্জনা কি দিল্লিতেই আছে?'

'হ্যাঁ। দোতলায় থাকে। একতলা ভাড়া দিয়ে এগার শ' টাকা পাচ্ছে।'

'টাকার হিসেব শুনতে চাইনি।'

'এমনি বলছিলাম। ওর সম্পর্কে আপনার চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।'

'চিঠিপত্রের লেনদেন নেই নিশ্চয়ই?'

'না। তবে পর পর কয়েকবার টাকা পাঠিয়েছি, কিন্তু ও নেয়নি।'

'না নেওয়াই তো উচিত।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর দেবব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি পরশুই যাচ্ছেন?'

'কেন? আরো কিছু শোনাতে চান?'

দেবব্রত উঠে দাঁড়াল। আমিও। ও একবার আমার দিকে তাকিয়েই দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমার উপর রাগ করবেন না। আমি বড় দুঃখী। আমি বড় একা।'

আমিও ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, 'রাগ করিনি ঠিকই তবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভালো হতো।'

আমার কাঁধের উপর ফোঁটা ফোঁটা ওর চোখের জল পড়ছিল। 'হয়তো আপনার ভালো হতো, কিন্তু আপনাকে সব কিছু বলে একটু হালকা হতে পারলাম।'

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'বাড়ি যান। অনেক রাত হয়েছে।'

'যাচ্ছি।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানেই থাকবেন না কি দেশে ফিরবেন?'

'দেশে ফেরার ইচ্ছা নেই। এখানেই বেশ আছি।'

'বেশ আর কোথায় আছেন?'

'যারা দেশে সুখে থাকতে পারে তারা কেউ লন্ডনে আসে না। আসবে কেন? পৃথিবীর যত দুঃখী লোকের ভিড় তো এই লন্ডনে। আমিও ওদের মধ্যে দিনগুলো ঠিক কাটিয়ে দেব।'

অনেক দিন বিদেশে কাটিয়ে দিল্লি ফিরলাম। রাধাকিষণকে আগেই খবর দিয়েছিলাম। ও এয়ারপোর্টেও এসেছিল। পালাম থেকে বাড়ি ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু জরুরী খবর আছে নাকি?'

রাধাকিষণ বললো, 'অনেক চিঠিপত্র এসেছে আর চৌধুরী মেমসাব এসেছিলেন।'

'কবে এসেছিলেন?'

'তিন-চার দিন।'

'কিছু বলে গেছেন?'

'জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কবে আসবেন, আর একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।'

'উনি জানেন আমি আজ আসছি?'

'হ্যাঁ সাব। আমি বলেছি।'

'চিঠি কবে দিয়ে গেলেন?'

'আজই।'

বাড়িতে এসেই রঞ্জনার চিঠি পড়লাম।...'যত রাত্রিই হোক একবার আমার এখানে আসবেন।'

হাতের ঘড়িতে দেখলাম দশটা বেজে গেছে। মিনিট খানেক ভাবলাম। তারপরই একটা ট্যাকসি নিয়ে চলে গেলাম।

আমি ট্যাকসি থেকে নামতেই দেখি রঞ্জনা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাকসি ছেড়ে দিলাম না, ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বললাম।

এক পা এগুতেই রঞ্জনা বললো, 'আসুন।'

আমি একটি কথা না বলে ওর পিছন পিছন উপরে উঠলাম। সামনের ঘরে ঢুকতেই বললো, 'বসুন।'

বসলাম।

পাশের ঘর থেকে ছেলেকে কোলে করে এনে আমার সামনেই বসে পড়ে বললো, 'আজ এর জন্মদিন। আপনি যদি একটু আশীর্বাদ করতেন...'

রঞ্জনা আর কথা বলতে পারল না।

আমি ওর কোল থেকে ছেলেটাকে দু হাতে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম।

আমার পায়ের উপর রঞ্জনার কয়েক ফোঁটা গরম চোখের জল পড়তেই ওকেও আমি বুকের মধ্যে টেনে নিলাম।